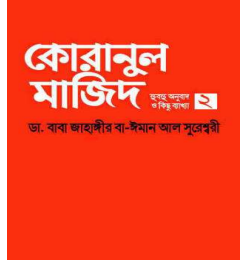
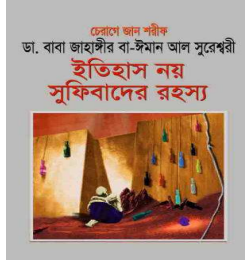
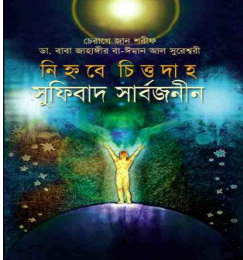
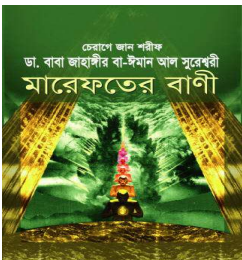
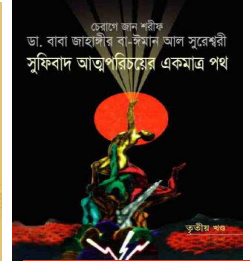
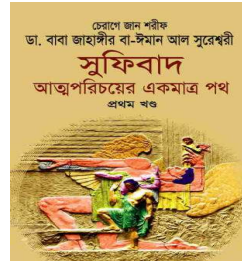
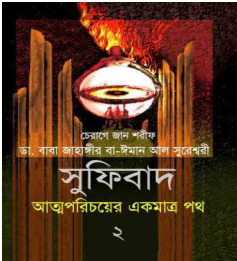
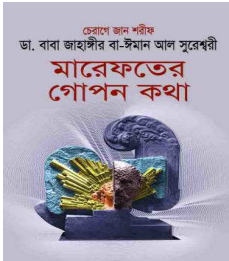
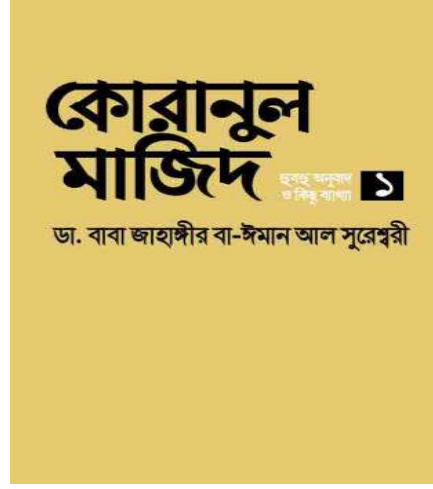




চেরাগে জ্ঞান শরীফ ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি





কোরানুল মাজিদ

১

হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
 প্রযোজ্য : বে-দমান হোমিও হল
 ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
 ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১১১২৮১৬৯

সূচি

নফস ও রুহের পার্থক্য /	১১
১নং সূরা : ফাতিহা /	৩৯
২নং সূরা : বাকারা /	৪০
১৯নং সূরা : মরিয়ম /	২৯৪
২০নং সূরা : তায়াহা /	৩১৩
২১নং সূরা : আশ্বিয়া /	৩৩৬
২২নং সূরা : হজ্জ /	২৮৫

চিহ্ন পরিচিতি

- বাক্যে আয়াতের অনুবাদ
- + আয়াতের পরবর্তী অংশের শব্দার্থ ভিত্তিক অনুবাদ
- ব্যাখ্যা

নফস ও রুহের পার্থক্য

নফস শব্দটি দিয়ে প্রাণকেই বোঝানো হয়েছে। যদিও হিন্দুশাস্ত্রে নফসকে আত্মাই বলা হয়েছে তবে জীবের আত্মা বলা হয়েছে। এই নফস তথা প্রাণ কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের মধ্যেই দেওয়া হয় নি, বরং স্থলচর, জলচর, সর্বপ্রকার অতিক্রম হতে অতি বড় জীব – সবারই নফস আছে তথা প্রাণ আছে।

আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, বন্ধ হতে তরু-লতারও প্রাণ আছে। এবং যে কতিন ছোট-ছোট পাথরগুলো আস্তে-আস্তে প্রকাণ্ড পাথরে পরিণত হয় উহাতে কি প্রাণ আছে? নাকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাআপনি বেড়ে চলে? এই প্রশ্নটির উত্তর জীববিজ্ঞানীরাই ভালো দিতে পারবেন। তবে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাঝে যাদেরকে নফস তথা প্রাণ দেওয়া হয়েছে তারা সবাই তওহীদে বাস করে – একমাত্র জিন এবং মানুষ ছাড়া। কারণ জিন এবং মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে। তথা ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করার সীমিত স্বাধীন ক্ষমতাটি আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয়েছে। অন্যথায়, আমাদের জানা মতে আর কোনো জীবকেই এই রকম সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় নাই। স্থলচর এবং জলচর যত প্রকার অসংখ্য ছোট এবং বড় প্রাণী আছে তাদের কারও শাহারগের তথা জীবন-রণের নিকটে আল্লাহর অবস্থান করার কথাটি কোরান-এ পাওয়া যায় না, এমনকি আল্লাহ তার সমগ্র সৃষ্টিজগতের জড় পদার্থের সঙ্গে অবস্থান করার কথাটিও পাওয়া যায় না। অকের হিসাবের চেয়েও অনেক বেশি হিসাব করে আল্লাহ কোরান-এর প্রতিটি শব্দ চয়ন করেছেন। কিন্তু আমাদের বুঝবার সক্ষম দুর্বলতাটিকে প্রকাশ না করে গোজামিলের আশ্রয় নেই এবং নিতে হয়। যেমন রুহ শব্দটির পরিভাষা ইংরেজিতে পাওয়া যায় না। তাই না বুঝে ‘স্পিরিট’ শব্দটি ব্যবহার করি।

রুহের প্রতিশব্দ যদিও আমরা পাই না তবে হিব্রুশাস্ত্রে এই রুহ শব্দটিকে পরমাত্মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে পরম অর্থটি হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর আত্মা বলে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কোরান-এ রুহকে বলা হয়েছে “কলুর রুহ মিন আম্মরি রাব্বি” - অর্থাৎ, “রুহ আমার রবেরই আদেশ হইতে আগতি।”

জীবের জীবন আছে তথা প্রাণ আছে তথা নফস আছে - তাহলে এই জীবন, এই প্রাণ এবং এই নফসকে কেমন করে আত্মা বলে ঘোষণা করি? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাও একটি সাংঘর্ষিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে এবং বোঝাতে কোনো উপায় থাকে না বলেই এই সাংঘর্ষিক বিষয়টি তুলে ধরতে হয়। কেউ জেনে-গুনে তুলে ধরেন, আবার কেউ না-জেনে তুলে ধরেন। বিষয়টি ভুল হলেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ জ্ঞানের অভাবেই এ বকমটি হয় বলে মনে করি। জীবের প্রাণ আছে, কিন্তু কোনো আত্মা নাই - এই কথাটি কেমন করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরব? আসলে হাকিকতে কোনো জীবেরই আত্মা নাই - একমাত্র জিন এবং মানুষের শাহারগের তথা জীবন-রগের নিকটে অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, যাঁহা টের পাবার কোনো উপায় থাকে না সেই পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত না একজন মানুষ একটানা কয়েক বছর ক্যামেল গুরু অথবা ক্যামেল গুরুর খেলাফতপ্রাপ্ত কোনো খলিফার নির্দেশে নিজের স্থানে একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে। কারণ রুহ বিষয়টি কথার দ্বারা বোঝানো যায় না। তবে অতি সামান্য একটি ধারণার ছায়া দেওয়া যায়। কোরান-এর এই ছোট্ট আয়াতটির দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখুন যে, ‘কলুর নাকসি মিন আম্মরি রাব্বি’ বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? কারণ আল্লাহর কোনো নফস নাই। নফস যাদের আছে তাদের অবশ্যই একটি বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু রুহ রবেরই আদেশ বলা হয়েছে সেই-হেতু রুহ জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তে তথা বলয়ে অবস্থান করে না। যেহেতু রবের আদেশটি হলো রুহ এবং এই রুহ নামক আদেশটি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে (অবশ্য আমাদের জানা মতে, কারণ অন্য গ্রন্থে যদি এই জাতীয় কোনো জীব থেকে থাকে!) কেবলমাত্র দুটি জীবের সঙ্গে তথা দুইটি নফসের কাছাকাছি অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সেই দুইটি জীবের নাম হলো : একটি জিন এবং অপরটি মানুষ। যেহেতু আমাদের কাজ-কারবার মানুষদের নিয়েই সেই হেতু ইচ্ছা করেই জিন জাতিকে এড়িয়ে যাই। তাছাড়া কোরান এই মানুষকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব (ক্রাউন অব দ্য ক্রিয়েশন) বলে ঘোষণা করেছেন। এরপরেও আরও কিছু কথা থাকে আর সেই কথাটি হলো, শয়তানকেও আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে জিন এবং মানুষের অন্তরে অবস্থান করার আদেশটি আল্লাহ কতক দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে যে জিন এবং মানুষের অন্তরে বিহনে আর কোথাও শয়তানকে অবস্থান করার অনুমতিটি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং শয়তানের যত বাহাদুরি, যত নতুন-কুদন সব কিছু এই জিন এবং মানুষের অন্তরের মধ্যেই অবস্থান করে। জীগতিক সভ্যতার বিকাশ ঘটানোর পেছনে এবং ধ্বংসের বিভীষিকা ছড়ানোর পেছনে শয়তানের অবদান কতটুকু তা আমাদের জানা নাই। এই শয়তান আবার চারটি রূপ ধারণ করতে পারে এবং এই চার রূপের যে-কোনো রূপ ধারণ করে মানুষকে সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত পথে ঠেলে দেয়। সেই চারটি রূপ হলো : এক. শয়তান, দুই. ইবলিস, তিন. মরদুদ এবং চার. খান্নাস। যেহেতু ‘মিন শাররিল্ ওয়াসওয়াসিল খান্নাস’ তথা খান্নাসের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাওয়ায় কথাটি কোরান-এ বলা হয়েছে তাই পবিত্র নফস তথা প্রাণ তথা জীবনের সঙ্গে একত্রে বাস করে নফসটিকে খান্নাসরূপী শয়তান মোহ-মায়ায় জালে আটকিয়ে রাখে। এই মোহ-মায়ায়

জালটিকে ছিন্ন করতে পারলেই নফসের নিকট যে-রুহ অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করছে উহা তখন পরিপূর্ণরূপে ধারণ করতে থাকে। সাধকেরা একটানা ধ্যানসাধনা করার পর আল্লাহর বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হলেই রুহের অতীব সূক্ষ্ম রূপটিকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পেয়ে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব খেয়ে যায়। এই পরিপূর্ণতার প্রসঙ্গে সাধকদের নিকট রুহের দর্শনে ফানা-বাকার এমন রহস্যময় লীলাখেলা চলে যে সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বরং বড়-বড় বিদ্বান পণ্ডিতেরাও এদের বিষয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। রুহের পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থানটি যে-সাধকের মধ্যে অবস্থান করে তিনিই বান্দানেওয়াজ তথা আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত বান্দা। তিনিই রুহুল্লাহ তথা পরিপূর্ণ রুহের অধিকারী। তিনিই ওয়াজহুল্লাহ তথা তিনিই আল্লাহর চেহারা। তিনিই নরের রূপে নারায়ণ তথা নরনারায়ণ। আল্লাহর এই দানটি একমাত্র শক্তিশালী রাব্বিতে দান করা হয়। ইহা কোনো নৈসর্গিক রাব্বি নহে, বরং আধ্যাত্মিক রাব্বি। নফস এবং খান্নাস জোড়া হলে এই শক্তিশালী রাব্বির সঙ্কলন পাওয়া যায় না। তাই খান্নাসকে তাড়িয়ে দিয়ে সাধক যখন বেজোড় রাব্বিতে অবস্থান করে তখনই সেই রাব্বিটি হয় শক্তিশালী রাব্বি এবং এই শক্তিশালী রাব্বিই আল্লাহ 'রহিম'-রূপটি ধারণ করে (রহমান-রূপে নয় কারণ রহমান-রূপে সাধারণ দান) দান করেন। তাই আল্লাহ এখানে গফুরর রহিম, কিন্তু গফুরর রহমান নন, কারণ কোরান-এর একটি স্থানেও গফুরর রহমান ব্যবহৃত হয় নি।

কোরান-এর ৯৭ নম্বর সূরা কদর-এর ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: *তানাজ্জালুল মালাইকাত ওয়াহ রুহ ফিহা বিইজ্জনি বাব্বিহিম মিন কুল্লি আম্মরিন* - অর্থাৎ, "তাহার মধ্যে (সেই রাব্বিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেশতাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে।"

সাধকেরা যখন বিরাট ধৈর্যধারণ করে একটানা নির্জন ধ্যানসাধনা করতে থাকেন (মহানবির হেরাণ্ডহায় পনের বছর ধ্যানসাধনাটি মনে রেখে) তখন সাধকদের মধ্যে অবস্থান করা রব তথা প্রতিপালকের প্রত্যেক আদেশ হতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। এই ফেরেশতাগণ এবং রুহ শক্তিশালী বেজোড় রাব্বিতে অবতরণ করে, কারণ জোড় রাব্বিতে সাধকের সঙ্গে তখনও খান্নাসরূপী শয়তানটির সামান্য অবস্থানেও দুইজন হয়ে যায় এবং এই দুইজন হওয়াকেই জোড় বলা হয়। এবং দিনে না বলে রাব্বিতে কেন বলা হলো? দিনের আলোতে সব কিছু যেমন পরিষ্কার দেখা যায় তেমনি রাব্বির অঙ্ককার সব কিছু ঢেকে দেয়। এই রাব্বির অঙ্ককারের সব কিছু ঢেকে দেবার কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দর্শনীয় সব রকম মোহমায়াগুলো আল্লাহর অনুমতিতে ঢেকে দেওয়া হয়। রাতের আধার যে রকম সব কিছু ঢেকে দেয় তেমনি সাধকের ডেতরে অবস্থান করা লোভ-মোহ মায়াগুলো আল্লাহর অনুমতিতে ঢেকে দেওয়া হয় এবং যখনই ঢেকে দেওয়া হয় তখনই ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। এই ফেরেশতাগণ এবং রুহ যে-রাতেরই আল্লাহর অনুমতিতে অবতরণ করে সেই রাতটিকে বেজোড় এবং শক্তিশালী রাব্বি বলে অখ্যায়িত করা হয়। হাকিকতের সঙ্গে মেজাজি কথাগুলোর কী অপূর্ব মিলন ঘটানো হয়েছে কোরানুল হাকিম-এ। এখানে একটি লুক্ক করে দেখুন তো যে ফেরেশতাগণ এবং নফস নাজেল করার কথাটি বলা হয় নি। প্রথমে ফেরেশতাগণ এবং পরে রুহের কথাটি বলা হয়েছে, কারণ ফেরেশতাদের নফসও নাই রুহও নাই এবং থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না কারণ ফেরেশতারা যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মোটেও বলা হয় নি, বরং ফেরেশতাদেরকে আমরা সেবকের ভূমিকায় দেখতে পাই, মণ্ডলার ভূমিকায় নয়। ফেরেশতারা সেফাতি নূরের তীর তাই ফেরেশতারা

সৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত তথা সিদ্দরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত যাবার অনুমতি পেয়েছে। অনেক অনুবাদক না-বুঝে, নী-পুনে রুহকে জিবরাইল ফেরেশতা বলে অনুবাদ করেছেন। সহজ-সরল পাঠকের এ রকম খাঙ্গা অনুবাদ পড়ে-পড়ে অস্টি থাকার কথা নয় এবং তখনই এক ইসলামের মধ্যে ফেরকাবাজি শুরু হয়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিকতার অন্ধকার গম্বরে নিরপেক্ষ দর্শনটি হারিয়ে যায়। অনেকে তো কোরানুল হাকিম-কে ডাল-ভাতের মতো সহজ মনে করে থাকে এবং বিকৃত অনুবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্যায় ভরপুর করে রাখে এবং এই বিকৃত অনুবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্যা পড়ে-পড়ে সরল-সহজ মানুষটির মনের অবস্থানটি কেমন হয় তাহা কমবোশি সবাই বুঝতে পারে। নিউটন, আইনস্টাইন, নিলস বোর এবং স্টিফেন হকিং-এর মতো অসংখ্য জ্ঞানীপুণিদের জন্য যদি কোরানুল হাকিম শিক্ষণীয় বিরাট একটি বিষয় না হতে পারে তাহলে আমাদের মতো অল্প বিদ্যায় বিদ্বানেরা এই প্রশ্নের কী উত্তর দেয়?

সূরা মোমিন-এর ১৫ নম্বর আয়াতে রুহ সঙ্ক্ষে বলা হয়েছে : *ইউনকির* (নিষ্ক্রেপ করেন, ক্রেপণ করেন, সম্মুখে স্থাপন করেন, অর্পণ করেন) *রুহা* (রুহকে, পুরমাত্মাকে) *মিন্* (হইতে) *আমরিহি* (তাহার আদেশে) *আলা* (উপর) *মাহু* (যাহাকে) *ইয়াশাউ* (ইচ্ছা করেন)।

অর্থাৎ, "নিষ্ক্রেপ করেন রুহ তাহার আদেশ হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন।"

এই আয়াতে রুহকে নিষ্ক্রেপ করার কথাটি বলা হয়েছে তথা রুহকে ক্রেপণ করা হয় বলা হয়েছে। এই রুহকে ক্রেপণ করার কাজটি করা হয় তার (আল্লাহর) আদেশ হতে যার উপর তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করেন। আল্লাহর ইচ্ছার উপযুক্ত বান্দা হতে পারলেই সেই বান্দার উপর তার আদেশ হতে রুহ নিষ্ক্রেপ করা হয়। অবশ্য আল্লাহর তৈরি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রুহকে অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে তথা প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ প্রতিপালকরূপে তথা রবরূপে বিরাজ করছেন। সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না যে আল্লাহ তারই ভেতর রবরূপটি তথা প্রতিপালকের রূপটি ধারণ করে অতীব সূক্ষ্ম রুহরূপে বিরাজ করছেন। তাই *মানুষ নিজের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সত্যটিকে বুঝতে না পেরে উর্ধ্ব গগনে আল্লাহর অবস্থানটি আছে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভাষাটি বলতে থাকে।* সাধক যখন নিজনে একাকী মাসের পর মাস বিরাট ধৈর্যধারণ করে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে তখন এই মগ্ন অবস্থার মাঝেই একদিন না একদিন আল্লাহরই আদেশ হতে তথা আল্লাহর বিশেষ রহমতে এই রুহকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায় এবং মেজাজি সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

আসলে সাধকের অন্তরে যে পর্যন্ত দুইয়ের অবস্থান বিরাজ করে তথা পবিত্র নফস যোগ খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে একত্রে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত রুহের আসল পরিচয়টি লাভ করা যায় না। আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার গভীরতাটি সমভাবে সবার বেলায় প্রযোজ্য হয় না। কারও অন্তর সময়েই হয়ে থাকে, আবার কারও-বা বেশ কিছু সময় লাগে, আবার কারও-বা দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে। যেইমাত্র পবিত্র নফসটি অপবিত্র খান্নাস হতে মুক্তি লাভ করে তখনই রুহের আসল পরিচয়টি জানতে পারে এবং এই জ্ঞানটি আল্লাহর আদেশ হতেই আগত। তাই সাধকের কাছে মনে হবে যে, এই রুহকে নিষ্ক্রেপ করা হয়েছে।

এই রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটিকেই আমরা তথা মুসলমানেরা নুরে মুহাম্মদির দর্শন বলে থাকি। আবার অন্য যে-কোনো ধর্মের যে-কোনো সাধক যদি পরিপূর্ণ রুহের দর্শনটি লাভ করে থাকেন আর যদি সেই ধর্মের প্রবর্তকের নামে নুরটির নামকরণ করে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছু থাকে না। কারণ আল্লাহ এক, তার নুরও এক এবং বীজরূপী রুহের অবস্থানটিও এক।

এখানে দুইয়ের কোনো স্থান নাই। দুইয়ের স্থানটিকে স্বীকার করে নিলেই শেরেক করা হয়ে যায়। ইহাই আসল শেরেক। মুখের কথায় শেরেকের কোনো দাম নাই।

এই আয়াতে বর্ণিত রুহ শব্দটির মর্মার্থ বুঝতে না পেরে অনেক অনুবাদক এই রুহকেই 'ওহি' অনুবাদ করেছেন। কোথায় রুহ আর কোথায় ওহি! আল্লাহ কি রুহের স্থলে ওহি শব্দটি বলতে পারতেন না? অবশ্য না বোঝার কারণেই এ রকম গৌজামিল দাঁড় করানো হয়। তবু একটি বারের তরেও এই অনুবাদকারীরা ভুলেও বলতে চাইবেন না যে ইহার অর্থটি জানা নাই। ইনারা সব কিছু জানেন, তাই রুহকেও প্রয়োজনে ওহি লিখে ফেলেন। সুতরাং এ রকম অনুবাদ পড়ে আপনি আর আমি যে কত রকম ভুল শিখছি তারও হিসাব নাই। যেমন কোরান-এর সূরা বানি ইসরাইল-এর ৭৮ নম্বর আয়াতের কোরানকে প্রায় অনুবাদকারী 'নামাজ' অনুবাদ করে ফেলেছেন এবং কোরানকে নামাজ অনুবাদ করার কারণটির একবোঝা ব্যাখ্যা আর বিশেষণ আপনাকে আর আমাকে শুনিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। আবার এই 'রুহ' শব্দটিকেই অনেক অনুবাদকারী বুঝতে না পেরে রুহের অনুবাদে জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি যে জিবরাইল ফেরেশতা যতই মর্যাদার অধিকারী হুন না কেন, কিছু জিবরাইল ফেরেশতার মাঝে রুহও নাই এবং নফসও নাই। এ যেন অন্ধকে সুন্দর দুটি চোখের অধিকারী বলার মতো। এ যেন টুন্ডা ছেলেকে 'হাটিবার নূতন স্টাইল দেখানো হচ্ছে' বলে বোঝানো।

কোরান-এর ৭৮ নম্বর সূরা নাবা-র ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :
 ইয়াওম্মা (সেই দিনটিতে) ইয়াকুম্বর (দাঁড়াইবে) রুহ (রুহ) ওয়াল (এবং)
 মালাইকাতু (ফেরেশতারা) সাফফলিল্লা (সারিবদ্ধভাবে)।

অর্থাৎ, "সেই দিনটিতে রুহ এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে।"

এই আয়াতে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর তা হলো, রুহকেও দাঁড়াবার কথাটি বলা হয়েছে এবং রুহের সঙ্গে ফেরেশতাদেরও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নফসের দাঁড়াবার কথাটি বলা হয় নাই। অথচ নফসেরই দাঁড়াবার কথা। যে-সাধকের নফসটি খান্নাসমুজ্জ হয়ে পবিত্র হয়েছে সেই নফসটি তখন রুহের মহাশক্তির মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়। তখন মনে হয় নফস দাঁড়িয়ে আছে : আসলে রুহের মহাশক্তির মাঝে অবস্থান করছে। কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আপনি হুড়ে মারেন নি, বরং আমি (আল্লাহ) স্বয়ং হুড়ে মেরেছি। সাধারণ মানুষ হতে বিজ্ঞলোকেরা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে যে, মহানবি হাত দিয়ে হুড়ে মারছেন, অথচ আল্লাহ অস্বীকার করে বলছেন যে, ওটা আপনার হাত নয়, বরং ওটা আমার হাত। সেই রকম খান্নাসমুজ্জ রুহ-এর জাগ্রত পরিপূর্ণতায় নফসটি ডুবে থাকলে রুহের দাঁড়ানোর কথাটি বলা একান্ত স্বাভাবিক। এবং ফেরেশতাদের দাঁড়াবার বিষয়টি এখানে স্বাভাবিক একটি বিষয়। কারণ ফেরেশতারা নফস-ও রুহ-বর্জিত আল্লাহর সেকাতি নব্বের তেরি কুদরতি বোবট। কুদরতি বোবট এজন্যই বলা হলো যে ফেরেশতাদের ভালো এবং মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নাই, বরং আল্লাহ যে-হুকুমটি করবে উহাই পালন করতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতারাও দাঁড়াবে ইহাতে অরাক হবার কিছু নাই।

জাগ্রত রুহের অধিকারী সাধকেরা আকৃতিতে মানব হলেও মানবের স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি হতে সম্পূর্ণ বর্জিত অবস্থায় অবস্থান করে। এই জাতীয় সাধকদেরকে বান্দানেওয়াজ বলা হয়। আবার কখনো ওয়াজহলাহ বলা হয়। আবার কখনো সারাপা বলা হয়। আবার কখনো নব্বের রূপে নারায়ণ বলা হয়ে থাকে। কারণ এই সাধকেরাই আল্লাহর রূপটি ধারণ করে আছেন। এই জাতীয় অনেক সাধকেরা এক ও অভিন্ন। কারণ সব সাধকই একই নব্বের অধিকারী। এজন্য বিশেষভাবে আরেকটু লক্ষ করার মতো বিষয়টি হলো, রুহ

শব্দটি *কোরানুল হাকিম*-এ একটি বারের তরেও ব্যবহার করা হয় নাই। ইহারা সবাই মিলে 'আমরা'-রূপটি ধারণ করে। আসলে এই 'আমরা'ই এক ও অভিন্ন। এইখানে এসেই শেরেকের হয় অবসান। যদিও সাধারণ মানুষের পক্ষে এই বিষয়টি বোঝা একটু কষ্টকর বৈ কি।

কোরান-এ 'আমরা' নামক বহুবচনের ব্যবহারটিতে একটি বিস্ময়কর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এই বিস্ময়কর *কোরান*-এর সৌন্দর্যটি বুঝতে না পারলে তওহিদের আসল এবং রহস্যময় রূপটি উপলব্ধি করা প্রায় এক রকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আবার *কোরান*-এর অনেক অনুবাদক ফেরেশতাদের দাঁড়াবার কথাটি মেনে নেয়, কিন্তু তারপরেই রুহকে জিবরাইল অনুবাদ করে। জিবরাইলও যে একজন ফেরেশতা ইহা তারা জেনেও না জানার ভুল করে। আল্লাহ কি রুহের মূলে জিবরাইল নামক বিশেষ ফেরেশতার নাম উল্লেখ করতে পারতেন না? কিন্তু *কোরান*-এ রুহ শব্দটি ব্যবহার করলে কী হবে, অনুবাদে অনুবাদক রুহকে জিবরাইল ফেরেশতা অনুবাদ করে ফেলেন। কেন এই রকম করেন বলে প্রশ্ন করলে একবোঝা গোজামিল-দেওয়া কথা শুনিয়া দেবেন, তবু নিজেদের ভুলটি মোটেই স্বীকার করে নেবেন না, অথবা 'বুঝতে পারলাম না' বলে সংসীহস নিয়ে ঘোষণাও করেন না। এভাবে *কোরান*-এর কত শব্দের যে কত রকম বিকৃত অর্থের দ্বারা ভরে রাখে তারই বা প্রতিবাদ কে করে? এই রকম অনুবাদকদেরকে জ্ঞানপাপী বলতে চাই না, কিন্তু এ রকম করাটি কি বিদ্রাণ্ডি ছড়ায় না? এই রকম বিদ্রাণ্ডির যাতাকলে পড়ে কত সহজ-সরল মানুষেরা যে বিভ্রান্ত হচ্ছেন তারই বা খবর কে রাখেন? একটিবারের তরে চিন্তা করে দেখুন তো যে, প্রথমেই বলা হয়েছে ফেরেশতাগণ এবং তার পরে বলা হয়েছে রুহ, আর সেই রুহের অনুবাদটি করা হলো জিবরাইল নামক ফেরেশতা। অনুবাদক কি বেমানাম ভুলে গেছেন যে জিবরাইল ফেরেশতার রুহও নাই এবং নফসও নাই? যেখানে জিবরাইল ফেরেশতার রুহটি থাকার প্রশ্নই ওঠে না সেখানে রুহকে কেমন করে জিবরাইল ফেরেশতা বলে অনুবাদ করা হয়?

কোরান-এর ২১ নম্বর সূরা আশ্বিয়ার ৯১ নম্বর আয়াতে আছে : *ওয়া (এবং) লাতি (যে) আহসানতি (রক্ষা করিয়াছিল, সংরক্ষণ করিয়াছিল, বজায় রাখিয়াছিল, টিকাইয়া রাখিয়াছিল) ফারজাহা (তাহার কামপ্রবৃত্তিকে, তাহার সতীত্বকে, যৌন সম্বোগকে) ফানাফাখনা (সূতরা আমরা [আল্লাহ] ফৎকার দিয়াছিলাম) ফিহা (তাহার [মরিয়ম] মধ্যে) মিন (হইতে) রুহিনা (আমাদের রুহ) ওয়া (এবং) জাআলনাহা (তাহাকে বানাইয়াছিলাম) ওয়া (এবং) আবনাহা (তাহার পুত্রকে) আয়াতাল (একটি আয়াত [নিদর্শন] লিল (জন্য) আলামিন (সমস্ত আলমের, বিশ্ববাসীদের)।*

অর্থাৎ, "এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সূতরাং আমরা ফৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাহাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য।"

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, আল্লাহ কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই রুহ ফৎকার করেন না, বরং মানুষের তৈরি সমাজে অবহেলিত নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফৎকার করেন। নারী জাতিতে দুর্বল পেয়ে পুরুষেরা নারীদেরকে সমাজের বুকে তেমন মর্যাদা দেয় না, কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফৎকার করেন। যদি সেই নারী আল্লাহর দৃষ্টিতে রুহ ফৎকার করার উপযুক্ত হন তো অবশ্যই রুহ ফৎকার করা হয়। আমরা *কোরান* হতে জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রথম রুহ ফৎকারটি আদমের মধ্যে করেছিলেন। আরও একটি ভালো করে লক্ষ্য করুন যে, এখানে তথা এই আয়াতে নফস ফৎকার করার কথাটি বলা হয় নি এবং নফস ফৎকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আল্লাহর কোনো নফস

নাই। যেহেতু আল্লাহর কোনো নফসই নাই, সুতরাং ফৎকার দেবার প্রশ্নই ওঠে না। নফস জীবন-মৃত্যুর অধিনি। নফস স্থি-দুঃখ ভোগ করে। নফসের কান্দি-অবসাদ-ঘুম-আলস্য আছে। সুতরাং আল্লাহ এইসব বিষয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে তথা মৃত্যু-ঘটনাটির মুখোমুখি নফসটিকেই হতে হয় - যাকে আমরা বাংলায় জীবাত্মা বলে থাকি। প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে - বলা হয়েছে *কোরান*-এ, কিন্তু *কোরান* মৃত্যুতে নফসটি ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটি বলে নি। 'জায়েক' অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা, চেখে দেখা। মা-বোনেরা তরকারিতে লবণ হয়েছে কি না তরকারির গুরুয়া চেখে দেখলে বুঝতে পারেন। সেই রকম প্রতিটি নফসকে মৃত্যু-ঘটনাটি কেমন উহা চেখে দেখতে হবে। যেহেতু রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, রুহ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে না, সেই হেতু রুহের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি *কোরান*-এ একবারও বলা হয় নি। যেমন 'কুললু রুহিন জায়েকাতুল মউত' অর্থাৎ প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এই কথাটি *কোরান*-এ একবারও বলা হয় নি। গায়েব জোরে গুপ্তা হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। যারা রুহকেও সৃষ্টির আওতায় এনে 'নুরানি মাখলুক' তথা নুরের সৃষ্টি বলতে চায় এবং ব্যাখ্যা করতে চায়, তাঁদেরকেও বলার কিছু থাকে না। কারণ, তকদির তাকে অথবা তাঁদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে দেয় না। আরও লক্ষ করুন যে, আল্লাহ এক হয়েছে আমরা শব্দটি ব্যবহার করছেন, কিন্তু রুহ শব্দটি *কোরান*-এ কোথাও বহুবচনে ব্যবহার করা হয় নি। আল্লাহর রুহ কেবলমাত্র ইসা (আ.)-এর মাঝেই ফৎকার করেন নি, বরং তাহার পুত্র ইসা (আ.)-কেও (অনেকে যিশুখ্রিস্টও বলে থাকেন) রুহ ফৎকার করে দিয়েছেন। *কোরান*-এ ওয়া আব্বা নাহা - এবং তাহার পুত্রকেও রুহ ফৎকার করেছেন বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, *কোরান* মরিয়ম-এর পুত্রকেও সমস্ত আলমের জন্য একটি আয়াত করে রেখেছেন তথা 'আইয়ীতাললিল আলামিন'। আল্লাহর প্রতিটি আয়াতই একে একটি বিস্ময়, কিন্তু ইসা (আ.) হলেন আল্লাহর একটি বিস্ময়ের বিস্ময় নামক আয়াত। কারণ ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেই কথা বলেছিলেন এবং দোলনায় শুয়ে-শুয়ে অনেক কথা বলেছেন - এরও নিদর্শন আমরা দেখতে পাই এবং আরও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাই - যেমন হজরত ইসা (আ.) জন্মান্নাকে চক্কু দান করেছেন, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছেন এবং যে-বিস্ময়টি সবচেয়ে বিস্ময়কর : মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং মাটির তৈরি একটি পাখি, যার মধ্যে নফস নাই তথা জীবনই নাই, সেই পাখিটিকে ফৎকার দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে গেল এবং ইসা (আ.)-র সাহাবারা কে কী দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন সেটাও বলে দিতে পারতেন এবং সাহাবাদের ঘরের ভিতর কী কী আছে তাও পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে হজরত ইসা (আ.)-এর এলম্নে গায়েব জানবার পরিষ্কার দলিলটি পেলাম, সেখানে মহানবি এলম্নে গায়েব জানতেন না বলাটা যে একটি কুফরি আকিদা, এটা অনেকেই বুঝেও বোঝেন না। যারা বুঝেও বোঝেন না তাঁদেরকেই বা কী করে দোষারোপ করব? কারণ ইহা তাঁদের তকদির। মহানবি আব জাহেলের হাতের মুঠোর পাথর-কণাগুলোকে কলেমা পাঠ করালেন, যে পাথর-কণাগুলোর নফস থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে *কোরান*-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পুরিপোষিত মূল বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহানবি সম্পর্কে যা-তা বলাটাকে সমীচীন মনে করি না।

কোরান-এর ৪ নম্বর সূরা আন নিসা-র ১৭১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :
 ইননামান্ (নিশ্চয়ই) মাসিহ (মসিহ) ইসাবন (ইসা [খিনি] পুত্র) মারিয়ামা (মরিয়মের) রাসুলুনাহি (আল্লাহর রসুল) ওয়া (এবং) কালিমাতুহ (তাহার কালাম) আলকাহি (তিনি [আল্লাহ] যাহা নিক্রপ করিয়াছিলেন) ইলা (দিকে)

মারিয়াম (মরিয়মের) ওয়া (এবং) রুহুন (রুহ) মিনহ (তাঁহার [আল্লাহর] হইতে)।

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মরিয়মপুত্র ইসা মসিহ আল্লাহর রসুল এবং তাঁহার কালাম। তিনি (আল্লাহ) যাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মরিয়মের দিকে এবং তাঁহার (আল্লাহ) হইতে রুহ।

এই আয়াতে ইসা মসিহ (আ.)-কে মরিয়মের পুত্র এবং আল্লাহর একজন রসুল এবং আল্লাহরই কালাম যাহা আল্লাহ মরিয়মের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ হতে একটি রুহ বলা হয়েছে। এই আয়াতটুকুর সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে-প্রশ্নটি সবার মাঝে জেগে উঠবে তা হলো, মরিয়মের পুত্র কেন বলা হলো? সবার পরিচয় বৃহন করে পিতার মাধ্যমে, কিন্তু ইসা মসিহের বেলায় মরিয়ম তথা মায়ের পরিচয়ে তথা নারীর পরিচয়ে কেন পরিচিত করা হলো? ইহার প্রধান কারণটি হলো, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মটিকে লঙ্ঘন করে পিতা ছাড়া ইসা মসিহ-র জন্মগ্রহণ করাটা সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় তথা ঘটনা। যদিও ইহা একটি বিষয় তথা ঘটনা, কিন্তু এই বিষয়টি তথা এই ঘটনাটি একটি অভাবনীয় বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্বরূপ মানবজাতির সামনে আল্লাহ দাঁড় করিয়ে দিলেন। অন্যত্র আল্লাহ ইসা মসিহকে একটি বিশেষ নিদর্শন বলেও অভিহিত করেছেন। এই ইসা মসিহ পিতা ছাড়া দুনিয়াতে আগমন করেছেন বলে কোরান-এর ভাষাটি হলো : মরিয়মের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার মিলনে যে সন্তান প্রকৃতির নিয়মে জন্মগ্রহণ করে তা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক এবং নিক্ষেপ করার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইহা সবার চোখে ধরা পড়ে না। তাই পিতা ছাড়া ইসা মসিহকে মরিয়মের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলা হলো। তারপর বলা হলো, জন্মলগ্ন হতেই ইসা মসিহ আল্লাহর একজন রসুল। কোরান-এর অন্যত্র ইসা মসিহকে নবি বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর রসুল। তিনি রেসালত এবং নবুয়ত – উভয় গুণে গুণাবিষ্ট। তারপর আল্লাহ ইসাকে আরেক ধাপ উপরে উঠিয়ে বলছেন ‘কালিমাতে’ তথা আল্লাহর কালাম। এবং তারপরে আবার আল্লাহ বললেন যে, ইসা মসিহ ‘ওয়া রুহুন মিনহ’ তথা ‘এবং তাঁহার (আল্লাহ) হইতে রুহ।’ প্রথমে রসুল, তারপরে আল্লাহর কালাম, তারপর আল্লাহ হতে একটি রুহ বলা হয়েছে। এখানে কিছু নফস বলা হয় নি, কারণ নফস হলো প্রাণ। এই নফস তথা প্রাণের কথাটি না বলে আল্লাহর আদেশ তথা রুহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই বৃহস্যময় রুহ-শব্দটির বৃহস্য বুঝতে না পেরে অনেকেই আবোল-তাবোল, উল্টা-পাল্টা লিখেছেন। অবশ্য না বুঝেই এ রকমটি করা হয়। অনেকে তো পণ্ডিতি করে রুহকে পাচ ভাগে ভাগ করে ফেলেন, যেমন : ১. রুহে ইনুসানি, ২. রুহে হায়ানি, ৩. রুহে নাবাতি, ৪. রুহে জামাদি, ৫. রুহে বাতেনি। কী চমৎকার পাচ ভাগে ভাগ করার বাহারি লীলাখেলা! তবে একটি কথা না বলেই পারলাম না, আর সেটা হলো রুহে হায়ানি তথা জীবজন্তুর রুহ। সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও জীবজন্তুকে রুহ দান করার কথাটি পেলাম না, অথচ চোখ বুজে ইনারা জানোয়ারের মধ্যেও আল্লাহর রুহের আবিষ্কারটি করে ফেলেছেন। এরাই আবার মারেফতের বৃহস্যগুলো গলা উচু করে পণ্ডিতি ভাষায় লিখে চলছেন। এইসব অখাদ্য-মার্কা মারেফতের গোপন বিষয়গুলো পড়ে-পড়ে সরল-সহজ অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিতরা ভুল পথে পরিচালিত হয়। ইহাও কি তকদিরের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দেব?

কোরান-এর ১৯ নম্বর সূরা মরিয়ম-এর ১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ফাততাহাজ্জাত (সুতরাং তিনি [মরিয়ম] গ্রহণ করিলেন) মিন দুনিহিম (তাঁহাদের হইতে) হিজাবান (পর্দা) ফা আবসালনা (সুতরাং আমরা [আল্লাহ] পাঠাইলাম) ইলাইহা (তাঁহার দিকে) রুহানা (আমাদের [আল্লাহর] রুহ)

ফাতামাসসালা (সূতরাং উহা প্রকাশিত হইল) লাহা (তাহার জন্য) বাশারান্ (বাশার [মানুষ]) সাউইইয়ান (পরিপূর্ণ)।

অর্থাৎ, সূতরাং তিনি (মরিয়ম) পর্দা গ্রহণ করিলেন তাহাদের হইতে, সূতরাং আমরা (আল্লাহ) পাঠাইলাম তাহার দিকে আমাদের (আল্লাহ) রুহ সূতরাং উহা প্রকাশিত হইল তাহার জন্য পরিপূর্ণ বাশার (মানুষ)।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হলো, তিনি তথা মরিয়ম পর্দা গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ, তিনি একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন রহিলেন – যে-ধ্যানসাধনাটিকে অনেকে মোরাকাবা-মোশাহেদা বলে থাকেন, আবার অনেকে এতেকাফ-ও বলে থাকেন। যার যে রকম দৃষ্টিভঙ্গি সে তো সেই রকমই বলবে। তারপরেই বলা হলো, আল্লাহ আমরা-রূপটি ধারণ করে তথা বহুবচনের রূপ ধারণ করে মরিয়মের দিকে আমাদের তথা বহুবচন ব্যবহার করে এক বচনে রুহকে পাঠানো হলো এবং সেই রুহ বাশার-এর রূপ ধারণ করে তথা পরিপূর্ণ মানবের আকার ধারণ করে তার কাছে দেখা দিলেন। এই বিষয়টি এতই রহস্যপূর্ণ যে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে সাধারণ মানুষ খতমত খেয়ে যাবে। তাই এই রহস্যটি জানা থাকা সত্ত্বেও লিখলাম না। অনেকে তো এখানেও এই ‘রুহানা’ শব্দটির অর্থ করে থাকেন জিবরাইল নামক ফেরেশতা। অথচ জিবরাইল ফেরেশতাকে আল্লাহ রুহও দেন নাই এবং নফসও দেন নাই। এই রুহ-এবং নফস-বর্জিত জিবরাইল ফেরেশতাটিকে রুহানার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করে বাক্য গঠন করে তপ্তি লাভ করেন, তবু এরা নিজেকে ডুলটি স্বীকার করে নেবেন না অথবা “এই ‘রুহানা’ কথাটি বলতে কী বোঝায় তাহা আমাদের জানা নাই” বলতে বড়ই লজ্জা পায়। আল্লাহর রুহ যে বাশার-রূপটি তথা পরিপূর্ণ মানব-আকৃতি তথা পুরুষের আকৃতি ধারণ করেন ইহা আমরা জানতে পারি, কিন্তু রুহ যে পরিপূর্ণ নারী-রূপও ধারণ করতে পারেন ইহা আমাদের জানা নাই। তবে নারীকেও যে রুহ ফুৎকার করে দেওয়া হয় ইহার জুলন্ত প্রমাণটি এখানেই পাওয়া যায়।

রুহ যে পরিপূর্ণ মানব-আকৃতিও ধারণ করতে পারে ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ রুহ-রূপ ধারণ করে সাধককে দর্শন দান করেন। তাই আল্লাহর ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল এবং আরিফেরা বলে থাকেন যে যিনি অথবা যারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন তারা আদম-সূরতেই দর্শন করেছেন। এই আদম-সূরতটিকে কোথাও ইনসানরূপ ধারণ করার পরিবর্তে বাশাররূপ ধারণের কথাটি পাই। তা ছাড়া যে-জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর সেফাতি নুরের তৈরি এবং জিবরাইলের রুহও নাই এবং নফসও নাই, সে জিবরাইল ফেরেশতা মানবের আকার ধারণ করে মহানবি এবং মহানবির সাহাবাদের সঙ্গে দর্শন দান করেছেন। জিবরাইল মানবের আকার ধারণ করলেই যে মাটির তৈরি বলতে হবে ইহাও যেমন মোটেও সত্য নহে তেমনি মহানবি যদিও আমাদেরই মতো, কিন্তু মোটেও মাটির তৈরি তো ননই, এমনকি আল্লাহর সেফাতি নুরেরও নহেন, বরং আল্লাহর জাত নুরে নুরময় হলেন মহানবি। যদি তাহাই না হয় তাহলে মহানবির পক্ষে লা-মোকামে প্রবেশ করা একটি অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জিবরাইল ফেরেশতা সিদরাতুল মুনতাহায় এসে থেমে গেলেন এবং বললেন যে, এরপরে যদি একটি ধাপ অগ্রসর হতে চাই তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে জুলে-পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাবো। কারণ জিবরাইল সেফাতি নুরের তৈরি আর মহানবি আল্লাহর জাত নুরে নুরময়। তাই আল্লাহর ওলিরা বলে থাকেন যে, *দোনোহিকা শেকেল এক হ্যায়, কিসকো খোদা কাহ* তথা আল্লাহ ও মহানবির একই চেহারা, তাহলে কাকে খোদা বলবো? আল্লাহর এই লা-মোকামে যাবার অনুমতি ও বহমতটি মহানবির উম্মতদেরকে দান করা হয়েছে। তাই মাহুববে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত আমির খসরু-লিখিত ফারসি ভাষার কালামে বলা হয়েছে :

খোদা খোদ মিরে মুজলিশ বদ আন্ধার লা মোকোঁ খসরু তথা 'খসরু লা মোকামে গিয়েছিলেন' - এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমরা খসরু লা-মোকামে যাবার ক্ষমতাটি অর্জন করতে পারেন তাহলে তাঁরই পীর মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়া পীর বাবা শেখ ফরিদ এবং শেখ ফরিদের পীর খাজা গরিব নেওয়াজ এবং খাজা গরিব নেওয়াজের পীর খাজা উসমান হারুনি এবং খাজা উসমান হারুনির পীর হাজি শরিফ জিনদানা - এ রকমভাবে চিশতিয়া সিলসিলার সব ওলিরাই যে লা-মোকামে অবস্থান করেছেন উহা হজরত আমরা খসরুর লিখিত কালাম হতে পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য আমার এই কথাগুলোয় শুদেয় ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেবার মতো ছিলবিলিয়ে উঠবে এবং যা-তা মন্তব্য করতে সামান্য ইতস্ততও করবে না।

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ৮৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনে (পুত্র) মারিয়ামা (মারিয়মের) বাইয়ানাতি (উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ, সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি) বিরুহিলকুদুস (রুহুল কুদুস)।

অর্থাৎ, এবং ইসা ইবনে মারিয়মকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং রুহুল কুদুস দিয়া তাহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি। এই আয়াতে মারিয়মের পুত্র ইসাকে রুহুল কুদুস দিয়া সাহায্য করার কথাটি বলা হয়েছে, সুতরাং ইহার কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ অনেকেই কোনো কিছু চিন্তাভাবনা না করেই রুহুল কুদুস বলতে জিবরাইল ফেরেশতার নামটি উল্লেখ করে তাঁপির হাসি হাসে এবং চোখেমুখে জ্ঞান গিজগিজ করার দৃশ্যটি ফটে ওঠে। একবার সামান্য চিন্তাও করে না যে জিবরাইল ফেরেশতাদের কোনো নফস এবং কোনো রুহ - দুইটির একটিও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা আল্লাহর সেকাতি নুরের তৈরি তথা আল্লাহর গুণবাচক নুরের তৈরি। ফেরেশতারা যদি জ্ঞান নুরেরই তৈরি হতো তাহলে সিহারাভুল মুনতাহা এসে জিবরাইল ফেরেশতা খেঁমে যেতেন না, কারণ সেকাতি নুরের লা-মোকামে প্রবেশ করার বিধানটি রাখা হয় নি। পা বাড়ালেই সঙ্গে-সঙ্গে জুলে-পুড়ে হারখার হয়ে যেতেন। অথচ মহানবি সেই লা-মোকামে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করলেন দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে - অর্থাৎ একটি ধনুক একটি অর্ধবৃত্ত, দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি অর্ধবৃত্ত সমান-সমান একটি পূর্ণ বৃত্ত। সুতরাং দুইটি অর্ধবৃত্তের দ্বারা যদি একটি বৃত্ত হবার সামান্য ফাক-ফোকর থেকে যায় তাই কোরান ফাক-ফোকরের অবসান ঘটিয়ে বলছে, 'আওআদনা' - অর্থাৎ আরও নিকটে। সুতরাং বৃত্তের প্রকাশিত স্থানটিকে বলা হয় নুরে মোহাম্মদ এবং অপ্রকাশিত স্থানটির নাম হলো আল্লাহ। তাই জগতের বড় বড় ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে থাকেন যে দুজনের চেহারা তো একই, কার্কে খোদা বলব? আমার এই ব্যাখ্যাটিতে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা শরীকে পেট্রোলে আগুন ধরান মতো চিংকারে প্রতিবাদ শুরু করে দেবে; গোজামিলের একবস্তা এইটা-ওইটা-সেইটা বলে মহানবিকে কেবল সাধারণ মানুষই বলবে না, বরং বলবে মহানবি ম্যাটির তৈরি। ওহাবিদের শত দুলিল দিয়ে বোঝালেও বুঝতে চাইবে না। কেন? ইহাই ওহাবিদের তকদির। ঢোড়া সাপের সামনে অনেক বীণ বাজালেও ঢোড়া সাপ ফণা তুলতে জানে না। ঢোড়া সাপের মোটেই কোনো দোষ নাই। কেন নাই? কারণ ঢোড়া সাপকে আল্লাহ জন্মের আগেই কপালে ফণা তুলার বিধানটি লিখে দেন নি। ফণা নাই, সুতরাং ফণা তুলবে কী করে? ওহাবিদের বুঝবার ক্ষমতাটি দেওয়া হয় নি, সুতরাং বুঝবে কী করে? সুতরাং চরম পর্যায়ে ওহাবিদের গালি দিতে নাই। আল্লাহর হাতে ওহাবিদেরকে সোপদ করাই শ্রেয়

বলে জগতের ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে গেছেন। তাছাড়া ওহাবিরা আছে বলেই তো এঁত ফেরকার বৈচিত্র্য আমরা এক ইসলামের ভেতর দেখতে পাই। যে-ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি সেই ফেরেশতা কি করে রুহল কুদ্দুস হয় ইহা ভাবতেও কষ্ট হয় এবং অবাক হই। জিন এবং মানুষ ছাড়া, আমাদের জানা মতে, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্ট জীবদেরকে কেবলমাত্র নফসটি দেওয়া হয়েছে তথা প্রাণটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিন এবং ইনসানকেই নফসের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে রুহকে তথা আল্লাহর হুকুমকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, বড়-বড় প্রাণীরা পাক করে খেতে জানে না। মানুষের নফসের সঙ্গে যেহেতু রুহের অবস্থানটি আছে তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। ফেরেশতারা কখনই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নয়। ফেরেশতারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন এবং যত বড়ই ক্ষমতা থাক না কেন, ভালোমন্দ করার কোনো এখতিয়ার নাই। স্বাধীনতা থাকলেই ভালোমন্দ করার প্রশ্নটি আসে। যেহেতু নফস এবং রুহ একটিও নাই সেই হেতু স্বাধীনতাও নাই। এক কথায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ জালাশানাহর আদেশ-নিষেধ পালন করার রোবট বলা যায়। এই রোবটদের নিয়ে যখন আদম সন্তানেরা মাথায় তুলে নিয়ে ধেঁইধেঁই করে নাচতে থাকে এবং হিয়াহুয়া বলে জাহির করতে থাকে তখন এতিমের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি আর ভাবি, এদের মাথায় কত জ্ঞান গিজগিজ করে। সুতরাং, হজরত ইসা (আ.)-কে রুহল কুদ্দুস দিয়ে সাহায্য করার কথাটি বুঝতে না পেরে জিবরাইল ফেরেশতাকে টেনে এনে সাহায্য করার দৃশ্যটি দেখতে পাই।

কামেল সাধকদের খান্নাসমুজ্জ পরিণত নফসের উপর রুহ যখন জাগ্রত রূপটি ধারণ করে তখন তাদের কুখাবাতা, তাদের আদেশ-উপদেশ এবং তাদের বাণীগুলো সাধারণ মানুষের নিকট কেবল অপছন্দই হয় না, বরং বোঝা এবং আমেলা বলে মনে হয়। কারণ সাধারণ মানুষ নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসের পুজারি এবং মোহমায়ার ফাদে বাস করে। এ জন্যই সাধারণ মানুষ নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটির তাকারুরি তথা দেমাকি ভাবটি সব সময় রক্ষা করে চলে। এবং তারই ফলে এই জাতীয় রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের আদেশ-নিষেধটি বর্জন করতে ভালোবাসে। তাই আমরা দেখতে পাই, এই সাধারণ মানুষেরাই রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের অনেককেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়, আরার কাহাকেও হত্যা করতেও কুঠা বোধ করে না। ইহার প্রধান কারণটি হলো, খান্নাসের পুজারিদের নিকট রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের আদেশ নিষেধ এবং বাণীগুলো অচল বলে মনে হয় এবং সেই বাণীগুলো সাধারণ মানুষের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর বলে মনে হয়।

কোরান-এর ৫৮ নম্বর সূরা আল মুজাদালার ২২ নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষে বলা হয়েছে :

উল্লাইকা (উহারাই তাহারা) কাতাবা (লিখিয়া দিয়াছেন) ফি (মধ্যে) কলুবিল্হিনুল (তাহাদের কলবে) ইমানা (ইমান) ওয়া (এবং) আইয়াদা (শক্তিশালী করা) হম্ (তাহাদের) বিরুহিম (রুহের দ্বারা) মিন্হ (তাহার পক্ষ হইতে)।

অর্থাৎ, উহারাই তাহারা, লিখিয়া দিয়াছেন তাহাদের কলবের মধ্যে ইমান এবং শক্তিশালী করিয়াছেন তাহাদের রুহের দ্বারা তাহার পক্ষ হইতে।

উহারাই তাহারা বলতে তাহাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী। এমন কোনো কণ্ডম পাওয়া যাবে না যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারপর আরও বলা হয়েছে যে তারা তাদের পিতা-পুত্র-ভাই অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনও যদি হয়। কারণ এই জাতীয় কণ্ডমের মানুষগুলোর কলবে

আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে রুহ-এর দ্বারা আল্লাহ শক্তিশালী করেছেন। অনেকে এই রুহ-এর প্রতিশব্দটি 'অদৃশ্য শক্তি' বুঝাতে চেয়েছেন। আবার অনেকে রুহ-এর প্রতিশব্দটি 'দৃশ্যশক্তি' বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে রুহ-কে রুহ-এর সঠিক অবস্থান হতে সরে গিয়ে রুহ-এর প্রতিশব্দটি যে কত রকম করা হয় তা সরল পাঠকদের ধরবার আর কোনো উপায় থাকে না। অনেকে তো রুহ-এর প্রতিশব্দ হিসাবে চোখ বুজে লিখে ফেলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাদের নাম। আবার অনেকে রুহ-এর প্রতিশব্দটি 'ওহি' বলেও চালিয়ে দেন। আপনি যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনাকে একবোঝা লুলা-টুঙা-মাকু তথা খাপছাড়া কতগুলো কথা শুনিতে দেবে। প্রকৃত সত্যটি হয়তো এভাবেই ঢেকে যেতে থাকে, অথচ মনে করে যে কত বড় সওয়াবের কাজটি করলাম। একজন মানুষ তখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে যখন সেই মানুষটির অন্তরে এক ফোটাও খান্নাসের গন্ধ থাকে না। তাই একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে তথা কলবে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কারটি থাকবে সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। খান্নাসমুক্ত একজন মানুষকেই আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি উচ্চ মর্যাদাশালী একজন মোমিন বলে গণ্য করা হয়। কারণ একটি খান্নাসমুক্ত পবিত্র নফসের উপরেই রুহ তার আপন পরিচয় নিয়ে পূর্ণ আকৃতিতে প্রকাশ পায়। ইহাই আল্লাহর রহস্যময় প্রকাশের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। আসলে আল্লাহ যাকে যতটুকু জ্ঞানের উচ্চতা দান করেছেন সে তো ততটুকুই জানবে এবং লিখতে পারবে। এর বেশি আশা করাটাও ঠিক নয়।

কোরান-এর ১৬ নম্বর সূরা আননাহল-এর ১০২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

কল (বলুন) নাজ্জালাহ (তিনিই নাজেল করেন) রুহল কুদ্দুস (রুহল কুদ্দুস)
মির (হইতে) বাবুরিকা (তোমার রব) বিন্ হীককি (সত্যসহ)
লিউউসাববিতাল (প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য) আললাজিনা (যাহারা) আমান
(ইমান আনিয়াছে) ওয়া (এবং) হেদাও (হেদায়েত) ওয়া (এবং) বুশরী
(সুসংবাদ) লিল্ (জন্য) মুসলিমিনা (মুসলমান আত্মসমর্পণকারীদের)।

অর্থাৎ, তিনিই নাজেল করেন রুহল কুদ্দুস তোমার রব হইতে সত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং হেদায়েত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] জন্য।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে :

রুহল কুদ্দুস তিনিই নাজেল করেন তোমার রব হইতে। খেয়াল করুন, এখানে 'মিরবাবুরিকম' তথা তোমাদের রব হইতে বলা হয় নি, বরং নিছক তোমার রব হইতে রুহল কুদ্দুস নাজেল করা হয়। তারপরেই বলা হয়েছে : সত্যসহ এবং তারপরে বলা হয়েছে : প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইহা কাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাজেল করা হয়? উত্তরটি হলো, যারা ইমান এনেছে এবং হেদায়েত এবং যারা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) তাদের জন্য এই বিষয়টি একটি বিরাট সুসংবাদ। এই রুহল কুদ্দুস যারা মুসলমান এবং ইমান ও হেদায়েত লাভ করেছেন তাদের জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ। তাহলে রুহল কুদ্দুস নাজেল করাটি অতীত কালের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, বরং সর্বকালে সর্বদিকে যারা বিশ্বাসী এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত আত্মসমর্পণকারী, তাদের জন্য রুহল কুদ্দুস পরিপূর্ণরূপে ধারণ করে পরিচালিত করেন। আফসোস! এই রুহল কুদ্দুস তথা পবিত্র রুহ অথবা শক্তিশালী রুহ বলতে নফস ও রুহবিহীন জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে সার্বজনীনতার এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট কালের গণ্ডির মধ্যে বেধে রাখা হয়েছে। আমরা কিহুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে রুহল কুদ্দুস বলতে কেমন করে জিবরাইল ফেরেশতা অনুবাদ করে বিভ্রান্ত করে। মতানিবি হেরাণ্ডহায়

ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যে নিজের নফসের উপর রুহটি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় উহাই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যারা হেরাণ্ডহার ধ্যানসাধনার বিষয়টি সূত্রে এড়িয়ে যায় তাদের পক্ষে রুহল কুদ্দুসের পরিচয় জানাটি অসম্ভব এবং বিষয়টি নিছক শাস্ত্রিক ও মৌখিক বিষয়ে পরিণত হয়। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে তওহীদের মূল বিষয়টি শিক্ষা দিতে হলে নিজে আগে কেমন করে লাভ করা যায় সেই প্রয়োগ-পদ্ধতিটি দেখিয়ে দিয়ে যান। হেরাণ্ডহার নিজনে একাকী সম্ময়-অসম্ময়ে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনের উপর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে গেলেন যে, এই হেরাণ্ডহার নিজের সাধনার মতো ধ্যানসাধনা ছাড়া রুহল কুদ্দুসের পরিচয়টি পাওয়া অসম্ভব। কারণ, মহানবি তখনও নবি যখন প্রথম মহামানব হজরত আদম (আ.) মাটি ও পানিতে ভাসমান। সুতরাং এই হেরাণ্ডহার ধ্যানসাধনাটি নিছক মহানবির অনুসারীদের জন্য একটি জুলন্ত শিক্ষণীয় বিষয় এবং দেদীপ্যমান সার্বজনীনতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সে জন্যই পরিশেষে বিরাট একটি দুঃখ নিয়ে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, কোথায় রুহল কুদ্দুস আর কোথায় যার নফসও নাই রুহও নাই এমন একজন ফেরেশতা যার নাম জিবরাইল! মিথ্যার চাদরে ঢাকতে-ঢাকতে সত্য সম্পূর্ণরূপে ঢেকে যায়। তেমনি আজ মানব-সমাজের বুকে সত্য উদ্ধারের প্রচেষ্টায় পদে-পদে হোচট খেতে হয় যখন দেখতে পাই উলঙ্গ একটি সত্যকে তথা রুহল কুদ্দুসকে কেমন করে মিথ্যার কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলতে চাই যে, রুহ-এর পরিপূর্ণরূপটি যখন সাধক তথা মোমিন-এর (আম্মান নহে) আপন নফসের উপর আলোকিত হয় উহাকেই নূরে মোহাম্মদি বলা হয় এবং এই নূরে মোহাম্মদি-কে আপন নফসের উপর উদ্ভাসিত করবার সাধনাটি ইসলামের মূল কথা। এ জন্য ইসলামকে আলো তথা নূর বলা হয়। যেমন 'আল ইসলামুন নুরুন' - অর্থাৎ, ইসলামই একমাত্র নূর তথা আলো। এই নূর সার্বজনীন। যে-কোনো সাধক ধ্যানসাধনার একাগ্রতায় এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করার পরেই তা অর্জন করতে পারবে। আবার ইসলামকে শাস্তিও বলা হয়, বলা হয় ইসলাম আত্মসমর্পণ করার ধর্ম, কিন্তু ইসলাম যে একমাত্র নূর ইহা মৌখিকভাবে জানা থাকলেও সাধকেরাই বুঝতে পারেন।

কোরান-এর ৪২ নম্বর সূরা আশ শুরা-র ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :
 ওয়া (এবং) কাজালিকা (ওইভাবে) আওহাইনা (ওহি পাঠাইয়াছি আমরা)
 ইলাইকা (আপনার দিকে) রুহাম্ম (রুহ) মিন্ (হইতে) আম্মরিনা (আমাদের হকুমে/আদেশে/আজ্ঞায়/অনুমতিতে/নির্দেশে)।

অর্থাৎ, এবং ওইভাবে আমরা ওহি পাঠাইয়াছি আপনার দিকে রুহ আমাদের হকুম হইতে।

এই আয়াতের 'রুহ' শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায় তফসিরকারকেরাই ইহার একান্ত গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে একে একে রকম রকম রুহ-এর প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেকে তো বিশেষ করে এই আয়াতে 'রুহাম্ম'-কে 'ওহি' অনুবাদ করে ফেলেছেন। অথচ অনুবাদক একবার ভুলেও চিন্তা করে দেখলেন না যে 'আওহাইনা' তথা 'আমরা ওহি পাঠাইয়াছি' আগেই বলে দেওয়া হয়েছে এবং এই বলে দেবার পরেও রুহাম্ম তথা রুহ-এর গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে 'ওহি' অনুবাদ করেছেন। প্রথমেই তো 'আমরা ওহি পাঠাইয়াছি' বলা হলো তারপরে আবার 'রুহাম্ম' শব্দটিকেও কেমন করে এবং কীভাবে 'ওহি' অনুবাদ করেন ইহা ভাবতে গেলেও অবাক হই। অনুবাদের চেহারা যদি এত গোজামিল আর মনগড়া কথা দিয়ে ভরে রাখা হয় তাহলে সহজ-সরল পাঠকেরা কেমন করে সূত্রের পরিচয়টি জানতে পারবে? আবার অনেক অনুবাদক 'রুহাম্ম'-কে 'ওহি' লিখতে খুবই শরম পেয়ে 'রুহাম্ম'-এর

অনুবাদ করেছেন ‘কোরআন’। মাশাআল্লাহ। ইনাদের *কোরান*-এর এহেন অনুবাদের চেহারাটি যদি এমন হয় তাহলে পাঠক কোনটা গ্রহণ করবে ইহাতেও যে একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়।

মনে শান্তি পাওয়া এক জিনিস আর সত্য উদ্ধারের গবেষণাটি অন্য জিনিস। এক ইসলামের তিন কুড়ি তেরটি সাইনবোর্ড কাঁধের উপর ঝুলছে। প্রশ্ন আসতে পারে, এই তিন কুড়ি তেরটি সাইনবোর্ডের মধ্যে কোন সাইনবোর্ডটি সাদা? সাদা সাইনবোর্ডটি উদ্ধার করতে গিয়ে সরল-সহজ পাঠকদের অবস্থাটি কি লেজে-গোবরে পরিণত হচ্ছে না? বীজরূপে রুহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছে বলেই আল্লাহ বলেছেন যে, ‘আমরা (আল্লাহ – বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে) জীবন-রণের নিকটেই অবস্থান করছি।’ এখানে ‘ইলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তথা ‘দিকে’ বলা হয়েছে, ‘ইন্দা’ তথা ‘ভেতরে’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। শয়তান খান্নাসরূপে নফসের সঙ্গে মিশে থাকে। কিন্তু রুহ জীবন-রণের নিকটে বীজরূপে অবস্থান করে। লক্ষ করুন, এই আয়াতেও ‘ইলাইকা’ তথা আপনার দিকে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতীত দুঃখ নিয়ে বলতে হচ্ছে যে দশচক্রে ভগবানকেও যে ভূতরূপে আম জ্ঞনতা গ্রহণ করে ফেলে তারই জলন্ত নমুনাগুলো একটি একটি করে পেশ করছি। অনেকের আঁতে ঘা লাগতে পারে, আবার অনেকের হশ আসতে পারে। আঁতে ঘা লাগাটাও তকদির এবং হশ আসাটাও তকদির।

মানুষ যখন নিজনে মহানবির হেরাণ্ডহার মতো স্থানে একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন হয়ে নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার জেহাদে রত থাকে তখনই সেই নফসটিকে বলা হয় নফসে লাউয়াম্মা তথা সংগ্রামরত নফস তথা যুদ্ধরত নফস তথা জেহাদে রত থাকা নফস। *এই জেহাদ বাহিরের অস্ত্র হাতে নিয়ে জেহাদ করা নয়, বরং ধ্যানসাধনায় ডুবে থেকে আপন নফস হতে খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার অথবা খান্নাসকে মুসলমান বানিয়ে ফেলার জেহাদ।*

একটি নফস যখন খান্নাস হতে মুক্ত হতে থাকে, মুক্তির কাছাকাছি এসেই কেতাব এবং ইমানের পরিচয়টি পেতে থাকে। নতুন নফসের সঙ্গে খান্নাস পরিপূর্ণরূপে মিশে থাকলে ইমান ও কেতাবের পরিচয়টি চিনতে পারে না। যেহেতু অধম লিখক মুসলমান তাই আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে হচ্ছে যে নূরে মোহাম্মদি আল্লাহরই জাতনুর। অন্যান্য ধর্মের সাধকেরা নূরে মোহাম্মদি-র স্থলে অন্য যে-কোনো নামটি দিতে পারেন। এই রুহ যখন সাধকের নফসের উপর প্রকাশিত হয় তখন নুরুপেই মূর্তিমান হয়। কালি ও কলমের তৈরি শব্দের বলয়ে রুহ-এর অবস্থানটি থাকে না, কালি ও কলমে কাগজের উপর তৈরি করা বাঘ আর সিংহের ছবিগুলো যেমন বাঘ আর সিংহ নয়, আসল বাঘ আর সিংহ দেখতে হলে চিড়িয়াখানাতে গিয়ে দেখতে হয়, তেমনি নিজের সঙ্গে রুহ-এর পরিচয়টি জানতে চাইলে ওই হেরাণ্ডহার মতো নিজস্ব সাধনা ছাড়া পাওয়া সম্ভব কিনা পাঠকদের হাতেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম।

পরিশেষে একদম খোলামেলা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, রুহ-এর পরিপূর্ণ রূপটি আল্লাহর রব-রূপী পরিপূর্ণরূপ। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা রূপে সবাই (নাস্তিক ছাড়া) মেনে নেয়, কিন্তু আল্লাহকে রব-রূপে মেনে নিতে গেলেই ধ্যানসাধনাটির প্রয়োজনটি অত্যাবশ্যকীয়। তাই আমরা দেখতে পাই, *কোরান*-এর প্রথম হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র রাব্বুল আলামিনের ‘জিকির’ শব্দটি দেখতে পাই। মানুষের মাঝে রব-রূপে প্রকাশিত হওয়ার পরিপূর্ণ রূপটি হলো রুহ। সুতরাং রুহ-এর এই ভেদরহস্য ধ্যানসাধনাবিহনে কিছু একটা বলতে গেলে অনুমানের ঢিলটি ছুঁতে হয় এবং যারা এই

অনুমানের ঢিল ছোঁড়ে তাদেরই বা কী দোষ দিতে যাব? এ যে মহান রাববুল আলামিনের লীলাখেলা। তাই দর্শনেই মুক্তি, অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্ধন। এই মুক্তি ও বন্ধনের লীলা খেলাটি যদি খেঁদে যায় তাহলে দুনিয়া অচল, নিষ্ক্রিয় এবং অথবা।

কোরান-এর ১৬ নম্বর সূরা আন নহলেব ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ইউনাজ্জিলুল (নাঙ্গেল করেন) মাল্লাইকাতা (ফেরেশতাদেরকে) বিরুহি (রুহের সহিত) মিন (হইতে) আমরিহি (তাহার হুকমে) আলা (উপর) মাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (ইচ্ছা করেন) মিন (হইতে) ইব্বাদিহি (তাহার বাক্যদের) আন (যে, এই যে, হইতে) আনজিক (তোমরা সাবধান করিয়া দাও) আনুনাহ (অবশ্যই ইহা) না (নাই) ইলাহা (ইলাহ, অধিকারী) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) আনা (আমি) ফাত্তাকুনি (সুতরাং আমার তাকওয়া কর)।

অর্থাৎ, নাঙ্গেল করেন ফেরেশতাদেরকে রুহের সহিত তাহার হুকম হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন তাহার বাক্যদের হইতে যে তোমরা সাবধান করিয়া দাও অবশ্যই ইহা নাই ইলাহ একমাত্র আমি, সুতরাং আমার তাকওয়া কর।

এই আয়াতে ফেরেশতাদেরকে নাঙ্গেল করার কথাটি বলা হয়েছে এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে রুহকেও নাঙ্গেল করার কথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রুহের সহিত - অর্থাৎ, ফেরেশতারা এবং রুহ বিষয়টি যে মোটেই এক ও অভিন্ন নয়, বরং দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্ন এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে কেমন করে রুহ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়? কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি যে জিবরাইল যুত শক্তিরই অধিকারী হন না কেন তিনি নিছক একজন ফেরেশতা বে আর কিছু নন। আমরা আজরাইল, মিকাইল এবং ইসরাফিলকেও ফেরেশতা বলেই জানি এবং এই চারজনই ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। এই চারজন ফেরেশতাদের বাহিরের কেহ নন। তাহলে রুহ বলতে কেমন করে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে অনুবাদ করা হয়? কোথায় জিবরাইল ফেরেশতা আর কোথায় রুহ! অনুবাদক এবং তুফসিরকারক এই জটিল এবং সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝতে না পেরে জগাখিচড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি লেজে-গোবরের অবস্থায় পরিণত হবার গোজামিলের রূপগুলো চোখের সামনে পরিষ্কার ধরা পড়তে থাকে। তখনই মহানবির নামে সনদের দোহাই দিয়ে উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে সংগ্রহ করা কথাকে হাদিস নামে চালিয়ে দিতে থাকে। (আলামা সা'দ উল্লাহ সাহেবের রচিত হাদিস সংগ্রহের ইতিহাস-টি পড়লেই অনেক কিছু ভালো-মন্দ বিষয়গুলো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন)। প্রশ্ন আসে, আসলেই কি এগুলো মহানবির কথা তথা হাদিস, নাকি মহানবির নামে চালিয়ে দেবার অপকৌশল মাত্র? ফেরেশতাদের সঙ্গে রুহ নাঙ্গেল করার কথাটি না বলে জিবরাইলের কথাটি তো আলাহ বলতে পারতেন। তাহলে রুহ অর্থে কেমন করে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে দাড় করানো হয়? তাহলে কি এই কথাটুকু বলা যায় না যে, সবজাতির ভূমিকা পালন না করে সোজা বলে দিলেই হতো যে, আমি ইহার অর্থাৎ বুঝলাম না তথা আলাহর কালামের এই আয়াতের মর্ম আমাদের বোধগম্য নহে? কেহ যদি মূর্খ ফসকে বলে ফেলেন যে, আপনারা জেনেগুনেন অথবা না-জেনে ভুলও করছেন এবং ভণ্ডামিও করছেন? - যদিও আপনাদের এই ভুল, এই ভণ্ডামি এতই সূক্ষ্ম বিষয় যে সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়।

নাই কোনো ইলাই একমাত্র আলাহ ছাড়া, সুতরাং তাকওয়া কর অথবা ভয় কর - বিষয়টি এখানে এবং এই ক্ষুদ্র 'নফস ও রুহের পার্থক্য' নামক প্রবন্ধে তুলে ধরা হতে ইচ্ছা করেই বিরত রইলাম।

হজরত ইসা নবিকে যে-রুহ দেওয়া হয়েছে উহা বীজরূপী রুহ নহে, বরং পরিপূর্ণ রুহ। তাই তিনি দোলনায় দুলেও কথা বলেছেন এবং পিতা ছাড়া যে

জন্মগ্রহণ করেছেন ইহা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি একেক নবির মধ্যে একেক রকমভাবে আল্লাহ তুলে ধরেছেন। যেমন, হজরত সোলায়মান (আ.)-কে রহমতের বাতীস নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটি দান করেছেন। হজরত মুসা (আ.)-র লাঠিটি সর্পে পরিণত হবার বৈশিষ্ট্যটি দান করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক নবির বেলাতেই ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের রূপগুলো আমরা দেখতে পাই। সুতরাং বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বলেই মনে করতে চাই।

কোরান-এর ২৬ নম্বর সূরা শুয়ারা-র ১৯২ হতে ১৯৪ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

+ ওয়া (এবং) ইননাহ (নিশ্চয়ই ইহা) লাভান্জিলু (অবশ্যই নাজেল করা) রাব্বিল (রব) আলামিন (জগৎসমূহের)।

□ এবং নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই নাজেল করিয়াছেন জগৎসমূহের রব।

+ নাজালা (নাজেল করিয়াছেন) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) রুহল (রুহ) আমিনু (বিশ্বস্ত)।

□ নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে বিশ্বস্ত রুহ।

+ আলা (উপর) কালবিলা (আপনার কলবের) লিতাকুনা (যেন আপনি হন) মিনাল (হইতে) মুনজিরিন (সাবধানকারীদের)।

□ আপনার কলবের উপর যেন আপনি হন সাবধানকারীদের হইতে।

এই আয়াত তিনটির দর্শন তথা ভাবধারাটি খুবই গভীর এবং রহস্যময়। (যারা আল্লাহকে) ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আপনার সাথে সূক্ষ্ম বাজিরূপে তথা রুহরূপে যে আল্লাহ অবস্থান করেন তাকে রবরূপে তথা প্রতিপালকরূপে দর্শন লাভ করতে পারিলেই পবিত্র নফসের মধ্যে যে খান্নাসরূপী আবরণটি থাকে, সেই আবরণের পদা ছিন্ন করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনরূপে তথা জগৎসমূহের রবরূপে প্রকাশিত হন এবং তখনই ইহাকে বলা হয় নিরাপত্তা দানকারী রুহ নাজেল করা। এ-জাতীয় সাধকেরাই মহাপুরুষ তথা জগৎপুরু এবং এরাই সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী হন এবং সেই কারণেই আত্ম জন্মতার নিকট সাবধানকারী বলে পরিচিতি লাভ করেন। ইহা কোনো বৈষয়িক বিষয়ের উল্টাপাল্টা সাংঘর্ষিক দর্শন নয়, কারণ বৈষয়িক দর্শন যতই মূর্খবৃত্ত হোক না কেন, একটি ব্যক্তি-জীবনের সামনে খুব বেশি হলে আশি-নব্বই বছর মোহ বিস্তারের নকল সত্য বলে মনে হয়, তারপর সব শেষ। যে-সকল সাধকেরা আল্লাহকে রবরূপে পাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যধারণ করেন, সেই সাধকদের উপর রাব্বুল আলামিন তথা আপন রব যখন প্রকাশিত হন তখনই তিনি দর্শন দান করেন বিশ্বরবরূপে। সাধকের পবিত্র নফস হতে যখন খান্নাসরূপী শয়তানের পদাঙ্গলি তথা আবরণগুলি একে-একে ছিন্ন করে ফেলা হয় তখনই রবরূপে জগৎময় তিনিই মূর্তিমান তথা প্রতিভাত হয়ে ওঠেন সাধকের অন্তরে তথা নফসে। আসলে উলঙ্গ সত্য কথাটি বলতে গেলে বলতে হয় যে রুহল আমিন ইলেন মহানবির আপন আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি। ইহা জগৎময় ব্যক্তিত্ব হতে পারে আবার যে-কোনোরূপ মূর্তি ধারণ করতেও পারে। ইহা স্থান কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) সব রকম মানুষের আদি এবং আসল রূপ। এই রূপের মাঝে প্রত্যাবর্তন করাই মানব জীবনের পরম এবং চরম সার্থকতা। আল্লাহর নিকট মানুষের প্রত্যাবর্তন করার তথা ফিরে আসার অর্থটিও ইহাই।

রুহ নাজেল করা অর্থে যদি জীবনীশক্তি দান করা অথবা প্রাণের সঞ্চার করা অর্থে তফসির করা হয় তাহলে জীবনীশক্তি দান অথবা প্রাণসঞ্চার কেবলমাত্র মানুষ কেন তিনি তো সকল জীবকেই দান করে থাকেন। ইহা ছাড়া “মৌলাকাং দিবস সন্বন্ধে জনগণকে সাবধান করবার জন্যেই রুহ দান করেন।” এখানে প্রাণ অর্থে রুহ শব্দটিকে গ্রহণ করলে কথা ও ভাবের দর্শনের মিলটি তো খুজে পাওয়া যায়ই না, বরং সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে ওই একই কথা বারবার বলতে হচ্ছে যে, জিবরাইল যদি ফেরেশতা হয়ে থাকে এবং জিবরাইল তো সত্যিই একজন ফেরেশতা – আমরা দেখতে পাই যে কোনো ফেরেশতাকেই নফস এবং রুহ দেওয়া হয় নাই। তাহলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে রুহের স্থলে কেমন করে দাড় করানো যায় উহা আমাদের জানা নেই।

কোরান-এর ৩২ নম্বর সূরা সাজদা-র ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

সম্মান (তারপর) সাওয়াহি (তাহাকে সুন্দর চেহারাযুক্ত করিয়াছেন, তাহাকে অঙ্গসৌভব বিশিষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে সুগঠিত করিয়াছেন, তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন, তাহাকে সম্মানভাবে তৈরি করিয়াছেন, তাহাকে সুসংবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন) ওয়া (এবং) নাফাখা (ফুৎকার করিয়াছেন, ফুকিয়া দিয়াছেন) ফিহি (উহার মধ্যে, তাহার মধ্যে) মির (হইতে) কহিহি (তাহার আল্লাহর) রুহ ওয়া (এবং) জাআলা (দিয়াছেন) লাকুমস (তোমাদের জন্য) সাম্মআ (শ্রবণ শক্তি, শ্রুতিবার শক্তি) ওয়াল (এবং) আবিসারা (দর্শন শক্তি, দেখিবার শক্তি) ওয়াল (এবং) আফযিদাতা (অন্তঃকরণ, হৃদয়, মন, অনুভূতি, অন্তর) কালিলাম (কন্ম, অল্প, সামান্য) দ্বা (যাহা) তাশকুরুন (তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তোমরা উপকারীর উপকার স্বীকার কর)।

অর্থাৎ, তারপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং ফুৎকার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহার [আল্লাহর] রুহ হইতে এবং দিয়াছেন তোমাদের জন্য শ্রবণ শক্তি এবং দর্শন শক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাহা কন্মই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে মনে হবে রুহকে নফসরূপে তথা প্রাণরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে বিরাট ভুল করা হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে 'আল্লাহর নফস হইতে' বলা হয় নাই, বরং বলা হয়েছে 'ফিহি মির কহিহি' তথা তাহার মধ্যে তাহার তথা আল্লাহর রুহ হইতে। এই একটি মাত্র আয়াতে রুহকে প্রাণরূপে গ্রহণ করবার সম্ভব বিপদ থেকে যায়, কিন্তু প্রাণ বলতে নফসকে বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে নফস না বলে 'আল্লাহর রুহ হতে' বলা হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর নফস তথা প্রাণ থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ নফস তথা প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় তথা একটিবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় তথা মৃত্যুর আশ্বাদন গ্রহণ করতে হয়। অথচ রুহকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি, তবে এই আয়াত দ্বারা এই কথাটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তার রুহকে বিজ্ঞরূপে দান করেছেন। তাছাড়া পূর্ণাঙ্গ রুহরূপে গ্রহণ করে নিতে গেলে সব মানুষই পরিপূর্ণ রুহপ্রাপ্ত হয়েছে বলতে হয়, কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব। রুহকে নুরে মোহান্নাদির মূর্তিমান রূপও বলা যেতে পারে, কারণ রুহ-এর পরিপূর্ণ বিকাশটি নুরে মোহান্নাদির মধ্যেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। রুহ ফুৎকার অর্থে প্রাণ ফুৎকারের কথাটি আসতেই পারে না। শ্রবণ, দর্শন ও অন্তঃকরণ শব্দগুলোর দ্বারা বাহ্যহৃদয়ের অনুভূতিটি বোঝায়। আল্লাহকে রবরূপে গ্রহণ করে ধ্যানসাধনা করে নফসের সঙ্গে খান্নাসের আবরণরূপী আমিত্বের পর্দাটি সরিয়ে দিতে পারলেই রবকে জ্ঞাত করে তোলা যায় এবং তখনই নফসের উপর রুহের আলোকিত রূপটি প্রকাশিত হয় এবং ইহাকেই নুরে মোহান্নাদি বলা হয় এবং অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে, নুরে মোহান্নাদির মোড়কে (সিল) নফসকে আবৃত ও সুরক্ষিত করে নেন। তাছাড়া রুহ নিক্ষেপ করবার কথাটি কেমন করে কোরান-এ বলা হয়েছে? বাহির হতে কোনো কিছু আসলে উহাকে নিক্ষেপ বলা যেতে পারে। আল্লাহ তো প্রতিটি মানুষের মাঝে রবরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু মানুষ তার নিজের রবের পরিচয় পায় না ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি বিকশিত হয়ে আপন পরিচয় দান না করেন। রুহের বিজ্ঞ প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত আছে, কিন্তু উহা মানুষের জানা নাই। উহা

কেবল সন্ধান করলেই পাওয়া যায় না, সন্ধানকারীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত হলেই সন্ধান মেলে। যদিও রুহ মানুষের ভেতরেই বজ্ররূপে অবস্থান করার পর নিষ্ক্ষেপ করা অথবা নাজেল করা কথাটি কোরান-এ প্রকাশ করা হয়েছে, এই নিষ্ক্ষেপ করা অথবা নাজেল করার কথাটির দ্বারা পরিপূর্ণ রুহের বিকশিত রূপটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রুহকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করে যখন রুহের দ্বারা নফসকে চালনা করা হয় সেই অবস্থাটিকেই রুহ নিষ্ক্ষেপ করা বলা হয়েছে। নফসের খান্নাসরূপী কঠোর আনিতটি যখন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ রহমতে সরে পড়ে তখনই নফসের উপর রুহের নিষ্ক্ষেপ করা অথবা নাজেল হওয়া কথাটি বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া রুহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শুধু এটুকুই বলেছিলেন ‘কলুর রুহ মিন আম্মরি রাব্বি’ – তথা রুহ আম্মার রবেরই আদেশ হতে আগত। এ জন্য রুহকে সৃষ্টি চিনতে পারে না। সৃষ্টি বুদ্ধি রুহকে ধারণা করতে পারে না বলেই জটিলতার পাকে পড়ে যায়। সুতরাং রুহ রহস্যময় এবং এই রহস্যময় বিষয়টিকে কথায় অথবা ভাষায় বোঝানো যায় না।

কোরান-এর ১৭ নম্বর সূরা বনি ইসরাইলের ৮৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং) ইয়াসআলুনাকা (তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে) আনির (সম্পর্কে, সম্বন্ধে, বিষয়ে) রুহি (রুহ) কলির (বলুন) রুহ (রুহ) মিন (হইতে) আম্মরি (হকুম, নির্দেশ, আদেশ, অনুজ্ঞা) রাব্বি (আম্মার রব), ওয়া (এবং) মা (না) উত্তির (তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে) মিনাল (হইতে) ইল্লমি (জ্ঞান) ইল্লা (ব্যতীত, কিছু, একমাত্র) কালিলান (সামান্য, অল্প, তুচ্ছ, খুব কম, নগণ্য)।

অর্থাৎ, এবং তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে রুহ সম্পর্কে। বলুন, রুহ আম্মার রবের হকুম হইতে, এবং জ্ঞান হইতে তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে সামান্য ব্যতীত নহে।

মহানবিকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মহানবি বললেন যে, রুহ হলো আম্মার রবের হকুম তথা আদেশ। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ সত্যের অতি সামান্যই বুঝতে পারে। আবার, এই কথাটিও বলে দেওয়া হলো যে, বিশেষ করে রুহের বিষয়টির জ্ঞান দান করা হয়েছে অতি সামান্য। অতি সামান্য তথা অতি অল্প জ্ঞান দেবার কথাটি রুহ-বিষয়ে কেন বলা হলো? কারণ, রুহ অতীব সুক্ষ্মরূপে – যাকে আম্মরা বজ্ররূপে অবস্থানের কথাটি বলে থাকি, সেই বিষয়টির পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একে তো রুহ-বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তার উপর খান্নাসের অনেক ধরনের প্রতারণার জাল পাতা থাকে। সুতরাং, খান্নাসের প্রতারণার জালগুলো যখন সাধকেরা হেরাফুরার মতো নিজনে একাকী বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিতে পারেন তখনই নফসের উপর রুহ পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয় এবং তখনই একজন সাধকের নফসটিকে রূপক ভাষায় চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণের মতো গিলে ফেলে এবং তখনই সাধক কেবলই রুহের অবস্থানটি দেখতে পান এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং তখনই সাধক বিভিন্ন ভাষায় বলে ফেলেন : আনাল হক তথা আমিই সত্য; আনা সুবহানি মা আজামুশশানি তথা আমিই সুবহানি, সব শান আম্মারই, লাইসা ফি জুহুতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা তথা এই জোবার ভেতর আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই, না দিদাম মোস্তফারা বালুকে খোদারা তথা মোস্তফা-রূপ ধারণ করেই আল্লাহকে দেখলাম, সোহহম সোহমি তথা তিনিই আমি – এভাবে অনেক-অনেক উদাহরণ সুফিদের মধ্যে পেয়ে থাকি। সুতরাং খান্নাসমুক্ত জ্ঞান ব্যতীত মানুষ সত্যটির সামান্যই বুঝতে পারে এবং এজন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষকে যে-জ্ঞান দান করা হয়েছে ওটা অতি

সামান্য। সুতরাং রুহ বিষয়ে অনেক রকম কথা দিয়ে অধিক কিছু জানতে চাওয়া বখা। তাই অনেক ওলি-আল্লাহ বলে থাকেন যে, রুহের আসল পরিচয়টি জানবার আগ্রহটি যাদের নাই তারা শিক্ষিত বটে, জ্ঞানীও বটে, কিন্তু মানুষ হতে পারে নি।

আল্লাহর প্রত্যেক ওলি, যাদেরকে আমরা মহামানব বলে থাকি তাঁরা রুহুলহি তথা আল্লাহর রুহ। কিন্তু এখানে একটি বিরাট কথা থেকে যায়, আর সেই কথাটি হলো, সাধক যখন নফস হতে খান্নাসকে মুক্ত করতে পারেন তখনই রুহুল্লাহ হন, তবে যারা মাসুম, মহানবির আওলীদেরা এবং সকল নবীই আজন্ম রুহপ্রাপ্ত, যদিও হজরত ইসা (আ.) তথা যিশু খ্রিস্টকে সাধারণভাবে রুহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে এবং যেহেতু কোরান-এ বলা হয়েছে, 'আমরা ইসা-কে রুহুল কুদ্দুস দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম।' এই কথাটির দ্বারা অনেকেই ভুল করে বসেন, কারণ ইহাতে হজরত ইসা নবির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয় না, বরং বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হয়। এই রুহের পরিপূর্ণ বিকাশটিকেই আবার নূরে মোহাম্মদির ভাণ্ডার বলা হয়।

একটি বিখ্যাত হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে যে, মানবদেহের মাঝে কলব আছে। কলবের মাঝে আছে 'ফুয়াদ' অর্থাৎ অনুভূতি ও চিন্তার বিচিত্র গতিপ্রবাহ। এই ফুয়াদের মধ্যে রুহ উদ্ভাসিত হয় তখনই যখন ফুয়াদ খান্নাসমুক্ত হয়। রুহের মাঝে আছে 'সের' তথা রহস্য। সের তথা রহস্যের মাঝে আছে 'নূর' তথা নূরে মোহাম্মদি। নূরে মোহাম্মাদির মধ্যে আছে 'আনা' তথা 'আমিই আমি।' আল্লাহ বলেছেন, নূরের মাঝে শুধু আমিই আছি।

কোরান-এর ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

তিলকা (ওই) রসুল (রসুলেরা, রসুলগণ) ফাদদালনা (আমরা ফজিলত দিয়াছি, আমরা মর্যাদা দিয়াছি, আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি) বাদাতহম (তাহাদের কেহ কেহ) আলা (উপর) বাদিন (অংশ, টুকরা, সম্পূর্ণ বস্তুর কিছু অংশ, কিছু, কাহারও)।

□□□ওই রসুলগণ আমরা ফজিলত দিয়াছি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর।

+ মিনহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কাহারও, কেহ) কাললামা (কথা বলিয়াছেন) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়া (এবং) রাফাআ (উর্ধ্বে স্থাপন করিলেন, উপরে উঠাইলেন, উঠাইলেন) বাদাতহম (তাহাদের কেহ-কেহ) দারাজাতিন (মর্যাদা, ধাপ, সিঁড়ি)।

□□তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ কথা বলিয়াছে কাহারও (সাথে) এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে স্থান করিলেন তাহাদের কেহ-কেহকে।

+ ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দান করিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনা (পুত্র) মারিয়ামা (মারিয়মের) বাইইনাতি (খোলা চিকুসমূহ, উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি, শক্তি দিয়াছি) বিকহি (রুহের দ্বারা) কুদসি (খুব পবিত্র, পবিত্র সত্তা)।

□□এবং আমরা দিয়াছি মারিয়মের ছেলে ইসাকে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং আমরা তাহাকে (ইসাকে) সাহায্য করিয়াছি খুব পবিত্র রুহের দ্বারা।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাআ (চাইতেন, ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালা (সে যুদ্ধ করিল, পরস্পর যুদ্ধ করা) আল্লাজিনা (যাহারা) মিন (হইতে) বাদি (পরে) হিম (তাহাদের) মিনবাদি (হইতে পরে) মা (যাহা) জাতাতহম (তাহাদের কাছে আসিয়াছিল) বাইইনাতি (উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়ালাকিনি (এবং কিছু) ইখতালাক (তাহারা মতভেদ করিল, তাহারা মতবিরোধ করিল) ফামিনহম (সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে) মান (যে, কেহ, কাহারও) আমানা (ইমান আনিয়াছে, ইমান আনিল) ওয়া (এবং)

মিনুহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কেহ) কাফারা (কুফরি করিল, অস্বীকার করিল)।

এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না তাহাদের পর হইতে যাহারা, যাহা তাহাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণগুলি আসিয়াছিল ইহার পরেও এবং কিছু তাহারা মতবিরোধ করিল সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ইমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কুফরি করিল।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাআ (ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালু (তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত)।

এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত না। + ওয়া (এবং) লাকিননা (কিন্তু) আল্লাহা (আল্লাহ) ইয়াফআলু (করেন) মা (যাহা) ইওরিদু (তিনি চাহেন)।

এবং কিছু আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

এই আয়াতে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করছেন এই বলে যে, রসুলগণের মধ্যে তিনি ফজিলতের প্রশ্নে কিছুটা কমবেশি করেছেন। অথচ এই সূরা বাকারাতেই আল্লাহ আদমদেরকে তথা মানুষদেরকে রসুলগণের মধ্যে ছোট-বড় করার ভাগ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা এই কথাটুকুর মাঝে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আল্লাহ মর্যাদার প্রশ্নে তথা ফজিলতের বিষয়ে রসুলগণের মধ্যে একজন হতে আরেকজনকে মর্যাদাবান বেশি করেছেন। যেহেতু এই মর্যাদার বিভাজনটি রসুলগণের মধ্যে তিনিই করেছেন সেই হেতু কোনো কিছু বলার এবং অভিযোগ করার প্রশ্নটি অবান্তর। অথচ আমাদেরকে রসুলগণের মধ্যে ছোট-বড় করতে মানা করে দিয়েছেন। কারণ যদিও রসুলগণ আমাদেরই মতো অথচ রসুলগণ মোটেও আমাদের মতো নহেন। যেহেতু রসুলেরা আমাদের মতো নহেন সেই হেতু আল্লাহ আমাদেরকে ছোট-বড় করতে তথা পার্থক্য করতে মানা করে দিয়েছেন।

আবার আল্লাহ বলেছেন, রসুলগণের মধ্যে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। এই কথাটির গভীর রহস্য অধম লিখকের পরিষ্কার জানা থাকলেও অপরিষ্কারের ভান করে বলতে হচ্ছে যে তিনি (আল্লাহ) রসুলদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন। আবার তিনি বলছেন যে উচ্চমর্যাদার প্রশ্নে রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও উচ্চমর্যাদাটি দান করেছেন। তারপর আল্লাহ বলছেন, মরিয়মপুত্র হজরত ইসা রুহ্লাহ (আ.)-কে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই উজ্জ্বল প্রমাণ (বাইব্রাত) বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? অধম লিখকের মনে হয় যে এই উজ্জ্বল প্রমাণটি হলো হজরত ইসা রুহ্লাহ (আ.) দোলনাতে গুয়ে-গুয়েই কথা বলতেন। তিন দিনের শিশু অবস্থায় আর কোনো রসুল কথা বলেছেন কি না উহা অধম লেখকের জানা নাই। কিন্তু হজরত ইসা রুহ্লাহ (আ.) যে জন্মগ্রহণ করেই কথা বলতে শুরু করেছেন ইহার জুলন্ত দলিলটি আমরা কোরান-এই পাই। কথিত আছে যে, দোলনায় গুয়ে-গুয়ে শিশু ইসা রুহ্লাহ (আ.) যখন মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন সেই মানুষেরা অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত এবং ভক্ত তথা মুবিদ হয়ে যেত। তারপরে আবার মরিয়মপুত্র ইসাকে রুহল কুদ্দুস তথা অতি পবিত্র রুহ দ্বারা শক্তিশালী করার কথাটিও বলা হয়েছে। অধিকাংশ তফসিরকারকেরা রুহল কুদ্দুসের অর্থটি বুঝতে না পেরে অনুমানের গুলম্বারা বিদ্যাটি জাহির করে ফেলেছেন। আর সেই গুলম্বারা বিদ্যাটি হলো, রুহল কুদ্দুস বলতে তারা ফেরেশতা জিবরাইলের কথাটি উল্লেখ করেছেন। হায় রে খোদা! এরা কি এটুকু বেমানান ভুলে গেছেন যে, জিবরাইল ফেরেশতার নফসও নাই এবং রুহও নাই। তথা নির্বাচন করার অধিকার হতে ফেরেশতারা

সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আসলে ফেরেশতা জিবরাইলের নাম যদি রুহুল কুদ্দুস দেওয়া হয় তাহলে ইহা অনেকটা কানা ছেলের নাম পদ্যলোচনের মতো শোনায়, তথা চোখই নাই অথচ কী সুন্দর অপূর্ব চোখ দুইটি। বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাকি না দিয়ে একবার ভাবুন তো যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে কোনো নফস এবং কোনো রুহ দান করেন নি। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ নফস দান করেছেন, কিন্তু রুহ দান করেন নাই – একমাত্র মানুষ এবং জিন ছাড়া। তাই আমরা দেখতে পাই, মানুষের মধ্যে যে-রকম আল্লাহর ওলি হয়, তেমনি জিনের মধ্যেও আল্লাহর ওলি হয়। যেহেতু জিনজাতির সঙ্গে আমাদের তথা মানুষদের সঙ্গে পরিচয় নাই বললেই চলে তাই ইচ্ছা করেই জিনজাতির কথাটি বাদ দিয়ে যাই। আমরা জ্ঞানি, ফেরেশতার অতি পবিত্র, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নহে। সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। তাই মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফেরেশতার অতি পবিত্র হয়েও এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটির ধারেকাছেও নাই। কারণ নির্বাচন করার ক্ষমতাটি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি। নির্বাচন করার কথাটি তখনই আসে যখন ভালো এবং মন্দে মিশ্রণ করা হয়। ভালো-মন্দের অধিকারটি দান করলেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিও দান করা হয়ে যায়। কারণ কান টানলে মাথা আপনিই আসবে। আল্লাহর এত বড়-বড় জুলন্ত প্রমাণসমূহ দেখার পরেও মানুষ উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হত্যায়জ্ঞ এমনকি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে বারবার। ইহা মানবজাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কের তিলক হয়ে আছে এবং থাকবে। তাই এই সীমিত ইচ্ছাশক্তিটি দান করার দরুন কেহ ইম্মান আনবে কেহ সরাসরি কুফরি করবে। ভালো এবং মন্দের এই লীলাখেলাটি যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে অনেক রূপ ও রঙে এবং অনেক রকম লেবাসে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেছেন তথা নির্বাচন করার অধিকারটি দিচ্ছেন সেই হেতু আল্লাহ ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যদি হস্তক্ষেপ আল্লাহ করতেন তাহলে এই হত্যায়জ্ঞের লীলাখেলাটির চিরতরে অবসান হতো। এখানে অনেকেই আল্লাহকে গোপনে দোষ দিতে চায়। কিন্তু অধম লিখক নিরপেক্ষ মনে বলছি যে, স্বাধীনতা দেবার পর যদি উহা হরণ করা হয় তাহলে এই স্বাধীনতার মর্যাদাটি থাকে কোথায়? সুতরাং সর্বপ্রকার দোষ হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালাহশানাহ সম্পূর্ণ মুক্ত।

কোরান-এর ৭০ নম্বর সূরা মারেজ-এর ৪ নম্বর অয়াতে বলা হয়েছে :

তারুজুল (উরুজ করে, আরোহণ করে, উপরে উঠে, উর্ধ্ব গমন করে, অধিরোহণ করে) *মালারিকাত* (ফেরেশতারা) *ওয়া* (এবং) *রুহ* (রুহ [রুহের প্রতিশব্দ বাংলাতেও নাই এবং ইংরেজি ভাষাতেও নাই। তবে বাংলা ভাষায় পুরমাত্রা এবং ইংরেজিতে 'স্পিরিট' কেহ-কেহ অনুবাদ করিয়া থাকেন।) *ইলাইহি* (তাহার দিকে) *ফি* (মধ্যে) *ইয়াওমিন্* (একদিন) *কানা* (হয়) *মিকদারুহ* (যাহার পরিমাণ, যাহার মাপ, যাহার মাত্রা, যাহার ওজন, যাহার সংখ্যা, যাহার বিস্তার, যাহার গুরুত্ব) *খামসিনা* (পঞ্চাশ) *আলফা* (হাজার) *হানাহতিন* (বহুর)।

অর্থাৎ, উরুজ করে ফেরেশতারা এবং রুহ তাঁহার (আল্লাহর) দিকে একদিনের মধ্যে যাহার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার বহুর।

এই আয়াতে 'উরুজ' শব্দটির অর্থ হলো উপরে ওঠা তথা উর্ধ্বগমন। আবার 'উরুজ' শব্দটির অর্থটি মিলনও হয়। আরবি ভাষায় একটি শব্দের যে কত রকম অর্থ হয় তার কিছুটা নমুনা কোথাও-কোথাও তুলে ধরেছি। আল্লাহর সঙ্গে মিলনের জন্য আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতিকেও 'উরুজ' বলে। এই 'উরুজ' শব্দের সঙ্গে মেরাজ নামক পরিচিত শব্দটি আমাদের জানা আছে। এই 'উরুজ' শব্দ

হতেই মেরাজ শব্দটির আগমন। ফেরেশতারা এবং রুহ আল্লাহর দিকে যে-গতিতে এগিয়ে যায় তা পৃথিবীতে বাস করা মানুষের নিকট পঞ্চাশ হাজার গুণ তিনশত ষাট দিন (হিজরি সনের গণনায়) - এই কথাটির মাধ্যমে স্থান ও কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) সম্মানবদ্ধ দৈহিক গতিটিকে বোঝানো হয় নাই। কারণ, আল্লাহ স্থান এবং কালের বস্তুর গতিতে আবদ্ধ নন। *আল্লাহ কখনই মানুষ হতে কোনো এক সুদূর স্থানে অবস্থান করেন না যার জন্য এত বড় লম্বা বাস্টিটি অতিক্রম করে আল্লাহর নিকট যেতে হবে।* এই গতি দৈহিক অথবা বৈষয়িক গতি (ফেনোমেনাল স্পিড) নহে। ইহা নিছক একটি আধ্যাত্মিক গতি (স্পিরিচুয়াল স্পিড)। আপন নফস হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতে ভুবে থেকে সাধক যখন খান্নাসমুক্ত হতে পারে তখনই সে আল্লাহর রহস্যময় পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে।

আপন নফসের মধ্যে রুহটি যখন পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে, সেই পরিপূর্ণ রূপটিই হলো আল্লাহর রূপ এবং যেখানেই আল্লাহর রূপের পরিচয়টি ধরা দেবে সেখানে ফেরেশতাদের আগমনটি অবধারিত।

মুহানবি যে মেরাজে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন সেই সময়টিকেও সর্বনিম্ন সাতাশ বছর হতে সাতাশি হাজার বছর পর্যন্ত অবস্থান করার কথাটি দেখতে পাই, অথচ মুহানবির ওজর পানি তখনও গড়িয়ে যাচ্ছিল এবং আরও কিছু ঘটনা। এই স্থান ও কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) বিষয়টির কিছুটা পরিচয় আমরা এই আধুনিক কালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ইতে জানতে পারি। তাছাড়া আল্লাহর বহু ওলিরা বলেই ফেলেছেন যে 'বুদ আন্দার লা মোকা খসরু' তথা খসরু লা-মোকায় অবস্থান করেছিল।

মুহানবি বলেছেন, *আসসালাত মেরাজুল মোমেনিন* - অর্থাৎ, সালাতই মোমিনদের মেরাজ। পক্ষান্তরে আল্লাহ সুরা মারেজ-এর ২৩ নম্বর আয়াতে বলছেন, *আল্লাজিনা হম্ম আলা সলিতিহিমু দায়েমুন* - অর্থাৎ, যারা দায়েমি সালাতের উপর তথা ২৪ ঘণ্টা সালাতের উপর অবস্থান করে তারাই মুসলিম। এখানে একটু লক্ষ্য করবার বিষয়টি হলো, *কোরান* দায়েমি সালাতের কথাটি একদম সোজাসজি বলে দিলেন। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফিয়া সালাতের কথাটি *কোরান*-এ সোজাসজি বলা হয় নি অথবা বলেন নি। ধ্যানসাধনায় রত থাকা একজন সাধক যখন আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে তখনই সেই সাধক মোমিনে পরিণত হয় এবং রুহ পরিপূর্ণরূপ ধারণ করে যে-দর্শনটি দান করা হয় উহাই হলো সাধকের মেরাজ।

নফস সরল, কিন্তু খান্নাস বক্র তথা আকাম-ককামের গুরু ঠাকুর। খান্নাসমুক্ত নফসটি একদম সরল-সহজ এবং নিশ্চাপ। তাই বলা হয়ে থাকে 'ফেরেশতার মতো'। সুতরাং রুহ রহস্যের ভাঙার, রুহ গোপনেরও গোপন, রুহ বিজ্ঞান বহির্ভূত বিজ্ঞান, রুহ ধারণার বহির্ভূত ধারণা। অথচ এই রুহ প্রতিটি মানুষের জীবন-রঙের নিকটেই অবস্থান করে - যদিও বুঝতে পারি না এবং দুনিয়ার অনেক রকম চাকচিক্যময় মোহনীয় বিষয়গুলোর মায়াজালে আপন নফসের সঙ্গেই মিশে থাকা খান্নাসটি সত্যদর্শন হতে তথা রুহের পরিচয় হতে ফিরিয়ে রাখে অনেক রকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে।

১নং সূরা : ফাতিহা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর নামের সাথে (*বিসমিল্লাহে*) যিনি একমাত্র দাতা (*আর রাহমান*)

একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. আল্ হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।
 □□ একমাত্র প্রশংসা (আল্হামদু) আল্লাহর জন্য (লিল্লাহে)। (যিনি) জগতসমূহের রব (প্রতিপালক) (রাব্বিল আলামিন)।
২. আর রাহমানির রাহিম।
 □□ (যিনি) আরু রহমান (একমাত্র দাতা) আর রাহিম (একমাত্র দয়ালু)।
৩. মালেকে ইয়াওমিদদিনে।
 □□ (যিনি) ইয়াওমিদদিনের মালিক (বিচার-দিনের অধিপতি)।
৪. ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়াকানাস্তায়িনু।
 □□ আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি (ইয়্যা কানাবুদু) এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (ওয়া ইয়্যা কানাস্তায়িনু)।
৫. ইহদিনাস্ সেরাতাল মুস্তাকিম।
 □□ আমাদেরকে দান কর (ইহদিনা) সেরাতাল মুস্তাকিম (একমাত্র সঠিক পথ)।
৬. সেরাতাল্লাজিনা আনুআমতা আলাইহিম।
 □□ তাহাদের পথ (সেরাতাল্লাজিনা) যাহাদের উপর (আলাইহিম) তোমার নেয়ামত দান করা হইয়াছে (আনুআমতা)।
৭. গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্ দোয়াল্লিনা।
 □□ যাহারা তোমার নিকটে পথভ্রষ্ট নয় (গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম) এবং বিপথগামীও নহে (ওয়ালাদ্ দোয়াল্লিনা)।

২নং সূরা : বাকারা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর নামের সাথে (বিসমিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. আলিফ-লাম-মিম।

২. জালিকাল্ (ওইটাই) কিতাব (কিতাব, আল্লাহর আপন নুর)।

□□ আল্লাহর আপন জাত নুরের নুরে মুহাম্মদি নাম ধারণ করে সেই নুরের মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টিক্রমে আল্লাহর বিকাশ ও প্রকাশ বিজ্ঞানকে কিতাব বলা হয়। আল্লাহর এই বিকাশ বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি ধরা পড়ে মানবদেহে। মানবদেহকে 'আল কিতাব' বলা হয়। আল কিতাবের সর্বশ্রেষ্ঠ জাহেরি রূপ হলো এই মানবদেহটি এবং বিকাশ বিজ্ঞানটি হলো বাতেনি কর্মফল। নুরে মুহাম্মদি এই আল কিতাবের জাহেরি এবং বাতেনি প্রকাশ-বিকাশের মূল উৎস। নিজের দেহটিকে পাঠ করা তথা আপন দেহের মাঝে আপনার অনুশীলন করার অপর নামটিই হলো 'আল কিতাব' পাঠ করা। নিজের দেহটি হলো সকল প্রকার জ্ঞানের মূল উৎসের ভাণ্ডার। সুতরাং যাহা কিছু আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে একটি মানবদেহে।

+ লা (নাই) রাইবা (কোনো সন্দেহ) ফিহি (ইহার মধ্যে) হদাল্ (হেদায়েত) লিল্ (জন্য) মুঠাকিন (মুঠাকি)।

□□ আলিফ-লাম-মিম। ওইটাই কিতাব। নাই কোনো সন্দেহ ইহার মধ্যে, মুত্তাকিদেব জন্য হেদায়েত।

□□ 'আলিফ-লাম-মিম' যদিও তিনটি অক্ষর, কিন্তু এখানে 'আলিফ-লাম-মিম'-টাই হলো কিতাব। তাই 'জালিকাল কিতাব' তথা 'ওইটাই কিতাব' বলা হয়েছে। বলা হয় নি 'হাজ্জাল কিতাব' তথা 'এইটাই কিতাব'। এখন 'ওইটা' বলতে কোনটা বোঝানো হয়েছে? 'আলিফ-লাম-মিম'-টাকেই বোঝানো হয়েছে কিতাব। আল্লাহর এই রহস্যপূর্ণ কথাগুলো বুঝতে না পেরে অনেকে বলে ফেলেন যে ইহার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তো সব কিছুই জানেন, ইহা একটি মামুলি ব্যাপার, কিন্তু যেহেতু এই কথাগুলো প্রকাশ্যে আল্লাহ বলেছেন সেই হেতু ইহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অবশ্যই আছে। তবে আল্লাহর এই কিতাবের ব্যাখ্যাটি দিতে কষ্ট হয় বলে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ এটাও বলেছেন যে, কোরান-এ যাহা কিছু নাজেল করা হয়েছে উহা মানবজাতিকে বোঝাবার জন্যই নাজেল করা হয়েছে। এই 'আলিফ-লাম-মিম'-এর যত রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেওয়া হোক না কেন, যদি আন্তরিক হয় তাহলে দোষের কিছুই থাকে না। একেক জনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ একেক রকম হতে পারে এবং তাই হয়। কোনো প্রকার ব্যাখ্যা না দিয়ে চুপ করে থাকলেও ভালো মানায়, কিন্তু চুপ না করে সমস্ত বিষয়টা আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই সম্মত নয়।

৩. আল্লাজিনা (যাহারা) ইউম্মিনুনা (ইমানের কাজ করে) বিন্ গাইবি (গায়েবের সহিত) ওয়া (এবং) ইউকিমুনাস্ (কায়েম করে) সালাতা (সালাত) ওয়া (এবং) মিম্মা (তাহা হইতে যাহা) রাজাকনাস্ (আমরা রেজেক দিয়াছি তাহাদের) ইউনফিকুন্ (তাহারা ব্যয় করে, তাহারা খরচ করে)।

□□ যাহারা ইমানের কাজ করে গায়েবের সহিত এবং কায়েম করে সালাত এবং তাহা হইতে, যাহা আমরা রেজেক দিয়াছি তাহাদের, তাহারা ব্যয় করে।

□□ মুত্তাকি তাহদেরকেই বলা হচ্ছে যারা গায়েবের সহিত ইমানের কাজ করে। এই গায়েবের সহিত ইমানের কাজ করাটির শর্ত হলো, প্রথমে গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেই ইমানের কাজে এগিয়ে যেতে হয়। সাধককে ইমানের কাজের জন্য গায়েবের গোপন বিষয়গুলোর উপর আস্থা রেখেই ধ্যানসাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়। তারপর বেশ কিছুদিন সাধক ধ্যানসাধনা নামক ইমানের কাজগুলো একাগ্র মনে চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই চালিয়ে যাবার বিশেষ বিশেষ সময়ে গায়েবের বিষয়গুলো ধরা পড়তে থাকে। সুতরাং গায়েবের বিষয়গুলো বিনা শর্তে প্রথমে মনে নিতে হবে এবং পরে ইমানের কাজের মাধ্যমে ধ্যানসাধনা করে গায়েবকে বুঝবার জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে ধ্যানসাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাবার পথে সাধককে অবশ্যই বিরাট ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং গায়েবের বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয় লাভ করার জন্য যে নিয়ম-নীতিগুলো মনে চলতে হয় উহা ভালো করে জেনে নিতে হবে এবং সেই নিয়ম-নীতির উপর দাঁড়িয়ে ইমানের সাথে ধ্যানসাধনাটি করে যেতে হবে। সাধকের ধ্যানের গভীরতা দেখেই আল্লাহ গায়েবের বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুতরাং মুত্তাকি তাহাই যারা ইমানের সাথে একাগ্র মনে ধ্যানসাধনার মোরাকবাটি বিরাট ধৈর্যধারণ করে করতে পারেন। তাহাই ধাপে-ধাপে গায়েবের বিষয়গুলোর পরিচয় লাভ করতে পারেন এবং এই রকম সাধকদেরকেই আসল মুত্তাকি তথা হাকিকি মুত্তাকি বলা হয় এবং এই মুত্তাকিদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বলে কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে। যে-সাধক যতটুকু ধ্যানসাধনা করে এগিয়ে গেছেন, সেই সাধক গায়েবের বিষয়গুলো ততটুকুই জানতে পারবেন। প্রতিটি সাধকের প্রতিটি 'আমি'-র সঙ্গে পরীক্ষা করবার জন্য শ্রুতানুকে খান্নাসরূপে দেওয়া হয়েছে, সেই খান্নাসটিকে যে-সাধক যতটুকু তাড়িয়ে দিতে পেরেছে সে ততটুকুই গায়েবের

রহস্য বুঝতে পেরেছে। যে-সাধক খান্নাসরূপী শয়তানটিকে ইমানের সাথে ধ্যানসাধনা করে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন, সেই সাধক গায়েবের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। সেই সাধকের কাছে জাহের এবং বাতেন তথা বাহির এবং ভেতর একাকার হয়ে গেছে। এবং তখনই সাধক 'সালাত' তথা যোগাযোগটিকে পরিপূর্ণরূপে হাসিল করতে পেরেছেন। তখন সেই সাধকের কাছে আনুষ্ঠানিক সালাতের গুরুত্বটি তেমন আর থাকে না এবং তখনই আল্লাহ 'আমরা'-রূপ ধারণ করে যে-রেজেক দান করেন সেই রেজেক হতে ব্যয় করার রহমতটি সাধক পেয়ে যান। এই রেজেক হাকিকি রেজেক। এই রেজেক বৈষয়িক বিষয়ের অর্জন করা মেজাজি রেজেক নয়। মেজাজি রেজেকটি আছে বলেই হাকিকি রেজেকের কথাটি আপনিই এসে পড়ে এবং এই হাকিকি রেজেকটি যে-সাধককে ব্যয় করার রহমত দান করা হয়েছে সেই সাধকই হাকিকি রেজেক ব্যয় করতে পারেন। এই রেজেক অফুরন্ত রেজেক। এই রেজেক হিসাব করে ধরা যায় না। তাই এই রেজেককে বোহিসাব রেজেক বলা হয়েছে। হিসাবের বাইরে এই রেজেকের অবস্থান। বৈষয়িক রেজেক তথা মেজাজি রেজেক কখনই বোহিসাব হতে পারে না। মেজাজি রেজেককে হিসাবের আওতায় বেধে রাখা যায়। দুনিয়াতে কতটুকু চাউল-গম্ব হচ্ছে তার হিসাব রাখাটা একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং ইহা কখনই বোহিসাব রেজেক নয়। রহমতের রেজেক বোহিসাব এবং এই বোহিসাব রেজেকই সাধকদেরকে দান করা হয়ে থাকে। বৈষয়িক বিষয়ের মেজাজি রেজেকটির মূল্য আল্লাহর কাছে কতটুকু তা সহজেই ধরা যায়। কারণ, বৈষয়িক বিষয়ের রেজেকটিই যদি মুখ্য বিষয় হয়ে থাকে তাহলে বিল গেটস, ওয়ারেন ব্যাফেট, লক্ষ্মী মিতাল, অনিল আস্থানী, টাটা, বিডলা, গোয়েঙ্কা, মোফটলাল, ডাল মিয়া, বাজাজ, জয়পুরিয়া এবং বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীরাই এই মেজাজি রেজেক অনেকখানি অর্জন করতে পেরেছেন। এখন পাঠকই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ রেজেক বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

৪. ওয়া (এবং) আল্লাজিনা (যাহারা) ইউমিনুন (ইমান আনে) বিম্বা (ওই বিষয়ে যাহা) উনজিল (নাফেল করা হইয়াছে) ইলাইকা (আপনার দিকে) ওয়া (এবং) মা (যাহা) উনজিল (নাফেল করা হইয়াছে) মিন্ (হইতে) কাবলিকা (আপনার আগে) ওয়া (এবং) বিল্ আখেরাতি (আখেরাতের সহিত) হম্ (তাহারা) ইউকিনুন (নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে)।

□ এবং যাহারা ইমান আনে ওই বিষয়ে যাহা নাফেল করা হইয়াছে আপনার দিকে এবং যাহা নাফেল করা হইয়াছে আপনার পূর্ব হইতে এবং আখেরাতের সহিত তাহারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

□ এই আয়াতে মৃত্তাকি কারা তাহাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আপনার (রসুলের) প্রতি যাহা কিছু নাফেল হয়েছে তাহার উপর ইমান এনেছে এবং আপনার আগেও যাদের উপর নাফেল হয়েছিল তাদের প্রতিও ইমান এনেছে এবং আখেরাতের সহিত যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছে তাদেরকেই মৃত্তাকি বলা হয়েছে। এই বিষয়-কথাটিতে যখনই নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় তখনই সে একজন মৃত্তাকি তথা তাকওয়ায়-রত হয়ে যায়। এই মৃত্তাকিরাই ধ্যানসাধনার নিয়মাবলিকে মেনে নিয়ে ধ্যানসাধনায়-রত হয়ে যায় এবং রহস্যলোকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এই মৃত্তাকির্য বিরাট ধৈর্যধারণ করে অগ্রসর হতে থাকে। এই রুকম অগ্রসর হওয়াটিকে 'আমলে সালেহা'-ও বলা হয়ে থাকে। আগেকার দিনের প্রায় ওলি-আল্লাহদের ধ্যানসাধনা করার কথাটি আমরা পরিষ্কার জানতে পারি। আমরা আরও জানতে পারি যে, আগেকার দিনের ওলি-আউলিয়ারা বছরের পর বছর নিজনে একাকী ধ্যানসাধনায় মশগুল হয়ে থাকতেন এবং রহস্যলোকের রহস্যময় সত্যগুলো উদ্ধার করতে পারতেন। এখন এই যুগে এই সময়ে ধ্যানসাধনার বিষয়টি যেন একটি বাড়তি

আম্মেলা বলে মনে করে। তাই ধ্যানসাধনার কথাটি বললেই অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে থাকে – যেন নূতন কিছু শোনানো হচ্ছে।

৫. উলাইকা (তাহারাই) আলা (উপর) হদা (সঠিক পথ) মির (হইতে) রাবরিহিম (তাহাদের রবের) ওয়া (এবং) উলাইকা (তাহারা) হম (যাহারা) মফলিহন (সফলকাম, কল্যাণপ্রাপ্ত, কল্যাণলাভকারী, সাফল্যলাভকারী, সিঁড়িগ্যবান, উন্নতিশীল)।

তাহারাই তাহাদের রব হইতে সঠিক পথের উপর এবং তাহারাই যাহারা কল্যাণপ্রাপ্ত।

এই মৃত্তাকিরাই সঠিক পথের উপর অবস্থান করছেন এবং এই সঠিক পথে অবস্থান করার দরুনই তারা কল্যাণ লাভকারী এবং তাহাই সফলকাম বলে আলাহ ঘোষণা করছেন। এজন্যই মহানবি তার নিজের জীবনে হেরাণ্ডহায় পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করে আমাদের জন্য ধ্যানসাধনার বিষয়টিকে গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ধ্যানসাধনা বিহনে রহস্যলোকের কিছুই অর্জন করা যায় না, বরং কয়েক বস্তা কুথার যুক্তিতর্কের ফলস্বরূপ লাভ করা যায়। তাই অনেক সাধক বলে থাকেন, 'কুথার মধ্যে খোদানাই এবং খোদার মধ্যে কথা নাই।' যদিও বাক্যটি রূপক, কিন্তু গুরুত্বের প্রশ্নে অবহেলা করা যায় না।

এই মৃত্তাকিদেরকে যদি আমরা ভাগ করতে চাই তাহলে প্রথম ভাগটির নাম হবে মেরাজি মৃত্তাকি এবং দ্বিতীয় ভাগটির নাম হাকিকি মৃত্তাকি তথা আসল মৃত্তাকি। প্রথম অর্থে, কেউ ধর্মীয় অনুশাসন আন্তরিকভাবে পালন করলেই তাকে মেরাজি মৃত্তাকি বলা যায়। কিন্তু নিজনে একাকী ধ্যানসাধনা তথা মোরাকারা-মোশাহেদার মাধ্যমে আলাহকে লাভ করার প্রচেষ্টায় যিনি বা যারা কামিয়াব হয়েছেন তাহাই আসল মৃত্তাকি তথা হাকিকি মৃত্তাকি। মেরাজি মৃত্তাকির মাধ্যমে হাকিকি মৃত্তাকি হবার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রত্যেকটি বিষয়ের দুইটি দিক থাকে : একটি বাহির, অপরটি ভেতর।

৬. ইননা (নিশ্চয়ই) আল্লাজিনা (যাহারা) কাফারু (কুফরি করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে, কাফের, বাতিল করিয়াছে, গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, প্রত্যাখ্যান করিয়াছে) সাওয়াউন (সম্মান হইয়া গিয়াছে, বরাবর হইয়াছে) আলাইহিম (তাহাদের উপর) আআনজাবতাহম (তাহাদের আপনি করেন কি?) আম্ম (অথবা) লাম্ম (নাই) তুনজির (আপনি সতর্ক করুন) হম (তাহাদেরকে) লা (না) ইউমিনুন (তাহারা ইমান আনিবে)।

নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের আপনি সাবধান করুন কি অথবা নাই সতর্ক করুন (উহা) সম্মান তাহাদের (নিকটে), তাহারা ইমান আনিবে না।

এখানে সত্য-অস্বীকারকারীদেরকেই কাফের বলা হয়েছে। আরবি ভাষায় এদেরকে 'কাফারু' বলা হয়েছে। সত্যের আমন্ত্রণ জানালেও যারা গ্রহণ করে নিতে পারে নি তাহাদেরই কাফের বলা হয়েছে। এই রকম কাফেরদের কাছে সত্য বিষয়গুলো তুলে ধরা আর না-ধরা একই কথা। কারণ, এরা প্রথমেই সত্যকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং যত সুন্দর, কবেই এদেরকে সত্যের জন্য ডাক দেওয়া হোক না কেন, এরা মেনে নেয় না। তাই আলাহ মহানবির মাধ্যমে সত্যকে যারা আলিঙ্গন করে মোমিন হয়েছেন তাহাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আশ্রয় জানানো আর না-জানানো একই কথা।

৭. খাতাম্মা (মোহর করিয়া দিয়াছেন) আলাহ (আলাহ) আলা (উপর) কুলুবিহিম (তাহাদের কলবগুলিতে) ওয়া (এবং) আলা (উপর) সাম্মইহিম

(তাহাদের কান্ডুলিতে) *ওয়া* (এবং) *আলা* (উপর) *আবসার* (চোখগুলির) *হিম* (তাহাদের) *গিশাওয়াতুন* (পরদা, আবরণ) *ওয়া* (এবং) *লাহম* (তাহাদের জন্য) *আজাবুন* (আজাব, শাস্তি) *আজিম* (বড়)।

□ তাহাদের কান্ডুলির উপর আল্লাহ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের কান্ডুলির উপর এবং তাহাদের চোখগুলির উপর আবরণ (দিয়াছেন) এবং তাহাদের জন্য বড় শাস্তি (রহিয়াছে)।

□ এই আয়াতে মোটামুটি এই ধারণাটি হুতে পারে যে বস্তুমোহের আবরণে যখন অন্তর, কান্ডুলো ঢেকে যায় তখন ইমানের কাজগুলো করবার আর কোনো সুযোগ থাকে না। মন তখন মুক্তির পরিবর্তে মানসিক শাস্তির বলয়ের মাঝে বন্দি হয়ে যায়। এই মানসিক শাস্তি চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু প্রতিটি আচার-আচরণের মাঝে মানসিক শাস্তির ছাপগুলো দেখতে পাই। উহাই ‘আজাবুন আজিম’ তথা বড় শাস্তি। দেখা যায় না, ধরা যায় না, অথচ দেখা যায় এবং ধরাও যায় – যখন অন্তর্দৃষ্টির দরজাটি তথা তৃতীয় চক্রটি খুলে যায়। আপন পবিত্র নফসের ভিতর অপবিত্র খান্নাসরুপি শয়তানটি যখন বস্তুমোহের জাল বনে অন্তরাআ এবং দৃষ্টিশক্তিকে ঢেকে ফেলে, তখন মানুষ মোহের নিকট মানসিকভাবে বন্দি হয়ে যায় এবং এই বন্দিজীবনকেই ‘আজাবুন আজিম’ বলা হয়। এদের মধ্যে কিছু-কিছু লোক আছে যারা ধর্মীয় কাজকর্মগুলো সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়, কিছু বোঝাতে চায়, কিছু স্বীকার করে নিতে চায় এবং প্রকাশ্যে অনেক সময় বলিও বেড়ায় যে, ‘আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আখেরাতের উপরেও ইমান আনলাম।’ এইগুলো তাদের মুখের কথা, মনের কথা নয়। মুখের ইমান আর মনের ইমানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই বিষয়গুলো মাঝে-মাঝে এতই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে যায় যে কোনটা আসল কথা আর কোনটা নকল কথা এই পার্থক্য করা বড়ই কঠিন হয়ে যায়।

৮. *ওয়া* (এবং) *মিনান* (মধ্য হইতে) *নাস* (মানুষদের) *মাই* (যাহারা) *ইয়াকুন* (বলে) *আমাননা* (আমরা ইমান আনিয়াছি) *বিনাতি* (আল্লাহর সহিত) *ওয়া* (এবং) *বিন ইয়াওমিন* (দিনের সহিত) *আখিরি* (আখেরাতের) *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *হম* (তাহারা) *বিম্মিনিন্* (মোমিনদের সহিত)।

□ এবং মানুষদের মধ্য হইতে যাহারা বলে আমরা ইমান আনিয়াছি আল্লাহর সহিত এবং আখেরাতের দিনের সহিত এবং তাহারা মোমিনদের সাথী নহে।

□ এই আয়াতে অধিকাংশ মানুষ যে ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে ফাঁকা বলি ও আচার-আচরণের উপর নিছক অনুষ্ঠানবাদী হয়ে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করার কথাটি প্রচার করে বেড়ায়, আসলে তারা আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি বলে বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এরা মোমিনদের সাথী হতে পারে না।

৯. *ইউখাদিউনালাহ* (তাহারা প্রতারণা করিতে চায় আল্লাহর সহিত) *ওয়া* (এবং) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমান* (ইমান আনিয়াছে) *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *ইয়াখদাউনা* (তাহারা প্রতারণা করে) *ইল্লা* (একমাত্র) *আনফুসাহম* (তাহাদের নিজেদের নফসগুলিকে) *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *ইয়াশউকুন* (তাহারা অনুভব করে, তাহারা চিন্তা করে, তাহারা বুঝিতে পারে)।

□ তাহারা প্রতারণা করিতে চায় আল্লাহর সহিত এবং যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং না তাহারা প্রতারণা করে একমাত্র তাহাদের নফসগুলিকে এবং তাহারা অনুভব করে না।

□ এই প্রতারণাটি স্থূল প্রতারণা নয়, বরং সূক্ষ্ম প্রতারণা। এই প্রতারণা এতই সূক্ষ্ম যে প্রতারকেরা নিজেরাই এই প্রতারণাটি বুঝতে পারে না। নিজেরা না-বোঝা প্রতারণাটি আল্লাহর সহিত এবং ইমানদারদের সহিত করছে বলে মনে হলেও আসলে এই প্রতারণাটি তাদের নফসগুলিকেই প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রতারণার ফাঁদটি তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

১০. ফি (মধ্যে) কলবিহিম (তাহাদের কলবগুলির) মারাদন (ব্যাধি, রোগ, অসুস্থতা, সন্দেহ, কপটতা, হিংসা, শত্রুতা [লোগাতুল কোরান, রশীদ নোমানি অনুসারে] ফাজাদা (সুতরাং বাড়াইলেন, বৃদ্ধি করিলেন) হুম (তাহাদের) আল্লাহ (আল্লাহ) মারাদান (রোগ, ব্যাধি) ওয়া (এবং) লাহম (তাহাদের জন্য) আজাবুন (আজাব) আলিমুন (কঠিন, কষ্টদায়ক, দুঃখজনক) বিমা (এইজন্য যে) কানু (ছিল, আছে, হয়) ইয়াকজিবুন (তাহারা মিথ্যা বলিত)।

□ তাহাদের কলবগুলির মধ্যে রোগ (আছে) সুতরাং বাড়াইলেন আল্লাহ তাহাদের রোগ এবং তাহাদের জন্য (রহিয়াছে) কষ্টদায়ক আজাব এই জন্য যে তাহারা মিথ্যা বলিত।

১১. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) কিল্লা (বলা হয়) লাহম (তাহাদের) লা (না) তুফসিদ (ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা) ফি (মধ্যে) আরদি (পৃথিবীতে, জমিনে, দেহে) কানু (তাহারা বলে) ইননামা (নিশ্চয়ই আমরা) লাহম (আমরা) মুসলিহন (সংশোধনকারী, শান্তিস্থাপনকারী, আমল দুরস্তকারী)।

□ এবং যখন বলা হয় তাহাদেরকে, ফ্যাসাদ তৈরি করিও না পৃথিবীর মধ্যে, তাহারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আমরা সংশোধনকারী (শান্তি স্থাপনকারী)।

□ এই আয়াতটির জুলন্ত দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে আমরা অহরহ দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, যারা সত্যিকার ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী তথা অনেক রকম গুণ্ডগোল তৈরি করে, তাদেরকেই যদি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী বলে আখ্যায়িত করতে চাই, তখন ওইসব ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরাই অবাক বিস্ময়ে বলে থাকে যে তারাই শান্তিস্থাপন করে চলছে। কোনটা শান্তি আর কোনটা ফ্যাসাদ – এই পার্থক্য করার বোধশক্তিটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। ফ্যাসাদ তৈরি করার অপবাদ নিজেদের ঘাড়ের নৈবার তো প্রথমেই ওঠে না, বরং ওই সকল ফ্যাসাদকারীরাই গর্ব ভরে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে বলে বেড়ায় যে তারাই শান্তি স্থাপনকারী। আল্লাহ কোরানে এই বিষয়টি অতি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং মানবচরিত্রের বেচিরের ধারাগুলো তুলে ধরেছেন।

১২. আলা (সাবধান) ইননাম (নিশ্চয়ই তাহারা) হুম (তাহারাই) মুফসিদনা (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী) ওয়া (এবং) লাকিন (কিন্তু) লা (না) ইয়াসউরুন (তাহারা বুঝতে পারে)।

□ সাবধান! নিশ্চয়ই তাহারা তাহারাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কিন্তু তাহারা বুঝতে পারে না।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, এই দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে যারা নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হয়েও সেই অপকর্মগুলিকে অপকর্ম মনেই করে না। তাদের যুক্তিতর্ক এবং তাদের বানানো আইন অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে অপকর্মেরী হোতা বলে মনেই করতে চায় না। তারা সমাজের বুকে অহরহ ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে চলছে, অথচ ফ্যাসাদের বিষয়টি তুললেই অবাক হয়ে ফ্যাসাদ সৃষ্টির কথাটি অস্বীকার করে। এই প্রকৃতির মনোভাব কমবেশি অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। জেনেপ্তরে বিরাট-বিরাট ভুল করছে অথচ ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে গেলে ভুলের স্বীকৃতি তো দূরের কথা, বরং নিজেদেরকে

ভুলের ঊর্ধ্বে অবস্থানের কথাটি ঘোষণা করে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, ভুল করছে – কিন্তু ভুলটি ধরিয়ে দিতে গেলে কিছুতেই মেনে নেয় না। এটাও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়।

১৩. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) কিল (বলা হয়) লাহু (তাহাদেরকে) আমিনু (তোমরা ইমান আনো) কামা (যেমন) আমানান (ইমান আনিয়াছে) নাসু (মানুষেরা) কাল (তাহারা বলে) আনমিনু (আমরা ইমান আনিব কি?) কামা (যেমন) আমানা (ইমান আনিয়াছে) সফাহাউ (মুখরা, নিবোধেরা, অজ্ঞানরা, বুদ্ধিহীনেরা, বেয়াকবেরা, অবুঝেরা, আহাম্মকেরা [রশীদ নোমানি রচিত লোগাতিল কোবানী আলী (সাবধান) ইনুনাহু (নিশ্চয়ই তাহারা) হুসু (তাহারাই) সফাহাউ (নিবোধ) ওয়া (এবং) লাকিন (কিন্তু) লা (না) ইয়ালমিন (তাহারা জানে)।

এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয়, তোমরা ইমান আনো – যেমন মানুষেরা ইমান আনিয়াছে, (তখন) তাহারা বলে, ‘আমরা ইমান আনিব কি, যেমন নিবোধেরা ইমান আনিয়াছে?’ সাবধান! নিশ্চয়ই তাহারা তাহারাই নিবোধ মানুষ এবং কিন্তু তাহারা জানে না।

এই আয়াতের হুবহু অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদের মাঝে সাবলীলতার ছন্দটি থাকে না ইহা জানা সত্ত্বেও আমরা হুবহু অনুবাদটি তুলে ধরার প্রাণপন চেষ্টা করেছি। আপন মন ও মানসিকতাটি সব সময় স্বাধীনতা ভোগ করতে চায়। ধর্মীয় দর্শনকে স্বেচ্ছাচারী মন ও মানসিকতা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে না। যারা গ্রহণ করে নিতে পেরেছে তাদের উদাহরণ তুলে ধরলে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং উল্টা যারা গ্রহণ করে নিয়েছে তাদেরকে নিবোধ, মুখ, অজ্ঞ ইত্যাদি গালাগালির বিশেষণে জর্জরিত করে এবং নিজেকে বিরাট জ্ঞানী বলে নিজেই মনে করে। কিন্তু আল্লাহ এই জাতীয় মানুষদেরকেই নিবোধ, মুখ বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ আরও বলছেন যে, এই ধর্মদর্শনটি গ্রহণ না করে যে নিজের কত বড় ক্ষতি সাধন করা হলো তা তারা জানে না। মৃত্যু নামক ঘটনাটি যখন এইসব লোকদের মুখোমুখি হবে তখনই সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পারবে – আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে যে অপবিত্র খান্নাসরূপী শয়তানটি জীবদ্দশায় প্রতারণা করে গেছে, সেই প্রতারণার ফাদে পড়ে তারাই অজ্ঞতার এবং মুখতার পরিচয় দিয়ে গেছে। বৈষয়িক চিহ্না-চেতনার মধ্যে যখন একজন মানুষ প্রচণ্ডভাবে ডুবে থাকে তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সত্যের পরিচয় জানবারি ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করতে পারে না। কলুষিত বস্তুবাদের লতা দিয়ে এদেরকে এমনভাবে বেধে ফেলে যে মরার পরেও যে একটি জীবন আছে উহা অস্বীকার করে। সুতরাং কলুষিত বস্তুবাদ মানুষকে বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞানী করতে পারে, বৈষয়িক জ্ঞানের বড় বড় ভিত্তি নিতে পারে, বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে সমাজের বকে সম্মান নামটি ধারণ করে চলতে পারে, কিন্তু আখেরাতের জীবনটি কষ্টদায়ক এবং হা-হতাশের মধ্যে থেকে যায়।

১৪. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) লাকুল (সামনাসামনি হয়) লাজিনা (যাহারা) আমান (ইমান আনিয়াছে) কাল (তাহারা বলে) আমাননা (আমরা ইমান আনিয়াছি) ওয়া (এবং) ইজা (যখন) খালাও (গোপনে মিলে) ইলা (দিকে) শাইয়াতিনিহিন (তাহাদের শয়তানদের) কাল (তাহারা বলে) ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) মাআকুল (তোমাদের সাথে) ইননামা (নিশ্চয়ই আমরা) নাহন (আমরা) মুস্তাহজিন (তাঁরা-তামাসাকারী, উপহাসকারী, মজাকারী, মজা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া, অস্বীকারকারী)।

এবং যখন ‘সামনাসামনি হয় যাহারা ইমান আনিয়াছে বলে ‘আমরা ইমান আনিয়াছি’ এবং যখন গোপনে মিলে তাহাদের শয়তানদের দিকে

(তাহারা) বলে ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে, নিশ্চয়ই আমরা, আমরা ঠাট্টাতামাসাকারী (উপহাসকারী)।’

যারা ইমান এনেছে যখন তাদের সামনাসামনি হয় তখন তারাও ইমান এনেছে বলে ইমানদারদেরকে বলে। বাজারে বহল প্রচারিত একটি প্রতিষ্ঠানের অনুবাদেও যখন ‘আম্মান’-কে ‘মোমিন’ অনুবাদ করে তখন এই দুঃখ কাকে জ্ঞাব? তখন মনে হয়, ভুতেরাই ভগবান হয়ে গেছে। আর আমাদের হবহ অনুবাদটি প্রচারের অপেক্ষায় আছে। যেদিন হবহ অনুবাদটি প্রচার হবে সেই দিন বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের কোরান-অনুবাদের গ্রন্থটির ভুল-ত্রুটিগুলো পাঠক আপনিই ধরতে পারবে। কোরান-এর এই আয়াতে আরও একটি লক্ষ্য করুন, যে, বলা হয়েছে ‘ইলা শায়াতিনিহিম’ - তথা, তাহাদের শয়তানদের দিকে’ বলা হয়েছে, মানুষরূপী বন্ধুদের দিকে বলা হয় নি। কেন মানুষ না বলে ‘শয়তানদের দিকে’ বলা হলো? যারা ইমানদারদের সঙ্গে ইমানের বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে তারা তো মানুষই, কিন্তু কোরান এদেরকে মানুষ না বলে ‘শয়তানদের দিকে’ বলেছে। এই ঠাট্টাকারীদের প্রত্যেকের ভিতর খান্নাসরূপী শয়তানটি বহল তব্রিতে বিরাজমান এবং এই শয়তানদের প্ররোচনায় পড়ে ইমানদারদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করে। শয়তান যে মানুষের ভেতরে বাস করে এটাই তার জলন্ত প্রমাণ এবং দলিল। শয়তান বাহিরে বাস করে না। তাই বলা হচ্ছে, ‘শয়তানদের দিকে গোপনে যখন মিলে।’

শয়তানের প্ররোচনায় যখন একটি মানুষ উঠে বসে তখন কোরান সেই মানুষটিকে মানুষ না বলে জীবন্ত শয়তানের সঙ্গে গোপনে মিলিত হবার কথাটি বলেছে। শয়তানের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে যারা মুক্ত হতে পেরেছেন তারাই ‘মোমিন’, আর যারা শয়তানের কথামতো চলে না, কিন্তু শয়তান দ্বর্বলরূপে যাদের মধ্যে অবস্থান করে তারাই ‘আম্মান’ তথা ইমান এনেছো সতরাং ‘আম্মান’ তথা ইমানদারের সঙ্গে ‘মোমিন’ তথা শয়তানমুক্ত মানুষের অকিংশ-পাতাল পার্থক্য। শয়তানের প্রভাবটা নিজের ভেতরে প্রকট হলেই ইমানদারদের

কথা আর পছন্দ হয় না। ইমানদারদের কথা তখন উল্টাপাল্টা মনে হয়। আসলে এরাই উল্টাপাল্টার বলয়ে বাস করে। এরা চেহারা-নকশায় মানুষ, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনা এদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে; তাই ইমানদারদের কথা এদের বরং ঠাট্টা-তামাসা বলে মনে হয়। কী অপূর্ব, কী অতুলনীয় স্টাইলে কোরানুল কারিম এই কথাগুলো তুলে ধরেছে যাতে আমরা এই কথাগুলোর আঘাতে কিছুটা হিশ ফিরে পাই। তারপরেও কথা থাকে, কথার উপরেও গোপন কথা থাকে যেগুলো আর বলা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ তখন শরিয়ত বলে আর কিছু থাকে না। রহস্য বুঝবার বিষয়, বর্ণনা করবার বিষয় নয়; তবে এই আধুনিক যুগে কিছুটা বর্ণনা না করলেই নয়। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বুখারি শরিফ-এ একদম খোলাসা করে বলেই ফেলেছেন যে, অতি উচ্চস্তরের রহস্যের কথাগুলো বলতে পারলাম না, কারণ উহা বলতে গেলেই কাটা যাইবে এই গলা। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-ও মারেকতের গোপন ভেদরহস্যগুলো বলে যান নি, বলে যান নি হজরত হজায়ফা (রা.) এবং হজরত আবু জর গিফারি (রা.)।

১৫. আল্লাহ (আল্লাহ) ইয়াসতাহজিউ (উপহাস করেন, ঠাট্টা করেন) বিহিম (তাহাদের সহিত) ওয়া (এবং) ইয়ামুদু (বাড়াইয়া দেন) হুম (তাহাদের) ফি (মধ্যে) তগ্হয়ানিহিম (তাহাদের অবাধ্যতা, বিপথগামিতা) ইয়াম্মাহন (তাহারা বিদ্রোহের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরে)।

আল্লাহ তাহাদের সহিত উপহাস করেন এবং বাড়াইয়া দেন তাহাদের মধ্যে তাহাদের অবাধ্যতা, তাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরে।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আমান’ তথা যারা ইমান এনেছে তাদের সঙ্গে যারা ইমান আনে নি অথচ ইমান আনার ভান করে আমানদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে আল্লাহ তাদেরকেই উপহাস করতে বাধ্য হন। আল্লাহর দৃষ্টিতে যখন উপহাসের যোগ্য হয়ে দাঁড়ায় তখনই উপহাস করতে বাধ্য হন। কারণ জিন এবং মানুষের নফসকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ দান করেছেন। এই দান-করা স্বাধীনতাকে যখন অপারে-কুপারে তেলে দেয় তখনই তারা উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে অব্যাহত রশিটি চিলু দিতে-দিতে এমন এক স্থানে এসে দাঁড়ায় যেখানে কেবলই বিদ্রাশ্তি আর বিদ্রাশ্তি। আর সেই ঘূর্ণায়মান বিদ্রাশ্তির পাকে পড়ে বিদ্রাশ্তির বৃত্তে ঘুরতে থাকে।

১৬. **উল্লাইকা** (উহারাই তাহারা) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **আশতারাউ** (কিনিয়া লইয়াছে) **দালালাতা** (পথভ্রষ্টতা, গোমরাহি, বিদ্রাশ্তি) **বিলুহদা** (হেদায়েতের সহিত, হেদায়েতের দ্বারা) **ফামা** (সূতরাং না) **রাবিহাত** (লাভজনক) **তিজারাতুহম** (তাহাদের ব্যবসা) **ওয়া** (এবং) **মা** (না) **কান** (ছিল, আছে, হয়) **মুহিতাদিন** (যাহারা হেদায়েত পাইয়াছে, যাহারা সঠিক পথের অনুসারী)।

□ উহারাই তাহারা যাহারা কিনিয়া লইয়াছে গোমরাহিকে (পথভ্রষ্টতাকে) হেদায়েতের সহিত (দ্বারা)। সূতরাং লাভজনক হয় না তাহাদের ব্যবসা এবং তাহারা সঠিক বাস্তবায়নে চলে না।

□ প্রতিটি পবিত্র নফস তথা পবিত্র ‘আমি’-টির সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসরুপী শয়তানটিকে অবস্থান করতে দেওয়া হয়েছে। সেই খান্নাসরুপী শয়তানসহ নফসটির তথা ‘আমি’-টির অবস্থানের নামটিই হলো স্বাধীনতা। সূতরাং এই স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরাটি চাটখানি কথা নয়। এইরূপ স্বাধীনতায় অবস্থান করে যে-কোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হতে সর্ববিষয়ে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহিকে কিনে নিতে বাধ্য এবং এই কিনে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। ইহার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গেলেই খান্নাসরুপী শয়তানের মুখোমুখি হতে হয় এবং সঠিক পথের অনুসারী হতে গিয়ে সংগ্রামী হতে হয়। আপন নফসের সহিত খান্নাসটিকে রেখে যে-কোনো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় করুক না কেন – উহা হাকিকতে কখনই লাভজনক হয় না। আপাতত মনে হবে বিরাট লাভজনক ব্যবসা, কিন্তু পরে বুঝা যায় যে উহা মোটেই লাভজনক নহে। এই জাতীয় ব্যবসায়ীরা কখনই সঠিক পথটির অনুসারী হতে পারে না। কারণ এরা জানে না যে সব রকম কাজের এবং সব রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং সব রকম চালচলনের মূলে একটিমাত্র বিষয়, একটিমাত্র দর্শন বাধার সৃষ্টি করে, আর সেই বিষয়টি হলো প্রতিটি মানুষের পবিত্র নফসের সঙ্গে তথা ‘আমি’র সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানটি। এই খান্নাসরুপী শয়তানটিকে আপন পবিত্র নফস হতে তাড়িয়ে দেবার নিয়তটি ধরে রাখতে না পারলে যে-কোনো ধরনের কর্ম কলুষিত হয়ে যায়। প্রতিটি কর্মই একেকটি এবাদত, কিন্তু কর্মের সঙ্গে যখন খান্নাস জড়িয়ে থাকে তখনই কর্মটি কলুষিত হয়। কর্ম এবাদত, কর্ম পবিত্র, কিন্তু কর্মের সঙ্গে খান্নাস থাকলে হেদায়েত থাকে না, আর হেদায়েত না থাকলে পবিত্রতার প্রশ্নই ওঠে না।

সূতরাং আল্লাহর সব বাণীর পেছনে মূল দোষের বিষয়টি হলো মাত্র একটি বিষয় আর সেই বিষয়টি হলো, প্রতিটি পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটিকে শতহীনভাবে মেনে নেওয়া। উহাই আল্লাহর দাসত্ব না করে শয়তানের দাসত্ব করা। অথচ মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারে না। সমস্ত রকম অপকর্মের মূল হোতাটি হলো আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খান্নাস। আর এই খান্নাসের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে যারা নেকি-বদীর পেছনে ছোটে তারা চোখে কালো কাপড় বাধা কলুর বলদের মতো কেবল একই স্থানে বারবার ঘুরে বেড়ায় অথচ মনে করে, অনেক পথ এগিয়ে এলাম।

হজরত আম্বির খসরুর ঠুমরি রাগের মতো অনেক কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে গেয়ে চলে, কিন্তু পরে দেখা যায় সব কথার মূলে একটি কথাই বারবার বলা হচ্ছে।

১৭. *মাসালুহু* (তাহাদের উদাহরণ) *কামাসালি* (উদাহরণ, যেমন)-*লাজি* (যে) *ইসতাকাদা* (জ্বালাইল) *নারান* (আগুন) *ফালাম্মা* (সূতরাং, যখন) *আদাআত* (আলোকিত করিল) *মা* (যাহা) *হাওলাহ* (তাহার চারিদিক) *জাহাবালাহ* (আল্লাহ লইয়া গেলেন) *বিনুরি* (আলো-সহ) *হিম* (তাহাদের) *ওয়া* (এবং) *তারীকাহু* (তাহাদের ছাড়া দিলেন) *ফি* (মধ্যে) *জুলুমাতিন* (অন্ধকার সমূহের) *না* (না) *ইউবসিকুন* (তাহারা দেখিতে পায়)।

□ তাহাদের উদাহরণ যেমন যে জ্বালাইল আগুন সূতরাং যখন আলোকিত করিল যাহা তাহার চারিদিকে, আল্লাহ লইয়া গেলেন তাহাদের আলো-সহ এবং তাহাদের ছাড়া দিলেন অন্ধকার সমূহের মধ্যে, তাহারা দেখিতে পায় না।

□ এই আয়াতটির ব্যাখ্যা অধম লিখক দিতে পারলো না। এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে নিজের কথায় নিজেই আত্মবিরোধের বাড়িতে পরিণত হই। *কোরান*-এ কোনো আত্মবিরোধ নাই। আত্মবিরোধ অধম লিখকের মধ্যে। সূতরাং আত্মবিরোধ-মার্কী ব্যাখ্যা অথবা *কোরান*-এর অন্যান্য তফসির হতে এই আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো আত্মবিরোধী মনে হওয়াতে তুলে দিতে পারলাম না। সূতরাং অকপটে অধম লিখক পাঠকদেরকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হলাম এই বলে যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমার জানা নাই।

১৮. *সুম্মুন* (বধির, কানে শোনে না যে) *বুকমুন* (বোবা) *উমইউন* (অন্ধ) *ফাহু* (সূতরাং তাহারা) *না* (না) *ইয়ারজিউন* (তাহারা ফিরে না)।

□ তাহারা বধির, বোবা, অন্ধ সূতরাং তাহারা ফিরে না।

□ এই আয়াতে তারা বধির, বোবা, অন্ধ - এই তিনটি শব্দের দ্বারা সত্য অথবা আলোর অভাবের কথাটি বোঝানো হয়েছে। মেক্কা জি ভাষায় এদেরকে বধির, বোবা, অন্ধ বলা হয়েছে, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে তথা মূল দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখতে গেলেই দেখা যাবে যে তারা বধির, বোবা এবং অন্ধ নয় - এরা শুনতে পায়, এরা অনর্গল কথা বলে, এরা সুন্দর চোখে দেখে, কিন্তু এই দেখাটির দ্বারা সত্যের আলোকে এরা দেখতে পায় না, সত্যের আলোর প্রশ্নে এরা বোবা, সত্যের আলোর প্রশ্নে এরা বধির তথা কানে শুনতে পায় না।

কোরান-এর এই আয়াতটি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয় নি, বরং হাকিকি অর্থাৎ গ্রহণ করা হয়েছে। এই জাতীয় মানুষেরা দুনিয়ার সব রকম কথা শুনতে পায়, কিন্তু আল্লাহর নূরানি সত্যের কথাগুলো শুনতে পায় না তথা হৃদয়ের কান দিয়ে এরা বুঝতে পারে না। এদের কান আছে, এরা শুনতেও পায়, কিন্তু আল্লাহর রহস্যময় সত্যগুলো এদের হৃদয়ের কানে প্রবেশ করে না। এরা সব কিছু বলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর রহস্যময় আলোর কথাগুলো বললেই বোবার ভূমিকা পালন করে। এরা সব কিছু দেখতে পায়, কিন্তু আল্লাহর রহস্যময় আলোর কথাগুলো যখন তুলে ধরা হয় তখন এরা দেখতে পায় না। এক কথায়, আল্লাহর রহস্যময় কথাগুলো এদের বললেও, বোঝালেও এরা বুঝতে পারে না। ভাষার বাস্তবতায় এরা বধিরও নয়, বোবাও নয়, এমনকি অন্ধও নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্য নূরময় দর্শনের কথাগুলো যখন তুলে ধরা হয় তখন এরা বধির হয়ে যায় এবং বোবা ও অন্ধের ভূমিকা পালন করে। এরা চোখ থাকতেও অন্ধ, তাই সত্যের দিকে আর ফিরে আসে না।

১৯. *আও* (অথবা) *কা* (যেন) *সাইইব* (খুব জোরে বৃষ্টি হওয়াকে আরবিতে 'সাইইব' বলে, যাহাকে আমরা মার্জিত ভাষায় মুষলধারায় বৃষ্টিবর্ষণ অথবা বৃষ্টিপাত বলিয়া থাকি) *মিনাস্* (হইতে) *সামাই* (আকাশ) *ফিহি* (ইহার মধ্যে) *জুলুমাতুন* (অন্ধকারগুলি, অজ্ঞানতাসমূহ - আলোর

অভাবে জ্বলমান বলা হয়) ওয়া (এবং) রাব্বুন (গর্জন) ওয়া (এবং) বারুকন (বিদ্যুৎ) ইয়াজ্জালনা (তাহারা রাখে) আসাবিআহ্ম (তাহাদের আঙুলগুলিকে) ফি (মধ্যে) আজ্জানিহিম (তাহাদের কানগুলির) মিনাস (হইতে) সাঈয়াইকি (তাঁরা পড়ার বিকট আওয়াজ, বজ্রধ্বনি) হাজ্জারা (ভয়) মাওত (মৃত্যু, মরণ) ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) মাহিতন (ঢাকিয়া রাখা, আবৃত, চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখা) বিন্ কাফেরিন (কাফেরদের দ্বারা)।

□□ অথবা মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের মতো আকাশ হইতে, ইহার মধ্যে আছে অন্ধকারগুলি এবং গর্জন এবং বিদ্যুৎ, তাহারা রাখে তাহাদের আঙুলগুলিকে তাহাদের কানগুলির মধ্যে বজ্রধ্বনি হইতে মৃত্যুর ভয়ে এবং আল্লাহ ঢাকিয়া আছেন কাফেরদের দ্বারা।

□ এই আয়াতের ইবহ অনুবাদ করাটা কষ্টকর। এই আয়াতে রূপক বর্ণনার মাধ্যমে মৃত্যু-বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এবং আয়াতের সর্বশেষে বলা হয়েছে, কাফেরেরা আল্লাহকে ঢেকে রেখেছে। বিন কাফেরিন বলতে কাফেরদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে তথা কাফেরদের দ্বারা আল্লাহ ঢেকে আছেন। কিন্তু প্রায় তফসিরকারকরাই এই শেষের আয়াতটিকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি, তাই তারা সম্পূর্ণ উল্টা অনুবাদ করে থাকেন। তারা বলে থাকেন, আল্লাহই কাফেরদেরকে ঢেকে রাখেন। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ জীবন-রংগের নিকটেই আছেন, সুতরাং কাফেরেরা আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশকে নিজেদের মধ্যে ফটিয়ে তুলতে পারে না।

এই বিষয়টির সবটাইতে সুন্দর এবং অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর কোরান দর্শন নামক তফসিরে। আমি অনেক চেষ্টা করেও এই আয়াতের তফসির তথা ব্যাখ্যা লিখতে পারলাম না।

২০. ইয়াকাদু (নিকটবর্তী হওয়া, কাছে আসা, অচিরেই) বারুক (বিদ্যুৎ) ইয়াখতাহ (কাড়িয়া লয়, হরণ করে, ছিনাইয়া লয়) আবসোয়ারা (দৃষ্টিশক্তিগুলি, চক্ৰগুলি) হম (তাহাদের) কুললামা (যখনই) আদাআ (আলোকিত হয়) লাহম (তাহাদের জন্য) মাশাউ (তাহারা চলে) ফিহি (ইহার মধ্যে) ওয়া (এবং) ইজ্জা (যখন) আজ্জলামা (অন্ধকার হয়) আল্লাইহিম (তাহাদের উপর) কাম (তাহারা দাঁড়াইয়া যায়) ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাআ (চাওয়া, চান) আল্লাহ (আল্লাহ) লাজ্জাহা (নিশ্চয়ই নিয়া নেওয়া) বিসামহইহিম (তাহাদের শ্রবণ) ওয়া (এবং) আবসোয়ারি (দর্শন) হিম (তাহাদের) ইন্ন (নিশ্চয়ই) আল্লাহ (আল্লাহ) আলা (উপর) কুললি (সব) শাইয়িন (কিছুর) কাহির (সর্বশক্তিমান)।

□□ বিদ্যুৎ তাহাদের নিকটবর্তী হয়, তাহাদের দৃষ্টিশক্তিগুলি কাড়িয়া লইবে যখনই তাহাদের জন্য আলোকিত হয় তাহারা চলে ইহার মধ্যে, এবং যখন তাহাদের উপর অন্ধকার হয় তাহারা দাঁড়াইয়া যায় এবং যদি আল্লাহ চান তাহাদের শ্রবণ এবং দর্শনশক্তি নিয়া নিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

২১. ইয়া আইউহান (হে) নাস (মানুষ) ইবদু (এবাদত করো) রাব্বাকুম (তোমাদের রবের) আললাজি (যিনি) খলিকাকুম (তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন) ওয়া (এবং) আললাজিনা (যাহারা) মিন (হইতে) কাবলিকুম (তোমাদের আগে) লাআল্লাকুম (তোমরা যেন) তাত্তাকুন (তাকওয়াকারী, খোদাভীর, বাচিয়া চলিতে পুরা, কঠব্যপালনকারী)।

□□ হে মানুষ, তোমাদের রবের এবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহারা তোমাদের পূর্ব হইতে, তোমরা যেন তাকওয়াকারী হইতে পারো।

২২. *আল্লাহ্* (যিনি) *জ্বাআলা* (বানাইয়াছেন) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *আরদা* (জমিনকে, মাটিকে, পৃথিবীকে, দেহকে) *ফিরাশা* (বিছানা, শয্যা) *ওয়া* (এবং) *সাম্মাআ* (আকাশকে) *বিনাআন* (সাম্মিয়ানা, ছাদ) *ওয়া* (এবং) *আনজ্বালা* (প্রেরণ করা) *মিনাস্* (হইতে) *সাম্মায়ি* (আকাশ) *ম্মাআন* (পানি) *ফাআখরাজ্জা* (সুতরাং বাহির করিয়াছেন) *বিহি* (উহার দ্বারা) *মিনাশ্* (হইতে) *সাম্মারাতি* (ফলমূল) *রিজ্জুকান্* (রেজেক) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *ফালা* (সুতরাং না) *তাজ্জ্বালু* (নিবাচন, বানাও) *লিল্লাহি* (আল্লাহর) *আনদাদিন্* (সমতুল্য, সমকক্ষ) *ওয়া* (এবং) *আনতুম্* (তোমরা) *তাআলিমুননা* (জানা, বোঝা)।

যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানাইয়াছেন এবং আকাশকে সাম্মিয়ানা এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করিয়াছেন পানি সুতরাং তাহার দ্বারা বাহির করিয়াছেন ফলমূল রেজেক (হিসাবে) তোমাদের জন্য সুতরাং আল্লাহর সমকক্ষ বানাইও না এবং তোমরা জানো।

২৩. *ওয়া* (এবং) *ইন্* (যদি) *কুনতুম্* (তোমরা হও) *ফি* (মধ্যে) *রাইবিন্* (সন্ধেহ) *মিম্মা* (যাহা) *নাজ্জালনা* (আমরা নাজেল করিয়াছি) *আলা* (উপর) *আবদি* (বান্দা) *না* (আমাদের) *ফাআত্* (সুতরাং তোমরা আনো) *বিসুবাতিন্* (একটি সুরার সহিত) *মিম্* (হইতে) *মিস্মিহি* (ইহার অনুরূপ, সদৃশ) *ওয়া* (এবং) *উদ্ড* (ডাকো) *শুহাদাআ* (সাক্ষীদের, সহযোগীদের) *কুম্* (তোমরা) *মিন্* (হইতে) *দিনি* (ছাড়া, ব্যতীত) *আল্লাহি* (আল্লাহ) *ইন্* (যদি) *কুনতুম্* (তোমরা হও) *সাদেকিন্* (সত্যবাদী)।

এবং যদি তোমরা হও সন্ধেহের মধ্যে যাহা আমরা নাজেল করিয়াছি আমাদের বান্দার উপর সুতরাং তোমরা আনো সুরা হইতে ইহার অনুরূপ এবং ডাকো তোমাদের সাক্ষীদেরকে হইতে আল্লাহ ব্যতীত যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

প্রথমেই বলে রাখি, এই আয়াতের শেষের অংশের ‘মিন্’ তথা হইতে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে মিলাতে পারলাম না। তারপরে আল্লাহ যে মহামূল্যবান কথাটি বলেছেন তা এই যে, তোমরা সবাই মিলে আমাদের নাজেল করা যে-কোনো সুরার অনুরূপ আরেকটি সুরা অথবা ইহার অংশবিশেষ বানাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। *কোরান*-এর গভীরতার মধ্যে যতই ডুব দেওয়া যায় ততই মনে হয় যে, *কোরান*-এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। *কোরান*-এর গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে গেলেই ভাষা আর থাকে না এবং বোঝা হয়ে যেতে হয়। *কোরান*-এর গভীরতার সীমা নাই। *কোরান* অসীম জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। দুনিয়ার সমস্ত পানি যদি কালি হয় এবং গাছগুলো যদি কলম হয় তবু এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে শেষ করা যাবে না। কথায় বলে, অল্প শোকে কাতুর বেশি শোকে পার্থক্য। অল্প কিছু জানলে বকবক করা যায় প্রচুর, পরকণে গভীরে প্রবেশ করলে কেবল বোকহি বনে যেতে হয় না, বরং সব কিছু ভুলে গিয়ে বোঝার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে হয়। কী রহস্যের আধার, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এই *কোরানুল কারিম*। মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সব কিছু মাপতে চায় এবং ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর *কোরান*-কেও মাপতে চায় এবং মাপতে গিয়ে ভুল করে ফেলে নিজে অথচ দোষটা চাপিয়ে দেয় *কোরান*-এর উপর। ইহাই মানুষের দুর্ভাগ্য।

২৪. *ফাইন্* (সুতরাং যদি) *লাম্* (না) *তাফালু* (তোমরা কর) *ওয়া* (এবং) *লান্* (কখনই না) *তাফালু* (তোমরা কর) *ফাততকি* (সুতরাং তোমরা ভয় কর) *নারা* (আপ্তন)-*লাতি* (যাহা) *ওয়া* (এবং) *কদ্* (আপ্তন জ্বালাইবার উপকরণ, ইন্ধন) *হা* (তাহারি) *নাস্* (মানুষ) *ওয়া* (এবং) *হিজারাত্* (পাথরগুলি) *উইদদাত্* (তৈরি করা হইয়াছে) *লিল্কাফেরিন্* (কাফেরদের জন্য)।

□□সূতরাং যদি তোমরা কর না এবং কখনই তোমরা করিতে পার না সূতরাং ভয় কর, আশ্রনকে, যাহার ইচ্ছন হইবে মানুষ এবং পাথরসমূহ, কাফেরদের জন্য তৈরি করা হইয়াছে।

□ এই আয়াতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেটা হলো, মানুষের সাথে পাহাড়ও আশ্রনে জ্বলবে। নিশ্চয়ই ইহা দোজখের আশ্রন, যদিও দোজখ শব্দটি এই আয়াতে নাই। মানুষ এবং জিন আশ্রনে জ্বলবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পাথরও আশ্রনে জ্বলবে বলার রহস্যটি বুঝতে পারলাম না। কারণ পাথরের প্রাণও নাই রুহও নাই, তথা নফসও নাই রুহও নাই, তথা জীবাআও নাই পরমাআও নাই। অনেকে নিহুর প্রকৃতির যারা তাদেরকে পাথর অনুবাদ করে থাকেন, কিন্তু পাথর বলতে নিহুর প্রকৃতির এ রকম অর্থটি কোনো ডিক্শনারি, কোনো লোগাত-এ পেলাম না।

২৫. ওয়া (এবং) বাশরিল (সুসংবাদ) লাজিনা (যাহারা) আম্মান (ইমান আনিয়াছে) ওয়া (এবং) আম্মেলু (আমল করিয়াছে) সোয়ালিহাতি (সালেহার, সংকম)।

□□এবং সুসংবাদ যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আম্মলে সালেহা করিয়াছে।

+ আননা (নিশ্চয়ই) লাহম (তাহাদের জন্য) জাল্লাতিন (জাল্লাত)।

□□নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য জাল্লাত (রহিয়াছে)।

+ তাজরি (প্রবাহিত হয়) মিন (হইতে) তাহতিহান (তাহার তলদেশে, পাদদেশে) আনহার (ঝরনাগুলি, নহরসমূহ)।

□□যাহার তলদেশ হইতে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ।

+ কুলুলামা (যখনই) রুজিক (রেজেক দেওয়া হইবে) মিনহা (তাহা হইতে) মিনু (হইতে) সামারাতিন (ফলফলাদি, ফলমূল) রিজ্কান (রেজেক হিসাবে)।

□□যখনই রেজেক দেওয়া হইবে তাহা হইতে ফলমূল হইতে রেজেক হিসাবে।

+ কান (তাহারা বলিবে) হাজ্জাল (এইটা) লাজি (যাহা) রুজিকনা (আম্মাদেরকে রেজেক দেওয়া হইয়াছিল) মিনু (হইতে) কাবলু (আগে)।

□□তাহারা বলিবে আম্মাদেরকে তো এইগুলি রেজেকরূপে পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল।

+ ওয়া (এবং) উতুবিহি (যাহা দেওয়া হইয়াছিল) মুত্তাসাবিহা (অনুরূপ, সদৃশ হইবে)।

□□এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে (তাহা তো) অনুরূপ।

+ ওয়া (এবং) লাহম (তাহাদের জন্য) ফিহা (ইহার মধ্যে) আজওয়াজুন (স্বীয়া) মুতাহতারাতুন (পবিত্র)।

□□এবং তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে পবিত্র স্বীগণ (থাকিবে)।

+ ওয়া (এবং) হম (তাহারা) ফিহা (ইহার মধ্যে) খালিদুনা (দৃঢ় হইয়া থাকিবে)।

□□এবং তাহারা ইহার মধ্যে দৃঢ় হইয়া থাকিবে।

২৬. ইন্নাল্লাহা (নিশ্চয়ই আল্লাহ) লা (না) ইয়াস্তাহই (লজ্জাবোধ করা, সংকোচ করা)।

□□নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না।

+ আইয়াদরিবী (পেশ করিতে, সম্মুখে স্থাপন করিতে, দাখিল করিতে, নিবেদন করিতে) মাসালান (নজির, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন, উপমা) বা (যাহা) বাউদাতান (মশা, তুচ্ছ) ফাম্মা (সূতরাং যাহা) ফাওকাহা (তাহার উপরে, তাহার চাইতে ক্ষুদ্রতর)।

□□যাহা মশা অথবা যাহা ইহার চাইতে ক্ষুদ্রতর (তাহার) নমুনা পেশ করিতে।

+ ফাআম্মা (সুতরাং আর) আল্লাজিনা (যাহারা) আম্মান (ইমান আনিয়েছে) ফাইয়ালিমুন (সুতরাং জানিতে পারে) আননাহ (তাহা নিশ্চয়ই) হাক্ক (সত্য) মিন (হইতে) বাববিহিন্ন (তাহাদের রবের)।

□□ সুতরাং আর যাহারা ইমান আনিয়েছে সুতরাং জানিতে পারে তাহা নিশ্চয়ই সত্য তাহাদের রব হইতে।

+ ওয়া (এবং) আম্মা (আর) আল্লাজিনা (যাহারা) কাফারু (কুফরি করিয়াছে) ফাইয়াকুলনা (সুতরাং তাহারা বলে)।

□□ এবং আর যাহারা কুফরি করে সুতরাং তাহারা বলে।

+ মাজ্জা (কী কারণে) আরাদা (চাহিয়াছেন) আল্লাহ (আল্লাহ) বিহাজ্জা (এইটা দিয়া) মাসালান (উদাহরণ)।

□□ কী কারণে আল্লাহ এইটা দিয়া উদাহরণ চাহিয়াছেন।

+ ইউদ্দিনু (বিপথগামী করেন) বিহি (ইহার দ্বারা) কাসিরান (অনেককে)।

□□ অনেককে ইহার দ্বারা বিভ্রান্ত করেন।

+ ওয়া (এবং) ইয়াহদিহি (হেদায়েত করেন) বিহি (ইহার দ্বারা) কাসিরান (অনেককে)।

□□ এবং ইহার দ্বারা অনেককে হেদায়েত করেন।

+ ওয়া (এবং) মা (না) ইউদ্দিনু (বিপথগামী করা, বিভ্রান্ত করা) বিহি (ইহার দ্বারা) ইল্লা (একমাত্র) ফাসিকিন (ফাসেক)।

□□ এবং ইহার দ্বারা বিপথগামী করেন না, একমাত্র ফাসেকদেরকে।

□□ এই আয়াতে আল্লাহ অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং আমাদের দৃষ্টিতে যাহা তচ্ছ সেই তচ্ছ বিষয়ের মাধ্যমে দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরতে মোটেই সংকোচ বোধ করেন না অথবা লজ্জা করেন না। সত্যকে তুলে ধরার জন্য অতি তচ্ছ বিষয়গুলো অনেক সময় সহায়তার গুরুত্ব বহন করে। যারা ইমান এনেছে তারা এইসব তচ্ছ বিষয়ের মাধ্যমে দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরার পিছনে সত্যের আলো দেখতে পায়। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে তারাই এ রকম তচ্ছ বিষয় তুলে ধরাটিকে বন্ধ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আল্লাহর এই অতি ক্রুদ্ধ তচ্ছ বিষয়গুলোর বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনেকেই বিপথগামী হয় আবার অনেকেই হেদায়েতপ্রাপ্ত হন। একই তচ্ছ বিষয়ের বর্ণনায় কেউ হেদায়েত গ্রহণ করেন আবার কেউ হেদায়েতের বলয় হতে ছিটকিয়ে দূরে পড়ে যান। যারা সব সময় গুনার কাজে তথা পাপকর্মে লিপ্ত থাকে সেই সব ফাসেকেরা ছাড়া আর কেউ বিপথগামী হয় না।

২৭. আল্লাজিনা (যাহারা) ইয়ানকুদনা (ভঙ্গ করে, বন্ধ করে না, লঙ্ঘন করে) আহদা (অস্বীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা) আল্লাহি (আল্লাহর) মিন (হইতে) বাদি (পরে) মিসাকিহি (তাহা পাকাপাকি করা, তাহা আবদ্ধ হওয়া)।

□□ যাহারা আল্লাহর (সহিত) অস্বীকারে আবদ্ধ হইবার পরে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

+ ওয়া (এবং) ইয়াকতাউনা (তাহারা ছিন্ন করে, তাহারা কর্তন করে) মা (যাহা) আম্মা (নিদেশ দেওয়া, হুকুম করা, আদেশ করা) আল্লাহ (আল্লাহ) বিহি (ইহার সহিত) আইউসসালা (অক্লুণ রাখা হয়, সম্পর্ক জোড়া লাগানো হয়)।

□□ এবং আল্লাহ যাহা হুকুম করিয়াছিলেন ইহার সহিত (সম্পর্ক অক্লুণ রাখিতে) তাহা তাহারা ছিন্ন করে।

+ ওয়া (এবং) ইউফসিদনা (ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে) ফিল (মধ্যে) আরদি (পৃথিবীতে)।

□□ এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মধ্যে।

+ **উলাইকা** (ওই সব, উহারাই) **হম** (তাহারা) **খাসেরুন** (কতিয়ন্ত)।

□□ উহারাই হয় কতিয়ন্ত।

□□ **কোরান**-এর এই আয়াতে যে-বিষয়টি বলা হয়েছে ইহা একটি নির্মম বাস্তব সত্য। আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার পরেও যারা আমানতের ওয়াদাটি ভঙ্গ করতে সাহসের পরিচয় দেয় তারা মোটেই সাহসী নয়, বরং ভীক। এই জাতীয় সাহস আপাতমধুর হতে পারে, কিন্তু পরে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। যারা বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ এবং বিপর্যয়ের পরিবেশ তথা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মধ্যে নানা প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাহাদের পরিণামে দঃখজনক কতিয়ন্ততার সম্মুখীন হতে হয়। যারা আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার পরে সেই ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে তাদের দ্বারাই পৃথিবীর বুকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়াটি একটি মামুলি ব্যাপার, যদিও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা কখনই মনে করে না যে তারা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে। এত বড় অপরাধ করার পরেও যারা নিজেদেরকে নিরাপরাধ বলে ভাবে তাহাই তো পৃথিবীর বুকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, এবং এই ফ্যাসাদ সৃষ্টির পরিণামে পৃথিবীতে বাস করা সামাজিক জীবনের ভারসাম্যগুলো কতটুকু নড়বড়ে হতে পারে তারা জাজ্বল্য প্রমাণ আমরা সবাই হাড়ে-হাড়ে টের পাই।

২৮. **কাইফা** (কেমন করিয়া, কীভাবে, কীভাবে) **তাকফুরুনা** (কুফরি করা, অস্বীকার করা, মিথ্যারোপ করা) **বিল্লাহি** (আল্লাহর সহিত বা সঙ্গে, আল্লাহকে)।

□□ কেমন করিয়া কুফরি করো আল্লাহর সাথে?

+ **ওয়া** (এবং) **কুনুতুম** (তোমরা ছিলে) **আমুওয়াতান** (মৃত)।

□□ এবং তোমরা ছিলে মৃত।

+ **ফাআহুইয়াকুম** (সুতরাং তোমাদেরকে জীবিত করিয়াছেন)।

□□ সুতরাং তোমাদেরকে জীবিত করিয়াছেন।

+ **সুম্মা** (তারপর) **ইউমিতকুম** (তোমাদেরকে মৃত্যুদান করিবেন)।

□□ তারপর তোমাদেরকে মৃত্যুদান করিবেন।

+ **সুম্মা** (তারপর) **ইউহয়িকুম** (তোমাদেরকে জীবিত করিবেন)।

□□ তারপর তোমাদেরকে জীবিত করিবেন।

+ **সুম্মা** (তারপর) **ইলাইহে** (তাহার দিকে) **তুরজাউন** (প্রত্যাবর্তন তথা ফিরিয়া আসা)।

□□ তারপর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন তথা ফিরিয়া আসা।

□□ এই আয়াতে প্রথমেই ‘তোমরা মৃত ছিলে’ বলার আগে ‘এবং’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘এবং’ অর্থটি হলো মানবের অতীত জীবনের ইঙ্গিত বহন করা। সেখান থেকে তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন। তারপর তোমাদেরকে মৃত্যু-ঘটনাটি দান করেন। তারপর তোমাদেরকে জীবন দান করেন। তারপর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এই ‘তারপর’ শব্দটি তিন-তিনটি বার উল্লেখ করে জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তির ইঙ্গিত দিতেছেন। সূরা মুল্কের ২ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই আল্লাহ জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জন্মটি যতটুকু রহস্যপূর্ণ মৃত্যুটাও সেই রকম রহস্যপূর্ণ।

২৯. **হয়া** (তিনিই) **আল্লাজ্জি** (যিনি) **খালাকা** (সৃষ্টি করিয়াছেন) **লাকুম** (তোমাদের জন্য) **মা** (যাহা কিছু) **ফি** (মধ্যে) **আরুদি** (পৃথিবী) **জামিয়ান** (সব কিছু) **সুম্মা** (তারপর) **ইস্তাওয়া** (ইচ্ছা করিলেন, লক্ষ্য দিলেন, স্থির করিলেন, দৃষ্টি দিলেন) **ইলা** (দিকে) **সামায়ি** (আকাশের) **ফাসাউওয়াহুননা** (সুতরাং ইহাদেরকে সুন্দরভাবে সজ্জিত অথবা যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন)

সাবা (সাত) সাম্মাওয়াত (আকাশ) ওয়া (এবং) হয়া (তিনি) বিকুল্লি (প্রত্যেকের সহিত) শাইয়িন্ (জিনিস) আলিম্বুন (মহাজ্ঞানী)।

□□ তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা কিছু পৃথিবীর মধ্যে, সব কিছুকেই তারপর ইচ্ছা করিলেন আকাশের দিকে, সুতরাং ইহাদেরকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন সাত আসমান এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের সহিত মহাজ্ঞানী।

৩০. ওয়া (এবং) ইউজ (যখন) কালা (বলিলেন) রাব্বুকা (আপনার রব, পালনকর্তা) লিল্মালাইকাতি (ফেরেশতাদের জন্য)।

□□ এবং যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বলিলেন।

+ ইননি (নিশ্চয়ই আমি) জ্বায়েলুন (নির্বাচন করিব) ফিল (মধ্যে) আরদি (পৃথিবীতে) খলিফাতান (প্রতিনিধি, খলিফা)।

□□ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর মধ্যে খলিফা নির্বাচন করিব।

+ কালু (তাহারা বলিল) আতাঙ্আলু (তুমি কি নির্বাচন করিবে?) ফিহা (ইহার মধ্যে)।

□□ তাহারা বলিল, তুমি কি ইহার মধ্যে নির্বাচন করিবে?

+ মাউ (যাহারা) ইউফসিদু (ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা) ফিহা (ইহার মধ্যে) ওয়া (এবং) ইয়াস্ফিকু (ঝরানো, প্রবাহিত করা) দিমাআ (রক্ত)।

□□ যাহারা ইহার মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং রক্ত ঝরাইবে।

+ ওয়া (এবং) নাহনু (আমরা) নুসাববেহ (তাসবিহ করি) বিহাম্দিকা (তোমার প্রশংসা) ওয়া (এবং) নুকীদ্দেরু (পবিত্রতা বর্ণনা করি) লাকা (তোমার)।

□□ এবং আমরা তাসবিহ করি তোমার প্রশংসা এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

+ কালা (বলিলেন) ইননি (নিশ্চয়ই আমি) আলামু (জানি) মা (যাহা) লা (না) তাআলামু (তোমরা জানো)।

□□ (আল্লাহ বলিলেন) নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি (তাহা) তোমরা জানো না।

৩১. ওয়া (এবং) আললামা (শিক্ষা দেওয়া) আদামা (আদমকে) আস্মাআ (নামগুলি, নামসমূহ) কল্লাহা (ইহার সব কিছু)।

□□ এবং আদমকে নামসমূহ শিক্ষা দিলেন, ইহার সব কিছু।

+ সুম্মা (তারপর) আরীদাহুম (তাহাদেরকে উত্থাপন/উপস্থাপন/প্রস্থাবন/আনয়ন/পেশ/উপস্থিত করিলেন) আলা (উপরে) মালাইকাতি (ফেরেশতাদের)।

□□ তারপর ফেরেশতাদের উপর উপস্থাপন করিলেন

+ ফাকাআলা (সুতরাং বলিলেন) আম্বিউনি (আমাকে জানাও) বিআস্মাই (নামসমূহের সহিত) হাউলায়ে (এইসবের)।

□□ সুতরাং বলিলেন, আমাকে জানাও এইসবের নামসমূহ।

+ ইনু (যদি) কনতুম (তোমরা হও) সাদিকিন্ (সত্যবাদী)।

□□ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩২. কালু (তাহারা [ফেরেশতারা] বলিল) সুবহানা (তুমি ভাসমান, পবিত্র) লা (না) ইল্মা (জ্ঞান) লানা (আমাদের) ইল্লা (ব্যতীত, একমাত্র, ছাড়া) মা (যাহা) আললামতানা (আমাদেরকে শিখাইয়াছ) ইন্নাকা (নিশ্চয়ই তুমি) আন্তা (তুমি) আলিম্বুন (জ্ঞানী) হাকিম (বিজ্ঞানী)।

□□ তাহারা (ফেরেশতারা) বলিল, তুমি ভাসমান (পবিত্র), আমাদের জ্ঞান নাই একমাত্র যাহা তুমি আমাদেরকে শিখাইয়াছ, নিশ্চয়ই তুমি, তুমিই জ্ঞানী, বিজ্ঞানী।

□ এই ৩১ ও ৩২ নম্বর আয়াতে একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ফেরেশতারা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তারা মানুষের মতো জ্ঞানী নয়। তারা যে মানুষের মতো জ্ঞানী নয়, ইহা ফেরেশতাই অকপটে মেনে নিলো, কারণ একটি বিষয় খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যে, কোনো ফেরেশতাকেই নফস তথা জীবন এবং রুহ তথা আত্মা – তথা সহজভাবে বলা হয়ে থাকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা – এই দুটির একটিও দেওয়া হয় নি। সুতরাং ফেরেশতারা যতই ক্লমতাশালী হোক না কেন এবং যত কিছুই অবাক করা বিষয়গুলো প্রদর্শন করুক না কেন, ফেরেশতারা মানুষের জ্ঞানের প্রশ্নে ধারেকাছেও ভিড়তে পারে না। বেশ কিছু মানুষ ‘রুহুল কুদ্দুস’ তথা পবিত্র আত্মা বলতে ফেরেশতার নামটি উল্লেখ করে। অথচ অকের হিসাবে ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। তাহলে একজন ফেরেশতাকে কেমন করে, কোন যুক্তিতে ‘রুহুল কুদ্দুস’ বলে ফেলে? যেহেতু ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই তথা জীবন এবং আত্মা দুটোর একটিও নাই সেখানে ‘রুহুল কুদ্দুস’ তথা পবিত্র আত্মা বলতে কেমন করে ফেরেশতার নামটি উল্লেখ করেন?

৩৩. কালা ([আল্লাহ] বলিলেন) *ইয়া (হে) আদাম (আদম) আমবিহম* (তুমি তাহাদেরকে বলিয়া দাও) *বিআসমাইহিম* (তাহাদের নামগুলির সহিত) *ফীলাম্মা* (সুতরাং যখন) *আম্বা* (বলিয়া দেওয়া হইল) *হম* (তাহাদেরকে) *বিআসমাইহিম* (তাহাদের নামগুলির সহিত)।

□□ (আল্লাহ) বলিলেন, হে আদম, তাহাদিগকে জানাইয়া দাও তাহাদের নামগুলির সহিত সুতরাং যখন তাহাদেরকে বলিয়া দেওয়া হইল তাহাদের নামগুলির সহিত।

কালা ([আল্লাহ] বলিলেন) *আলামআকুল* (আমি কি বলি নাই?) *লাকুল* (তোমাদেরকে) *ইননি* (নিশ্চয়ই) *আলাম* (আমি জানি) *গাইবা* (অদৃশ্যকে) *সাম্মাওয়াতি* (আকাশসমূহে) ওয়াল (এবং) *আরদি* (জমিনে)।

□□ (আল্লাহ) বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই, নিশ্চয়ই আমি অদৃশ্যকে জানি, আসমানসমূহের এবং জমিনের।

+ *ওয়া* (এবং) *আলাম* (আমি জানি) *মা* (যাহা) *তব্দনা* (তোমরা প্রকাশ করো) *ওয়া* (এবং) *মা* (যাহা) *কনতম* (তোমরা) *তাকতম* (গোপন করো)।

□□ এবং আমি জানি যাহা তোমরা প্রকাশ করো এবং যাহা তোমরা গোপন করো।

৩৪. *ওয়া* (এবং) *ইজ্* (যখন) *কলনা* (আমরা বলিয়াছিলাম) *লিলম্মলাইকাতি* (ফেরেশতাদেরকে) *উসুজ্জদ* (সেজ্জদা দাও) *লিআদামা* (আদমের জন্য) *ফাসাজাদু* (সুতরাং সবাই সেজ্জদা দিলো) *ইন্না* (ব্যতীত) *ইবলিস* (ইবলিস)।

□□ এবং যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলিয়াছিলাম, সেজ্জদা দাও আদমকে, সুতরাং তাহারা সেজ্জদা করিল, ইবলিস ব্যতীত।

+ *আবা* (সে অস্বীকার করিল, সে অমান্য করিল) *ওয়া* (এবং) *আসতাব্বারা* (অহংকার করিল)।

□□ সে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিল।

+ *ওয়া* (এবং) *কানা* (হয়) *মিনাল্* (হইতে) *কাফিরিন্* (কাফেরদের)।

□□ এবং হইল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৫. *ওয়া* (এবং) *কলনা* (আমরা বলিলাম) *ইয়া (হে) আদাম (আদম)* *উসুকন্* (বসবাস করো) *আনতা* (তুমি) *ওয়া* (এবং) *জাওজুকা* (তোমার স্বা) *জান্নাতা* (জান্নাত) *ওয়া* (এবং) *কীনা* (দুইজনে খাও) *মিনহা* (ইহা হইতে) *রাগাদান্* (পর্যাপ্ত, প্রশস্ত, ভালো করিয়া, খুব) *হাইসু* (যেখানে, যেস্থানে)

শিতমা (দুইজনে তোমরা চাও) ওয়া (এবং) না (না) তাকরাবা (দুইজনে কাছে অর্থবা নিকটে যাইও) হাজ্জিহি (এই) শাক্কারাতা (গাছের) ফাতাকুননা (সুতরাং তোমরা দুইজনে হইবে) মিনাস্ (হইতে, অন্তর্ভুক্ত) জালিমিন (জালিমদের)।

এবং আমরা বলিলাম, হে আদম, বসবাস করো তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং দুইজনে খাও ইহা হইতে পর্যাপ্ত যেখানে তোমরা দুইজনে চাও এবং এই গাছের কাছে দুইজনে যাইও না (যদি যাও) সুতরাং তোমরা দুইজনে হইবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৬. ফাআজ্জালাহমা (সুতরাং তাহাদের দুইজনকে বিচ্ছিন্ন করিল) শাইতানু (শয়তান) আনহা (উহা হইতে) ফাআকরাজাহমা (সুতরাং তাহাদের দুইজনকে বাহির করিল) মিমমা (সেইখান হইতে) কানা (ছিল) ফিতে (ইহার মধ্যে)।

উহা হইতে শয়তান সুতরাং তাহাদের দুইজনকে বিচ্ছিন্ন করিল সুতরাং তাহাদের দুইজনকে বাহির করিল সেইখান হইতে ইহার মধ্যে দুইজনে ছিল।

+ ওয়া (এবং) কুননা (আমরা বলিলাম) ইহবিত (বিভাজিত হও, নামিয়া যাও) বাদুকুম (তোমাদের একে) লিবাদিন্ (অপরের জন্য) আদুডুন (দুশমন, শত্রু)।

এবং আমরা বলিলাম, তোমরা বিভাজিত হও, তোমরা একে অপরের জন্য শত্রুরূপে।

+ ওয়া (এবং) লাকুম (তোমাদের জন্য) ফি (মধ্যে) আবদি (পৃথিবীর) মুস্তাকারকুন (কিছুকালের অবস্থান) ওয়া (এবং) মাআউন (জীবনোপকরণ, জীবন সামগ্রী) ইলা (দিকে) হিনিন (একটি নির্দিষ্ট সময়)।

এবং পৃথিবীর মধ্যে তোমাদের জন্য কিছুকালের অবস্থান এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিকে জীবনোপকরণ।

৩৭. ফাতালাককা (সুতরাং বাণী পাইল, শিখিয়া লইল) আদামু (আদম) মিন (হইতে) রাব্বিহি (তাহার রবের নিকট হইতে) কালিমাতিন্ (কিছু কালান্বিত/বাণী) ফাতাবা (তিনি তওবা করিলেন) আলাহিহি (উহার দ্বারা)।

সুতরাং আদম শিখিয়া লইলেন তাহার রবের নিকট হইতে কিছু বাণী তিনি উহার দ্বারা তওবা করিলেন।

+ ইন্নাহ (নিশ্চয়ই তিনি) হয়া (তিনিই) তাউয়াবু (তওবা গ্রহণকারী) রাহিমুন (দয়ালু)।

নিশ্চয়ই তিনি তিনিই তওবা গ্রহণকারী দয়ালু।

এই আয়াত এবং উপরের আয়াতগুলি এতই স্পষ্ট যে ইহার ব্যাখ্যাটি লিখলাম না। তবে এই 'তাউয়াবুর রাহিম' দুইটি শব্দের সামান্য ব্যাখ্যা লিখাটা প্রয়োজন মনে করছি। আমরা জানি, 'রাহমান' বলতেও দয়ালু বোঝায় এবং 'রাহিম' বলতেও দয়ালু বোঝায়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি অনেকের চোখেই ধরা পড়ে না। তাই 'রাহমান' এবং 'রাহিম' নামক দুইটি শব্দে একই অর্থ বহন করে বলে অনেকেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন এবং দুইটি ভিন্ন শব্দ দিয়ে একই বিষয়টিকে লিখে থাকেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন যে 'তাউয়াবুর রাহিম' বলা হয়েছে, তওবা যদি আল্লাহ গ্রহণ করে নেন তখন আল্লাহ 'রাহিম'-রূপ ধারণ করেন। যেহেতু 'রাহিম'-রূপটি তার বিশেষ দান এবং ক্ষমা বা অনুতপ্ত হবার পূর্ব এই দান এবং সেই অনুতপ্ত ভাবটি আল্লাহ গ্রহণ করলেই আল্লাহর দয়াটি 'রাহিম'-রূপ ধারণ করে। তাই 'গফুরুর রাহিম' এবং 'তাউয়াবুর রাহিম'। গফুরুর রাহমান কোনোদিন হয় না, সেই রকম তাউয়াবুর রাহমানও হয় না। কারণ আল্লাহর 'রাহমান'-রূপটি হলো একদম সাধারণ দান। সবাইকে দান করার প্রশ্নটি আসলেই আল্লাহ 'রাহমান'

রূপটি ধারণ করেন। তাই 'রহমান'-রূপে হলো সাধারণ দান এবং 'রহিম'-রূপে হলো বিশেষ দান। একটি সুবাইকে, এবং অপরটি তওবা ও ক্রমার পরে। তাই একটি 'রহমান' এবং অপরটি 'রহিম'।

৩৮. কলনা (আমরা বলিলাম) ইহবিটু (তোমরা নামিয়া যাও) মিন্হা (উহা হইতে) জামিয়ান (সবাই)।

□□ আমরা বলিলাম, উহা হইতে সবাই তোমরা নামো।

+ ফাইম্মা (সূতরাং যখন) ইয়াতিইয়ান্নাকুম (তোমাদের কাছে আসিবে) মিন্নি (আম্মা হইতে) হদান (পথনির্দেশনা, হেদায়েতের নির্দেশ) ফামান (সূতরাং তখন) তাবিয়া (মানিয়া চলিবে) হদাইয়া (আম্মার হেদায়েত) ফালা (সূতরাং নাই) খাওফুন (ভয়) আলাইহিম (তাহাদের উপর) ওয়া (এবং) লা (না) হম (তাহারা) ইয়াহজানু (বিষণু হওয়া, দুঃখ পাওয়া, চিন্তাযুক্ত হওয়া)।

□□ সূতরাং যখন তোমাদের কাছে আসিবে আম্মা হইতে হেদায়েত (পথ-নির্দেশনা) সূতরাং তখন আম্মার হেদায়েত মানিয়া চলিবে সূতরাং তাহাদের উপর ভয় নাই এবং তাহারা চিন্তাযুক্ত (বিষণু) হইবে না।

৩৯. ওয়া (এবং) আল্লাজিনা (যাহারা) কাফারু (কফরি করে) ওয়া (এবং) কাজ্জাবু (মিথ্যারোপ করে) বিআয়াতিনা (আম্মাদের পরিচয়ের সহিত) উলাইকা (তাহারা) আসহাবু (অধিবাসী) নার (আপ্তন) হম (তাহারা) ফিহা (উহার মধ্যে) খালিদুন (দীর্ঘস্থায়ী, লম্বা সময়)।

□□ এবং যাহারা কফরি করে এবং মিথ্যারোপ করে আম্মাদের পরিচয়ের সহিত তাহারা আপ্তনের অধিবাসী, তাহারা উহার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী।

৪০. ইয়া (হে) বানি (সন্তান) ইসরাইল (ইসরাইলের) উজ্জুরু (তোমরা জিকির করো, সংযোগ করো) নিয়ামাতি (আম্মার নিয়ামতকে) আল্লাতি (যাহা) আনআমত (নিয়ামত দিয়াছি) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ওয়া (এবং) আওফ (তোমরা পূর্ণ করো) বিআহাদি (আম্মার ওয়াদা) উফি (আম্মি পূর্ণ করিব) বিআহাদিকুম (তোমাদের ওয়াদা) ওয়া (এবং) ইয়াইয়া (কেবলমাত্র আম্মাকে) ফরিহাবুন (তোমরা আম্মাকে ভয় করো)।

□□ হে ইসরাইলের সন্তান, তোমরা জিকির করো আম্মার নিয়ামতের যাহা তোমাদের উপর আম্মি নিয়ামত দিয়াছি এবং আম্মার ওয়াদা তোমরা পূর্ণ করো, তোমাদের ওয়াদা আম্মি পূর্ণ করিব এবং কেবল আম্মাকেই তোমরা ভয় করো।

□ আল্লাহর কোরান-এর এই আয়াতের অ্যুগামাথা এবং মাখামুত্তু কিছুই বুঝতে পারিলাম না, সূতরাং অনুমানের ঢিল ছুড়ে বড়-বড় গুলতানি মারিতে চাই না। যারা এই আয়াতের কিছুই বুঝতে না পেরে এইটা-সেইটা লিখে তাদেরকেও বলার কিছুই নাই এবং তাদের এই প্রচেষ্টাকে অবশ্যই আত্তরিক প্রচেষ্টা বলে মেনে নেব। কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যা লেখা তো দূরের কথা, বহু চেষ্টা করেও উহার মর্মার্থ বুঝতে পারি নাই, সূতরাং আল্লাহর কালামের এই আয়াতের মর্মটি আম্মার বোধগম্য নহে।

৪১. ওয়া (এবং) আম্মিনু (তোমরা ইম্মান আনো, তাহার দ্বারা ইম্মানের কাজ কর) বিম্মা (যাহা, ওই বিষয়ে যাহা) আনজালু (আম্মি নাজেল করিয়াছি)।

□□ এবং আম্মি যাহা নাজেল করি তাহার দ্বারা ইম্মানের কাজ করো।

+ মুসাদ্দিকান (সততার সমর্থনকারী) লিম্মা (যাহা আছে) মাআকুম (তোমাদের কাছে)।

□□ সততার সমর্থনকারী যাহা আছে তোমাদের নিকট।

+ ওয়া (এবং) লা (না) তাকুন (তোমরা হইও) আউয়াল (প্রথম) কাফিরিন (অস্বীকারকারী, আবরণকারী) বিহি (উহার)।

□□এবং তোমরা হইও না উহার প্রথম অস্বীকারকারী।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাশতাক (তোমরা বিক্রয় করো) বিআয়াতিহি (আম্মার আয়াতকে) সামানান (মূল্যে) কালিলান (সামান্য)।

□□এবং তোমরা বিক্রয় করিও না আম্মার আয়াত সামান্য মূল্যে।

+ ওয়া (এবং) ইয়াইয়া (শুধু আম্মাকেই) ফাততাকুন (সুতরাং তোমরা ভয় করো)।

□□এবং শুধু আম্মাকেই সুতরাং তোমরা ভয় করো।

৪২. ওয়া (এবং) না (না) তালবিস (তোমরা মিশাইও না) হাককা (সত্যকে) বিলবাতিনি (বাতুনের সাথে, মিথ্যার সাথে)।

□□এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করিও না।

+ ওয়া (এবং) তাকতমুন (তোমরা গোপন করিও না), তোমরা লুকাইও না। হাককা (সত্যকে) ওয়া (এবং) আনতম (তোমরা) তাআলামুন (জানো)।

□□এবং সত্যকে তোমরা গোপন করিও না এবং তোমরা জানো।

৪৩. ওয়া (এবং) আকিমুস (তোমরা কয়েম করো) সালাত (সালাত) ওয়া (এবং) আতজ (তোমরা দাও) জাকাত (জাকাত) ওয়া (এবং) আরকাউ (তোমরা রুকু করো) মাআ (সাথে, সঙ্গে) রাকিইন (রুকুকারীদের)।

□□এবং তোমরা সালাত কয়েম করো এবং তোমরা জাকাত দাও এবং তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।

৪৪. আতামরুনা (তোমরা কি নির্দেশ দান করো?) নাসা (মানুষদেরকে) বিলবিররি (সং কাজের, নেকির) ওয়া (এবং) তানসাওনা (তোমরা ভুলিয়া যাও) আনফসাকুম (তোমাদের নফসগুলিকে) ওয়া (এবং) আনতম (তোমরা) তাতনুনা (তেলগিয়াত করো, পাঠ করো) কিতাবা (কিতাব) আফালা (তবে কিনে) তাকিনুন (তোমরা বোঝ)।

□□তোমরা কি মানুষদেরকে নির্দেশ দান করো সং কাজের এবং তোমরা ভুলিয়া যাও তোমাদের নফসগুলিকে এবং তোমরা কিতাব তেলগিয়াত করো, তবে কি তোমরা বোঝ না?

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের আসল এবং একমাত্র কাজটি হলো নিজেদের নফসগুলোকে না ভুলে নফসের গবেষণা করা। তোমরা অপূরকে সং কাজ করার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছ এবং কিতাবও পাঠ করে যাচ্ছ, কিন্তু নিজেদের নফস বিষয়টি সম্বন্ধে উদাসীন থাকো। নিজেদের নফসের বিষয়টিতে আল্লাহ মনোযোগ এবং অনুশীলন করার তাগিদটি দিলেন। এবং এই তাগিদটিতে সংকাজ এবং কিতাব পাঠ করার চেয়েও অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হলো কেন? কারণ মানুষের প্রতিটি নফসের সঙ্গে শয়তানকে খান্নাসরূপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। মানুষ বুঝতে চেষ্টা করুক যে, আপন নফসের ভেতরেই খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে। সেই বিষয়ে সব সময়ে যেন সজাগ থাকে। কারণ আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে মুসলমান বানাতে পারলে অথবা তাড়িয়ে দিতে পারলে মানুষ আসল রহস্যের মধ্যে অগ্রসর হতে পারে এবং রহস্যের পরিচয়ের পদাটি উঠে যেতে থাকে। আপন পরিচয়, আপন রহস্য জানবার জন্যেই নফস বিষয়টিকে জানবার তাগিদ দিয়েছেন আল্লাহ। তাই আল্লাহ কোরান-এর ভাষায় বলেছেন, 'তানসাওনা আনফসাকুম' তথা তোমরা ভুলে যাচ্ছ তোমাদের নিজেদের নফসকে। এই নফসকে জানবার জন্য ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করে যেতে হয় নিজনে একাকী এবং এই ধ্যানসাধনাটি মহানবি জাবানুন নূর পবিত্রের আড়াই হাজার ফুট উচুতে অবস্থিত হেরাওহায় পনের বছর এক মাস উনিশ দিন করে তার অনাগত কালের উম্মতদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে আপন-আপন নফসের গবেষণাটি এভাবেই করতে হয়। অবশ্য নফস গবেষণার অনেক রকম পথ থাকতে পারে, কিন্তু মতটি এক ও অভিন্ন। এই ফেতনা-ফ্যাসাদের

যুগে আপন-আপন নফসটিকে আমরা বেমানান ভুলে গেছি এবং এই ভুলে যাবার পেছনে অনেকেই দায়ী। এ যুগে মানুষদেরকে নেকির কথা বলান হয়, বলা হয় কিতাব অধ্যয়নের কথা, কিন্তু 'তান্সাওনা আনফুসাকুম' তথা 'তোমরা ভুলে যাচ্ছ তোমাদের নফসকে'।

৪৫. *ওয়া (এবং) আস্তাইন (তোমরা সাহায্য চাও) বিস্‌সাবরি (সবরের সহিত, ধৈর্যের সহিত) ওয়া (এবং) সালাতি (সালাতের সহিত) ওয়া (এবং) ইন্নাহা (নিশ্চয়ই উহা) লাকাবিরাতন (অবশ্যই বড়) ইল্লা (একমাত্র, ব্যতীত) আলা (উপর) খাশিইন (বিনীতিদের, ভীতগণ)।*

□□ এবং তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য এবং সালাতের সহিত এবং নিশ্চয়ই উহা অবশ্যই বড় একমাত্র বিনীতদের উপর।

□ এই আয়াতে আপন-আপন নফসকে জানবার এবং চিনবার জন্য যারা আগ্রহ প্রকাশ করে তাদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে তোমরা মস্তানি সাহায্য চাও ধৈর্য এবং সালাতের সহিত। আপন নফসের পরিচয় জানতে হলে যোগাযোগের প্রয়োজন তথা সালাতের প্রয়োজন। এ রকম সংযোগ প্রচেষ্টার সালাতটিকে ধরে রাখতে হলে সেই সালাতটি হয়ে যায় দ্বায়েমি তথা অবিরাম এবং এই অবিরাম সালাতটি গ্রহণ করতে গেলেই বিরাট ধৈর্য ধারণ করতে হয় তথা সবরের সাথে অপেক্ষা করতে হয়। ইহা যে সবার পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য নয়, বরং বড়ই কঠিন বিষয় উহাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলা হয়েছে যে যারা বিনীত এবং যারা ভীত তাদের জন্য ইহা মোটেই কঠিন নয়।

৪৬. *আল্লাজিনা (যাহারা) ইয়াজনুননা (ধারণা করে, বিশ্বাস করে, মনে করে) আননাহম (নিশ্চয়ই তাহারা) মলাক (মোলাকাত করিবে, মিলন ঘটাবে, সাক্ষাৎ করিবে) রাব্বিহিম (তাহাদের রবের সহিত) ওয়া (এবং) আননাহম (নিশ্চয়ই তাহারা) ইলাইহি (তাহারই দিকে) রাজিউন (ফিরিয়া যায়, প্রত্যাবর্তন করে)।*

□□ যাহারা বিশ্বাস করে (ধারণা করে) নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের রবের সহিত মোলাকাত করিবে এবং নিশ্চয়ই তাহারা তাহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

□ এই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যারা আপন-আপন নফসের পরিচয় জানবার ধ্যানসাধনার গবেষণায় ভুবে আছে। এবং তারা বিশ্বাস রাখে যে তাদের রবের সঙ্গে একদিন না একদিন মিলন হবেই তথা মোলাকাত করবেই। এবং এও তারা জানে যে, একদিন না একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতেই হবে এবং সেই যাওয়াটা ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক।

৪৭. *ইয়া বানি (হে সন্তান) ইসরাইলা (ইসরাইলের) উজ্জুরু (জিকির করো) নিম্নাতি (আমার নিয়ামতকে)-লাতি (যাহা) আনআমত (আমি নিয়ামত দিয়াছি) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ওয়া (এবং) আননি (নিশ্চয়ই আমি) ফারদালুকুম (তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি) আলা (উপর) আলামিন (জগতসমূহের)।*

□□ হে ইসরাইলের সন্তান, তোমরা জিকির করো আমার নিয়ামতকে যাহা আমি দিয়াছি তোমাদের উপর এবং আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি জগতসমূহের উপর।

□ কোরান-এর এই আয়াতে অন্তত এটুকু স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, ইসরাইলের সন্তানদেরকে আল্লাহ জগতসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই বাক্যটি অতীত কাল ধরব নী বর্তমান কাল ধরব তা বুঝে উঠতে পারছি না। যেহেতু অধম লিখকের কাধের উপর 'মুসলমান' নামক বিরাট একটি

সাইনবোর্ড বুলছে তাই এই বাক্যটিকে অতীত কালেই নিয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যদি এই বাক্যটি বর্তমান কাল বলে ধরে নিই তাহলে ইসরাইলের সন্তানদেরকে জগতসমুহের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তা আল্লাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে গেলেন।

৪৮. ওয়া (এবং) আততাকু (তোমরা ভয় করো) ইয়াওমা (সেই দিনকে) লা (না) তাজ্জি (কাজে আসিবে) নাকসুনু (নফস) আনু (বদলে, পরিবর্তে) নাকসিনু (কোনো নফসের) শাইয়ানু (কিছুই) ওয়া (এবং) লা (না) ইউকবালু (কবুল করা) মিনহা (উহা হইতে) শাকীয়াতনু (সুপারিশ) ওয়া (এবং) লা (না) ইউখাজু (নেওয়া হইবে) মিনহা (উহা হইতে) আদনুনু (বিনিময়) ওয়া (এবং) লা (না) হমু (তাহাদের) ইউনসাকুনু (সাহায্য করা হইবে)।

এবং সেই দিনকে তোমরা ভয় করো (যেদিন) কোনো নফস কোনো নফসের বদলে কিছুই (কাজে) আসিবে না এবং উহা হইতে কোনো সুপারিশ কবুল করা হইবে না এবং দেওয়া হইবে না উহা হইতে কোনো বিনিময় এবং তাহাদের সাহায্য করা হইবে না।

এই আয়াতে সেই দিনটিকে ভয় করতে বলা হয়েছে এবং সেই দিনটি বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? বোঝানো হয়েছে প্রতিটি মানুষের মৃত্যু-ঘটনা ঘটে যাবার দিবসটিকে। মৃত্যু-ঘটনা ঘটে যাবার দিবসটিকে আখেরাত ও সায়াত এবং কেয়ামত বলা হয়েছে।

৪৯. ওয়া (এবং) ইউজু (যখন) নাজ্জাইনাকুম (তোমাদেরকে নাজাত [মুক্তি] দিয়াছিলাম) মিন (হইতে) আলি (অনুসারীদের) ফিরআউনা (ফেরাউনের) ইয়াসমুনাকুম (তোমাদেরকে তাহারা আজাব দিত) সুয়া (কঠিন, নিকৃষ্ট) ইউজুবিহিনা (তাহারা জবেহ করিত, তাহারা হত্যা করিত) আব্বনাআকুম (তোমাদের পুত্রসন্তানদের) ওয়া (এবং) ইয়াস্তাহইউনা (জীবিত রাখিত) নিসাআকুম (তোমাদের কন্যাসন্তানদের) ওয়া (এবং) ফি (মধ্যে) জালিকুম (উহার) বালউমু (পরীক্ষা) মিন (হইতে) রাব্বিকুম (তোমাদের রবের) আজিম (শক্ত, কঠিন, ভয়াবহ)।

এবং যখন তোমাদেরকে নাজাত দিয়াছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের হইতে, তোমাদেরকে তাহারা আজাব দিত, নিকৃষ্ট আজাব, তাহারা জবেহ করিত তোমাদের পুত্রসন্তানদের এবং জীবিত রাখিত তোমাদের কন্যাসন্তানদের এবং উহার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ হইতে (ছিল) কঠিন পরীক্ষা।

৫০. ওয়া (এবং) ইউজু (যখন) ফারাকনা (আমরা ভাগ করিয়াছিলাম) বিকুম (তোমাদের জন্য) বাহারা (সমুদ্র) ফাআনজাইনাকুম (সুতরাং আমরা তোমাদের নাজাত দিয়াছিলাম) ওয়া (এবং) আগ্বাকনা (আমরা ডুবাইয়া দিয়াছিলাম) আলা (অনুসারীদেরকে) ফিরআউনা (ফেরাউনের) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) তানজুনু (দেখিতেছিলে)।

এবং যখন আমরা বিভক্ত করিয়াছিলাম সমুদ্রকে তোমাদের জন্য সুতরাং আমরা তোমাদের নাজাত দিয়াছিলাম এবং আমরা ডুবাইয়া দিয়াছিলাম আলে ফেরাউনকে এবং তোমরা দেখিতেছিলে।

৫১. ওয়া (এবং) ইউজু (যখন) ওয়াআদনা (আমরা ওয়াদা করিয়াছিলাম) মুসা (মুসা) আব্বাইনা (চলিশ) লাইলাতান (রাত্রি) সুম্মা (তারপর) তাখাস্তুম (তোমরা গ্রহণ করিয়াছিলে) ইউজলা (গরুর বাছুর) মিম্বাদি (তাহার পরে) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) জালিমুন (জালিম)।

এবং যখন মুসার জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম চলিশ রাত্রি তারপর তোমরা গরুর বাছুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তোমরা (ছিলে) জালিম।

৫২. *সুম্মা* (তারপর) *আফাওনা* (আমরা ক্রমা করিয়াছিলাম) *আনকুম* (তোমাদেরকে) *মিম্বাদি* (তাহার পরে) *জালিকা* (ওইটা) *লাআল্লাকুম* (যেন তোমরা) *তাশকুরুন* (কতজ্ঞ হও)।

তারপর তোমাদেরকে আমরা ক্রমা করিয়াছিলাম তাহার পরে তোমরা যেন ওইটার (জন্য) কতজ্ঞ হও।

৫৩. *ওয়া* (এবং) *ইজু* (যখন) *আতাইনা* (আমরা দিয়াছিলাম) *মুসা* (মুসাকে) *কিতাবা* (কিতাব) *ওয়া* (এবং) *ফুরকানা* (ফোরকান) *লাআল্লাকুম* (তোমরা যেন) *তাহতাদুন* (হেদায়েত পাওয়া)।

এবং যখন আমরা মুসাকে দিয়াছিলাম কিতাব এবং সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী ফোরকান, যাহাতে তোমরা হেদায়েত পাইতে পার।

৫৪. *ওয়া* (এবং) *ইজু* (যখন) *কাল* (বলিল) *মুসা* (মুসা) *লিকাওমিহি* (তাহার কণ্ঠের জন্য) *ইয়া কাওমি* (হে আমার কণ্ঠ) *ইননাকুম* (নিশ্চয়ই তোমরা) *জালামতুম* (তোমরা জুলুম করিয়াছ) *আনফুসাকুম* (তোমাদের নফসের উপর) *বিততিখাজিকুম* (তোমাদের গ্রহণ করার কারণে) *ইজলা* (গরুর বাহুরকে) *ফাতুব* (সুতরাং তোমরা ফিরিয়া আসো) *ইলা* (দিকে) *বারিকুম* (তোমাদের সৃষ্টির দিকে) *ফাতুল* (সুতরাং কতল করো) *আনফুসাকুম* (তোমাদের নফসগুলিকে) *জালিকুম* (ওইটাই) *খাইরুন* (উত্তম) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *ইন্দা* (নিকট, কাছে) *বারিকুম* (তোমাদের সৃষ্টির) *ফতিবা* (সুতরাং তিনি মারফু করিলেন) *আলাইকুম* (তোমাদেরকে) *ইন্নাই* (নিশ্চয়ই তিনি) *হয়া* (তিনিই) *তাওয়াব* (তওবা করিলকারী) *রাহিম* (রহিম)।

এবং যখন মুসা তাহার কণ্ঠের জন্য বলিলেন, হে আমার কণ্ঠ, নিশ্চয়ই তোমরা গরুর বাহুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়া তোমাদের নফসের উপর জুলুম করিয়াছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে তওবা করো সুতরাং তোমরা তোমাদের নফসগুলিকে কতল করো, তোমাদের জন্য, ওইটাই উত্তম তোমাদের সৃষ্টির নিকট, সুতরাং তোমাদের উপর তিনি ক্রমাশীল হইতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্রমাশীল (এবং) রহিমরূপী দয়ালু।

এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে মুসা নবির (আ.) উম্মতদেরকে তওহিদের অনেক কিছু শিক্ষা দেবার পরও চল্লিশ দিনের নিজনবাসে যাবার পর মুসার উম্মতেরা তওহিদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে গরুর বাহুরের পূজা শুরু করে দিল। আমি অধম লিখক অনেক সময় ভেবে পাড়-কল পাই না যে, সব কিছু বাদ দিয়ে এরা কেন গরুর বাহুরের পূজা করতো। আরও তো অনেক কিছু পূজা করার ছিলো। কিন্তু অদ্ভুত মুসা নবি (আ.)-র কণ্ঠদের অদ্ভুত পূজা করার অদ্ভুত ধারণা। এরা গরু না পূজা করে কেন গরুর বাহুরের পূজা করতো এই কথা মনে আসলেই অবাক হই। গরুর বাহুর পূজা করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে যা আমরা জানা নাই। আরও লক্ষ করার বিষয়টি হলো, সে গো-বৎস তথা গরুর বাহুরটি মাটির তৈরি নয়, অথবা অন্য কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, বরং একদম নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি হতে হবে।

ধনসম্পদ তথা মালপানির আত্মজাতিক রূপটি হলো সোনা। সুতরাং আল্লাহর তওহিদের পূজা না করে সোনা দিয়ে গরুর বাহুর তৈরি করে সেই বাহুরের পূজা করাটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। পাঠকেরা, এই কথাগুলো আমার নিজস্ব। এই আয়াতটির সুবচাইতে সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিশেষণটি করেছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত *কোরান-এর তফসির কোরান দর্শন* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। আয়াতটির শেষ অংশে একটি লক্ষ করে দেখুন যে, ক্রমার পরে আল্লাহ 'রাহিম'-রূপে অবস্থান করেন। ক্রমার আগে আল্লাহ 'রহমান', কিন্তু যেইমাত্র ক্রমার কথাটি আসে তখনই 'রাহিম'-রূপ ধারণ করেন।

৫৫. ওয়া (এবং) ইউ (যখন) কনতুম (তোমরা বলিয়াছিলে) ইয়া মুসা (হে মুসা) লান (কখনই না) নুমিনা (আমরা ইমান আনিব) লাকা (তোমরা উপর) হাততা (যতক্ষণ না) নারা (আমরা দেখিব) আলাহ (আলাহকে) জাহরাতান (প্রকাশ্যে) ফাআখাজাতকুম (সুতরাং তোমাদেরকে ধরিয়াছিল) সোয়াইকাত (বজ্র-বিদ্যুৎ) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) তানজুরুন (দেখিতেছিলে)।

এবং যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুসা, আমরা তোমার উপর কখনই ইমান আনিব না যে পর্যন্ত না আমরা আলাহকে প্রকাশ্যে দেখিব, সুতরাং তোমাদেরকে বজ্র-বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া নিল এবং তোমরা দেখিতেছিলে।

৫৬. সুম্মা (তারপর) বাআসনাকুম (আমরা তোমাদেরকে পুনরায় উঠাইলাম) মিম্বাদি (হইতে পরে) মাওতিকুম (তোমাদের মৃত্যুর) লাআল্লাকুম (যাহাতে তোমরা) তাশকুরুন (কৃতজ্ঞ হও)।

তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর হইতে তোমাদেরকে আমরা পুনরায় উঠাইলাম যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

এই আয়াতের মর্মটি আমরা বুঝিতে পারিলাম না তথা বোধগম্য নহে। তবে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তার কোরান দর্শন-এ অপূর্ব ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন।

৫৭. ওয়া (এবং) জাললালনা (আমরা ছায়া দিয়াছিলাম) আলাইকুম (তোমাদের উপর) গামামা (মেঘের) ওয়া (এবং) আনজালনা (আমরা নাজেল করিয়াছিলাম) আলাইকুম (তোমাদের উপর) মান্না (মান্না) ওয়া (এবং) সালওয়া (সালোয়া) কুলী (তোমরা খাও) মিন (হইতে) তাইয়েবাত (পবিত্র) মা (যাহা) রাজাকনাকুম (আমরা তোমাদেরকে রেজেক দিয়াছি) ওয়া (এবং) মা (না) জালামনা (আমাদের উপর) তাহারা জুলুম করিয়াছে) ওয়ালাকিন (এবং) কিছু, বরং) কান (তাহারা ছিল) আনফুসাইম (তাহাদের নফসের উপরই) ইয়াজলিমুন (জুলুম করিয়াছিল)।

এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদের উপর মান্না এবং সালোয়া নাজেল করিয়াছিলাম, তোমরা খাও পবিত্র রেজেক হইতে যাহা তোমাদেরকে আমরা দিয়াছি এবং আমাদের তাহারা জুলুম করে নাই বরং তাহারা তাহাদের নফসের উপরই জুলুম করিয়াছিল।

৫৮. ওয়া (এবং) ইউ (যখন) কুলনা (আমরা বলিয়াছিলাম) উদখল (তোমরা প্রবেশ করো) হাজ্জিহি (এই) কারইয়াতা (নগরীতে) ফাকুল (সুতরাং তোমরা খাও) মিন্হা (তাহা হইতে) হাইস (যেভাবে) শিতম (তোমরা চাও) রাগাদান (নিজের ইচ্ছানুযায়ী, অবাধে, স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দে) ওয়া (এবং) উদখল (তোমরা প্রবেশ করো) বাবা (দরজা) শুজুদান (সেজদা দিয়া) ওয়া (এবং) কুল (তোমরা বলো) হিততাতন (ক্লমা চাইবার কথা) নাগফিরলাকুম (আমরা তোমাদেরকে মাফ করিব) খাতাইয়াকুম (তোমাদের ভুলক্রটিগুলিকে) ওয়া (এবং) সানাজিদ (বাড়াইয়া দেওয়া) মোহসিনি (নেক লোকদেরকে, পবিত্র লোকদেরকে, সৎলোকদেরকে)।

এবং আমরা যখন বলিয়াছিলাম তোমরা প্রবেশ করো এই নগরীতে, সুতরাং তোমরা খাও তাহা হইতে তোমরা যেভাবে চাও নিজের ইচ্ছানুযায়ী এবং [শহরের] দরজায় তোমরা প্রবেশ করো সেজদা দিয়া এবং তোমরা বলো ক্লমা চাইবার কথা আমরা তোমাদেরকে ক্লমা করিব তোমাদের দোষক্রটিগুলিকে এবং নেক লোকদেরকে (রহমত) বাড়াইয়া দিব।

৫৯. ফাবাদ্দালাল (সুতরাং পরিবর্তন করিল) লাজিনা (যাহারা) জালাম (জুলুম করিয়াছিল) কাওলান (কথা) গাইরা (অন্য কিছু)-ল্লাজি (যাহা) কিনা

(বলা হইয়াছিল) *লাহম* (তাহাদেরকে) *ফাআনজালনা* (সুতরাং আমরা নাজেল করিলাম) *আলা* (উপর) *লাজিনা* (যাহারা) *জালানু* (জুলুম করিয়াছিল) *রিজ্জান* (আজাব) *মিনাস* (হইতে) *সামায়ি* (আকাশ) *বিম্বা* (এই কারণে যাহা) *কান* (ছিল) *ইয়াফুসকুন* (সীমালঙ্ঘনকারী)।

সুতরাং যাহারা পরিবর্তন করিল জালেমদের কথা অন্য কিছু হইতে যাহা বলা হইয়াছিল তাহাদেরকে সুতরাং আমরা নাজেল করিলাম আজাব আকাশ হইতে শাস্তি জালেমদের উপর কারণ তাহারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

আলাহর কালামের এই আয়াতের তাৎপর্য এবং গূঢ় রহস্য আমাদের জানা নাই, সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে তবে অন্যান্য তফসির হতে ইহার ধার করা ব্যাখ্যাটি তুলে দিতে পারি। কারণ চল্লিশের উপর কোরান-এর তফসির আমাদের কাছে আছে এবং সবচাইতে সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি আমরা দৃষ্টিভঙ্গিতে যিনি করেছেন তিনি হলেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। উনার ব্যাখ্যাগুলো এতই চমৎকার যে অবাঁক হতে হয়।

৬০. *ওয়া* (এবং) *ইজিস* (যখন) *তাসকা* (পানি প্রার্থনা করিয়াছিল) *মুসা* (মুসা) *লিকাওমিহি* (তাহার কণ্ঠের জন্য)।

এবং যখন মুসা তাহার কণ্ঠের জন্য পানি প্রার্থনা করিলেন।

+ *ফাকুলনা* (সুতরাং আমরা বলিয়াছিলাম) *নাদরিব* (আঘাত করো) *বিআসাকী* (তোমার লাঠি দিয়া) *হাজারা* (পাথর)।

সুতরাং আমরা বলিয়াছিলাম, তোমার লাঠি দিয়া পাথরে আঘাত করো।

+ *ফানফাজারাত* (সুতরাং ফাটিয়া বাহির হইল) *মিনহ* (উহা হইতে) *ইসনাতাআশরাতা* (বারো) *আইনান* (চক্র, ঘরনা)।

সুতরাং উহা হইতে ফাটিয়া বাহির হইল বারোটি ঘরনা (অথবা চোখ)।

+ *কাদ* (নিশ্চয়ই) *আলিমা* (চিনিয়া লইল) *কললু* (প্রত্যেক, প্রতিটি) *উনাসিন* (মানুষগুলি) *মাশরাবাহম* (তাহাদের পানি পান করার স্থান)।

নিশ্চয়ই চিনিয়া লইল প্রত্যেক (গোত্রের) মানুষগুলি তাহাদের পানি পানের স্থান।

+ *কলু* (তোমরা খাও) *ওয়া* (এবং) *আশরাবু* (তোমরা পান করো) *মির* (হইতে) *রিজ্জিকিলাহ* (আলাহর রেজেক)।

তোমরা খাও এবং তোমরা পান করো আলাহর রেজেক হইতে।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তাসাও* (তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো) *ফি* (মধ্যে) *আবদি* (পৃথিবীতে) *মুফসিদিন* (ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হওয়া)।

এবং তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করিও না পৃথিবীর মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হইও না।

আলাহর কালামের এই আয়াতের আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি এবং অনেক প্রকার কোরান-এর তফসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা পড়েছি, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই নিরপেক্ষতার ধার ধারে নি। তাই বুঝতে পারি নি এবং ব্যাখ্যা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে ইহা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে দুনিয়ার সব পানি যদি কালি হয় এবং গাছগুলো যদি কলম হয় তবে যে ইহার ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না, - কথাটির মর্মটি মর্মে-মর্মে বুঝতে পারলাম। আমি বুঝতে পারলাম না কথাটি লিখতে অন্যান্য তফসিরকারকেরা ভীষণ শরম পান। কিন্তু আমি শরম পাই না বলে পাঠকদেরকে জানিয়ে দিলাম।

৬১. *ওয়া* (এবং) *ইজ* (যখন) *কলতম* (তোমরা বলিয়াছিলে) *ইয়ামুসা* (হে মুসা) *লান* (কখনই না) *নাসরিব* (আমরা ধৈর্যধারণ করিতে পারিব) *আলা* (উপর) *তোয়ামিন* (খাদ্য) *ওয়াইদিন* (একই)।

□□এবং যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুসা, আমরা কখনই ধৈর্যধারণ করিতে পারিব না একই খাবারের উপর।

+ ফাদু (সুতরাং প্রার্থনা করো) লানা (আমাদের জন্য) রাব্বাকা (তোমার রবের কাছে) ইউখরিজ্ (তিনি বাহির করেন) লানা (আমাদের জন্য) মিম্মা (তাহা হইতে যাহা) তুম্বিতুল্ (উৎপাদন করে) আরদু (জমিন)।

□□সুতরাং প্রার্থনা করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে, তিনি বাহির করেন আমাদের জন্য তাহা হইতে যাহা জমিনে উৎপাদন করে।

+ মিম্ম (হইতে) বাকলিহা (শাকসবজি) ওয়া (এবং) কেসসায়েহা (শসা) ওয়া (এবং) ফুমিহা (তাহার গম) ওয়া (এবং) আদাসিহা (ডাল) ওয়া (এবং) বাসালিহা (পিয়াজ)।

□□তাহার শাকসবজি এবং তাহার শসা এবং তাহার গম এবং তাহার ডাল এবং তাহার পিয়াজ হইতে।

+ কালা ([মুসা] বলিলেন) আতাস্তাবদিলুনা (তোমরা কি বদল করিতে চাও?) - লাজি (যাহা) হুয়া (যাহা) আদনা (নগন্য জিনিস) বিল্লাজি (সেইটার বদলে) ইয়া (যাহা) খাইকুন (উত্তম)।

□□[মুসা] বলিলেন, তোমরা কি যাহা উত্তম সেইটার বদলে যাহা নগন্য জিনিস তাহা বদল করিতে চাও?

+ ইউবিতু (তোমরা নামো) মিসরান্ ([কোনো] শহরে) ফাইননা (সুতরাং নিশ্চয়ই) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) মা (যাহা) সাআলুতুম্ (তোমরা চাহিয়াছিলে)।

□□তোমরা নামো শহরে সুতরাং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য যাহা তোমরা চাহিয়াছ।

+ ওয়া (এবং) দুরিবাত্ (পতিত হইল) আলাইহিম্ (তাহাদের উপর) জিল্লাত্ (অপমান, লাঞ্ছনা) ওয়া (এবং) মাস্কানা (দারিদ্র, দূরবস্থা) ওয়া (এবং) বাউ (তাহারা পরিবেষ্টিত হইল) বিগাদাবিম্ (গজবের দ্বারা) মিনাল্লাহি (আল্লাহর পক্ষ হইতে)।

□□এবং তাহাদের উপর অপমান-লাঞ্ছনা পতিত হইল এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহারা পরিবেষ্টিত হইল দারিদ্রতা [ও] গজবে।

+ জালিকা (ওইটা) বিআননাহম্ (তাহারা এই কারণে যে) কানু (ছিল) ইয়াকফুলনা (কুফরি করিয়াছিল) বিআয়াতি (আয়াতগুলিকে) আল্লাহি (আল্লাহ)।

□□ওইটা এই কারণে যে তাহারা কুফরি করিয়াছিল আল্লাহর আয়াতগুলিকে।

+ ওয়া (এবং) ইয়াকতুলুনা (তাহারা কতল করিয়াছিল) নাবিইনা (নবিদেরকে) বিগাইরিলহাক্কি (হকের বাহিরে তথা অন্যায়ভাবে)।

□□এবং তাহারা অন্যায়ভাবে নবিদেরকে কতল করিয়াছিল।

+ জালিকা (ওইটা) বিমা (এই কারণে যে) আসাউ (অবাধ্যতা) ওয়া (এবং) কানু (করিয়াছিল) ইয়াকাদু (সীমালঙ্ঘন)।

□□ওইটা এই কারণে যে তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল।

৬২ ইননাল্ (নিশ্চয়ই) লাজিনা (যাহারা) আম্মান্ (ইম্মান আনিয়াছে) ওয়াল্ (এবং) লাজিনা (যাহারা) হাদু (ইহদি) ওয়াল্ (এবং) নাসুরা (খিস্তান) ওয়াস্ (এবং) সাবেইনা (সাবেইন) মান্ (যে কেহ) আম্মানা (ইম্মানের কাজ করে) বিল্লাহি (আল্লাহর সঙ্গে) ওয়াল্ (এবং) ইয়াওমিল্ (দিনে) আখিরি (আখেরাতে) ওয়া (এবং) আমিনা (কাজ করে) সালিহান্ (সৎ) ফালাহম্ (সুতরাং তাহাদের জন্য) আজুরু (পূরস্কার) হম্ (তাহাদের) ইন্দা (নিকটে, কাছে) রাব্বিহিম্ (তাহাদের রবের) ওয়া (এবং) লা (না) খওফুন্ (ভয়)

আল্লাইহিম (তাহাদের জন্য) ওয়া (এবং) না (না) হম (তাহারা) ইয়াহজানুন (চিহ্নিত হওয়া, আক্ষেপ করা, বিষণ্ণ হওয়া)।

□□ নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহদি এবং খ্রিস্টান এবং সাবাইন যে কেহ ইমান আনিবে আল্লাহর উপর এবং আখেরাতের দিনে এবং সংকাজ করে সূতরাং তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রবের কাছে এবং তাহাদের জন্য ভয় নাই এবং তাহারা চিহ্নিত হইবে না।

□ কোরান-এর এই আয়াতটিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে ইহার ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সমাজের বকে কিছু গোড়া প্রকৃতির মানুষ সব সময়েই ছিল এবং আছে যারা সহজভাবে কোনো কিছু মেনে নিতে চায় না। এদের দরদ অনেকটা মার চেয়ে মাসির দরদের মতো। এরা মনে করে, ধর্মের সব কিছু তাদেরই জন্য। উদারতা, প্রসারতা এই সমস্ত লোকদের কাছে কোনো কালেই গ্রহণীয় হয় নাই, বরং অসহ্য মনে হয়েছে; তাই মহানুভবতা এবং উদারতার ঘোমটা পরিধান করে সংকীর্ণতার মতাদর্শ প্রচার করেছে এবং এখনও করে। অনেক গোড়া প্রকৃতির ধর্মের অনুসারীরা বলেই ফেলেন যে, কোরান-এর এই আয়াতটি বাতিল হয়ে গেছে তথা নাসেক-মনসুখের মধ্যে পড়ে গেছে – সূতরাং এই আয়াতটি পড়া যাইবে, কিন্তু ইহার কার্যকারিতা বহিত হয়ে গেছে। আমরা যতদূর জানি যে নাসেক-মনসুখের আয়াতগুলো স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন মাওলানা জালালউদ্দিন সয়তি এবং তফসিরাতে আহমদি-র তফসির-কারক মোলা জিউন। তাদের নাসেক-মনসুখ করা আয়াতগুলোর মধ্যে এই আয়াতটি পড়ে নাই এবং সূরা ইউসুফের ১০০ নম্বর আয়াতটিও পড়ে নাই। সূরা ইউসুফের ১০০ নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই, হজরত ইউসুফ (আ.)-কে তাহার পিতা হজরত ইয়াকুব (আ.) নবি হয়েছে এবং পিতা হয়েছে পুত্রকে সেজদা করেন এবং হজরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতাও পুত্রকে সেজদা করেন এবং হজরত ইউসুফ (আ.)-এর ১১ জন বড় ভাইও হজরত ইউসুফ (আ.)-কে সেজদা করেন। এই আয়াতটিকে কিছু মানুষ আশ্রয়ার্থীর উপর প্রচণ্ড চাপেটামাত মনে করে হাদিস দিয়ে – তাপ্তি মাত্র একটি হাদিস দিয়ে – কোরান-এর এই আয়াতটিকে কেটে দেয়। আমরা জানি হীরা দিয়ে কাচ কাটে, কিন্তু এরা কাচ দিয়ে হীরা কাটার ব্যবস্থার কথা বলে যায়। মানুষকে বিভ্রান্তির অতলে ফেলে দেবার জন্য এরা নিজের মনগড়া অর্থটিকে প্রচার করে বেড়ায়। পছন্দ হয় না ভালো কথা, কিন্তু নাসেক-মনসুখের ফাদে ফেলার চক্রান্তটি এদের মন হতে উঠে যেতে দেখি নি এবং কোনোদিন দেখতে পাবো কিনা জানি না। অনেক অপ্রিয় সত্য সমাজের বকে কিছু লোক কোনো দিনই গ্রহণ করে নিতে পারে নি এবং পারবে কিনা সন্দেহ, তাই চক্রান্তের ঘোমটা পরিধান করে সহজ-সরল সত্যটিকে চক্রান্তের যাতাকলে ফেলে দেয় এবং এতে বেশ কিছু সরল-সহজ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। যুগে-যুগেই এই রকম মানুষের রূপনকশা দেখতে পেয়েছি এবং সবযুগেই কিছু না কিছু থাকবে বলেই বিশ্বাস করি। না থাকলে, সোবহান আল্লাহ!

৬৩. ওয়া (এবং) ইজ (যখন) আখাজনা (আমরা নিয়াহিলাম) মিসাকাকুম (তোমাদের অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি) ওয়া (এবং) রাফানা (আমরা উঠাইয়াহিলাম) ফাওকাকুম (তোমাদের উপর) তরা (তর – যেহেতু তরের সঙ্গে পাহাড় শব্দটি নাই তাই পাহাড় শব্দটি দিলমি না) খজ (তোমরা ধরো) মা (যাহা) আতাইনাকুম (তোমাদেরকে আমরা দিয়াছি) বিকুয়াতিন (শক্তভাবে, দৃঢ়ভাবে) ওয়া (এবং) উজকর (তোমরা জিকির করো) লাআল্লাকুম (যাহাতে তোমরা) তাততাকুন (তাকওয়া গ্রহণ করিতে পারো)।

□□ এবং যখন আমরা (আল্লাই) নিয়াহিলাম তোমাদের প্রতিশ্রুতি (অঙ্গীকার) এবং আমরা উঠাইয়াহিলাম তর তোমাদের উপর তোমরা ধারণ করো যাহা শক্তভাবে আমরা দিয়াছি তোমাদেরকে এবং জিকির করো যাহা ইহার মধ্যে আছে যাহাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পারো।

৬৪. *সুম্মা* (তারপর) *তাওয়ালাইতুম্* (তোমরা ফিরিয়া গিয়াছিলে) *মিন্বাদি* (হইতে পরে) *জালিকা* (উহা)।

তারপর উহা হইতে তোমরা ফিরিয়া গিয়াছিলে।

+ *ফালাওলা* (কিন্তু যদি) *না* (না) *ফাদলু* (ফজল, অনুগ্রহ) *আল্লাহি* (আল্লাহর) *আলাইকুম্* (তোমাদের উপর) *ওয়া* (এবং) *রাইমাতুহ* (তাঁহার রহমত)।

সুতরাং যদি আল্লাহর ফজল তোমাদের উপর না (থাকিত) এবং তাঁহার রহমত।

+ *লাকুনতুম্* (অবশ্যই তোমরা হইতে) *মিনাল্* (হইতে) *খাসেরিন্* (কতিগ্রস্ত)।

অবশ্যই তোমরা হইতে কতিগ্রস্তদের (অন্তর্ভুক্ত)।

৬৫. *ওয়া* (এবং) *লাকাদ্* (নিশ্চয়ই) *আনিমতুম্* (তোমরা জানিয়াছ) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *ইতাদাত* (সম্মানজনন করিয়াছিল) *মিনকুম্* (তোমাদের মধ্য হইতে) *ফি* (মধ্যে) *সাবতে* (শনিবার) *ফাকুননা* (আমরা বলিয়াছিলাম) *লাহম্* (তাহাদেরকে) *কনু* (তোমরা হইয়া যাও) *কিরাদাতান্* (বানর) *খাসিইন্* (নিকৃষ্ট, লাক্ষিত, ঘৃণিত, অধম)।

এবং নিশ্চয়ই তোমরা জানিয়াছ যাহারা সম্মানজনন করিয়াছিল তোমাদের মধ্য হইতে শনিবারের সম্পর্কে (অথবা বিষয়ে) সুতরাং তাহাদেরকে আমরা বলিয়াছিলাম, তোমরা অধম বানর হইয়া যাও।

এই আয়াতের বিষয়বস্তু অতি উচ্চ স্তরের বিষয়। ইহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে। মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং যারা বিরোধিতা করেছিল আল্লাহ তাহাদেরকে অধম বানর হয়ে যাবার অভিশাপটি দিয়েছিলেন এবং তাঁরা বানর হয়ে গিয়েছিল। দেহের দ্বারাই নফসের পরিচয় বহন করে। মানবদেহে যখন একটি নফস অবস্থান করে তখন সেই নফসের অবস্থানটিকে মানব অথবা মানবা বলা হয়। এই আয়াতে দেহের বদল নাকি নফসের স্বভাবটি অধম বানরের স্বভাব অর্জন করা বোঝায় তা বলতে পারলাম না।

৬৬. *ফাজ্জালনাহা* (সুতরাং ইহাকে আমরা বানাইয়াছি) *নাকালান্* (দৃষ্টান্ত, শাস্তি) *লিন্না* (তাহাদের জন্য) *বাইনা* (আগে, পূর্বে) *ইয়াদাইহা* (সেই সময়) *ওয়া* (এবং) *মা* (যাহারা) *খাল্ফাহা* (তাহার পূর্বে) *ওয়া* (এবং) *মাওযিজাতান্* (উপদেশ, ওয়াজ, বক্তব্য, উপদেশবাণী) *লিন্মুতাকিন্* (মুতাকিদদের জন্য)।

সুতরাং আমরা ইহাকে বানাইয়াছি দৃষ্টান্ত তাহাদের জন্য (যাহারা ছিল) আগে সেই সময় এবং যাহারা (ছিল) তাহার পরে এবং মুতাকিদদের জন্য একটি ওয়াজ (একটি উপদেশ)।

৬৭. *ওয়া* (এবং) *ইজ্* (যখন) *কালান্* (বলিয়াছিলেন) *মুসা* (মুসা) *লিকাউমিহি* (তাহার কণ্ঠের জন্য) *ইননা* (নিশ্চয়ই) *আল্লাহি* (আল্লাহ) *ইয়ামুরুকুম্* (তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন) *আন্* (যে) *তাজ্জবাহ* (তোমরা জবেহ করো) *বাকারাতান্* (একটি গাভীকে)।

এবং যখন মুসা তাহার কণ্ঠের জন্য বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন যে, একটি গাভীকে তোমরা জবেহ করো।

+ *কাল্* (তাহারা বলিয়াছিল) *আতাততাজ্জিনা* (তুমি কি আমাদের গ্রহণ করিয়াছ?) *ইজ্জান্* (উপহাসরূপে, বিদ্রূপরূপে, ঠাট্টা করা)।

তাহারা বলিয়াছিল, তুমি কি উপহাসরূপে আমাদেরকে গ্রহণ করিয়াছ?

+ কাল (মুসা) বলিলেন) আউজুবিলাহ (আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই) আন (যেন) আকুনা (আমি হইব) মিনান্ (অন্তর্ভুক্ত) জাহিলিন্ (জাহেলদের)।

□□মুসা) বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই যেন জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত না হই।

৬৮. কাল (তাহারা বলিয়াছিল) উদুউলানা (আমাদের জন্য দোয়া করো) রাব্বাকা (তোমাদের রবের নিকট) ইউবাইইল্লানা (আমাদের জন্য তিনি বর্ণনা করেন) মা (কেমন) হিয়া (সেইটা)।

□□তাহারা বলিয়াছিল, তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো, তিনি বর্ণনা করেন সেইটা কেমন আমাদের জন্য।

+ কাল (মুসা) বলিলেন) ইন্নাহ (নিশ্চয়ই তিনি) ইয়াকুল (বলেন) ইন্নাহা (নিশ্চয়ই তাহা) বাকারাতন্ (একটি গাভী) লা (না) ফারিদুন্ (বৃদ্ধ) ওয়া (এবং) লা (না) বিকরুন্ (বাহুর, বাচ্চা)।

□□(মুসা) বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেন, তাহা নিশ্চয়ই একটি গাভী, বৃদ্ধ না এবং বাহুরও নয়।

+ আওযানুন্ (মধ্যম বয়সের) বাইনা (বরং) জালিকা (উহা)।

□□বরং উহা (হইবে) মধ্যবয়সী।

+ ফাফআনু (সুতরাং তোমরা করো) মা (যাহা) তুহমারুন্ (তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে)।

□□সুতরাং তোমরা করো যাহা তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬৯. কাল (তাহারা বলিল) উদুউ (দোয়া করো, ডাকো) লানা (আমাদের জন্য) রাব্বাকা (তোমার রব) ইউবাইন্ (তিনি বর্ণনা করেন) লানা (আমাদের জন্য) মা (কি) লাউনহা (তাহার রঙ) কাল (মুসা) বলিলেন) ইন্নাহ (নিশ্চয়ই তিনি) ইয়াকুল (বলেন) ইন্নাহা (তাহা নিশ্চয়ই) বাকারাতন্ (গাভী) সাফবাত্ (হলুদ) ফাকিউন্ (গাঢ়, খাট, গভীর, অবিমিশ্র) লাউনহা (তাহার রঙ) তাসুরকুন্ (আনন্দিত, আনন্দেও) নাজিরিন্ (দর্শকেরা, দর্শকবৃন্দ)।

□□তাহারা বলিল, আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে দোয়া করো, আমাদের জন্য তিনি যেন বলেন ইহার রঙ কী। মুসা বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেন, তাহা নিশ্চয়ই গাভী গাঢ় হলুদে রঙ ইহার, দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।

৭০. কাল (তাহারা বলিয়াছিল) উদুউ (তুমি ডাকো) লানা (আমাদের জন্য) রাব্বাকা (তোমার রব) ইউবাইন্ (তিনি স্পর্শ করিয়া বলেন) লানা (আমাদের জন্য) মা (কেমন) হিয়া (তাহা, উহা) ইন্নান্ (নিশ্চয়ই) বাকারা (গাভীটি) তাসাবাহা (সন্দেহ হওয়া, সংশয় হওয়া) আলাইনা (আমাদের কাছে) ওয়া (এবং) ইন্নান্ (নিশ্চয়ই আমরা) ইন্শাআলাহ (যদি আল্লাহ চাহেন) লাউমহতাদুন্ (অবশ্যই হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া, সঠিক জ্ঞান পাওয়া, দিশা পাওয়া)।

□□তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের জন্য তুমি ডাকো তোমার রবকে, তিনি আমাদের জন্য (যেন) স্পর্শ করিয়া বলিয়া দেন (যে) তাহা কেমন হইবে, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সংশয় হইতেছে গাভীটির (সম্পর্কে) এবং নিশ্চয়ই আমরা যদি আল্লাহ চান (তো) অবশ্যই আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হইব।

৭১. কাল (মুসা) বলিলেন) ইন্নাহ (নিশ্চয়ই তিনি) ইয়াকুল (আল্লাহ বলেন) ইন্নাহা (নিশ্চয়ই তাহা) বাকারাতন্ (একটি গাভী) লা (না) জালিলুন্ (লাগানো হইয়াছে, ব্যবহার করা হইয়াছে) তুসিরুন্ (চাষ, কষণ) আরিদা (জমিন)।

□□(মুসা) বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) বলেন, তাহা নিশ্চয়ই একটি গাভী যাঁহা জমিন চাষে ব্যবহার করা হয় নাই।
+ ওয়া (এবং) লা (না) তাস্কিন্ (পানি দিতে, সেচ করিতে) হারসা (ক্ষেতে)।

□□এবং ক্ষেত্রে সেচকার্য (করানো হয়) নাই।
+ মুসাল্লামাতুন (সম্মত-সবল, সালামতপ্রাপ্ত) লা (নাই) শিয়াতা (কোনো খুঁত/কলঙ্ক/দাগ) ফিহা (ইহার মধ্যে)।
□□সালামতপ্রাপ্ত ইহার মধ্যে কোনো খুঁত বা কলঙ্ক নাই।
+ কালু (তাহারা বলিল) আনা (এখন) জিতা (তুমি আনিয়াছ) বিন্হাক্কি (সত্যসহ, সত্যের সহিত, সত্য দিয়া)।

□□তাহারা বলিল, এখন তুমি সত্যসহ আনিয়াছ।
+ ফাজ্জাবাহ (সুতরাং তাহারা জবেহ করিল) হা (তাহা) ওয়া (এবং) মা (না) কাদ্ (আগ্নহী ছিল) ইয়াক্আলুন (তাহা করিতে)।
□□সুতরাং তাহারা জবেহ করিল তাহা এবং তাহারা (জবেহ করিতে) (মোটাই) আগ্নহী ছিল না।

৭২. ওয়া (এবং) ইউজ্ (যখন) কাতালতুম্ (তোমরা কতল করিয়াছিলে) নাক্ফসান্ (একটি নফসকে) ফাদ্দারাতুম্ (সুতরাং তোমরা একে অন্যকে দোষ দিয়াছিলে) ফিহা (ইহার মধ্যে)।

□□এবং যখন একটি নফসকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা একে অপরকে দোষ দিয়াছিলে।
+ ওয়া (এবং) আল্লাহ্ (আল্লাহ) মুখরিজুন (বাহির করা, প্রকাশ করা) মা (যাহা) কনতুম্ (তোমরা করিতেছিলে) তাকতমুন (গোপন)।
□□এবং আল্লাহ প্রকাশ করিলেন যাহা তোমরা গোপন করিতেছিলে।

৭৩. ফাকুলনা (সুতরাং আমরা বলিয়াছিলাম) ইউদ্রিব্ (তোমরা আঘাত করো) হ (তাহাকে, নফসকে) বিবাদিহা (তাহার কিছু অংশ দিয়া)।

□□আমরা তখন বলিয়াছিলাম তাহাকে (নফসটিকে) তোমরা আঘাত করো উহার কিছু অংশ দিয়া।

+ কজিলিকা (ওইভাবেই) ইউউহি (জীবিত করেন) আল্লাহ্ (আল্লাহ) মাওতা (মৃতকে)।

□□ওই ভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন।

+ ওয়া (এবং) ইউউরিকুম্ (তোমাদেরকে দেখান) আয়াতিহি (তাহার আয়াতগুলিকে / নিদর্শনগুলিকে) লাআল্লাকুম্ (যাহাতে তোমরা) তাকিনুন (বুঝিতে পারো)।

□□এবং তাহার আয়াতগুলিকে তোমাদেরকে দেখানো (হয়) যাহাতে তোমরা বুঝিতে পারো।

□ এই আয়াতে অধ্যাত্মবাদের উৎকর্ষ সাধনের চরম পরিণতিটির কথাই আল্লাহ রূপক ভাষায় বলেছেন। এই আয়াতের স্বাভাবিক অর্থটি গ্রহণ করতে গেলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে একটি নফসকে তথা একটি মানুষকে গাভীর কিছু গোস্বত অথবা কিছু হাড়িডর দ্বারা আঘাত করলে জীবিত ইবার দৃশ্যটি দেখা যায় না। সুতরাং এই আঘাতটি রূপক আঘাত। এই আঘাত একটি কতলকৃত নফস দ্বারাই করতে হয়। অর্থাৎ যে-নফস হতে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বাহির করে দিতে পেরেছে সেই পবিত্র নফসের আঘাতটিকে বোঝানো হয়েছে। এই রকম একটি পবিত্র নফস দ্বারাই 'লুডিয়ান্না' নফসের অধিকারী তথা সংগ্রামরত নফসের অধিকারী ইনসান, যিনি খান্নাসরুপী শয়তানটিকে নফস হতে বাহির করার জেহাদি যুদ্ধে রত আছেন, সেই রকম নফসটিকে আঘাত করেই মানবকে মহামানবে পরিণত করা হয়। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তার পরিচয় দান করে থাকেন। সুতরাং

হে সাধারণ মানুষ, তোমরাও বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করো এবং নফসটিকে পবিত্র করো তথা খান্নাসরূপী শয়তান হতে মুক্ত হও। নতুবা আয়াতের হুবহু অর্থটি গ্রহণ করতে গেলেই গোজামিলের ধানাই-পানাই দিয়ে এটা-সেটা বলে যেতে হয় এবং এই বলার মাঝে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোনো মিলই থাকে না। সুতরাং ওহাবি মতবাদে শুনতে এবং দেখতে ভালোই লাগে, কিন্তু পরিণামে ইহা যে একটি ভয়ঙ্কর বিষের ফল উহাই বা কয়জনে বুঝতে পারে?

৭৪. *সুম্মা* (তারপর), *কাসাত্* (কতিন হইয়া যাওয়া) *কনুব* (অন্তরগুলি) *কম* (তোমাদের) *মিম* (হইতে) *বাদি* (পরে) *জালিকা* (ঔঁটা) *ফাতিয়া* (সুতরাং তাহা) *কাল* (যেমন) *হিজরাতি* (পাথর, প্রস্তর) *আও* (অথবা) *আশাদ্দ* (অধিকতর, তার চেয়েও বেশি) *কাসওয়াতান* (কতিন)।

তারপর তোমাদের অন্তরগুলি উহার পরও কতিন হইয়া গেল, সুতরাং তাহা পাথর যেমন অথবা অধিকতর কতিন।

+ *ওয়া* (এবং) *ইননা* (নিশ্চয়ই) *মিনান* (হইতে) *হিজরাতি* (পাথর) *লাম্মা* (অবশ্যই যাহা) *ইয়াতাক্জাক্* (ফাটিয়া বাহির হয়) *মিনহ* (তাহা হইতে) *আনহাক্* (নহর)।

এবং নিশ্চয়ই এমন কিছু পাথর আছে যেগুলি হইতে নহর (ঝরনা) প্রবাহিত হয়।

+ *ওয়া* (এবং) *ইননা* (নিশ্চয়ই) *মিনহা* (উহা হইতে) *লাম্মা* (অবশ্যই যাহা) *ইয়াশাক্কা* (ফাটিয়া যায়) *ফাইয়াখরুজু* (সুতরাং বাহির হয়) *মিনহ* (উহা হইতে) *মাদ* (পানি)।

এবং নিশ্চয়ই উহা ফাটিয়া গিয়া (পাথর) (কখনো-কখনো) পানি বাহির হয়।

+ *ওয়া* (এবং) *ইননা* (নিশ্চয়ই) *মিনহা* (উহা হইতে) *লাম্মা* (অবশ্যই যাহা) *ইয়াহবিত* (পড়িয়া যায়) *মিন* (হইতে) *খাশইয়াতিলাহি* (আল্লাহর ভয়ে)।

এবং নিশ্চয়ই উহা (পাথর) (কখনো কখনো) আল্লাহর ভয়ে নিচে পতিত হয়।

+ *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *বিগাফিলিন* (গাফেল নন) *আম্মা* (তাহা হইতে যাহা) *তাম্মান* (তোমরা করিতেছ)।

এবং তোমরা যাহা করো আল্লাহ সেই বিষয়ে গাফেল (বেখবর) নহেন।

আল্লাহ যে মহাবিজ্ঞানময় মহাজ্ঞানী এবং মহাকৌশলদাতা *কোরান*-এর প্রতিটি আয়াতে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলো আম্মরা দেখতে পাই। আম্মরা বুঝতেই পারি না যে, একই মূল দর্শনকে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে এবং বিভিন্ন মৈসাল দাঁড় করিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে মানুষের প্রতিটি নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দিয়ে আপন-আপন নফসটিকে পুতঃপবিত্র করার তথা নফসে মোৎমায়েন্না করার আত্মানটি বারবার করে যাচ্ছেন। আম্মরা তা বুঝতে পারি না এবং এই না-পারাটাই আল্লাহর একটি বিশেষ বিজ্ঞানময় কৌশল। আল্লাহর এই সকল কৌশলগুলো দেখে বান্দা বিভিন্নতার দর্শন খুজতে থাকে। এবং এই বিভিন্নতার মধ্যে ছোটখাট করে গিয়ে মূল দর্শন হতে মনের অজান্তে ছিটকে পড়ে। মানুষ তখন বুঝতেই পারে না যে আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার দর্শনটি আল্লাহ বলে যাচ্ছেন। এটাই আল্লাহর বিজ্ঞানময় মহা কৌশলীর মহালীলাখেলা।

৭৫. *আফা* (তবে কি) *তাতম্মাউনা* (তোমরা আশা করো) *আন* (যে) *ইউমিন* (তাহারা ইমান আনিবে) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *ওয়া* (এবং) *কাদ* (নিশ্চয়ই) *কানা* (ছিল) *ফারিকুন* (একটি দল) *মিনহুম* (তাহাদের মধ্যে) *ইয়াসম্মাউনা* (শুনে) *কালাম্মা* (কালাম, বাণী) *আল্লাহি* (আল্লাহর) *সুম্মা*

(তারপর) *ইউহাবরিকনাহ* (তাহারা তাহা হেরফের করে) *মিম্বাদি* (হইতে পরে, ইহার পরও) *মী* (যাহা) *আকালুহ* (তাহারা বুঝিয়াছিল) *হ* (তাহা) *ওয়া* (এবং) *হম* (তাহারা) *ইয়ালামুন* (জানিয়াও)।

☐☐ তোমরা কি আশা করো যে তাহারা তোমাদের (কথায়) ইমান আনিবে? এবং অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে একটি দল আল্লাহর কালাম শুনিত তারপর তাহারা জানিয়া বুঝিয়া উহা বিকৃত (হেরফের) করিত।

৭৬. *ওয়া* (এবং) *ইজা* (যখন) *লাকুল* (তাহারা মিলিত হয়) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমানু* (ইমান আনিয়াছে) *কালু* (তাহারা বলে) *আমাননা* (আমরা ইমান আনিয়াছি)।

☐☐ এবং যখন তাহারা মিলিত হয় যাহারা ইমান আনিয়াছে (এবং) তাহারা বলে আমরা ইমান আনিয়াছি।

+ *ওয়া* (এবং) *ইজা* (যখন) *খালা* (মিলে) *বাদহম* (তাহাদের কেহ) *ইলা* (দিকে) *বাদিন্* (কাহারও) *কালু* (তাহারা বলে) *আতুহাদ্দিসুনাহম* (তোমরা কি তাহাদেরকে বলিয়া দাও) *বিমা* (যাহা) *ফাতাহী* (প্রকাশ করা) *আলাহ* (আল্লাহ) *আলাইকুম* (তোমাদের কাছে) *লিউহাজ্জকুম* (তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করিতে পারে) *বিহি* (ইহা দিয়া) *ইন্দা* (নিকটে, কাছে) *রাববিকুম* (তোমাদের রবের)।

☐☐ এবং যখন তাহাদের কেউ মিলে কাহারও সাথে তাহারা বলে তাহাদেরকে বলিয়া দাও কি তোমরা ওই বিষয়ে যাহা আল্লাহ প্রকাশ করিয়াছেন তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের কাছে ইহা দিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যেন প্রমাণ পেশ করিতে পারে।

+ *আফালা* (তবে কি না) *তাকিনুন* (তোমরা বোঝ)।

☐☐ তবে কি তোমরা বোঝ না।

“আত্মদর্শন বিষয়ে অমনোযোগী ব্যক্তিগণ আম্মানুদের পক্ষ হইয়া ইমানের কাজ করবে এইরূপ আশা করা যায় না। এরা বিষয়টি জেনে-বুঝেও অন্য লোকের নিকট ভিন্নভাবে, বিকৃতরূপে উপস্থাপন করে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধকগণের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আবার নিজের লোকের সঙ্গে একাকী হলে বলে, তোমরা তোমাদের মতাদর্শগুলো আম্মানুদের কাছে বলো না। এই জাতীয় লোকের ধারণা এই যে, আম্মানুগণ একই রকম যে-সকল মতাদর্শ ব্যক্ত করে তা তাদের দল হতে ধার করা কথা এবং উহার দ্বারাই বাগাড়ম্বর করে। তাই *কোরান* বলছে যে, তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয়েই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন।”

৭৭. *আওয়া* (কি) *লা* (না) *ইয়ালামুন* (তাহারা জানে) *আননা* (নিশ্চয়ই) *আলাহ* (আল্লাহ) *ইয়ালামু* (জানেন) *মী* (যাহা [কিছু]) *ইউসিরকনা* (তাহারা গোপন করে) *ওয়া* (এবং) *মী* (যাহা) *ইউলিননা* (তাহারা প্রকাশ করে)।

☐☐ তাহারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যাহা কিছু তাহারা গোপন করে এবং যাহা কিছু তাহারা প্রকাশ করে।

৭৮. *ওয়া* (এবং) *মিনহম* (তাহাদের মধ্যে) *উম্মিউউনা* (নিরক্ষর) *লা* (না) *ইয়ালামনা* (তাহারা জানে) *কিতাবা* (কিতাব) *ইল্লা* (একমাত্র) *আমানিয়া* (মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা, কাল্পনিক আশা) *ওয়া* (এবং) *ইন* (নিশ্চয়ই/যদিও) *হম* (তাহারা) *ইল্লা* (একমাত্র) *ইয়াজনুন* (ধারণা করে)।

☐☐ এবং তাহাদের মধ্যে (কিছু আছে) নিরক্ষর তাহারা কিতাব জানে না একমাত্র কাল্পনিক আশা-আকাঙ্ক্ষা (ছাড়া) এবং নিশ্চয়ই তাহারা শুধু (অমূলক) ধারণা করে।

☐ এই আয়াতে বলা হয়েছে উম্মির কিতাব-জ্ঞান জানে না। পাইকারিভাবে সব উম্মির বেলাতেই এই কথাটি প্রযোজ্য হয় না বলেই ধারণা করছি। কারণ

অধিকাংশ নবি-রসুলেরা উম্মিই থাকেন, অথচ উম্মিরা কেতাব-জ্ঞান জানে না বলাটাকে মূল চোখে অনেকেই আত্মবিরোধী মনে করবে। তাই বিশেষ কিছু উম্মিদের কথাই বলা হয়েছে বলে মনে করতে চাই। আমার মনে হয়, নবি-রসুলদের বেলায় এই উম্মি শব্দটি মোটেই প্রযোজ্য হবে না, কারণ কোরান-এ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, উম্মি নবিকেই মানবজাতিকে কিতাবের জ্ঞান দান করার জন্য আলাহ কর্তৃক পাঠানো হয়েছে (ওয়া ইউআলেন্নহল কিতাবা)। সুতরাং উম্মি শব্দটি সবার জন্য একই রকম ব্যবহারের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া পৃথিবীর হাতে গোনা যে-কয়টি ভাষা অতি উন্নত মানের ভাষা বলে বিবেচিত হয় তাহার মধ্যে আরবি ভাষাও একটি। কিন্তু আরবি ভাষা এতই গরিব ভাষা যে ইহার শব্দসংখ্যা অতি অল্প এবং এই অতি অল্প শব্দ শব্দে অনেক রকম অর্থ হয় এবং অনেক রকম অর্থ হবার দরুনই ডেজাল আর বিদ্বান্তির মধ্যে অনেক সময় হোচট খেতে হয়।

৭৯. ফাওয়াইলুলিল (সুতরাং ধ্বংস তাহাদের জন্য) লাজিনা (যাহারা) ইয়াকুবুনান (লিখে) কিতাবা (কিতাব) বিআইদিহিম (তাহাদের হাত দিয়া)।

□□ সুতরাং ধ্বংস তাহাদের জন্য যাহারা তাহাদের হাত দিয়া কিতাব লেখে।

+ মিম্মা (তারপর) ইয়াকুবুনান (তাহারা বলে) হাজ্জা (এইটা) মিন (হইতে) ইনদিল্লাহ (আলাহর নিকট) লিইয়াশতাক (তার বিনিময় লাভ করার জন্য) বিহি (ইহা দিয়া) সামানান (মূল্য) কালিলান (সামান্য)।

□□ তারপর তাহারা বলে এইটা আলাহর নিকট হইতে (আসিয়াছে), ইহা দিয়া তাহার বিনিময় লাভ করার জন্য সামান্য মূল্যে (বিক্রয় করে)।

+ ফাওয়াইলুল (সুতরাং ধ্বংস) লাহম (তাহাদের জন্য) মিম্মা (যাহা) কাতাবাত (লিখিয়াছে) আইদিহিম (তাহাদের হাত দিয়া) ওয়া (এবং) ওয়াইলুল (ধ্বংস) লাহম (তাহাদের জন্য) মিম্মা (যাহা) ইয়াকসিবুন (তাহারা উপার্জন করিয়াছে, অর্জন করিয়াছে)।

□□ সুতরাং ধ্বংস তাহাদের জন্য যাহা তাহাদের হাত (দিয়া) লিখিয়াছে এবং ধ্বংস তাহাদের জন্য যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে।

□ কোরান সংকলনের প্রশ্নে কারও কোনো সংশয়ের প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, মানুষের কথা কিছু না কিছু প্রবেশ করেছে। কিন্তু হাদিস সংগ্রহের ইতিহাসগুলো মনোযোগ সহকারে পড়তে গিয়ে অনেক স্থানেই দেখতে পেয়েছি মানুষের কথাকে নবি-রসুলদের কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এই জঘন্য অপকর্মটি করেছে তাদেরকে অভিশাপ দেবার আগেই প্রকৃতির নিয়মে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং ধ্বংস হতে বাধ্য। অন্ধ স্বার্থ, ক্ষমতার গদি আকড়িয়ে ধরার প্রবল বাসনা এবং মহৎ মানুষদেরকে ঘায়েল করার জন্য যারা নিজেদের কথাকে নবি-রসুলের নামে হাদিস বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে তারা তো ধ্বংসই।

৮০. ওয়া (এবং) কাল (তাহারা বলে) লান (কখনই না) তামাসমানা (আমাদেরকে স্পর্শ করিবে) নাক (আগুন) ইল্লা (একমাত্র) আইয়ামাম (কিছু দিন) মাওদুদাতান (গোনাগুনির)।

□□ এবং তাহারা বলে, কখনই আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করিবে না, একমাত্র গোনা কিছুদিন (যদি স্পর্শ করেও)।

+ কল (বলো) আততাসাতম (তোমরা গ্রহণ করিয়াছ কি?) ইনদাল্লাহি (আলাহর নিকট) আইদান (ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি) ফালান (সুতরাং না) ইউখলিফ (খেলাফ করা, ভঙ্গ করা) আলাহ (আলাহ) আহদাহ (তাহার ওয়াদা) আম (অথবা) তাকুলনা (তোমরা বলো) আলীল্লাহি (আলাহর উপর) মা (যাহা) না (না) তাআলীমুন (তোমরা জানো)।

□□বলো, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হইতে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছ সূতরাং আল্লাহ তাহার ওয়াদা উল্লংঘন করিবেন না অথবা তোমরা আল্লাহর উপর যাহা বলো (তাহা) তোমরা জানো না।

□ এই আয়াতে একটি অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ করা হয়েছে আর তা হলো, মানুষ যখন বিত্ত-বেত্তবের জাকজমকের জীবনের মধ্যে ডুবে থাকে তখন আল্লাহর বাণী এবং ভয়কে অনেকের উপেক্ষা করে বলতে চায় যে যদি বা কখনও আল্লাহর আজাব পতিত হয় সেই পতিত হবার সময়টি মাত্র সামান্য কিছু দিনের জন্য। নিজেদের মনগড়া কথা এরা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় তবু আল্লাহর দেখানো ভয়-ভীতিকে কমই তোয়াক্কা করে।

৮১. *বাল্লা* (হ্যাঁ) *মান্* (যে) *কাসাবা* (কামাই করা, উপার্জন করা) *সাইয়াতান্* (পাপ, মন্দ) *ওয়া* (এবং) *আহাতাত্* (ঘিরিয়া লইয়াছে, পরিবেষ্টিত) *বিহি* (তাহার সঙ্গে) *খাতিয়াতহ্* (তাহার পাপগুলি) *ফাউলাইকা* (সূতরাং ওইসব লোক) *আসহাবু* (অধিবাসী) *নারু* (আপ্তন)।

□□হ্যাঁ, যে কামাই করবে পাপ এবং পাপগুলি তাহার সঙ্গে ঘিরিয়া আছে সূতরাং ওইসব লোক আপ্তনের অধিবাসী।

+ *ফিতা* (উহার মধ্যে) *খালেদিনা* (দীর্ঘস্থায়ী)।

□□তাহারাই উহার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

□ এই আয়াতের শেষে ‘খালেদিনা’ শব্দটির অর্থ করা হয় ‘চিরস্থায়ী’। এই ‘চিরস্থায়ী’ শব্দটি সঠিক নয় এই জন্য যে প্রতিটি মানুষকে – যত শাস্তিই হোক না কেন – একদিন না একদিন মুসলমান হতেই হবে তথা আত্মসমর্পনের ধর্মে আসতেই হবে। ইহা নামে মুসলমান নয়, বরং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করার যে-ধর্মটি গ্রহণ করা হয় সেই ধর্মটিকে মনেপ্রাণে যারা গ্রহণ করেছে সেই মুসলমানদের কথা বলা হচ্ছে। কোনো দলগত-গোষ্ঠীগত মুসলমানের কথা মোটেই বলা হচ্ছে না। পাপীর সংশোধন হবার বিধানটি আল্লাহ এজন্যই রেখেছেন যে, তাঁর আরেক নাম রহমান তথা দয়ালু। কিন্তু জান্নাতে অবস্থান করার প্রশ্নে ‘খালেদুনা’ শব্দটির অর্থ হবে চিরস্থায়ী। যদিও *কোরান*-এ পাপের শাস্তির প্রশ্নে যেমন ‘খালেদুনা’ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, আবার জান্নাতের সুখভোগের বেলাতেও ‘খালেদুনা’ নামক একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে আপ্তনের অধিবাসী হবার সম্ভাবনা থাকবে সেখানে ‘খালেদুনা’ শব্দটির অর্থ হবে দীর্ঘস্থায়ী, কারণ আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে সংশোধন হবার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু জান্নাতে সুখভোগ করার প্রশ্ন যখন আসবে তখন ‘খালেদুনা’ শব্দটির অর্থ হবে চিরস্থায়ী। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির দর্শনে জান্নাতের সুখ চিরস্থায়ী কারণ এই সুখের আর কোনো পতনের মুখোমুখি হতে হয় না।

৮২. *ওয়া* (এবং) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমানু* (ইমান এনেছে) *ওয়া* (এবং) *আমিলু* (কাজ করেছে) *সালিহাতি* (সৎকর্ম) *উলাইকা* (উহারাই) *আসহাবু* (অধিবাসী) *জান্নাতি* (জান্নাতের)।

□□এবং যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আমলে সালেহা করিয়াছে ওইসব লোক জান্নাতের অধিবাসী।

+ *ইম্ম* (তাহারাই) *ফিতা* (উহার মধ্যে) *খালেদিনা* (চিরস্থায়ী হইবে)।

□□উহার মধ্যে তাহারাই চিরস্থায়ী হইবে।

৮৩. *ওয়া* (এবং) *এজ্জ* (যখন) *আখাজ্জনা* (আমরা লইয়াছিলাম) *মিসাকা* (অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি) *বানি* (বনি) *ইসরাইলা* (ইসরাইলের) *লা* (না) *তাবুদনা* (তোমরা এবাদত করিবে) *ইল্লা* (একমাত্র, ছাড়া, ব্যতীত) *আল্লাহ্* (আল্লাহ)।

□□এবং যখন আমরা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম বনি ইসরাইলের, তোমরা এবাদত করিবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া।

+ ওয়া (এবং) বিন্‌ওয়া লি দাউনে (পিতা-মাতার সহিত) এহসানান (ভালো ব্যবহার করিবে) ওয়া (এবং) জিন্‌কুব্বা (নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে) ওয়া (এবং) ইয়াতাম্মা (এতিমদের) মাসাকিন্ (মিসকিনদের) ওয়া (এবং) কুল্ (তোমরা বলিবে) লিন্‌নাসি (মানুষদেরকে) হসনান্ (সুন্দর) ওয়া (এবং) আকিমুস (তোমরা কায়েম করিবে) সালাতা (সালাত) ওয়া (এবং) আতু (তোমরা দিবে) জাকাতা (জাকাত)।

□□ এবং পিতামাতার সহিত ভালো ব্যবহার করিবে এবং নিকটাত্মীয় এবং এতিম এবং মিসকিনদের সাথেও এবং মানুষের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলিবে এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো।

+ সুম্মা (তারপর) তাওয়াল্ (তোমরা ফিরিয়া গিয়াছিলে) ইল্লা (ব্যতীত ছাড়া) কালিলান্ (সামান্য কিছু) মিন্‌কুম্ (তোমাদের মধ্যে হইতে) ওয়া (এবং) আনতুম্ (তোমরা) মুহরিদুন্ (মুখ ফিরানোকারী ছিলে)।

□□ তারপর তোমরা ফিরিয়া গিয়াছিলে তোমাদের মধ্যে হইতে সামান্য কিছু ছাড়া এবং (প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তো মুখ ফিরানোকারীই ছিলে।

৮৪. ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) আখাদনা (আমরা লইয়াছিলাম) মিসাকাকুম্ (তোমাদের অঙ্গীকার) লা (না) তাসফিকুন্ (তোমরা ঝরাইবে, তোমরা প্রবাহিত করিবে) দিম্মাআ (রক্ত) কুম্ (তোমাদের) ওয়া (এবং) লা (না) তখরিজুন্ (তোমরা বাহির করিবে) আনফসাকুম্ (তোমাদের নফসকে) মিন্ (হইতে) দিয়ারি (ঘর) কুম্ (তোমাদের) সুম্মা (তারপর) আকরার (স্বীকার করিয়াছিলে) তুম্ (তোমরা) ওয়া (এবং) আনতুম্ (তোমরা) তাশহাদুন্ (সাক্ষ্য দেওয়া)।

□□ এবং যখন আমরা তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম তোমরা ঝরাইবে না তোমাদের রক্ত এবং তোমরা বাহির করিবে না কোনো নফসকে তোমাদের ঘর হইতে তারপর তোমরা মানিয়া লইয়াছিলে এবং তোমরাই (সেই বিষয়ে) ছিলে সাক্ষী।

৮৫. সুম্মা (তারপর) আনতুম্ (তোমরা) হাউলাই (ওইসব) তাকতলুনা (তোমরা কতল করিয়াছ) আনফসাকুম্ (তোমাদের এক নফস অন্য নফসকে) ওয়া (এবং) তখরিজুনা (তোমরা বাহির করো) ফারিকান্ (এক পক্ষকে) মিন্‌কুম্ (তোমাদের মধ্যে) মিন্ (হইতে) দিয়ারিহিন্ (তাহাদের ঘরগুলি)।

□□ তারপর তোমরা ওইসব (মানুষদেরকে) তোমাদের এক নফস অন্য নফসকে তোমরা কতল করিয়াছ এবং তোমরা বাহির করিয়া দিয়াছ তোমাদের মধ্যে হইতে একপক্ষকে তাহাদের ঘরগুলি হইতে।

+ তাক্বাহাক্বনা (তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো) আলাইহিন্ (তাহাদের উপর) বিন্‌ইস্মে (গুনাহের সাথে) ওয়া (এবং) উদউয়ান্ (জ্বরদস্তি বাড়াবাড়ি করা)।

□□ তোমরা একে অন্যের উপরে সাহায্য করো, গুনাহের সাথে এবং জ্বরদস্তি র বাড়াবাড়ি করিয়া তাহাদের উপর।

+ ওয়া (এবং) ইন্ (যদি) ইয়াতকুম্ (তোমাদের কাছে আসে) উসারা (বন্দি) তফাদ্ (বিনিময় দিয়া) ইম্ (তাহাদের) ওয়া (এবং) ইয়া (সে) মুহাররাব্বিন্ (নিষিদ্ধ, হারাম) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) ইক্বাজুহম্ (তাহাদের বাহির করা)।

□□ এবং যদি তোমাদের কাছে বন্দি (হইয়া আসে) তাহাদেরকে মুক্তিপণ দিয়া (ছাড়াও) এবং সেই তাহাদেরকে বহিস্কার করাটাই তোমাদের উপর হারাম।

+ আফাতমিনুনা (সুতরাং তোমরা কি ইমান আনয়ন করো) বিবাদিন্ (কিছু অংশ) কিতাবি (কিতাবের) ওয়া (এবং) তাকফুরুনা (তোমরা কুফরি করো) বিবাদিন্ (কিছু অংশের)।

□□সুতরাং তোমরা কি ইমান আনয়ন করো কিতাবের কিছু অংশে এবং তোমরা কফর করো কিছু অংশের?

+ ফালা (সুতরাং কি) জাজাউ (প্রতিদানে, বিনিময়ে) মাই (যে) ইয়াফালু (কর্ম করিবে) জালিকা (ওইটা, ওইরূপ) মিনকুম (তোমাদের মধ্যে) ইলুনা (একমাত্র, ব্যতীত) খিজইউন (লাঞ্ছনা, অপমান, হীনতা) ফি (মধ্যে) হায়াতিদ (জীবনে) দুনিয়া (দুনিয়া)।

□□সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ওইরূপ কর্ম করিবে দুনিয়ার জীবনের মধ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত প্রতিদান (পাইবে না)।

+ ওয়া (এবং) ইয়াওমান (দিনে) কিয়ামাতি (কেয়ামতের) ইউরাদুনা (ফিরাইয়া দেওয়া, নিক্ষেপ করা) ইলা (দিকে) আশাদদিল (কঠোর, শক্ত, কঠিন) আজাব (আজাব, শাস্তি)।

□□এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদেরকে কঠিন আজাবের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

+ ওয়া (এবং) মা (না) আল্লাহ (আল্লাহ) বিগাফিলিন (বেখবর) আম্মা (সেই বিষয়ে) তামালুন (তোমরা করো)।

□□এবং তোমরা ওই বিষয়ে যাহা করিতেছ আল্লাহ বেখবর নহেন।

□ এই আয়াতে হজরত মুসা (আ.)-র জামানার কথাই কেবল বলা হচ্ছে না, বরং যাহা বলা হচ্ছে তাহা সর্বযুগেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। হজরত মুসা (আ.)-র জামানায় একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো। তাই বলে কি এ-যুগেও সেই অন্যায় কর্মটি করা হয় না? হজরত মুসা (আ.)-র জামানায় অনেক নিরীহ লোকদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে উচ্ছেদ করে দিত। এখনও কি এইসব অপকর্ম করা হচ্ছে না? যাদেরকে হত্যা করত এবং বাড়িঘর হতে উচ্ছেদ করে দিত তার বিভিন্ন রকম অজুহাত দাড় করিয়ে এইসব অপকর্ম করা হতো এবং আজও কি সেই একই পুরনো অজুহাতগুলো আইন নামক বাক্সে বন্ধি করে নতুন করে করা হচ্ছে না? অন্যায় অত্যাচারের ধরন-ধারণগুলো যুগের পরশে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি এক ও অভিন্ন। সেই দিনে বন্ধি করা কথিত অপরাধীদের উলঙ্গ মূর্তিপণ আদায় করার মতো আজও কি অন্যরূপ ধারণ করে মূর্তিপণ আদায় করা হচ্ছে না? আল্লাহ এইসব অপকর্মগুলোকে স্পষ্ট হারাম বলে কোরান-এ উল্লেখ করেছেন এবং সেই হারাম কাজগুলো কি মুসা নবির (আ.) জামানাতেই শেষ হয়ে গেছে, নাকি আজও বহাল তব্বিতে বিরাজ করছে? মুসা নবির (আ.) জামানাতেও আল্লাহর দেওয়া তাওরাত কিতাবের যেমন কিছু অংশ মেনে নিত এবং কিছু অংশ অবহেলা করত তথা দেখেও দেখত না, জেনেও জানত না, শুনেও শুনত না – সেই রকম আজও কি মুসলমানেরা আল্লাহর কোরান-কে আংশিকরূপে মেনে নেয় না? সুতরাং কোরান-এর এই আয়াতের বিষয়টি কেবল মুসা নবির জামানার জন্য প্রযোজ্য নহে, বরং সর্বযুগেই প্রযোজ্য বলে মনে করতে চাই।

৮৬. উলাইকা (তাহারা সবাই) আল্লাজিনা (যাহারা) ইস্তারাউ (কিনিয়া লইয়াছে) হায়াত (হায়াতকে, জীবনকে) দুনিয়া (দুনিয়া) বিন আখিরাতি (আখেরাতের বিনিময়ে) ফালা (সুতরাং না) ইউখাফুকাহ (হালকা করা হইবে না, কম করা হইবে না, সহজ করা হইবে না) আনহমুল (তাহাদের হইতে) আজাব (আজাব, শাস্তি) ওয়া (এবং) লা (না) ইম (তাহারা) ইউন্সালুন (সাহায্য পাওয়া)।

□□ওইসব লোক যাহারা কিনিয়া লইয়াছে দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের বিনিময়ে সুতরাং হালকা করা হইবে না তাহাদের হইতে শাস্তি এবং তাহারা সাহায্য পাইবে না।

৮৭. ওয়া (এবং) লাকাদ (নিশ্চয়ই) আতাইনা (আমরা দান করিয়াছি) মুসা (মুসাকে) কিতাবা (কিতাব) ওয়া (এবং) কাফকাইনা (ধারাবাহিকভাবে) আমরা পাঠাইয়াছি, পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠাইয়াছি) মিম্বাদি (তাহার পরে) বিরকসুলি (রসুলকে)।

□□ এবং নিশ্চয়ই মুসাকে আমরা কিতাব দিয়াছি এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা পাঠাইয়াছি তাহার পরে রসুলদেরকে।

+ ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনে (পুত্র) মারিয়ামা (মরিয়মের) বাইয়িনাতি (উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ, সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি) বিরহিনকুদুস (রুহুল কুদুস)।

□□ এবং ইসা ইবনে মরিয়মকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং রুহুল কুদুস দিয়া তাহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি।

+ আফাকুললামা (সূতরাং যখনই কি) জাআকুম (তোমাদের কাছে আসিয়াছে) রাসুলুম (কোনো রসুল) বিম্মা (তাহা দিয়া) না (না) তাহওয়া (পছন্দ করে) আনফসুকুম (তোমাদের নফস) ইস্তাক্বার (অহংকার করিয়াছে) তুম (তোমরা)।

□□ সূতরাং যখনই তোমাদের কাছে আসিয়াছেন কোনো রসুল তাহা নিয়া যাহা তোমাদের নফস পছন্দ করে না, তোমরা কি অহংকার কর নাহি?

+ ফাফারিকান (সূতরাং কতককে) কাজ্জাবতুম (তোমরা অস্বীকার করিয়াছ) ওয়া (এবং) ফারিকান (কতককে) তাকতুন (তোমরা হত্যা করিয়াছ)।

□□ সূতরাং তোমরা কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে তোমরা হত্যা করিয়াছ।

□ এই আয়াতে মরিয়মের পুত্র ইসাকে রুহুল কুদুস দিয়া সাহায্য করার কথাটি বলা হয়েছে। সূতরাং ইহাঁর কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি, কারণ অনেকেই কোনো কিছু চিন্তাভাবনা না করেই রুহুল কুদুস বলতে ফেরেশতা জিবরাইলের কথাটি বলে থাকেন। এরা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই জিবরাইল ফেরেশতার নামটি উল্লেখ করে তপ্তির হাসি হাসে এবং চোখেমুখে জ্ঞান গিজগিজ করার দৃশ্যটি ফটে ওঠে। একবার সামান্য চিন্তাও করে না যে ফেরেশতাদেরকে কোনো নফস এবং কোনো রুহ - দুইটির একটিও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতার আলাহর সেফাতি নুরের তৈরি তথা আলাহর গুণবাচক নুরের তৈরি। ফেরেশতার যদি জ্ঞাত নুরেরই তৈরি হতো তাহলে সিদরাতুল মুনতাহা এসে জিবরাইল ফেরেশতা খেঙ্গে যেত না, কারণ সেফাতি নুরের লী-মোকামে প্রবেশ করার বিধানটি রাখা হয় নি। পা বাড়ালেই সঙ্গে-সঙ্গে জুলে-পুড়ে হারখার হয়ে যেত। অথচ মহানবি সেই লী-মোকামে আলাহর রহমতে প্রবেশ করলেন দুই ধনুকুর ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে। অর্থাৎ একটি ধনুক একটি অর্ধবৃত্ত, দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি অর্ধবৃত্ত সমান-সমান একটি পূর্ণ বৃত্ত। সূতরাং দুইটি অর্ধবৃত্ত দ্বারা যদি একটি বৃত্ত হবার সামান্য ফাক-ফোকর থেকে যায় তাই কোরান ফাক-ফোকরের কথাটির অবসান ঘটিয়ে বলছে 'আও আদনা' - অর্থাৎ আরও নিকটে। সূতরাং বৃত্তের প্রকাশিত স্থানটিকে বলা হয় নুরে মোহাম্মদ এবং অপ্রকাশিত স্থানটির নাম হলো আলাহ। তাই জগতের সমস্ত বড়-বড় ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে থাকেন : দুজনের চেহারা তো একই, কার্কে খোদা বলব? আমার এই ব্যাখ্যাটিতে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা শরীফে পেট্রোলে আগুন ধরানোর মতো চিংকারে প্রতিবাদ শুরু করে দেবে। গোজামিলের একবস্তা এইটা-সেইটা বলে মহানবিকে কেবল সাধারণ মানুষই বলবে না, বরং বলবে : মহানবি মাটির তৈরি। ওহাবিদের শত দলিল দিয়ে বোঝালেও বুঝতে চাইবে না। কেন?

ইহাই ওহাবিদের তকদির। ঢোড়া সাপের সামনে অনেক বীণ বাজালেও ঢোড়া সাপ ফণা তুলতে জানে না। ইহাতে ঢোড়া সাপের মোটেই কোনো দোষ নাই। কেন নাই? কারণ ঢোড়া সাপকে আল্লাহ জন্মের আগেই কপালে ফণা তুলবার বিধানটি লিখে দেন নি। ফণা নাই, সুতরাং ফণা তুলবে কী করে? ওহাবিদের বুঝবার ক্ষমতাটি দেওয়া হয় নি, সুতরাং বুঝবে কী করে? সুতরাং চরম পর্যায়ে ওহাবিদের গালি দিতে নাই। আল্লাহর হাতে ওহাবিদেরকে সোপান করাই শ্রেয় বলে জগতের ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে গেছেন। তাছাড়া ওহাবিরা আছে বলেই তো এত কেরকার বৈচিত্র্য আমরা এক ইসলামের ভেতর দেখতে পাই। যে-ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি সেই ফেরেশতা কী করে রুহল কুদ্দুস হয় ইহা ভাবতেও কষ্ট হয় এবং অবাক হই। জিন এবং মানুষ ছাড়া আমাদের জানা মতে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্ট জীবদেরকে কেবলমাত্র নফসটি দেওয়া হয়েছে তথা প্রাণটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিন এবং ইনসানকেই নফসের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে রুহকে তথা আল্লাহর হুকুমকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, বড়-বড় প্রাণীরা পাক করে খেতে জানে না। মানুষের নফসের সঙ্গে যেহেতু রুহের অবস্থানটি আছে তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। ফেরেশতার কখনই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নয়। ফেরেশতারী যতই শক্তিশালী হোক না কেন এবং যত বড়ই ক্ষমতা থাকে না কেন ভালোমন্দ করার কোনো এখতিয়ার নাই। স্বাধীনতা থাকলেই ভালোমন্দ করার প্রশ্নটি আসে। যেহেতু ফেরেশতাদের নফস এবং রুহ একটিও নাই সেই হেতু স্বাধীনতাও নাই। এক কথায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ জালাশানাহর আদেশ-নিষেধ পালন করার রোবট বলা যায়। এই রোবটদের নিয়ে যখন আদম সত্ত্বানেরা ফেরেশতাদের মাথায় তুলে নিয়ে ধেই-ধেই করে নাচতে থাকে এবং হিয়াহিয়া বলে জাহির করতে থাকে তখন এতিমের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি আর ভাবি, এদের মাথায় কত জ্ঞান গিজগিজ করে। সুতরাং হজরত ইসা (আ.) -কে রুহল কুদ্দুস দিয়ে সাহায্য করার কথাটি বুঝতে না পেরে জিবরাইল ফেরেশতাকে টেনে এনে সাহায্য করার দৃশ্যটি দেখতে পাই।

৮৮. ওয়া (এবং) কানু (বলিয়াছিল) কলুবনা (আমাদের কলবগুলি) ওলফন (আচ্ছাদিত, সুরক্ষিত, আবৃত, ওই জিনিস যাহা গেলাপের মধ্যে বদ্ধ থাকে, রক্ষিত স্থান)।

এবং তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের কলবগুলি আবৃত।

+ বালু (বরং) লাআনাহমুল্লা (আল্লাহ তাহাদেরকে লানত করিয়াছেন) বিকফরিহিম (তাহাদের কুফরির সহিত) ফাকালিলান (সুতরাং কম) মা (যাহারা) ইউমিনুন (ইমান আনে)।

বরং আল্লাহ তাহাদেরকে লানত করিয়াছেন তাহাদের কুফরির কারণে সুতরাং কম (লৌকই) যাহারা ইমান আনে।

৮৯. ওয়া (এবং) লাম্মা (যখন) জাআ (আসিয়াছে) হম (তাহাদের কাছে) কিতাবুম (কিতাব) মিন (হইতে) ইনদিল (নিকটে) -লাহে (আল্লাহর) মুসাদ্দিকুন (সত্য বলিয়া স্বীকৃতিদাতা, সত্যবাদীর সমর্থনকারী) লিমা (যাহা) মাআহিম (তাহাদের সহিত আছে)।

এবং যখন তাহাদের কাছে আল্লাহর নিকট হইতে কিতাব আসিয়াছে সত্য বলিয়া স্বীকৃতিদাতা যাহা তাহাদের সহিত আছে।

+ ওয়া (এবং) কানু (ছিল) মিনকাবল (পূর্ব হইতে) ইয়াস্‌তাফতিহনা (বিজয় চাহিত) আলা (উপর) -ল্লাজিনী (যাহারা) কাফার (কুফরি করিয়াছে)।

এবং পূর্ব হইতে কাফেরদের উপর তাহারা বিজয় চাহিত।

+ ফালামমা (সূতরাং যখন) জাআ (আসিল) হম (তাহাদের) মা (যাহা) আরাফ (তাহারা চিনিত) কাফারুবিহি (উহার সহিত কফারি করিল) ফালানিতলাহি (সূতরাং আল্লাহর লানৎ) আলানকাফিরিনা (কাফেরদের)।
 সূতরাং যখন তাহাদের কাছে আসিল যাহা তাহারা চিনিত তাহা অস্বীকার করিল সূতরাং আল্লাহর অভিশাপ কাফেরদের উপর।

৯০. বিসামা (উহা কতই নিকুর্ফ/জঘন্য/নীচ/অপকুর্ফ) ইশতারাও (তাহারা কিনিয়াছে, তাহারা ক্রয় করিয়াছে) বিহি (বিনিময়ে) আনফুসাহম (তাহাদের নফস) আইইয়াকফুক (কফরি করে) বিমা (যাহা) আন্জানা (নাঙ্গেল করিয়াছেন) হ (আল্লাহ) বাগ্‌ইয়ান (বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ) আন (যে) ইউনাঙ্গিল্লাহ (আল্লাহ নাঙ্গেল করিয়াছেন) মিন্‌ফাদলিহি (তাহার ফজল হইতে) আলা (উপর) মান (যাহাকে) ইয়াশাউ (তিনি আল্লাহ চান) মিন (হইতে) ইবাদিহি (তাহার বান্দাদের)।

উহা কতই না নিকুর্ফ যাহা তাহারা তাহাদের নফসের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছে, (তাহারা) বিরোধিতা করিত (এই জন্ম) যে আল্লাহ নাঙ্গেল করিয়াছেন তাহার ফজল হইতে যাহার উপর তিনি ইচ্ছা করেন তাহার বান্দাদের মধ্যে হইতে।

+ ফাবাউ (সূতরাং তাহারা ঘেরাও-করা অবস্থায় আছে) বিগাদাবিন্ (গজবের সহিত) আলা গাদাবিন্ (গজবের উপর) ওয়া (এবং)।

সূতরাং তাহারা আল্লাহর গজবের উপর গজবের পাত্র হইল।

+ ওয়া (এবং) লিল্‌কাফেরিনা (কাফেরদের জন্য রহিয়াছে) আজাবুন (আজাব, শাস্তি) মুহিন্ (অবমাননাকর, অপমানকর, লাঞ্ছনাদায়ক, ভয়াবহ, মূল্যহীন করিয়া দেওয়া)।

এবং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক আজাব।

এই আয়াতে আজাব, গজব, শাস্তি, লাঞ্ছনা, অপমান - এতগুলো শব্দ তাদের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে যারা নিজেদের নফসের বিনিময়ে কুফরিকে কিনে নিয়েছে। এই কুফরিটি কি বাহিরে দেখা যায়? এই কুফরিটি কি অর্থের দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে নাকি নফসের বিনিময়ে খরিদ করা হয়েছে? এই কুফরি নফসের দ্বারাই ক্রয় করা হয় এবং ইহাই ক্রয় করার বিধান। এখন প্রশ্ন হলো, নফসের মধ্যে কী এমন আছে যাহার দ্বারা কুফরি ক্রয় করা যায়? ওই পুরনো একই কথা, ওই পুরনো একই সুর, ওই পুরনো একই চুঙ আর তা হলো: নফসের সহিত যে খান্নাসিরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে সেই শয়তানের লীলাখেলাটিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দান করা। এই শয়তানকে যারা আল্লাহর ফজলের সহিত আপন-আপন নফস হতে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে সফলকাম হয়েছেন তারাই তওহিদের মধ্যে বাস করেন। মুখে-মুখে তওহিদের কথা বললেই তওহিদে বাস করা যায় না। তওহিদে বাস করতে হলে আল্লাহর দেওয়া কোরান-এর অনুশাসনমতো ধ্যানসাধনা করতে হয়। 'আউজুবিলাহি মিনাশ শাইতোয়ানুর রাজিম' - তথা, 'পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই' মুখে শতবার পড়লেও শয়তান হতে মুক্ত হওয়া যায় না। শয়তান হতে মুক্ত হতে হলে আল্লাহর দেওয়া কোরান-হাদিস-এর অনুশাসনে আপন-আপন নফসকে শাসন করতে হয় এবং যারা এই অনুশাসনের মাধ্যমে শয়তান হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর বান্দাতে পরিণত হতে পেরেছেন সেই বান্দাদের পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হয়। আল্লাহর এই বান্দাদেরকেই মুরশিদ, দূয়াল, পীর বলা হয় এবং যারা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগমন করে তাদেরকেই মুরিদ বলা হয়। সূতরাং এই রকম পীর ও মুরশিদ বিহনে আপন-আপন নফস হতে শয়তানটিকে তথা 'আমিত'-টিকে তাড়ানো অসম্ভব। মুখে শতবার শয়তান হতে আশ্রয় চাইলেও যে রকম আশ্রয় পাওয়া যায় না তদ্রূপ এই রকম পীর ও মুরশিদ ছাড়া আপন নফস হতে শয়তানকে তাড়ানোও যায়

না। আগেই বলা হয়েছে যে, একই বিষয় বারবার অনেক রকম মেসাল দিয়ে বলা হচ্ছে। কেউ এই বিষয়টি বুঝতে পারে, ধরতে পারে - আবার অনেকেই বুঝতেও পারে না, ধরতেও পারে না।

৯১. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) কিনা (বলা হয়) লাহম (তাহাদেরকে) আমিন (ইমান আনো) বিমা (যাহা) আনজাল্লাহ (আল্লাহ নাজেল করিয়াছেন) কাল (তাহারা বলে), নুমিন (আমরা ইমান আনিব) বিমা (যাহা) উনজিলা (নাজেল করা হইয়াছে) আলিইনা (আমাদের উপর) ওয়া (এবং) ইয়াকফরনা (তাহারা কুফর করে) বিমা (যাহা) ওয়ারাআহ (আগে অথবা পিছনে)।

এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যাহা নাজেল করিয়াছেন (উহাতে) ইমান আনয়ন (করিতে) তাহারা বলে, আমরা ইমান আনিয়াছি যাহা আমাদের উপর নাজেল করা হইয়াছে এবং পিছনে যাহা তাহারা অস্বীকার করে।

+ ওয়া (এবং) হয়া (সেইটাই) হাকক (সত্য) মুসাদ্দিকান (সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দেয়) মাআহম (তাহাদের সহিত)।

তাহাদের সহিত যাহা (আছে) সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দেয় এবং সেইটাই সত্য।

+ কল (বলো) ফালিমা (সুতরাং কেন) তাকতলুনা (তোমরা কতল করিয়াছ) আমবিআল্লাহে (আল্লাহর নবিদেরকে) মিনকাবল (পূর্ব হইতে) ইন (যদি) কনতুম (তোমরা হইয়া থাকো) মুমিনিন (মোমিন)।

বলো, আল্লাহর নবিদেরকে সুতরাং কেন তোমরা কতল করিয়াছ পূর্ব হইতে, যদি তোমরা মোমিন (হইয়া থাকো)।

৯২. ওয়া (এবং) লাকাদ (নিশ্চয়ই) জাআকুম (তোমাদের কাছে আসিয়াছিল) মুসা (মুসা) বিন্বাইয়িনাতি (পরিষ্কার নিদর্শনসমূহের সহিত) সম্মা (তারপর) ইততাখাজ (গ্রহণ করিয়াছিল) তম (তোমরা) ইজলা (গরুর বাহুর) মিম্বাদি (তাহার পরে) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা ছিলে) জালিমুন (জালেম)।

এবং নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছিল মুসা পরিষ্কার নিদর্শনের সহিত তারপর তোমরা গরুর বাহুরকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে এবং তোমরাই ছিলে জালেম।

৯৩. ওয়া (এবং) ইজ (যখন) আখাজনা (আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম) মিসাকাকুম (তোমাদের ওয়াদা, অস্বীকার, প্রতিশ্রুতি) ওয়া (এবং) রাকানা (উঠাইয়াছিলাম) ফাওকাকুম (তোমাদের উপর) তরা (তর)।

এবং যখন আমরা গ্রহণ করিলাম তোমাদের ওয়াদা এবং তোমাদের উপর তর উঠাইয়াছিলাম।

+ খজ (তোমরা ধরো) মা (যাহা) আতাইনাকুম (তোমাদেরকে আমরা দিয়াছি) বিকুয়াতিন (সত্যভাবে) ওয়াসমাউন (এবং শোনো)।

তোমরা ধরো শক্তভাবে এবং তোমরা শোনো যাহা তোমাদেরকে আমরা দিয়াছি।

+ কাল (বলিল) সামিনা (আমরা শুনিলাম) ওয়া (এবং) আসাইনা (আমরা অমান্য করিলাম)।

বলিল, আমরা শুনিলাম এবং আমরা অমান্য করিলাম।

+ ওয়া (এবং) উসরিব (পান করো) ফি (মধ্যে) কলবিহিম (তাহাদের কলবগুলির) ইজলা (গরুর বাহুর : অতিরিক্ত চঞ্চল মনকে গরুর বাহুর বলা হয় এই জন্য যে গরুর বাহুর অকারণে এইদিক-সেইদিক দোঁড়াদোঁড়ি করে) বিকুফরিহিম (তাহাদের কুফরির কারণে)।

□□এবং পান করো তাহাদের কলবগুলির মধ্যে তাহাদের বাহুর (পূজার) কুফরির কারণে।

+ কুল (বলো) বিসাম্মা (কতই না নিকৃষ্ট) ইয়াম্বুকুম (তোমাদের নির্দেশ দেয়) বিহি (তাহার সঙ্গে) ইমানুকুম (তোমাদের ইমান) ইন্ (যদি) কুনতুম (তোমরা হইয়া থাকো) মুমিনিন্ (মোমিন)।

□□যদি তোমরা ইমান আনিয়া থাকো তাহার সঙ্গে উহা কতই না নিকৃষ্ট যাহা তোমাদেরকে নির্দেশ করে। যদি তোমরা মোমিন হইতে।

□ এই আয়াতের সব কয়টি উপদেশই রূপক ভাষায় বলা হয়েছে। আমরা তর বলতে পাহাড় বুঝি কিন্তু আল্লাহ তরের সঙ্গে পাহাড় শব্দটি যোগ করে বলেন নি। তারপর আল্লাহ বলেছেন, আমরা যাহা তোমাদেরকে দান করলাম উহা কখনই শিথিলভাবে ধরতে যেয়ো না, কারণ শৈথিল্য অমনোযোগী করে। তাই আমাদের দান তোমরা শক্তভাবে তথা দৃঢ় মনোবল নিয়ে ধরতে চেষ্টা করো এবং যদি দৃঢ়ভাবে ধরতে পারো তাহলে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে না। অবশ্য আমার দানের কথা শোনার পর তোমরা বললে যে আমরা গুনলাম এবং আমরা অমান্য করলাম। তোমাদের মনের মধ্যে যে ভীষণ চঞ্চলতা তোমাদের মনকে সব সময় এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করায়, সেই মনোচঞ্চল্যের বাহুরটিকে ভালোবাসার কারণে তোমরা জ্বলন্ত কুফরি করে চলছো। গরুর বাহুর যেমন অকারণে ছোটাছুটি করে এবং লাফাতে থাকে সেই রকম তোমাদের মনগুলোও বাহুরের মতো ছোটাছুটি করে। তাই পরিশেষে বলা হচ্ছে যে, বলো, যদি তোমরা ইমান এনে থাকো, সেই ইমান খুবই হালকা-পাতলা ইমান এবং সেই ইমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই পরিশেষে আল্লাহ আফসোসের ভাষায় বলছেন যে, যদি তোমরা বাহুর-পূজা পরিত্যাগ করে মোমিন হতে পারতে।

এই আয়াতের তফসিরটি শাহ সুফি সদর উদ্দিন চিশতি তাঁর কোরান দর্শন নামক তফসিরে এতই সুন্দর করে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে যারা চিন্তাশীল পাঠক তাদেরকে উনার রচিত তফসিরটি পড়তে অনুরোধ করছি।

৯৪. কুল (বলো) ইন্ (যদি) কানাত (হয়) লাকুম (তোমাদের জন্য) দারুল (ঘর) আখিরাত (পরবর্তী জীবনকাল, আখেরাত) ইন্দা (নিকটে, কাছে) লাহে (আল্লাহ) খালিসাতান (খালেস, খাঁটি) মিন্দুনি (ব্যতীত) নাসি (মানুষ) ফাতামান্নাত (সুতরাং তোমরা কামনা করো) মৃত্যু (মৃত্যু) ইন্ (যদি) কুনতুম (তোমরা হইয়া থাকো) সোয়াদিকিন (সত্যবাদী)।

□□বলো, তোমাদের জন্য আখেরাতের ঘর হয় আল্লাহর কাছে খালেসভাবে মানুষের কাছে (চাওয়া) ছাড়া সুতরাং তোমরা কামনা করো মৃত্যু যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

□ এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, যদি তোমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য ঘর পাবার আশা করো তাহলে খালেস নিযুতে চাও। এক কথায়, আল্লাহর কাছে যদি খালেস নিযুতে আখেরাতের ঘরটি কোনো মানুষ ব্যতীত আল্লাহর কাছে চাও তাহলে তোমরা মরার আগে মরে যাও। এই মরার আগে মরে যাবার বিষয়টি আশ্চর্যকভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে হয়। তাই পরিশেষে আল্লাহ বলছেন যে যদি তোমরা সত্যিই সাদেক হয়ে থাকো তথা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মরার আগে মরে যাবার সাধনাটি করো।

৯৫. ওয়া (এবং) লান (না) ইয়াতামান্নাহ (তাহারা তাহা কামনা করিবে) বিম্মা (যাহা) কাদুদাম্মাত (আগে পাঠাইয়াছে) আইদিহিম (তাহাদের হাত)।

□□এবং কখনই তাহারা তাহা কামনা করে না যাহা তাহাদের হাতে আগে পাঠানো হইয়াছে।

+ ওয়াল্লাহ (এবং আল্লাহ) আলিমুন (অবহিত, জ্ঞানেন) বিজ্জোয়ালিমিন (জালেমদের সম্পর্কে)

□□এবং আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে অবগত আছেন।

৯৬. ওয়া (এবং) লাভাজ্জিদা (অবশ্যই তোমরা) নাহম্ (তাহাদেরকে পাইবে) আহ্বাসান্ (অনেক লোভী) নাসি (মানুষদের মধ্যে) আলা (উপর) হায়াতিন্ (জীবনের)।

□□এবং অবশ্যই তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেক লোভী তাহাদেরকে পাইবে জীবনের উপর।

+ ওয়া (এবং) মিনাল্ (হইতে, চাইতেও) লাজ্জিনা (যাহারা) আশ্বরাকু (শেরেক করে)।

□□এবং যাহারা শেরেক করে তাহাদের চাইতেও।

+ ইয়াওয়াদ্দু (চায়) আহাদুহম্ (তাহাদের প্রত্যেকে) লাও (যদি) ইউআম্মারু (বয়স দেওয়া হইত, জীবন দেওয়া হইত, আয়ু দেওয়া হইত) আলফা (এক হাজার) সানাতিন্ (বছর)।

□□তাহাদের প্রত্যেকে চায় যদি এক হাজার বছর আয়ু দেওয়া হইত।

+ ওয়া (এবং) মা (না) হয় (তাহা) বিমুজ্জাহ্ (পারিবে) জিহিহি (তাহাকে তলাইতে) মিনাল্ (হইতে) আজ্জাবি (আজীব) আই (এই যে) ইউআম্মারা (বয়স দেওয়া হইলেও)।

□□এবং তাহা তাহাকে আজীব হইতে তলাইতে পারিবে না এই যে বয়স দেওয়া হইলেও।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ্ (আল্লাহ) বাসিরুন্ (দেখেন) বিম্মা (যাহা) ইয়াম্মালুনা (তাহারা করিয়াছে)।

□□এবং আল্লাহ দেখেন যাহা তাহারা করিয়াছে।

□ প্রথমেই বলতে চাই, এই দুনিয়াতে প্রায় অধিকাংশ মানুষই অনেক দিন বেঁচে থাকতে চায়। আল্লাহ এই কথাটি এতই খোলাসা করে বলেছেন যে, যারা শেরেক করে তথা কবিরার গুনাহর কাজ করে তাদের চেয়েও বেশি হায়াত পাবার আকাঙ্ক্ষা করে। একমাত্র আল্লাহর ওলিদের ছাড়া অনেক দিন বেঁচে থাকার মোহটি কমবেশি সবার মধ্যেই দেখতে পাই। তাই অমার্জনীয় অপরাধ শেরেক যারা করে তাদের চেয়েও বেশি লোভী হয়ে যায় বেশিদিন বেঁচে থাকার অদম্য আশায়। দুনিয়ার সব মানুষই দেশের ভিতরে অবস্থান করে, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ওলিরা দেশের ভিতর বাস করেন না, বরং আল্লাহর ওলিরা দেশের বাহিরে অবস্থান করেন বলেই তারা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যদি মানুষকে একটি হাজার বছর জীবিত থাকার কথা বলা হতো তবু তারা আজীবের মধ্যেই ভুবে থাকতো তথা মোহমায়ার জালে আটকা পড়ে থাকতো এবং মুক্তি পাবার কথাটি একবার চিন্তাও করতো না। দুনিয়ার লোভ ও মোহের সূতাপ্তিলো এতই শক্ত যে মুক্তির দর্শনের আত্মানটি কীনে ও হৃদয়ে প্রবেশ এবং আঘাত করতে পারে না। ইহা তাদের তকদির কিনা জানি না, তবে আল্লাহ কর্তক যে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দেওয়া হয়েছে সেই স্বাধীনতার বলয় হতে স্বেচ্ছায় মুক্তির দর্শনটিকে তারা আলিঙ্গন করতে চায় না। এটাই বিশ্ব অতি সাধারণ একটি বিধান। মুক্তির কথাটি জেনে ও বুঝে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। কী ভয়ংকর সত্য এই দুনিয়ার মোহমায়ার বাধন। জানে - হেরে যাচ্ছি, জানে - আজীবের লাঞ্জনীয় ভুবে যেতে হবে, তবু জেনেপুনে দুনিয়ার মোহমায়ার বিষ পান করে যায়। তাই আল্লাহ পরিশেষে খোলাসা করে বলেই দিলেন যে, তাদের কাজকর্ম, তাদের কীর্তিকলাপ সবই তো আল্লাহর জানা।

৯৭. কল (বলো) মান্ (যে) কানা (হয়) আদুওয়ানু (শত্রু, দুশমন) লিজিবরিলী (জিবরাইলের জন্য) ফাইনুনাহ্ (সুতরাং নিশ্চয়ই সে) নাজ্জালাহ্ (তাহা নাজেল করিয়াছে) আলা (উপর) কালবেকা (তোমার কলবে)

বেইজ্জিন্লাহি (আল্লাহর হুকমে/নির্দেশে/অনুমতিক্রমে) মুসাদ্দিকান (সত্য বলিয়া স্বীকৃতিদাতা, সত্যবাদী-সমর্থনকারী) লিমা (যাহা) বাইনা (মধ্যে) ইয়াদাইহি (তোমার হাতের) ওয়া (এবং) হদান (হেদায়েত) ওয়া (এবং) বুশরা (সুসংবাদ) লিন (জন্য) মুমিনিনা (মোমিনদের)।

বলো, যে হয় জিবরাইলের শত্রু সূতরাং নিশ্চয়ই সে তাহা নাজিল করিয়াছে তোমার কলবের উপর আল্লাহর হুকমে, সত্য বলিয়া স্বীকৃতিদাতা - যাহা তোমার হাতের মধ্যে এবং হেদায়েত এবং মোমিনদের জন্য সুসংবাদ।

এই আয়াতটির সাধারণ ব্যাখ্যাগুলো যারা করেছেন তাদের ব্যাখ্যায় উহাকে একটি কালের গণ্ডির মধ্যে আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি সব রকম বন্ধনমুক্ত। তবে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি সবচাইতে সুন্দর করে দিয়েছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর কোরান দর্শন নামক তফসির গ্রন্থে। জীববার প্রচণ্ড আগ্রহ যেসব পাঠকদের, তারা যেন উনার তফসিরটি পড়ে দেখেন। বিশ্ববিখ্যাত সুফিসাধক মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি তাঁর রচিত অমর গ্রন্থ ফুতহাতে মক্কিয়া-তে বলেছেন, যে প্রাচীন কালের মোম্মাছি এবং মধ্যযুগের মোম্মাছি এবং আজকের যুগের মোম্মাছি এবং অনাগত কালের মোম্মাছি মধুর চাক বানিয়েই যাবে।

৯৮. মানু (যে) আদুওয়ান (শত্রু) লিল্লাহি (আল্লাহর) ওয়া (এবং) মালাইকাতিহি (তাঁহার ফেরেশতাদের) ওয়া (এবং) রসুলিহি (তাঁর রসুলদের) ওয়া (এবং) জিবরীলা (জিবরাইলের) ওয়া (এবং) মিকালা (মিকাইলের) ফাইন্বালাহা (সূতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ) আদুউন (শত্রু) লিলকাফেরিনা (কাফেরদের জন্য)।

যে আল্লাহর শত্রু হয় এবং তাঁর ফেরেশতাদের এবং তাঁর রসুলদের এবং জিবরাইলের এবং মিকাইলের, সূতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য শত্রু।

এই আয়াতের বিষয়ে কিছু লেখার আগে স্মরণ করতে চাই, ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন যে, তুমি মাত্র একটি দরজার যদি উপযুক্ত হতে পারো তাহলে দেখতে পাবে সব রকম দরজাগুলো তোমার জন্য খোলা আছে। আবার পরকালে যদি একটি দরজায় উপযুক্ত হতে পারলে না, তাহলে দেখতে পাবে সব দরজার জন্যই তুমি অনুপযুক্ত। এই আয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু সে ফেরেশতাদেরও শত্রু এবং রসুলদেরও শত্রু এবং জিবরাইল ও মিকাইলেরও শত্রু।

৯৯. ওয়া (এবং) লাকাদ (নিশ্চয়ই) আনজালনা (আমরা নাজিল করিয়াছি) ইলাইকা (তোমার উপর) আয়াতিম্ (আয়াতসমূহ) বাইয়েনাতিন্ (সুস্পষ্ট) ওয়া (এবং) মা (না) ইয়াকফরুন্ (কুফরি করে) বিহা (ইহার সাথে) ইল্লা (ব্যতীত, ছাড়া, একমাত্র) ফাসিকুনা (ফাসেকরা)।

এবং নিশ্চয়ই তোমার উপর আমরা নাজিল করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং কুফরি করে না ইহার সাথে ফাসেকেরা ছাড়া।

১০০. আওয়া (এমন নয় কি, তবে কি) কুল্লামা (যখনই) আহাদু (তাহারা ওয়াদা করিয়াছে) আহদানু (কোনো ওয়াদা) নাবাজাহু (তাহা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিয়াছে) ফারিকুন্ (একদল) মিনহম্ (তাহাদের মধ্য হইতে) বাল্ (বরং) আক্সারুহম্ (তাহাদের অধিকাংশ) লা (না) ইউমিনুনা (ইমান আনে না)।

তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকার করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে একদল অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, বরং তাহাদের বেশিরভাগ ইমান আনে না।

১০১. ওয়া (এবং) লাম্মা (যখন) যাত্মা (কাছে আসিয়াছে, নিকটে আসিয়াছে) হম্ (তাহাদের) রাসুলুন্ (কোনো রসুল) মিন (হইতে) ইন্দাল্লাহ

(আল্লাহর নিকট) মুসাদ্দিকুন (সত্যবাদীর সমর্থনকারী) লিমা (যাহা) মারীহম (তাহাদের সাথে) নাবাজা (নিষ্কপ করা, ছুড়িয়া ফেলা) ফারিকুন (একদল) মিনাল্লাজিনা (যাহাদের মধ্যে) উতুন (দেওয়া হইয়াছে) কিতাব (কেতাব)।

এবং যখন কোনো রসুল তাহাদের কাছে আসিয়াছে আল্লাহর তরফ হইতে সমর্থক যাহা তাহাদের সাথে (আছে) যাহাদের কেতাব দেওয়া হইয়াছে (তাহাদের) মধ্য হইতে একদল ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে (কেতাব)।

+ কিতাবলাহি (আল্লাহর কেতাব) ওয়ারাআ (পিছনে) জুরি (পিঠের) হিম (তাহাদের) কাআনুনাহম (তাহারা যেন) লা (না) ইয়ালান্ন (জ্ঞানে)।

তাহাদের পিঠের পিছনে আল্লাহর কেতাব তাহারা যেন জ্ঞানেই না।

১০২. ওয়াততাবাউ (এবং তাহারা অনুসরণ করিত) মা (যাহা) তাতনুস (তেলাওয়াত করিত) শাইয়াতিনু (শয়তানগণ) আলা (উপরে) মুলকি (রাজত্বে) সোলায়মানা (সোলায়মানের)।

এবং তাহারা অনুসরণ করিত যাহা শয়তানেরা তেলাওয়াত করিত সোলায়মানের রাজত্বের উপর।

+ ওয়া (এবং) মা (না) কাফারা (কুফরি) সোলায়মান (সোলায়মান) ওয়ালাকিন (কিন্তু) শায়াতিনা (শয়তানেরা) কাফারু (কুফরি করিয়াছিল) ইউআল্লিমুনা (শিখাইত) নাসা (মানুষদেরকে) সিহরা (জাদু)।

এবং সোলায়মান কুফরি করেন নাই, কিন্তু কুফরি করিয়াছিল শয়তানেরা, মানুষদেরকে শিখাইত জাদু।

+ ওয়া (এবং) মা (যাহা) উনজিলা (নাজেল করা হইয়াছিল) আলা (উপরে) মালাকাইনে (দুই ফেরেশতা) বিবাবিলা (বাবেলে) হারুতা (হারুত) ওয়া (এবং) মারুতা (মারুত)।

এবং যাহা নাজেল করা হইয়াছিল হারুত এবং মারুত (নামক) দুই ফেরেশতার উপর বাবেল (শহরে)।

+ ওয়া (এবং) মা (না) ইউআল্লিমুনা (দুইজন শিখাইয়াছে) মিন (হইতে) আহাদিন (কাউকে) হারুতা (যতক্ষণ না) ইয়াকুলা (দুইজন বলিয়াছে) ইননামা (নিশ্চয়ই) নাহ্নু (আমরা) ফিতনাউন (ফিতনা) ফালা (সুতরাং না) তাকফ (কুফরি করিও)।

এবং দুইজনে শিখায় নাই কাহাকেও যতক্ষণ না দুইজন বলিয়াছে নিশ্চয়ই আমরা ফিতনা, সুতরাং কুফরি করিও না।

+ ফাইয়াতাল্লামুনা (সুতরাং তাহারা শিক্ষাগ্রহণ করিত) মিনহমা (তাহাদের দুইজন হইতে) মা (যাহা) ইউফারিকুন (তাহারা ফারেক [পৃথক, বিচ্ছেদ] করিত) বিহি (ইহা দিয়া) বাইনান (মধ্যে) মারএ (পুরুষের) ওয়া (এবং) জাওজিহি (তাহার ম্মীর)।

সুতরাং তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিত তাহাদের দুইজন হইতে যাহা তাহারা পৃথক করিত ইহা দিয়া তাহার ম্মী এবং পুরুষের (ম্মী) মাঝে।

+ ওয়া (এবং) মা (না) হম (তাহারা) বিদারবিনা (ক্লতি করিতে পারিত) বিহি (ইহার দ্বারা) মিন (হইতে) আহাদিন (কাহারও) ইন্না (ব্যতীত, একমাত্র, ছাড়া) বিইজ্জিল্লাহি (আল্লাহর হুকুম)।

এবং তাহারা ইহার দ্বারা ক্লতি করিতে পারিত না কাহাকেও আল্লাহর হুকুম ছাড়া।

+ ওয়া (এবং) ইয়াতাল্লামুনা (তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিত) মা (যাহা) ইয়াদুর (ক্লতি করিত) হম (তাহাদের) ওয়া (এবং) লা (না) ইয়ানফাউহম (তাহাদের উপকার করিত)।

□□এবং যাহা তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিত (তাহা) তাহাদেরই কৃতিসাধন করিত এবং তাহাদের উপকার করিত না।

+ ওয়া (এবং) লাকাদ (নিশ্চয়ই) আলিমুন (তাহারা জানিয়াছিল) লামানিশ (অবশ্যই যে কেহ) তাবাহ (তাহা কিনিয়াছিল) মা (নাই) লাহ (তাহার জন্য) ফিল (মধ্যে) আখিরাতি (আখেরাতে) মিন (হইতে) খালাকিন (অংশ)।

□□এবং নিশ্চয়ই তাহারা জানিয়াছিল অবশ্য যে কেহ তাহা ক্রয় করিয়াছিল তাহার জন্য আখেরাতের মধ্যে নাই অংশ হইতে।

+ ওয়া (এবং) লাবিসা (অবশ্যই কত নিকৃষ্ট) মা (যাহা) শাবাও (তাহারা বিক্রয় করে) বিহি (ইহার দ্বারা) আনফসাকুম (তাহাদের নফসের)।

□□এবং অবশ্যই কত নিকৃষ্ট ইহার দ্বারা যাহা তাহারা বিক্রয় করে তাহাদের নফসের।

+ লাও (যদি) কান (হয়) ইয়ালামুনা (তাহারা জানিত)।

□□যদি তাহারা (উহা) জানিত।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লেখা অধম লিখকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বেশ কিছু কোরান-এর তফসির হতে ইহার ব্যাখ্যাটি তুলে দেওয়া যায়, কিন্তু তা করলাম না। এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করেও, অনেক কোরান-এর তফসির ঘেটেও কোনো নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। ইহার বড় কারণটি হলো, ফেরেশতাদের কোনো নফসও নাই, রহও নাই। তাহলে হারুত এবং মারুত নামক দুই ফেরেশতার উপর এইসব জাদুবিদ্যার কথা কেমন করে খাটে তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরতে পারলাম না। ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। তাই এই আয়াতের মর্মার্থই বুঝতে পারলাম না, সুতরাং ব্যাখ্যা দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

১০৩. ওয়া (এবং) লাও (যদি) আননাহম (তাহারা) আমানু (আমান হইত) ওয়া (এবং) তাওতাকাও (তাকওয়া গ্রহণ করিত) লামাসুবাতুন (অবশ্যই সওয়াব লাভ করিত) মিন (হইতে) ইনদিল্লাহে (আল্লাহর নিকট) খায়রুন (উত্তম) লাও (যদি) কান ইয়ালামুনা (তাহারা জানিত)।

□□এবং তাহারা যদি আমান হইত এবং তাকওয়া গ্রহণ করিত আল্লাহর নিকট হইতে উত্তম পুরস্কার অবশ্যই পাইত, যদি তাহারা জানিত।

১০৪. ইয়া আইউহাল (ওহে তোমরা) লাজিনা (যাহারা) আমানু (ইমান আনিয়াছ) লা (না) তাকুন (বলিও না) রায়েনা (বাখাল, বেকুব) ওয়া (এবং) কুন (বলো) উনজুরনা (আমাদের দিকে তাকাও) ওয়াস্মাত (এবং তোমরা শ্রবণ করো) ওয়ালিলকাফেরিনা (এবং কাফেরদের জন্য) আজাবুন (আজাব, শাস্তি) আলিমুন (যত্নাদায়ক, কষ্টদায়ক)।

□□ওহে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা রায়েনা বলিও না এবং তোমরা বলো উনজুরনা এবং তোমরা শ্রবণ করো এবং কাফেরদের জন্য (রহিয়াছে) যত্নাদায়ক আজাব।

১০৫. মা (না) ইয়াওযাদদু (চায়) আললাজিনা (যাহারা) কাফারু (কুফরি করিয়াছে) মিন (হইতে) আহলিল (বাস করে, ধারণ করে) কিতাবি (কিতাবীদের) ওয়া (এবং) লা (না) মুশরিকিনা (মুশরিকদের, শেরেককারীদের) আন (যে) ইউনাজ্জলা (নাঙ্গেল হউক, অবতারণ হউক) আল্লাইকুম (তোমাদের উপর) মিন (হইতে) খাইরিন (কল্যাণ, মঙ্গল) মিন (হইতে) রাব্বিকুম (তোমাদের রবের)।

□□এবং কিতাবিধারীদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরি করিয়াছে (তাহারা) চায় না তোমাদের রবের পক্ষ হইতে (কোনো) কল্যাণ হইতে তোমাদের উপর নাঙ্গেল হউক যে তাহা মুশরিকেরাও (চায়) না।

+ **ওয়ালাহ্** (এবং **আলাহ্**) **ইয়াখতাস্** (বিশেষভাবে মনোনীত করেন)
বিরাহমাতি (তাঁহার রহমতের সহিত) **মাই** (যাহাকে) **ইয়াশাউ** (তিনি চান)।

□□এবং **আলাহ্** তাঁহার রহমতের সহিত বিশেষভাবে মনোনীত করেন যাহাকে তিনি চান।

+ **ওয়ালাহ্** (এবং **আলাহ্**) **জুলফাদলিল্** (ফজিলতের অধিকারী) **আজিম্** (মহান)।

□□এবং **আলাহ্** মহান ফজিলতের অধিকারী।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, **আলাহ্**র কেতাবধারীদের মধ্যেও কাকের এবং মশরিক যারা তারা কখনই চায় না যে তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের উপর কোনো কল্যাণ না জেল হোক। এই কাকের এবং মশরিকেরা বস্তুর বিভবভবের পূজা করে। তাই তারা চায় না যে তোমাদের উপর রবের রহমত বর্ষিত হোক। রবের তথা **আলাহ্**র এই রহমত আধ্যাত্মিক রহমত যাহা স্থল দৃষ্টিতে দেখা যায় না। আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসকে মুক্ত করার ইহাই খাস রহমত, কারণ এই রহমতে বারবার জন্মচক্রের বুকে ঘুরতে হয় না। এই রহমত মুক্তির রহমত, কারণ বন্ধন যত সুন্দরই হোক উহা কখনই রহমত হতে পারে না; কারণ বন্ধন মানুষকে বস্তুর পূজারি বানিয়ে ফেলে, কারণ প্রতিটি নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটি অবস্থান করে উহার প্ররোচনায় বস্তুপ্রীতিতে অন্ধ হয়ে যায় এবং তখনই সে কফরি এবং শেরেকের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য **আলাহ্**র এই রহমত **আলাহ্** যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন। এই যাকে ইচ্ছা তাকে দান করাটির গভীর রহস্য অনেকেই বুঝতে পারে না – তাই উপরে কিছু না বলে মনের ভিতরে **আলাহ্**কে এটাসিটা ভাবতে চায় এবং অনেকে ভাবেও। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা এতই ব্যাপক যে ইহার আলোচনাটি পরে করা হবে।

১০৬ **মা** (যাহা) **নান্সাক্** (আমরা রহিত/বর্জিত/পরিত্যক্ত/বাতিল/রদ/ প্রত্যাহার করি) **মিন্** (হইতে)
আয়াতিন্ (আয়াত) **আও** (অথবা) **নুনসিহা** (উহা আমরা ভুলাইয়া দেই)
নাতি (আমরা আনয়ন করি) **বিখাইরিন্** (উত্তমের সহিত) **মিন্** (উহা হইতে)
আও (অথবা) **মিসলিহা** (উহার অনুরূপ)।

□□আয়াত হইতে যাহা আমরা রহিত করি, অথবা উহা আমরা ভুলাইয়া দেই, উহার চাইতে আমরা আনি উত্তমের সহিত অথবা উহার অনুরূপ।

+ **আলাম্** (নাকি) **তালাম্** (তুমি জানো) **আন্বান্নালাহা** (নিশ্চয়ই **আলাহ্**)
আলা (উপর) **কুললি** (প্রত্যেক) **শাইয়িন্** (বিষয়ের) **কাদিরুন্** (শক্তিশালী, ক্ষমতাবান)।

□□তুমি কি জানো না? নিশ্চয়ই **আলাহ্** প্রত্যেক বিষয়ের উপর শক্তিশালী (ক্ষমতাবান)।

□ **আলাহ্**র কালামের এই আয়াতের মর্ম অধম লিখকের বোধগম্য নহে তথা জানা নাই।

১০৭. **আলাম্** (নাকি) **তালাম্** (তুমি জানো) **আন্বান্নালাহা** (যে **আলাহ্**)
লাহ্ (তাঁহারই জন্য) **মুলকুশ্** (রাজত্ব) **সামাওয়াতি** (আকাশসমূহ) **ঔয়ান্**
(এবং) **আরদি** (জমিনের)।

□□তুমি কি জানো না যে **আলাহ্** আসমানসমূহ এবং জমিনের রাজত্ব তাঁহারই জন্য।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (নাই) **লাকুম্** (তোমাদের জন্য) **মিন্** (হইতে) **দুনি** (হাড়া) **লাহি** (**আলাহ্**) **মিন্** (হইতে) **ওয়ালিউন্** (বন্ধু) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **নাসিরিন্** (সাহায্যকারী)।

□□এবং নাই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া বন্ধু এবং সাহায্যকারী নাই।

□ এই আয়াতে আমাদেরকে স্পষ্ট করে আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহ্ই আসমান এবং জমিনের একমাত্র মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া বন্ধুও নাই, সাহায্যকারীও নাই। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা তো মানুষের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করি। এবং এই বন্ধুত্ব করাটাই একান্ত স্বাভাবিক। নিরাকারি আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার প্রশ্নটিও অত্যন্ত জটিল বিষয়। কামেল পীর ব্যতীত এই বন্ধুত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। আমরা মানুষের কাছেই সাহায্য চাই। এই চাওয়াটি যে মোটেই শেরেক নয় ইহা বুঝতে হলে কামেল পীরের সহবতে থাকতে হবে। ওহাবিরা পীর-ফকিরের নাম শুনলেই অসহ্য যন্ত্রণার এলাজি তাদের সমস্ত শরীরে ফুটে ওঠে এবং রাগান্বিত হয়ে যা মনে আসে তাই বলে বেড়ায় এবং এই যা-তা বলার ফাকে-ফাকে অনেক রকম দলিল পেশ করে সরল মানুষদেরকে বিভ্রান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইহাও একটি রহস্যপূর্ণ খেলা। সুতরাং ওহাবিদের কেমন করে গালি দেওয়া যায়? খাজাবাবার কাছে কিছু চাইতে গেলে ওহাবিরা 'শেরেক, শেরেক' বলে চিৎকার করতে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম গাজ্জালি তাঁর রচিত এই ইয়ায়ে উলুম নামক গ্রন্থের একস্থানে এক কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে হজরত জুননুন মিশরির মাজারে সাহায্য চাইবার উপদেশটি দিয়েছেন বলে ওহাবিরা 'পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কাকের'-এর তালিকায় ইমাম গাজ্জালির নামটিও বসিয়ে দিয়েছে। সরল মানুষেরা এই ওহাবিদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে?

১০৮. আম্ম (কি) তরিদনা (তোমরা চাও) আন্ (যে) তাস্আন্ (প্রশ্ন করিবে) রসুলাকুম (তোমাদের রসুলকে) কাম্মা (যেমন) সুইলা (প্রশ্ন করা হইয়াছিল) মুস্সা (মুসা) মিন (হইতে) কাবুল (পূর্বে) ওয়া (এবং) মাই (যে) ইয়াতাবাত্ দালিল (পরিবর্তন করিল) কুফরা (কুফরিতে) বিল (বদলে) ইম্মানা (ইম্মানের) ফাকাদ (নিশ্চয়ই) দাল্লা (বিপথগামী) সাওয়াআস্ (সঠিক) সারিলি (পথটি)।

□□তোমরা কি চাও যে তোমাদের রসুলকে প্রশ্ন করিবে যেমন মুসাকে পূর্ব হইতে প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং যে ইম্মানের বদলে কুফরিতে পরিবর্তন করিল নিশ্চয়ই সে বিপথগামী সঠিক পথ হইতে।

১০৯. ওয়াদদা (ইচ্ছা করে) কাসিরুন (অনেকে) মিন (হইতে) আহলিল (অধিকারী) কিতাবি (কিতাবসমূহের) লাও (যদি) ইয়াকুদদুন (ফিরাইয়া লওয়া) কুম (তোমাদের) মিন (হইতে) বাদি (পরে) ইম্মানিকুম (তোমাদের ইম্মানের) কুফরান (কুফরিতে)।

□□কিতাবসমূহের অধিবাসীদের হইতে অনেকে ইচ্ছা করে তোমাদের ইম্মানের পর হইতে কুফরিতে যদি তোমাদেরকে ফিরাইতে পারিত।

+ আসাদান (হিংসার বশবর্তী হইয়া) মিন (হইতে) ইন্দি (নিকটে) আনফুসিহিম (তাহাদের নফসগুলির) মিম্বাদি (হইতে পরে) মা (যাহা) তাবাহিনা (প্রকাশ পাওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া) লাহম (তাহাদের কাছে) হাক্কু (সত্য)।

□□তাহাদের নফসের নিকট হইতে হিংসার বশবর্তী হইয়া যাহা ইহার পরেও প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের কাছে সত্য।

+ ফাআফ (সুতরাং তোমরা ক্রমা করো) ওয়াসফাউ (এবং উপেক্ষা করো) হাত্তা (যে পর্যন্ত না, যতক্ষণ না) ইয়াতিআল্লাহ্ (আল্লাহ্ দেন) বিআম্মরিহি (তাহার নির্দেশের সহিত, তাহার ইচ্ছার সহিত)।

□□সুতরাং তোমরা ক্রমা করো এবং উপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহার নির্দেশের সহিত (ফয়সালা করেন)।

+ **ইননালাহা** (নিশ্চয়ই আল্লাহ) **আলা** (উপর) **কুল্লি** (প্রত্যেক, প্রতিটি) **শাইয়িন্** (কিছুর) **কাদির্** (ক্ষমতাবান, শক্তিশালী)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

□ **কোরান**-এর এই আয়াতগুলির অত্যন্ত সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা যিনি দিয়ে গেছেন - যাহা আমরা জানা মতে আর কোনো তফসির-কারকের তফসিরে পাই নাই - উনার নাম শাহ সুফি সুদর উদ্দিন আহমদ চিশতি। উনার তফসিরের শৈলীটির সাথে বিশ্ববিখ্যাত ওলি-আল্লাহ মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির শৈলীর অনেকটা মিল পাই। অবশ্য ওহাবিরা হজরত মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবিকে 'পাচজন শেঠ কাকের'-এর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানটি দিয়েছে। 'প্রকৃত সত্য', 'প্রকৃত ইমান', 'প্রকৃত মোমিন', শব্দগুলোর কোনো অর্থই হয় না, কারণ ইমান ইমানই, সত্য সত্যই এবং মোমিন মোমিনই; সুতরাং না বুঝে, না শুনে 'প্রকৃত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

১১০. **ওয়া** (এবং) **আকিমুস্** (তোমরা কয়েম করো) **সালাতা** (সালাত, নামাজ) **ওয়া** (এবং) **আতজ্** (তোমরা আদায় করো) **জাকাতা** (জাকাত)।

□□ এবং তোমরা সালাত কয়েম করো এবং জাকাত আদায় করো।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (যাহা) **তুকাদদিম্** (পূর্ব হইতে পাঠাইবে) **লিআনফসিকুম্** (তোমাদের নফসের জন্য) **মিন্** (হইতে) **খাইরিন্** (উত্তম) **তাজিদুই** (তাহা তোমরা পাইবে) **ইনদালাহি** (আল্লাহর নিকট)।

□□ এবং যাহা তোমরা পূর্বে পাঠাইবে তোমাদের নফসের জন্য কল্যাণ হইতে তাহা পাইবে তোমরা আল্লাহর নিকট।

+ **ইননালাহা** (নিশ্চয়ই আল্লাহ) **বিমা** (যাহা) **তাম্মানুনা** (তোমরা আমল করিতেছ) **বাসিরুন্** (দেখিতেছেন)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যাহা আমল করিতেছ (উহা) দেখিতেছেন।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সামান্য একটি কথা বলতে চাই আর উহা হলো, আল্লাহ কেমন করে প্রতিটি মানুষের আমলগুলো দেখছেন। যেহেতু আল্লাহ আগেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি 'আমরা'-রূপ তথা বহুবচনের রূপটি ধারণ করে প্রতিটি মানুষের জীবন-রঙের তথা শাহারঙের নিকটেই আছেন। আল্লাহ সাত আসমানের উর্ধ্বে লা মোকামে যেমন অবস্থান করেন তেমনি প্রতিটি মানুষের জীবন-রঙের নিকটেও অবস্থান করেন। আল্লাহর প্রতিটি নফসের সঙ্গে অবস্থান করার কথাটি নিরপেক্ষ মন নিয়ে গবেষণা করা উচিত। অবশ্য নিরপেক্ষ মনটি অর্জন করাও একটি বিরাট ব্যাপার। মুখে নিরপেক্ষ হওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে নিরপেক্ষ হওয়াটা খুবই কঠিন। প্রতিটি নফস তার কর্মকাণ্ডের দর্শনের উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হয়। সুতরাং নিরপেক্ষ হওয়াটাও একটি কষ্টসাধ্য সাধনার ফসল বলে মনে করতে চাই। 'শয়তানের প্রতারণা হতে আশ্রয় চাই' - বাক্যটি শতবার পড়লেও শয়তান হতে যেমন বেহাই পাওয়া যায় না, তেমনি 'নিরপেক্ষ হয়ে গেলাম' বললেই নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। কিছু না কিছু পক্ষতার গন্ধটি থেকেই যায়। যখন একটি নফস খান্নাসমুজ্জ হয়ে যায়, সেই খান্নাসমুজ্জ নফসটি নিরপেক্ষ হবার দাবিটি করতে পারে এবং **কোরান**-এর সবগুলো আদেশ-উপদেশ, পুরস্কার-তিরস্কার, ভয়ভীতি ও সুসংবাদ একমাত্র খান্নাসমুজ্জ নফসের অধিকারী হবার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং খান্নাসমুজ্জ নফসটির নামও দিয়েছে **কোরান** : খান্নাসমুজ্জ নফসটির নাম **কোরান** দিয়েছে নফসে মোৎমায়েন্বা তথা পরিতপ্ত নফস। মনে হবে **কোরান**-হাদিস কত উপদেশ দিচ্ছে। আসলে সব উপদেশের মূলে কথাটি হলো, **আপনু নফসকে খান্নাস হতে মুক্ত করে দেওয়া তথা একটি খান্নাসমুজ্জ নফস।** এই বিষয়টি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন যিনি তার **কোরান**-তফসিরে তিনি শাহ সুফি সুদর উদ্দিন আহমদ চিশতি।

১১১. ওয়া (এবং) কান (তাহারা বলে) লান (কখনই না) ইয়াদখলান (প্রবেশ করিতে পারিবে) জান্নাত (জান্নাতে) ইল্লা (ব্যতীত, একমাত্র, ছাড়া) মান (যে) কানা (হয়) ইদান (ইহদি) আও (অথবা) নাসারা (খ্রিস্টান)।

এবং তাহারা বলে, ইহদি অথবা খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

+ তিলুকা (ওইটা) আম্মানিউইম্ম (তাহাদের আশা করা মাত্র)।

ওইটা তাহাদের আশা করা মাত্র।

+ কলু (বলো) হাত (তোমরা লইয়া আসো) বোরহানুকম্ম (তোমাদের প্রমাণ) ইন (যদি) কনউম্ম (তোমরা হও) সাদেকিন (সত্যবাদী)।

বলো, তোমরা লইয়া আসো তোমাদের প্রমাণ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

এই আয়াতে মানুষের দলীয় চিন্তাধারাকে একে একটি হংকার করতে দেখি। যেমন ইহুদিরা বলে যে, কেবলমাত্র তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার পরক্লেণে খ্রিস্টানেরাও বলে যে, তারাই একমাত্র জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথচ এই জাতীয় কথার মধ্যে অহংকারের বিকট একটি গন্ধ পাওয়া যায়। বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে, কেবলমাত্র তাদের দলই জান্নাতে যাবে - এই মনোবৃত্তিটি কেবলমাত্র ইহুদি এবং খ্রিস্টানের বেলাতেই নয়, বরং হিন্দুদেরও একই কথা বলতে দেখেছি। আবার কেবল হিন্দুরাই নয়, বরং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই মনে করে যে কেবল তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বাকি সবাই লাঞ্ছনাদায়ক জাহান্নামে যাবে। ইহাও একটি অপ্রিয় সত্য যে মুসলমানেরাও গর্ব ভরে ইহুদি-খ্রিস্টানের মতো বলে যে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই আল্লাহ বলছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার দলিল-প্রমাণটি আনয়ন করতে হবে। আল্লাহ আরও বলছেন যে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে দলিল-প্রমাণটি দেখাও। অবশ্য মনে হয় প্রতিটি ধর্মীয় দল দলিল-প্রমাণের নামে জাল দলিল-প্রমাণ আনতে কসুর করবে না। আমাদের ইহাও মনে রাখতে হবে যে মহানবি বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে তিন কুড়ি তেরটি ভাগ হবে এবং ইহার মধ্যে তিন কুড়ি বারোটি ভাগই বাতিল এবং একমাত্র আহলে সুন্নাতুল জামাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রশুটিও জটিল, উত্তরটি আরও জটিল। সুব দলই কমবেশি নিজেদেরকে আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী বলে দাবি করে।

১১২. বালা (হ্যাঁ) মান (যে) আসলাম্মা (সঁপিয়া দিয়াছে, সমর্পণ করিয়াছে, অনুগত হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সকল স্বত্ব ত্যাগপূর্বক দান করিয়াছে, উৎসর্গ করিয়াছে, প্রদান করিয়াছে, অর্পণ করিয়াছে - এই গুণগুলি যে ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তিনিই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কথায় নয়, বরং কাজে প্রমাণ করিতে হইবে। ওয়াজ্জাহ (তাহার নিজের চেহারা, তাহার নিজের মুখমণ্ডল) লিলাহি (আল্লাহর জন্য) ওয়া (এবং) হ্যা (সে, তিনি) মুহসিনুন (সৎকর্মশীল, যিনি ভালো কাজ করেন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, সৌন্দর্য অনুশীলনকারী) ফালাহ (সুতরাং তাহার জন্য) আজ্জাহ (প্রতিদান, বিনিময়, প্রতিফল, পুরস্কার) ইন্দা (নিকটে, কাছে) রাব্বিহি (তাহার রবের) ওয়া (এবং) লা (না) খাওকুন (কোনো ভয়, ভীতি, শঙ্কা, উর, ভ্রাস, আতঙ্ক) আলাইহিম্ম (তাহাদের জন্য) ওয়া (এবং) লা (না) ইম্ম (তাহারা) ইয়াহজানুন (দুঃখ পাইবে, চিন্তা করিবে)।

হ্যাঁ, যিনি সম্পূর্ণরূপে সঁপিয়া দিয়াছেন তাঁহার নিজের চেহারা কে আল্লাহর জন্য এবং যিনি ভালো কাজ করেন সুতরাং তাহার জন্য তাহার প্রতিফল তাহার রবের নিকটে এবং ভয় নাই তাহাদের জন্য এবং তাহারা দুঃখ পাইবে না।

□ এই আয়াতে পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন যে, যে-ব্যক্তি নিজের চেহারাটিকে আল্লাহর জন্য সপিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাপ্রলোকে কোরবানি করে দিতে পেরেছেন সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিফলটি রয়েছে তাহার রবের নিকটে। বাক্যটির প্রথমে ‘আল্লাহ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং প্রতিফলটি পাবার প্রশ্নে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহের প্রশ্নে ‘আল্লাহ’ শব্দটি পাই, কিন্তু প্রতিফল দেবার প্রশ্নে ‘আল্লাহ’ শব্দটি পাই না, বরং ‘রব’ তথা প্রতিপালকের ভূমিকায় আল্লাহর রূপটি দেখতে পাই। নিজের প্রবৃত্তি হতে আসা নানা রকম উল্টাপাল্টা চিন্তাধারাগুলোকে যখন একজন সাধক আল্লাহর নিকট একে-একে সবগুলো উৎসর্গ করতে পারে তখনই তাকে মোহসিনিন তথা সংকর্মশীলদের মধ্যে আল্লাহ গণনা করেন এবং এই রকম সংকর্মশীলদের সঙ্গেই আল্লাহ জাগ্রতরূপে ধারণ করে তথা ‘রব’-রূপে প্রতিদান দিয়ে যান। আল্লাহর এই রব-রূপটি একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা যিনি উৎসর্গ করতে পেরেছেন কেবল তারই জন্য এই প্রতিফলটি পাবার কথাটি বলা হয়েছে। এই রবের প্রতিফলটি কখনই আম জনতার জন্য রাখা হয় নি। আবার আমজনতাকেই আল্লাহ আহ্বান করছেন প্রতিফলটি পাবার জন্য। যিনি তার নিজের সত্তাকে, তাঁর প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট উৎসর্গ করে দিতে পেরেছেন তিনি মোহসিনিন তথা সংকর্মশীল। এই সংকর্মশীলদের আর কোনো বিষয়ে চিন্তিত হতে হবে না এবং কোনো প্রকার দুঃখে ভাবাক্রান্ত হতে হবে না। দুনিয়ায় আপাতঃ স্থল দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতীয় মোহসিনিনদেরকে আমরা অনেক রকম দুঃখে জর্জরিত হতে দেখি, কিন্তু আসলে উহা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই দুঃখ নয়, কারণ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন এবং মোহসিনিনদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। মোহসিনিন তথা সংকর্মশীলেরা আপন প্রবৃত্তি হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন এবং নিজের নিকটে যে আল্লাহ সব সময়ে অবস্থান করছেন সেই আল্লাহকে ‘রব’-রূপে জাগ্রত করতে পেরেছেন। সুতরাং বৈষয়িক যে-কোনো ধরনের দুঃখ, জালা, যন্ত্রণা হতে এই মোহসিনিনরা সম্পূর্ণ মুক্ত, যদিও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের চালচলন ভিন্ন প্রকৃতির। তাই সাধারণ মানুষের এই জাতীয় মোহসিনিনদের চিনে নিতে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় চিনতেও পারে না যে ইনারা রবের বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত সংকর্মশীল মোহসিনিন। আল্লাহ সমগ্র কোরান-এ যে-চারজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করার কথাটি ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে মোহসিনিনের নামটিও আছে। আমরা কোরান-এর অন্যত্র দেখতে পাই যে আল্লাহ মোহসিনিনদের সঙ্গে আছেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর এই রহমত এতই গোপন রহমত যে সাধারণ মানুষ কখনই বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষ মনে করে যে, ধন-দৌলত, সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা, দামি গাড়ি-বাড়ি, তাঁটবাড়ি এগুলোই রহমত। সংকর্মশীলদের এই জাতীয় জিনিসগুলো প্রায়ই থাকে না তাই পদে-পদে ভুল করে বুসে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনের পাল্লায় বসিয়ে সংকর্মশীল নামক মোহসিনিনদের বসিয়ে দিয়ে মাপতে গিয়ে মাপার অঙ্কটিতে মিল পায় না বলেই অনেক রকম ভুলের সমাগম ঘটে। যিনি তার চেহারাটিকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিতে পেরেছেন তার পুরস্কারটি তা রবের নিকটেই থেকে যায়। তাই পরিশেষে আল্লাহ বলছেন যে এদের কোনো ভয় নেই, এদের কোনো দুঃখও নেই এবং এদের কোনো চিন্তার বাম্বেলাও নেই।

১১৩. ওয়া (এবং) কালাতিল (বলে) ইয়াহুদ (ইহুদিরা) লাইসাতিন (নাই) নাসারা (খ্রিস্টানেরা) আলা (উপর) শাইয়িন (ভিত্তি, বস্তু, কিছু : যাহা জাতব্য এবং যার বিষয়ে কিছু বলা যায় তাহাকে শাইয়িন বলা হয়) ওয়া (এবং) কালাতিল (বলে) নাসারা (খ্রিস্টানেরা) লাইসাতিন (নাই) ইয়াহুদ (ইহুদিরা) আলা (উপর) শাইয়িন (ভিত্তি) ওয়া (এবং) হম (তাহারা)

ইয়াতলুনান (তেলাওয়াত করে) কিতাবা (কেতাব) কাজালিকা (ওইভাবে) কালানি (বলে) লাজিনা (যাহারা) না (না) ইয়ানামনা (জানে) মিসনা (মতো) কাওলিহিম (তাহাদের কথার, তাহাদের উক্তি) ফা (সুতরাং) আলাহ (আলাহ) ইয়াহকুম (হকুম দিবেন, ফয়সালা করিয়া দিবেন, মামাংসা করিয়া দিবেন) বাইনাহিম (তাহাদের মধ্যে, মাঝে) ইয়াওমান (দিনে) কিয়ামাতি (কেয়ামতের) ফিমা (তাহাদের দুইয়ের মাঝে, সেই বিষয়ে যাহা) কানু (ছিল, আছে, হয়) ফিহি (ইহার মধ্যে) ইয়াখতালিফন (তাহারা মতবিরোধ করিত)।

এবং ইহদিরা বলে খ্রিস্টানদের নাই কোনো কিছুর (ভিত্তি) উপর এবং খ্রিস্টানেরাও বলে ইহদিদের নাই কোনো কিছুর (ভিত্তি) উপর এবং তাহারা তেলাওয়াত করে কেতাব ওইভাবে (তাহারীও) বলে, যাহারা তাহাদের কথামতো জানে না। সুতরাং আলাহ ফয়সালা করিয়া দিবেন তাহাদের মধ্যে কেয়ামতের দিনে সেই বিষয়ে যে-বিষয়ের মধ্যে তাহারা মতবিরোধ করিত।

এইখানে ইহদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে যে-মতবিরোধটির কথা বলা হয়েছে সেই মতবিরোধটির প্রশ্নে উভয় সম্প্রদায়ই কেতাব পাঠ করত, তথা আলাহ-প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করত। কিন্তু উভয়ে উভয়ের উপর যে-ভিত্তির উপর দাঁড়াবার কথাটি নিয়ে অপবাদ দিচ্ছে সেই অপবাদগুলো তাদের নিজস্ব বানানো অপবাদ। আসলে ইহদিদেরও ভিত্তি আছে এবং খ্রিস্টানদেরও ভিত্তি আছে। কিন্তু ভিত্তি থাকলে কী হবে? যখন মতবিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তখন ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও ভিত্তি নাই অপবাদটি দেওয়া হয়ে থাকে। ভিত্তি ছাড়া কোনো ধর্মদর্শন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু মতবিরোধের অঙ্কুর ছায়াগুলো ভিত্তিটিকে ঢেকে দেয়। তখন ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও একে অপরের উপর মূল বিষয়টির উপর আঘাত হানে। এই আঘাতগুলো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে বুটে। তাই আলাহ বলছেন যে কেয়ামতের দিন না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর সমাধানটি পাওয়া যায় না। এইখানে কেয়ামতের দিন বলতে প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুদিবসটিকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয়। এই ধর্মীয় মতভেদের মধ্য দিয়ে কত রকম যে ফেরকার উদ্ভব হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। একেকটি ফেরকা একেক রকম দর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেহই নিজের ভুলটুকু স্বীকার করে নিতে চায় না, বরং মতভেদই থেকে যায়। আলাহ কেয়ামতের দিনে তথা মৃত্যুদিবসে সব কিছুর সমাধান করে দিবেন। এই মতবিরোধের কারণে ইহদি সম্প্রদায় অনেক ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। তেমনি খ্রিস্টানেরাও নিজেদের মধ্যে নিজেরা মতভেদ তৈরি করে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। এই অপবাদটি কেবল ইহদি আর খ্রিস্টানকে দিলেই চলবে না, বরং অনেক ধর্মই মতভেদের বিষফল ফেরকাটি দেখতে পাই। গোতম বুদ্ধের বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে মহাযান ও হীনযান নামক দুইটি ফেরকায় বিভক্ত হয়ে আছে। আর মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মীয় মতবিরোধ তৈরি করা হয়েছে সেগুলোর কথা সব্যরই জানা থাকার কথা। তবে শিয়া, সুন্নি, ওহাবি, মৃত্যাজিলা, দেওবান্দ, জামাতি, বাটালভি, চক্কালাভি এবং ইয়াজ্জিদি ও দ্রুজ - এই রকম ফেরকার অবস্থানটি কল্পবশি দেখা যায়। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশের সময় মহানবির বাণী তথা হাদিস বলে কত যে জাল হাদিস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টি কিছুটা বুঝতে হলে শুদ্ধেয় জনাব সাঈদউল্লাহ সাহেব রচিত হাদিস সংগ্রহের ইতিহাস বইটি পড়লেই বোঝা যায়।

১১৪. ওয়া (এবং) মান (কে) আজলান (বেশি জালেম, অধিক অত্যাচারী) মিমমাম (তাহার চাইতে যে) মানা (ভালো কাজে ব্যাধা দেওয়া) মাসাজ্জিদা (মসজিদগুলি) আলাহ (আলাহর) আইইউজ্জকারা (জিকির করিতে), ফিহা (উহার মধ্যে) ইসমীহ (তাহার নাম) ওয়া (এবং) সাআ (চেষ্টা করে, দোঁড়ায়, কামাই করে) ফি (মধ্যে, মাঝে) খারাবিহা (উহাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া,

উহাকে উপভূ করিয়া দেওয়া, বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হওয়া) **উলাইকা** (ওইসব লোক) **মা** (নহে, না) **কানা** (ছিল) **লাহম** (তাহাদের জন্য) **আন** (যে) **ইয়াদখুলহা** (উহাতে প্রবেশ করিবে) **ইন্না** (একমাত্র, ব্যতীত, ইহা ছাড়া যে) **খায়েফিন** (ভীত হইয়া, ভয় পাইয়া) **লাহম** (তাহাদের জন্য রহিয়াছে) **ফি** (মধ্যে) **দুনিয়া** (দুনিয়ার) **খিজ্জইউ** (অবমাননা, জিল্লতি, লাঞ্ছনা, অপমান) **ওয়া** (এবং) **লাহম** (তাহাদের জন্য) **ফি** (মধ্যে) **আখিরাতি** (আখেরাতে) **আজাবুন** (আজাব, পীড়ন, যন্ত্রণা) **আজিমুন** (শত্রু, কঠিন, সর্বোচ্চ)।

এবং তাহার চাইতে কে বেশি জ্বলেম (যে) আল্লাহর মসজিদগুলিতে জিকির করিতে বাধা দেয় এবং উহার মধ্যে ঢেঁচা করে তাহার (আল্লাহর) নামের মধ্যে খাবাবি করিতে ওইসব লোক উহাতে প্রবেশ করিবে যেন তাহাদের জন্য (উচিত) ছিল একমাত্র ভীত হইয়া তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়ার মধ্যে জিল্লতি এবং আখেরাতের মধ্যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আজাব।

কোরান-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্বলেম শব্দটি খুবই ব্যাপক এবং বিস্তৃত। বৈষয়িক বিষয়ের প্রশ্নে যারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার তরে অপরের অধিকারকে খর্ব করে তাদেরকেও কোরান-এর ভাষায় জ্বলেম বলা হয়েছে। আরার পরক্কে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে আল্লাহর জিকির যারা করেন তাদেরকেও যারা আল্লাহর জিকির করতে বাধা দেয় তাদেরকেও জ্বলেম বলা হয়েছে। এই জাতীয় জিকির করার মসজিদসমূহকে যারা বাধা প্রদান করে তাদেরকেও অধিক জ্বলেম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মসজিদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ একটি জাহেরি মসজিদ এবং অপবুটি হাকিকি মসজিদ। মোমিনের কলবকে মসজিদ বলা হয় এবং ইহাই হাকিকি মসজিদ এবং ইট-সুরকিতে বানানো যে মসজিদ উহা জাহেরি মসজিদ। এই জাহেরি এবং হাকিকি উভয় প্রকার মসজিদে যারা জিকির করে তাদেরকে বাধা প্রদান করলে তাকে অধিক জ্বলেম বলে কোরান উল্লেখ করেছে। কোরান-এর বাচনভঙ্গিটি আল্লাহর। সুতরাং জাহের এবং বাতেনের সমন্বয় সাধন করেই বলা হয়েছে বলে কোরান-এর ভাষাগুলো বুঝতে পড়ে-পড়ে হোচট খেতে হয়। মোমিনের কলবই যে হাকিকি মসজিদ তথা আসল মসজিদ এই কথাটি পরিষ্কারভাবে জানতে হলে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির অমর গ্রন্থ **মসনবি শরিফ** পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায় এবং বাঙলা ভাষা ভাষীদের জন্য এই বিষয়টির রহস্য জানতে হলে শাহ সুফি সুদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত বিখ্যাত বই **মসজিদ দর্শন** পড়লেই সব কিছু পরিষ্কার ধরা পড়ে যাবে।

১১৫. **ওয়া** (এবং) **লিলাহিল** (আল্লাহরই জন্য) **মাশরিক** (পূর্ব) **ওয়া** (এবং) **মাগরিব** (পশ্চিম) **ফাআইনাম্মা** (সুতরাং যদিকেই) **তয়ালিল** (মুখ ফিরাও) **ফাসমিমা** (সুতরাং সেখানেই) **ওয়াজ্জহ** (চেহারা, মুখমণ্ডল)-**লাহি** (আল্লাহর)-**ইন্না** (নিশ্চয়ই, অবশ্যই) **আলাই** (আল্লাহ) **ওয়াসিউন** (সকল দিকে অবস্থিত, সকল দিকে বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত, সর্বব্যাপী) **আলিমুন** (সব কিছু জানেন, জ্ঞানী)।

এবং পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্য সুতরাং যদিকেই মুখ ফিরাও সুতরাং সেখানেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল দিকে অবস্থিত, সব কিছু জানেন।

এই আয়াতে আল্লাহ যে সর্বস্থানে সর্বঅবস্থায় বিরাজ করছেন এবং যে-দিকেই মুখ ফিরানো হোক না কেন কেবলমাত্র আল্লাহর চেহারাটি দেখা যায় সেই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর জাত-নূর এবং সেফাতি-নূর দুটিই ভিন্ন মনে হলেও জাত-নূর হতেই সেফাতি-নূরের আগমন। তুলা হতে কাপড়ের আগমন - তাই বলে কাপড়কে যেমন তুলা বলা যাবে না তেমনি সেফাতি-নূরকে জাত-

নূর বলা যাবে না, যদিও সেফাতি-নূরও আল্লাহর বিশেষ ধরনের একটি চেহারা। আবার উপাসনার প্রশ্নে সামাজিক বন্ধনটিকে মজবুত করার লক্ষে একটি দিকের প্রয়োজন হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একে একে সম্প্রদায় একে একে দিকে উপাসনার প্রশ্নে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করার কল্পে - কেহ পশ্চিম দিক, কেহ পূর্ব দিক, কেহ উত্তর দিক, কেহ দক্ষিণ দিক গ্রহণ করে থাকে এবং যে-দল যে-দিকই গ্রহণ করুক না কেন সেই দিকটি এখানে মুখ্য বলে বিবেচনা না করে সবস্থানে, সবঅবস্থায়, সর্বব্যাপী আল্লাহই অবস্থান করছেন এবং আল্লাহর চেহারাটি দেখতে পাবার ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে। ইহার গভীরতম অর্থটি আমরা করতে গেলাম না, বরং যারা এই আয়াতের গভীর অর্থটি জানতে চান তারা হজরত শাহ সুফি মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফতহাতে মক্কা* নামক গ্রন্থটিতে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি জানতে পারবেন অথবা বাঙলা ভাষায় রচিত শাহ সুফি সুদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত *কোরান দর্শন* নামক *কোরান*-এর তফসিরটি পড়লেই জানতে পারবেন।

১১৬. *ওয়া* (এবং) *কাল* (তাহারা বলে) *তাখাজ্জা* (পছন্দ করিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *ওয়ালাদান* (সন্তান) *সুবহানাহ* (তিনি মহিমান্বিত, তিনি ভাসমান, তিনি পবিত্র) *বাল* (বরং) *লাহ* (তাহার জন্য) *মা* (যাহা কিছু) *ফি* (মধ্যে) *সামাওয়াতি* (আকাশগুলির) *ওয়া* (এবং) *আর্দি* (জমিনে, মাটিতে, দেহে, পৃথিবীতে) *কুল্ল* (সব কিছুই) *লাহ* (তাহারই জন্য) *কানিতুন* (অনুগত, অধীন, আশ্রিত, অনুসরণকারী)।

এবং তাহারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ভাসমান, তিনি মহিমান্বিত, বরং তাহার জন্য আসমানসমূহের মধ্যে এবং জমিনে যাহা কিছু, সব কিছুই তাহারই কাছে অধীন।

যেহেতু আল্লাহ নফস হতে মুক্ত সেই হেতু সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না।

১১৭. *বাদিত্ত* (নতন বস্তুর উদ্ভাবক, আদি স্রষ্টা, সৃষ্টা) *সামাওয়াতি* (আকাশসমূহের) *ওয়া* (এবং) *আর্দি* (জমিনের, পৃথিবীর, দেহের) *ওয়া* (এবং) *ইজ্জা* (যখন) *কাদওয়া* (ফয়সালা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, শেষ নির্দেশ, শেষ কাজ, খতম করিয়া দেওয়া, পূর্ণ করা, দৃঢ় ইচ্ছা করা, নির্দেশ প্রদান করা, দৃঢ় ইচ্ছা করা, কারো কাজ করিয়া দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, খণ পরিশোধ করা, কোনো কিছু অত্যাৱশ্যক করিয়া দেওয়া, অতিক্রম করা, কারো অনুকূলে রায় দেওয়া, প্রত্যক্ষভাবে ওহি প্রেরণ করিয়া অবহিত করা, নির্দিষ্ট করা, হাজত পূর্ণ করিয়া সম্পর্ক ছিন্ন করা, অবসর গ্রহণ করা, মরিয়া যাওয়া - ইত্যাদি অনেক রকম অর্থ হয়) *আম্বরান* (কোনো কাজ, কোনো কিছু, অবস্থা, আদেশ, ব্যাপার, ইজ্জতের মাধ্যমে আদেশ করা) *ফাইননামা* (সূত্রাং নিশ্চয়ই) *ইয়াকুন* (বলেন) *লাহ* (তাহাকে) *কুন* (হও) *ফাইয়াকুন* (সূত্রাং হইয়া যায়)।

উদ্ভাবক (স্রষ্টা) আকাশসমূহের এবং জমিনের এবং যখন ফয়সালা গ্রহণ করেন কোনো কাজ (করার) সূত্রাং নিশ্চয়ই বলেন তাহাকে 'হও' সূত্রাং হইয়া যায়।

কোরান-এর এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লেখা আমার পক্ষে অনেক শক্ত বলে মনে হয়, যদিও আয়াতের আক্ষরিক অর্থগুলো খুব সহজ মনে হয় এবং অনেকেই সহজভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখেছেন। সত্যি কথা বলতে কি - এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি আমার সামান্য জ্ঞানে জানা নাই তাই কিছু একটা লিখতে পারলাম না, তবে একে একটি শব্দের কৃত রকম অর্থ হতে পারে তার সামান্য নমুনা বিভিন্ন ডিকশনারি হতে তুলে দিলাম। তবে হজরত মহিউদ্দিন

ইবনুল আরাবি তাঁর রচিত বিখ্যাত অমর গ্রন্থ *ফতহাতে মক্কিয়া-তে* সুফিদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাটি লিখে গেছেন এবং বাংলাদেশে একমাত্র শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি তাঁর রচিত *কোরান দর্শন*-নামক তফসির গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ইহার ব্যাখ্যাটি লিখেছেন। যাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনেক কিছু জানবার তাঁদেরকে এই দুই মহাপুরুষের রচিত ব্যাখ্যাটি পড়বার অনুরোধ করলাম।

১১৮. *ওয়া* (এবং) *কাল* (বলে) *লাজিনা* (যাহারা) *না* (না) *ইয়ালান্ননা* (জানে) *নাও* (কেন) *না* (না) *ইউকাললিম্ননা* (আমাদের সাথে কথা বলেন) *আলাহ* (আলাহ) *আও* (অথবা) *তাতিনা* (আমাদের দেন) *আয়াতুন* (আয়াত, নিদর্শন, নমুনা) *কাঙ্কালিকা* (ওইভাবে) *কাল* (বলিয়াছিল) *আললাজিনা* (যাহারা) *মিন্কাবলিহিম* (পূর্ব হইতে) *মিসলা* (অনুরূপ, মতো) *কাওলিহিম* (তাহাদের কথার) *তাসাবুহাত* (সদৃশ হইয়া গিয়াছে, একই রকম হইয়া গিয়াছে, বরাবর হইয়া গিয়াছে, একই ধরনের হইয়া গিয়াছে) *কলুবহম* (তাহাদের কলবগুলি - নফস এবং কলব এক বিষয় নয় তাই অন্তর না লিখে কলবকে কলবই লিখলাম) *কাহ* (নিশ্চয়ই) *বাইয়ান্ননা* (আমরা [আলাহ] বয়ান করিয়াছি, আমরা প্রকাশ করিয়াছি, আমরা বর্ণনা করিয়াছি) *আয়াতি* (আয়াতগুলি, নিদর্শনসমূহ) *লিকাউম* (কওমের জন্য, লোকদের জন্য) *ইউকিনুন* (তাহারা বিশ্বাস করে)।

□□ এবং যাহারা জানে না (তাহারা) বলে, ‘কেন আমাদের সাথে আলাহ কথা বলেন না? অথবা কোনো আয়াত আমাদের দেন (না কেন?)’ ওইভাবে পূর্ব হইতে যাহারা তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল তাহাদের কলবগুলি একই রকম। নিশ্চয়ই আমরা (আলাহ) বর্ণনা করিয়াছি আয়াতসমূহ (সেই) কওমের জন্যে (যাহারা) বিশ্বাস করে।

□ এই আয়াতের শেষ অংশে সেই কওমদের জন্য বিশ্বাস করার কথাটি বলা হয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে, এই বিশ্বাসটি কি বই-পড়া বিশ্বাস নাকি অন্তরচোখের বিশ্বাস? কারণ বই-পড়া বিশ্বাস যে-কোনো পরিস্থিতিতে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির বিশ্বাসটি কোনো অবস্থাতেই ভেঙে যাবার প্রশ্নটি আসে না। সুতরাং এই ধরনের বিশ্বাসটি বই-পড়া বিশ্বাসও হতে পারে আবার অন্তর্দৃষ্টির বিশ্বাসও হতে পারে। তবে কথায়-কথায় বলছি, বই-পড়া বিশ্বাস অথবা মূখের কথার বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে-বিশ্বাসটি অর্জন করা হয় সেই বিশ্বাসটি কোনো অবস্থাতেই ভাঙে না।

১১৯. *ইননা* (নিশ্চয়ই আমরা) *আবসাল্নাকা* (আপনাকে পাঠাইয়াছি) *বিল্ হাক্কি* (হক [সত্য] সহকারে) *বাশিরাত* (শুভখবরদাতা, সুসংবাদদাতা) *ওয়া* (এবং) *নাজিরাত* (সাবধানকারীরূপে, সতর্ককারী হিসাবে) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তসআল* (আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আপনাকে প্রশ্ন করা হইবে) *অনি* (হইতে) *আস্হাবি* (বাসিন্দা, অধিবাসী, নিবাসী) *জাহিম* (অত্যন্ত গরম আগুন, উত্তপ্ত আগুন, লেলিহান আগুন)।

□□ নিশ্চয়ই আমরা হক সহকারে আপনাকে পাঠাইয়াছি শুভখবরদাতা এবং সাবধানকারীরূপে এবং আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না অত্যন্ত গরম আগুনের বাসিন্দাদের হইতে।

□ এই আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, যারা আগুনের অধিবাসী তারা দুনিয়ার লোভ-মোহে এতই মত্ত থাকে যে আলাহ-বিষয়ে কোনো চিন্তা করার সময় পায় না, সুতরাং এই জাতীয় লোকদের বিষয়ে প্রশ্ন করা আর না করা একই কথা হয় বলে আলাহ কোনো নবি-রসুলকে প্রশ্ন করবেন না। এই জাতীয় লোকেরা দুনিয়ার লোভ-মোহে এতই মাতাল থাকে যে এদেরকে

ধর্মবিষয়ে কোনো সামান্য আদেশ-উপদেশ দিতে গেলেও গ্রহণ করা তো দূরে থাক, বরং কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে ফোসফোস শব্দ করতে থাকে।

১২০. ওয়া (এবং) লান (কখনই না) তারদোয়া (রাজি হইবে, খুশি হইবে) আনকা (আপনার থেকে, -হইতে) ইয়াহুদ (ইহুদিরা) ওয়া (এবং) লা (না) নাসারা (খ্রিস্টানেরা) হাততা (যতক্ষণ না) তাততাবিয়া (আপনি অনুসরণ করিবেন) মিললাতাহম (তাহাদের দলীয় ধর্মপদ্ধতি, তাহাদের মিল্লাতের) কল (বলুন) ইননা (নিশ্চয়ই) হদালাহি (আল্লাহই হেদায়েত দানকারী) হযাল (সেইটাই) হদা (একমাত্র হেদায়েতের পথ) ওয়া (এবং) লাইনিচ (অবশ্য যদি) তাবাতা (আপনি অনুসরণ করেন) আহওয়াআহম (তাহাদের খেয়ালখুশি, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ) বাদা (পরেও) -লাজি (যাহা) জাআকা (আপনার কাছে আসিয়াছে) মিনালহলমি (এলেম হইতে) মা (না) লাকা (আপনার জন্য) মিনালাহি (আল্লাহ হইতে) মিউ (কোনো) ওয়ালিইউ (বন্ধু, ওলি) ওয়া (এবং) লা (না) নাসির (সাহায্যকারী)।

□□এবং কখনই আপনা হইতে খুশি হইবে না ইহুদিরা এবং খ্রিস্টানেরা যতক্ষণ না আপনি তাহাদের ধর্মপদ্ধতির অনুসরণ করিবেন, বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহই হেদায়েত দানকারী, সেইটাই একমাত্র হেদায়েতের পথ এবং অবশ্য যদি আপনি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে এলেম হইতে যাহা আসিয়াছে (উহার) পরেও। আল্লাহ হইতে কোনো বন্ধু আপনার জন্য (থাকিবে) না এবং না সাহায্যকারী।

□ এই আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইহুদিদের ধর্মপালনের একটি ধর্মপদ্ধতি আছে এবং অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদেরও। আল্লাহর হেদায়েত এবং দলীয় ধর্মপদ্ধতি কখনো এক বিষয় নয়। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি (মুহম্মদ) যত বৃকম সত্য কথাই বলুন না কেন, তাহাদের নিজস্ব বানানো ধর্মপদ্ধতিটি মেনে না নিলে আপনাকে মানবে না। কারণ আল্লাহর হেদায়েতই হলো একমাত্র হেদায়েত। অত বড় জলজ্যান্ত সত্য কথাটি বাস্তবেও যখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো, তখন কিছুক্ষণের জন্য ওকবা খতমত খেয়ে অবাক মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু মহানবির বলা সত্যটি বাস্তবে জানবার পরও মহানবিকে নবি ও রসুলরূপে মেনে নিতে পারলো না। কেন পারলো না? কারণ ওকবার তকদিরে মেনে নেবার বিধানটি ছিল না। তাই যাহা একজনের তকদিরে লিখা না থাকে তাহা মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

১২১. আনলাজিনা (যাহারা) আতাইনাহমুল (আমরা আতা করিয়াছি তথা দান করিয়াছি তাহাদেরকে) কিতাব (কেতাব) ইয়াতলুনাহ (তাহারা উহাকে তেলাওয়াত করে) হাককা (সত্য, সঠিক) তেলাওয়াতিহি (উহার তেলাওয়াত) উলাইকা (তাহারাই) ইউমিননা (ইমান আনে) বিহি (উহার উপর) ওয়া (এবং) মাই (যে, যিনি) ইয়াকফরবিহি (উহার উপরে কুফরি করে) ফাউলাইকা (সুতরাং ওইসব [লোক]) হমুল (তাহারাই) খাসিরুল (কৃতঘ্ন)।

□□আমরা তাহাদেরকে কেতাব আতা করিয়াছি যাহারা উহা তাহারা তেলাওয়াত করে, উহার সত্য তেলাওয়াত। তাহারাই ইমান আনে উহার উপর। এবং যে উহার উপরে কুফরি করে সুতরাং ওইসব (লোক) তাহারাই কৃতঘ্ন।

□ এই আয়াতে কেতাব বলতে যদি কাগজে ছাপা অথবা হস্তলিখিত বই হয়। তাহলে সেই যুগে আমভাবে কেতাব পাঠ করাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় সুতরাং আল্লাহর পাঠানো একেকজন মহাপুরুষই হলেন জীবন্ত কেতাব এবং সেই মহাপুরুষদেরকে যথাযথ অনুসরণ করাটাই হলো কেতাব তেলাওয়াত করা। আল্লাহ প্রদত্ত মহাপুরুষকে তেলাওয়াত করা অর্থ সেই মহাপুরুষের স্বভাবচরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং চারিত্রিক গুণাবলি দেখেগুনে

অনুসরণ করা। মহাপুরুষ মহানবিকে তাঁর সাহাবারা যে অনুসরণ করেছেন সেই অনুসরণটি হলো কেতাব তেলাওয়াত করা এবং যারা এই কাজটি করেন তারাই ইম্মানদার এবং যারা আল্লাহ প্রদত্ত মহাপুরুষ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারাই ক্ৰতিগ্রস্ত। সর্বশেষ মহানবির আগমনটিও দেউ হাজার বছর আগে হওয়াতে কাগজ-কলমের যথার্থ ব্যবহারটি আমরা দেখতে পাই না। পূর্ববর্তী অন্যান্য নবির, যাদের আল্লাহ কর্তৃক পাঠানো হয়েছে, তাদের সময় কাগজে লেখা কেতাব পাঠ করা অসম্ভব একটি অসম্ভব ব্যাপার। যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে সব কিছু দেখতে হয়। ধান হতে যে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই চাউলের ভাত আমরা খাই। এই চাউল আবিষ্কার হয়েছে আনুমানিক পোনে পাচ হাজার বছর আগে। অথচ হিন্দু-ধর্মের মহাপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশসমূহ নামক গীতা-র জন্ম আনুমানিক সাড়ে পাচ হাজার বছর আগে। তাই আমরা গীতা-র মধ্যে ধান-চাউলের ব্যানটি পাই না। সুতরাং প্রতিটি বিষয় সেই যুগের, সেই পরিবেশের মাপকাঠিতে বিচার করে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়াটা শেভিনীয় বলে মনে করি।

১২২. **ইয়াবানি** (হে বনি) **ইসরাইলা** (ইসরাইল [সম্প্রদায়]) **উজ্জুক** (তোমরা জিকির করো) **নিম্নাতি** (আম্মার নেয়ামতকে) **আল্লাতি** (যে, যহা) **আনআমত** (আম্মি নিয়ামত দিয়াছি) **আলাইকুম** (তোমাদের উপর) **ওয়া** (এবং) **আননি** (নিশ্চয়ই আমি) **ফাদদালতকুম** (তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব, ফজিলত দিয়াছি) **আলাল** (উপরে) **আলামিন** (জগতসমূহের)।

□□ হে বনি ইসরাইল [সম্প্রদায়], তোমরা জিকির করো আম্মার নিয়ামতকে, যে-নিয়ামত আমি তোমাদের উপর দান করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের উপর তোমাদেরকে ফজিলত দান করিয়াছি।

□ এই আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ইহাদিদেরকে জগতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই বিশেষ নিয়ামতটি যে আল্লাহ ইহাদিদেরকে দান করেছেন ইহা **কোরান**-এরই ঘোষণা এবং আল্লাহ যে মহানিরপেক্ষ এই আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো ইহাদিদের উপর এই রুকম বিশেষ নিয়ামতটি দান করার প্রশ্ন সহজে মেনে নিতে চায় না। কারণ, ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি - যাহা জন্মসূত্রে পাওয়া, উহাকে ফেলে দিয়ে সত্যিকার নিরপেক্ষ হওয়াটা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। নিরপেক্ষতার ভান করা যায়, কিন্তু নিরপেক্ষ হওয়াটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সাধু সাজা যত সহজ, সাধু হওয়াটা ততটুকু কঠিন বৈ কি। এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গবেষকেরা তেলেবেগনে জলে ওঠেন এবং অনেক রুকম ধানাইপানাই করার স্টাইলে অনেক কিছু লিখে থাকেন এবং এরকম লিখাটাই স্বাভাবিক।

১২৩. **ওয়া** (এবং) **ইততাক** (তোমরা ভয় করো) **ইয়াওম্মা** (সেই দিনের) **লা** (না) **তাজ্জি** (কাজে আসিবে) **নাফসুন** (কোনো নফস) **আন** (হইতে) **নাফসিন** (কোনো নফসের) **শাইয়ান** (কিছু) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **ইক্বান** (গ্রহণ করা হইবে) **মিন্‌হা** (তাহার নিকট হইতে, তাহার পক্ষ হইতে, তাহার মধ্য হইতে) **আদলু** (বিনিময়, বদলা, দব্য বিনিময়, ইনসাফ, সম্মান) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **তানফাউহা** (তাহাকে ফায়দা দিবে, উপকারে আসিবে) **শাফাতুন** (কোনো সুপারিশ) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **হম্ম** (তাহারা) **ইউনসারুন** (সাহায্যকারী)।

□□ এবং তোমরা ভয় করো সেই দিনের [যেদিন] কোনো নফস কোনো নফসের কিছুই কাজে আসিবে না এবং গ্রহণ করা হইবে না তাহার নিকট হইতে [কোনো] বিনিময় এবং তাহার উপকারে আসিবে না [কোনো] সুপারিশ এবং তাহারা সাহায্য পাইবে না।

□ এই আয়াতে যে-দিনটিকে ভয় করতে বলা হয়েছে সেই বিশেষ দিনটি হলো মৃত্যু নামক ঘটনার দিনটি। মৃত্যু কোনো ধর্মসম্মত নয়, বরং একটি ঘটনা মাত্র। মৃত্যুর সময়ে অন্য কোনো নফসের সাহায্য পাওয়া যাবে না, এমনকি কোনো সুবিচার, কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না। এমনকি কোনো সাহায্যকারীও সাহায্য করতে পারবে না। এই ধরাধামে একাই আসতে হয় এবং চিরবিদায় নেবার সময়ে একাই যেতে হয় এবং কোনো রকম সাহায্য এবং সুপারিশ তখন আর কাজে আসে না। ইহাই বিধির বিধান। সুতরাং আল্লাহ সেই দিনটির কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন – ভয় করো সেই দিনটিকে, যেদিন কোনো নফস অন্য নফসের বিনিময়ে আসবে না এবং কারো পক্ষ হতে কোনো সুবিচার অথবা কোনো উপকার অথবা কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না।

১২৪. ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) ইব্রাহীম (পরীক্ষা করা, পরীক্ষা নেওয়া) ইব্রাহীম (ইব্রাহীমকে) রাব্বুহ (তাহার রব, প্রতিপালক, সদাপ্রভু) বিকালিমাতিন্ (কলেমার সহিত, কথার সহিত, বাক্যের সহিত) ফাতাতাম্মিমিন্ (সুতরাং তিনি সেইগুলি পরিপূর্ণ করিলেন) কালা (আল্লাহ বলিলেন) ইন্নি (নিশ্চয়ই আমি) জাহিলুকা (নিশ্চয়ই আপনাকে নির্বাচন করিলাম, মনোনীত করিলাম) লিনুনাসি (মানুষদের জন্য) ইমাম্ম (ইমামরূপে, নেতারূপে) কালা (ইব্রাহীম বলিলেন) মিন্ (হইতে) জুররিয়াতি (আমার সন্তানদের, আমার বংশধরদের) কালা (আল্লাহ বলিলেন) লা (না) ইয়ানালু (প্রযোজ্য হইবে, প্রয়োগ করার যোগ্য, প্রয়োগ করিতে হইবে এমন) আহদি (আমার ওয়াদা, আমার প্রতিশ্রুতি, আমার অঙ্গীকার) জোয়ালিমিন্ (জালিমদের, জুলুমকারীদের, উৎপীড়কদের, অত্যাচারীদের)।

□ এবং যখন ইব্রাহীমকে তাহার রব কথার দ্বারা পরীক্ষা করিলেন। সুতরাং তিনি সেইগুলি পরিপূর্ণ করিলেন। (আল্লাহ) বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (ইব্রাহীমকে) মনিষের জন্য ইমাম নির্বাচন করিলাম। (ইব্রাহীম) বলিলেন, এবং উহা কি আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও? (আল্লাহ) বলিলেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নহে।

□ এই আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, হজরত ইব্রাহীম (আ.)-কে সমগ্র মানবজাতির ইমামরূপে তথা নেতারূপে তথা পথপ্রদর্শকরূপে আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন। হজরত ইব্রাহীম (আ.)-কে ইহদি জাতি, খ্রিস্টানি জাতি এবং আর্য মুসলমানদের তথা নামেমাত্র যারা মুসলমান তাদের কাহারও নেতা নির্বাচিত করার কথাটি আল্লাহ না বলে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির ইমাম তথা নেতারূপে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর সত্যে হজরত ইব্রাহীম (আ.) সত্যের প্রতিমূর্তিরূপে প্রতিভাত হলেন। আল্লাহর সত্যে যিনি পরিপূর্ণরূপে অবগাহন করতে পেরেছেন তাকেই বাক্বানেওয়াজ্জ বলা হয়, আবার ওয়াজ্জহ্লাহ তথা আল্লাহর চেহারাও বলা হয়। হিন্দু-ধর্মে এই জাতীয় মহাপুরুষকে নরনারায়ণ বলা হয়। হজরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহকে এই বলে প্রশ্ন করলেন যে, এই জাতীয় নির্বাচনটি আমার বংশধরের মধ্য হইতেও কি করা হইবে? আল্লাহ সরাসরি কোনো জবাব হজরত ইব্রাহীমকে (আ.) না দিয়ে স্পষ্ট বলে দিলেন এই বলে যে, আমার ওয়াদা, আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের জন্য নয়। এই কথাতে ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি হজরত ইব্রাহীমের (আ.) বংশধরের মধ্যেও কেহ জালেমরূপে আল্লাহর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তাহলে সে যত কিছুই হোক না কেন জালেমরূপেই ধরে নেওয়া হবে। ইহা একটি অপ্রিয় সত্য কথা। ইহার জলজ্যন্ত উদাহরণটি আমরা সহজেই তুলে ধরতে পারি যে, মহানবির আপন চাচা আবু লাহিব এবং আবু জাহেল নবির বংশের হয়েও

তথা রক্তের সম্পর্ক থাকার পরও ইতিহাসের পাতায় বিকৃতরূপেই দেখতে পাই। আমরা কেহই মহানবির রক্তের বংশধর হলেও আবু লাহাব এবং আবু জাহেলকে সৈয়দ আবু লাহাব এবং সৈয়দ আবু জাহেল ভুলেও বলবো না। এখানেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহানবির নুরের বংশধরটি আসল বংশধর।

১২৫. ওয়া (এবং) ইউ (যখন) জাআলনা (আমরা নির্বাচন করিলাম) বাইতা (ঘরকে) মাসাবাতান (মিলনকেন্দ্র, ঘাটি, মানুষের ফিরিয়া যাইবার স্থান) লিন্নাসি (মানুষদের জন্য, মানবজাতির জন্য, লোকদের জন্য) ওয়া (এবং) আম্নানু (নিরাপত্তা) ওয়া (এবং) ইত্তাখিছু (গ্রহণ করো) মিন্ (হইতে) মাকামি-ইব্রাহিমা (ইব্রাহিমের মাকামকে) মুসাললান (সালাতের স্থান, নামাজের স্থান হিসাবে) ওয়া (এবং) আহিদ্না (আমরা তাগিদ করিয়াছিলাম, আমরা প্রতিশ্রুতি লইয়াছি) ইনা (দিকে, প্রতি) ইব্রাহিমা (ইব্রাহিমের) ওয়া (এবং) ইসমাইলা (ইসমাইলের) আন (যে, এই যে, হইতে) তাহিরা (পবিত্র রাখা, পাক রাখা) বাইতিয়া (তোমার ঘরটিকে, আমার গৃহটিকে) লিত্তোয়ায়িফিনা (তওয়াফকারীদের জন্য) ওয়া (এবং) আকিফিনা (ইত্তেকাফকারীদের জন্য, আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য) ওয়া (এবং) রুকুকা (রুকুকারীদের) ইসসুজ্জুদে (সেজ্জদাকারীদের জন্য)।

এবং যখন আমরা (অল্লীহ) ঘরটিকে মানুষদের জন্য মিলনকেন্দ্র (রূপে) নির্বাচন করিলাম। এবং নিরাপত্তার (জায়গা হিসাবে) এবং গ্রহণ করো মোকামে ইব্রাহিম হইতে মুসালা (নামাজের জায়গা) হিসাবে এবং আমরা প্রতিশ্রুতি রাখিলাম ইব্রাহিম এবং ইসমাইলের দিকে যেন পবিত্র করে আমার ঘরকে তওয়াফকারীদের জন্য এবং আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য এবং রুকুকারী (এবং) সেজ্জদাকারীদের (জন্য)।

এই আয়াতে প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে আম্মানদেরকে তথা ইমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে অথবা মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে অথবা কোনো নির্দিষ্ট দলের লোকদের উদ্দেশ্য করে না বলে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন যে আমার ঘরটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি চমৎকার মিলনকেন্দ্র। আল্লাহর এই ঘরটি বলতে কোন ঘরটির কথা বলা হয়েছে? ইহা কি ইট-পাথরের তৈরি আল্লাহর ঘর, নাকি মানবদেহে অবস্থিত কলবাটি? ইট-পাথরের তৈরি ঘরটিকে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে সমগ্র মানবজাতির মিলনকেন্দ্ররূপে কাঁভাবে বিবেচিত হয়? বরং একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের মিলনকেন্দ্ররূপে যদি গৃহিত হয়ে থাকে তাহলে 'মাসাবাতান লিন্নাসি'-কে মানবজাতির মিলনকেন্দ্ররূপে কেমন করে গ্রহণ করা যায়? কোরান যেখানে 'মাসাবাতান লিন্নাসি' বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, সেখানে 'মাসাবাতান মুসলমান'-রূপে গ্রহণ করলে কি সার্বজনীন ভাবধারাটি অক্ষুণ্ণ থাকে? যদি বলেন, থাকে - তাহলে অধম লিখকের বলার কিছু নাই। যদি একান্তই ম্বেজাজি ঘরটি আল্লাহর ঘর হয়ে থাকে তাহলে বায়তুল মোকাদ্দাসের স্থানটি কোথায় গিয়ে দাড়াইবে? ইহা কি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির দলীয় দর্শন নাকি আল্লাহর সার্বজনীন দর্শন? আল্লাহ 'মাসাবাতান আম্মান' তথা 'ইমানদারদের ঘরটি' না বলে 'মাসাবাতান লিন্নাসি' তথা 'সমগ্র মানবজাতির ঘর' বলে কেন ঘোষণা দিলেন?

এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি করতে গিয়ে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতি তার কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরের প্রথম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'কাবাঘরকে মানবদেহের প্রতীক করা হইয়াছে। তাই ইহাকে সার্বজনীন নিরাপত্তার স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। মানবদেহ নিরাপত্তাহীন। যখন ইহা শেরেক শূন্য হইয়া আপন নফসের সহিত যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করে উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া। - বর্তমান লেখক] শুদ্ধ হয় তখন ইহা নিরাপত্তা লাভ করে [এবং সার্বজনীন ফেরেশতাদের

দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করে। - বর্তমান লেখক।। এইরূপ ব্যক্তিগণই জগৎধরু।
হজরত ইবরাহিম এইরূপ একজন আদর্শ ব্যক্তি। তাহার মোকাম অর্থ তাহার
মর্যাদার স্তর হইতে সালাতের অনুশীলন গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া
হইতেছে। মোকামে ইবরাহিমকে মুসাল্লারূপে গ্রহণ করো - এইরূপ না বলিয়া
তাহার মোকাম হইতে মুসাল্লা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। মুসাল্লা
অর্থ সালাতের আসন অর্থাৎ অবস্থান। ইবরাহিমের (আ.) মর্যাদাশীল
সালাতের যে উচ্চাঙ্গ তাহা মুসাল্লারূপে হঠাৎ কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না।
এই জন্য উহা হইতে আসন গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। যাহার
পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেইরূপ শুদ্ধ মর্যাদা হইতে সে ততটুকুই গ্রহণ করিতে
পারিবে। কিন্তু আদর্শরূপে সাক্ষ্য থাকিবে তাহার উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন স্তর।

যিনি মানবজাতির ইমামরূপে নিয়োজিত হন তাহার কর্তব্য হইল রবের
ঘরকে পবিত্র করা। মানবদেহ রবের ঘর। ইহাকে পবিত্র করিবার সকল ব্যবস্থা
অবশ্য এইরূপ ইমামগণ গ্রহণ করিবেন। এই পথের পথিক হইতে না চাহিলে
কাহাকেও পবিত্র করা যায় না। তাহার গুরুরূপে, সেইসব মানুষের
চিত্তশুদ্ধিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন যাহারা 'তোয়াফকারী' অর্থাৎ আত্মদর্শন
অনুশীলনকারী সাধক। এবং যাহারা দঃখ হইতে নিরাপত্তালাভের জন্য ইহাতে
অশ্রিয় গ্রহণকারী। এবং যাহারা সেজদায় পৌছিবার জন্য রুকু করে অর্থাৎ প্ৰণত
হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট নিজেই সন্মপণ করে। যাহারা সালাত অবলম্বন করিয়া
আত্মশুদ্ধি অর্জনে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া তোলা যায় না। উক্ত
তিন শ্রেণীর ঘরকেই কেবল পবিত্র করা হইয়া থাকে।

১২৬. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) কালা (বলিলেন) ইবরাহিম (ইবরাহিম)
রাববি (হে আমার রব, হে আমার প্রতিপালক) ইজ্জান (আপনি বানাইয়া
দেন, আপনি করিয়া দেন, আপনি রাখুন) হাজা (এই) বানাদান (নগরকে,
শহরকে) আমিনান (নিরাপদ, পূর্ণ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, আপুৎশন্য, নির্বিঘ্ন,
বিপদমুক্ত) ওয়ারজুক (এবং রেজেক দেন) আলাহ (ইহার অধিবাসীদের) মিন
(হইতে) সামারাতি (ফলসমূহ, ফলমূলাদি) মান (যে কেহ) আমানা (ইমান
আনে) মিনহম (তাহাদের মধ্যে) বিনাহি (আলাহর সহিত, আলাহর উপর)
ওয়া (এবং) ইয়াওমি (দিনে) আখিরি (আখেরাতের) কালী (আলাহ
বলিলেন) ওয়া (এবং) মান (যে কেহ) কাফারা (কুফরি করে)
ফাউমাততিউহম (সুতরাং তাহাকেও জীবন-সামগ্রী দিবেন) কালিলান (কিছু
সময় পর্যন্ত, কিছুদিন পর্যন্ত) সুম্মা (তারপর) আদতোয়ারকহ (তাহাকে আমি
বাধ্য করিব) ইলা (দিকে) আজাবি (আজাব) নার (আপ্তন) ওয়া (এবং)
বিসাল (কতই না নিকৃষ্ট, অতি নিকৃষ্ট) মাসির (স্থান, জায়গা, ঠাই)।

□□ এবং যখন ইবরাহিম বলিয়াছিলেন, হে আমার রব, এই নগরকে
বানাইয়া দিন নিরাপদ এবং ইহার অধিবাসীদের রেজেক দিন ফলমূলাদি
হইতে, যে-কেহ ইমান আনে তাহাদের মধ্যে আলাহর উপর এবং আখেরাতের
দিনে। (আলাহ) বলিলেন, এবং যে-কেহ কুফরি করিবে সুতরাং তাহাকেও
জীবন-সামগ্রী দিব কিছু সময় পর্যন্ত তারপর তাহাকে আমি বাধ্য করিব
আপ্তনের আজাবের দিকে। এবং কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

□ এই আয়াতে হজরত ইবরাহিম (আ.) যে-শহরের নিরাপত্তাটি চেয়েছেন
উহা কি মানবদেহে অবস্থিত কলব নামক শহর, নাকি মেজাজি শহর মক্কা?
অনেকবার বলা হয়েছে যে, মেজাজি বিষয়টি না থাকলে হাকিকি বিষয়টি
বোঝাতে কষ্ট হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বোঝানোই যায় না - কিন্তু আলাহ
কোরান-এ মেজাজি এবং হাকিকির মিলন ঘটিয়ে একেটি বিষয়কে এত
সুন্দর করে ব্যাখ্যে দিয়েছেন যে, কোনো মানুষের পক্ষেই এরকম করাটা প্রায়
অসম্ভব ব্যাপার। যে-ব্যক্তি কুফরি করে আপ্তনই হলো তার ঠিকানা। মানুষ
কখন কুফরি করে? একটি মানুষের সঙ্গে যতদিন খান্নাসরূপী শয়তানটি

অবস্থান করে ততদিনই সেই ব্যক্তিটি কল্পবেশি কুফরিতে ডুবে থাকে। সুতরাং খান্নাসরূপী শয়তানমুক্ত তোহিদ জীবনটি মুখে বলা যত সহজ বাস্তবে ততটুকু নয়। সুতরাং মেজাজি শহর এবং মেজাজি কুফরি করার বিষয়টি নিয়ে আমাদের গবেষণা করা উচিত আবার গবেষণার প্রশ্নেও এই কথাটি থেকে যায় যে, কে গবেষণা করবে? আপন কলবে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপনার মধ্যে ধারণ করে গবেষণা করবে, নাকি আপন কলব হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিয়ে গবেষণা করবে? এই প্রশ্নের উত্তরটি এতই সূক্ষ্ম যে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেও ধরাটি কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং আপন-আপন তকদির এবং আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বুঝে আসাটা কষ্টকর বৈ কি!

১২৭. ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) ইয়াবফাউ (উঠতে উঠায়) ইবরাহিম (ইবরাহিম) কাওয়াইদা (ভিত্তি, প্রাচীর, বনিয়াদ, দেওয়াল) মিন (হইতে) বাইতি (ঘরের) ওয়া (এবং) ইসমাইল (ইসমাইল), রাব্বানা (হে আমাদের রব, হে আমাদের প্রভু) তাকাব্বালু (কবুল করুন, গ্রহণ করুন) মিননা (আমাদের হইতে) ইন্নাকা (নিশ্চয়ই আপনি) আন্তা (আপনিই, তুমিই) সান্নিউ (শোতা, শ্রবণকারী) আলিমু (সব কিছু জানেন)।

□□ এবং যখন ইবরাহিম ঘরটি হইতে ভিত্তি উঠায় এবং ইসমাইল। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের হইতে গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি, আপনিই শ্রবণকারী, সব কিছু জানেন।

□ মানবদেহটি আল্লাহর আসল ঘর। এই ঘরেই আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করেন এবং আল্লাহ সঙ্গত সৃষ্টিরাজ্যের আর কোথাও জাতরূপে অবস্থান না করে সেফাতরূপে অবস্থান করেন। এই মানবদেহ নামক ঘরটিকে উন্নত করে তোলাই মহাপুরুষদের কাজ। এই দুই মহাপুরুষ রবের ঘর হতে তথা মানবদেহসমূহ হতে বিশেষ-বিশেষ ঘরকে আত্মদর্শনের ধ্যানসাধনার সাহায্যে উন্নত করলেন তথা মর্যাদাশীল করে তুললেন এবং রবের নিকট প্রার্থনার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যেন তাদেরকেও উন্নত স্তরে গ্রহণ করে নেন। নিশ্চয়ই আল্লাহই শোনে এবং জানে। শ্রবণ এবং দর্শন এই দুটি অতীব চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে নিজের আয়ত্তে আনলেই তথা পরিপূর্ণরূপে কন্ট্রোল হয়ে গেলেই সেই মানুষটি আল্লাহর প্রধান দুইটি গুণে গুণাবৃত হয়ে যায় এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে আল্লাহর নিকটগামী হয়। মানবদেহের ভিত্তি খুবই দুর্বল এবং নাজুক। ইহাকে কিছুটা উন্নত করার পর বিশ্বরবের নিকট প্রার্থনার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। হজরত ইবরাহিম (আ.) কাবা ঘরের প্রতিষ্ঠাতা নাকি সংস্কারক এই বিষয়েও মতভেদ আছে। তবে হজরত ইবরাহিমের (আ.) সময় হতেই বিশ্বমুসলিমের মেজাজি হজ্জ সম্পাদন-কেন্দ্র হিসাবে তিনিই যে ইহার প্রতিষ্ঠাতা ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মেজাজি হজ্জ সম্পাদনের গুরুত্ব এবং ইহার তাৎপর্য হজরত ইবরাহিম (আ.) হতেই প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বমুসলিম একেই প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এই ঘরটির মেজাজি নাম হলো কাবা ঘর অথবা প্রথম ঘর তথা বাইতুল আতিক। এই বাইতুল আতিকে সমবেত হয়ে যে মেজাজি হজ্জকর্মটি সম্পন্ন করতে হয় উহার সঙ্গে তিনটি মেজাজি শয়তানকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মেজাজি শয়তানকে পাখর হুড়ে মারার মেজাজি ব্যবস্থাটি এজন্যই রাখা হয়েছে যে, প্রতিনিয়ত একটি মানুষ অদৃশ্য হাকিকি পাখরের আঘাত খেয়ে চলছে প্রতিনিয়ত। এই শয়তানের প্রতিনিয়ত পাখরের আঘাত খাওয়া হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় তারই বিরাট শিক্ষাটি মেজাজি হজ্জ এবং তিনটি মেজাজি শয়তানকে মেজাজি পাখর হুড়ে মারার ব্যবস্থাপত্রটিতে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেউ ইহার আসল রহস্যটি বুঝতে পারে, আবার কেহ বুঝতে পারে না। পারাটাও তকদির এবং না পারাটাও তকদির। কারণ একটি মানবশিশু জন্মগ্রহণ করার আগেই একটি সুনির্দিষ্ট তকদিরের বৃত্ত নিয়ে

ধরাধামে আগমন করে। এরকম তকদিরকে খণ্ডানো যায় কিনা অধম লিখকের জানা নাই।

১২৮. *রাব্বানা* (হে আমাদের রব, হে আমাদের প্রতিপালক, হে আমাদের সদাপ্রভু) *ওয়া* (এবং) *আল্লা* (আমাদেরকে বান্ধাও, আমাদেরকে নির্বাচিত করো, আমাদেরকে গ্রহণ করো) *মুসলিমাইনে* (দুইজনকে মুসলমান, দুইজনকে সর্বাপেক্ষা অনুগত, দুইজনকে সর্বোত্তম অধীন) *লাকা* (আপনারই জন্য) *ওয়া* (এবং) *মিন্* (ইহাতে) *জুবরিসয়াতিনা* (আমাদের বংশধর) *উম্মাতান্* (একটি জাতি) *মুসলিমাতান্* (একটি মুসলমান) *লাকা* (আপনারই জন্য) *ওয়া* (এবং) *আরিনা* (আমাদেরকে দেখান) *মানাসিকানা* (আমাদের এবাদতের নিয়মপদ্ধতি, আমাদের এবাদতের পন্থা, আমাদের ভক্তিনিষ্ঠা) *ওয়া* (এবং) *তব্* (আপনি ক্রমা করুন, ফিরিয়া যান, ধাবিত হওয়া) *আলাইনা* (আমাদের উপর) *ইন্নাকা* (নিশ্চয়ই আপনি) *আনতা* (আপনিই) *তাউয়াবু* (ক্রমাশীল, রহিম)।

□ হে আমার রব এবং আমাদেরকে বানান উভয়কে মুসলমান আপনারই জন্য এবং আমাদের বংশধর ইহাতে একটি জাতি (যাহারা) মুসলমান (ইহা আপনারই জন্য)। এবং আমাদেরকে দেখান আমাদের এবাদতের নিয়মপদ্ধতি এবং আমাদের উপর আপনি ক্রমাশীল হন। নিশ্চয়ই আপনি, আপনিই রহিমরূপী ক্রমাশীল (রহমানরূপী ক্রমাশীল নন)।

□ এই আয়াতে হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং হজরত ইসমাইল (আ.) দুজনই জাদরেল নবি এবং এবং রসুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন উভয়কে মুসলমান বানাতে। এখন প্রশ্ন হলো, এত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন দুইজন জাদরেল নবি মুসলমান বানাবার যে-প্রার্থনাটি আল্লাহর দরবারে করছেন সেই প্রার্থনাটি কি এই দুই নবির জন্য, নাকি অন্যদের জন্য? আমার মনে হয় আল্লাহর দরবারে এরকম আবেদনটি একটি অত্যন্ত বিনয়ের আবেদন। কারণ নবি হলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করার পরও মুসলমান বানাবার আবেদনটি ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গবেষণার বিষয়। উভয় নবি আল্লাহর দরবারে ইহাও প্রার্থনা করলেন যে একটি বিশেষ জাতিকে মুসলমান বানিয়ে দিন এবং এই মুসলমান বানিয়ে দেবার চাওয়াটি কেবলমাত্র আপনারই জন্য - অর্থাৎ, সকল যুগেই যেন জগৎবাসিকে হেদায়েতের শিক্ষাটি দিয়ে যেতে পারে।

হিন্দু-ধর্মেও বলা হয়ে থাকে যে, দুনিয়ার লোভ-মোহের জগৎকে যে বা যিনি জয় করতে পেরেছে তথা 'ভব' নামক লোভ-মোহের সিন্ধুকে অতিক্রম করতে পারলেই হিন্দু হওয়া যায়। এখন এই জাতীয় হিন্দু আমার মনে হয় কমই পাওয়া যাবে। সেই রকম এই আয়াতে বর্ণিত মুসলমান হওয়াটাও খুবই কষ্টসাধ্যের ব্যাপার। হিন্দু-ধর্মে বস্তুজগতের বৈষয়িক লোভ-লালসার মধ্যে ডুবে থাকাটিকে যেমন মায়ী বলা হয় তেমনি জগতের ছোট-বড় সব ধর্মেই বস্তুবাদের কলুষিত ধ্যানধারণা হতে দূরে থাকার অনেক রকম আদেশ-উপদেশটি দেখতে পাই। কোরান-এর বর্ণিত এই জাতীয় মুসলমান হবার যে-প্রার্থনাটি দুইজন জাদরেল নবি করলেন উহা কি সাধারণ মুসলমান নাকি আমিতুবর্জিত? আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে সেই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার নামই হলো আমিতু ত্যাগ করা, তথা হুম্মি মিটিয়ে ফেলা, তথা খুদি হতে নিজেকে মুক্ত রাখা। যুগে-যুগেই সর্বধর্মেই একটি বিশেষ শ্রেণীকে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর নৈকট্যের প্রশ্নে ধ্যানসাধনাটি করতে। এই ধ্যানসাধনাটি প্রয়োগের প্রশ্নে অনেক রকম হতে বাধ্য, কিন্তু মূল বিষয়টি কি একই নয়? কারণ আয়াতের শেষে আল্লাহকে আমরা 'রহমান'-রূপে পাচ্ছি না, কারণ 'আমিতু' ত্যাগের ধ্যানসাধনায় যারা মশগুল থাকেন তাঁদেরকে আল্লাহ যখন উদ্ধার করে নেন

সেই উদ্ধার করার রূপটিই হলো 'রহিম'-রূপ ধারণ করা। কারণ 'রহমান'-রূপে হলো একটি সাধারণ দান। তাই কোরান-এর কোথাও গফুরর রহমান পাওয়া যায় না, বরং গফুরর রহিম-রূপেই দেখতে পাই।

১২৯. রাব্বানা (আমাদের রব) ওয়াবাস (এবং পাঠাও) ফিহিম (তাহাদের মধ্যে) রাসুলান (একজন রসুল) মিনহুম (তাহাদের মধ্য হইতে) ইয়াতলু (তিনি তেলাওয়াত করিবেন) আলাইহিম (তাহাদের উপর) আয়াতিকা (আপনার আয়াতগুলিকে) ওয়া (এবং) ইউয়াল্লিমহুমলু (তিনি তাহাদেরকে শিখাইবেন) কিতাবা (কেতাব) ওয়াল (এবং) হিকমাতা (হেকমত, বিজ্ঞান, রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান) ওয়া (এবং) ইউজাক্কিহিম (তাহাদের পবিত্র করিবে, তাহাদের পাপমুক্ত করিবে, তাহাদের পরিশুদ্ধ করিবে) ইন্বাকা (নিশ্চয়ই আপনি) আনতা (আপনিই) আজ্জিল (প্রবল ক্ষমতাবান বা শক্তিমান, পরাক্রমশালী) হাকিম (হেকমতের অধিকারী)।

□ (হে) আমাদের রব, এবং পাঠান তাহাদের মধ্যে একজন রসুল তাহাদের মধ্য হইতে তিনি তেলাওয়াত করিবেন তাহাদের উপর আপনার আয়াতগুলিকে এবং তাহাদেরকে শিখাইবেন কেতাব এবং হেকমত এবং তাহাদের পরিশুদ্ধ করিবেন। নিশ্চয়ই আপনি, আপনিই পরাক্রমশালী হেকমতের অধিকারী।

□ এই আয়াতে বর্ণিত একজন রসুল কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তো ননই, বরং অক্ষরপরিচয়হীন। এই রসুলই তেলাওয়াত করবেন আয়াত, হেকমত এবং কেতাবের জ্ঞান এবং পরিশুদ্ধ করবেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই পরিশুদ্ধতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কি দৈহিক পরিশুদ্ধতা, নাকি আত্মিক পরিশুদ্ধতা, না উভয়ই? ইহা কি ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং মাসলা-মাসায়েল শিখবার পবিত্রতা, নাকি আমিত ত্যাগ করার পবিত্রতা? অহমকে ত্যাগ করতে পারলেই অহকার দূরীভূত হয়। মুহানবি বলেছেন যে, আশ্রিত যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে তদ্রূপ অহকারও মানবীয় গুণগুলোকে খেয়ে ফেলে। মুহানবি বলেছেন, এক সরিষা পরিমাণ অহকার যে-অস্তরে বাস করে সে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং এই অহকার এবং অহম ত্যাগ করবার বিধি-বিধান এবং মাসলা-মাসায়েলের জ্ঞান লাভ করাটাই সমীচীন বলে মনে করি। হুজরত ইবরাহিম (আ.) তাই প্রার্থনা করলেন যেন তার বংশধর হতে তাদেরই মাঝে একজন রসুল পাঠানো হয় যিনি জগতসমূহের রবের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিবেন। জগতসমূহের যিনি রব, তার জ্ঞান-রূপ প্রকাশ ও বিকাশটি হলো এই মানবদেহে, তাই 'আল কেতাব' বলতেও অনেক সময় এই মানবদেহটিকেই বোঝানো হয়েছে। সেই রসুল একটি মানবসত্তার পরিচয়জ্ঞান দান করেন মানুষকে কেমন করে আল্লাহর ওলি বানানো যায় উহাই শিক্ষা দেবার জন্য। নফস যোগ খান্নাস সমান দুইজন হয়ে গেল। একটি দেহে দুইজনের অবস্থানটিকে শেরেক বলা হয়। এই শেরেকের কালিমা হতে নফসকে পরিশুদ্ধ করে মানুষকে ওলি-আল্লাহ পরিণত করতে রসুলের আগমন। একটি নফসের সঙ্গে যতকণ খান্নাস যুক্ত থাকবে ততকণ সেই নফসটি শেরেকে বাস করে। নফসের শুদ্ধিকরণ তথা শেরেক হতে মুক্তি পেতে হলে খান্নাসকে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যই একজন রসুলের প্রয়োজন। সুতরাং হুজরত ইবরাহিমের (আ.) এই প্রার্থনাটি একটি সর্বিজনীন প্রার্থনা। তাছাড়া আল্লাহ কোরান-এর অন্যত্র নিজেকে 'সামাদ' বলে পরিচয় দিয়েছেন। 'সামাদ' অর্থটি হলো, যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং 'যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন' বাক্যটিকে একটি শব্দে আনতে গেলেই সেই শব্দটি হয় 'মহানিরপেক্ষ'। সুতরাং আল্লাহ মহানিরপেক্ষ। যেহেতু আল্লাহ মহানিরপেক্ষ তাই তার কালিমা তথা বাণীসমূহও মহানিরপেক্ষ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাই হলো ধর্ম। ধর্মান্ধতা নহে। কারণ ধর্মান্ধতা গণ্ডির বলয় হতে আগমন করে।

১৩০. ওয়া (এবং) মান (যে) ইয়ারগাব (বিম্ব হইয়াছে, মুখ ফিরাইয়াছে, অন্যপথে সরিয়াছে, প্রস্থান করিয়াছে, অপছন্দ করিয়াছে) আন (হইতে, যে, এই যে) মিল্লাতি (মিল্লাত) ইবরাহিমা (ইবরাহিমের) ইল্লা (ব্যতীত, ছাড়া) মান (যে) সাফিহা (নিবোধ করিয়াছে, সে আহাম্মক বানাইয়া দিয়াছে, সে বেয়াকুফ হইয়াছে, সে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে) নাকসাহ (তাহার নফসকে) ওয়া (এবং) লাকাদু (নিশ্চয়) তাফাইনাহু (তাহাকে আমরা আলাহ বাছাই করিয়াছি, আমরা তাহাকে মনোনীত করিয়াছি) ফি (মধ্যে) দুনিয়া (দুনিয়ার) ওয়া (এবং) ইন্নাহ (নিশ্চয়ই তিনি) ফি (মধ্যে) আখিরাতি (আখেরাতে) লাম্বিনাস (অবশ্যই অস্ত্রভুক্ত, অবশ্যই অস্ত্রগত, অবশ্যই মধ্যস্থিত) সালিহিন (সৎকর্মশীলগণের, সৎ লোকদের, যাহারা ভালো কাজ করে, যাহারা লোকহিতকর কর্ম করে, যাহারা পণ্যকর্ম করে)।

এবং যে মুখ ফিরাইয়াছে ইবরাহিমের মিল্লাত হইতে একমাত্র যে নফসটিকে আহাম্মক (নিবোধ) বানাইয়াছে এবং নিশ্চয়ই আমরা (আলাহ) বাছাই করিয়াছি তাহাকে দুনিয়ার মধ্যে। এবং নিশ্চয়ই তিনি আখেরাতের মধ্যে অবশ্যই সৎলোকদের মধ্যে অস্ত্রভুক্ত হইবেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে তার নফসটিকে মিল্লাতে ইবরাহিম হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে তো একটা নিবোধ তথা নিজেরই অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করলো, অথচ বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিষয়টি বুঝতে পারে না। অথবা বুঝবার সামান্যতম শক্তিও থাকে না। হজরত ইবরাহিম (আ.) যে আখেরাতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৎকর্মশীলদের অস্ত্রভুক্ত সেই কথাটিও এই আয়াতে ঘোষণা করা হলো। একটি নফস তথা একটি মানুষ নিজের কর্মফলের মধ্য দিয়েই নিবোধ অথবা মুখ কিনা তা ফুটে ওঠে। সত্যকে গ্রহণ করতে হলেই গুরুমুখী হতে হয়, কিন্তু এই রহস্যটি না বুঝতে পেরে গুরুমুখী হয় না। হজরত ইবরাহিমের (আ.) আদর্শ এবং পরিপূর্ণ দর্শনটি একমাত্র মুখরা ছাড়া আর কেহই অপছন্দ করে না। মুখেরা নিজেদের কর্মফলের কারণে জগৎগুরু হজরত ইবরাহিমের (আ.) নির্দেশিত মুক্তিমুখী না হয়ে কলুষিত বহুবাদের পুজারি হয়ে যায়। ইহাই পরিপূর্ণ শেবেক। জগৎগুরু হজরত ইবরাহিম (আ.) যে সৎকর্মশীলগণের মধ্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন সেই কথাটি বলা হয়েছে। হজরত ইবরাহিমের (আ.) মতো গুরুকে অস্বীকার করে যারা ধর্মদর্শনে অবস্থান করার কথাটি ঘোষণা করে তারা মূলতঃ আসল বিষয়টি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৩১. ইজ (যখন) কালা (বলিয়াছিলেন) লাহ (তাহাকে) রাব্বহ (তাঁহার রব) আসলিম (আত্মসমর্পণ করুন) কালা (তিনি [ইবরাহিম] বলিয়াছিলেন) আসলামত (আমি আত্মসমর্পণ করিলাম) লিরাবি (রবের জন্য) আলামিন (জগৎসমূহের)।

যখন তাঁহার রব তাঁহার জন্য বলিলেন, আত্মসমর্পণ করুন। তিনি (ইবরাহিম) বলিয়াছিলেন, আত্মসমর্পণ করিলাম জগৎসমূহের রবের জন্য।

এই আয়াতের হবহ অনুবাদটি করতে গিয়ে বাক্যের সৌন্দর্য ও লালিত্য হারিয়ে যায়, কিন্তু পাঠক যাতে বিষয়টি হবহ পায় তারই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাই।

১৩২. ওয়া (এবং) ওয়াসআ (ওসিয়ত করিয়াছিলেন, নির্দেশ দিয়াছিলেন, নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিলেন) বিহা (এই সঙ্কে, সঙ্গে, তাহাকে) ইবরাহিম (ইবরাহিম) বানিহি (তাঁহার সন্তানদেরকে, তাঁহার পুত্রগণকে) ওয়া (এবং) ইয়াকুব (ইয়াকুব) ইয়াবানিয়া (হে আমার সন্তানগণ, হে আমার পুত্রগণ) ইন্নী (নিশ্চয়ই) আলাহ (আলাহ) ইস্তাফা (পছন্দ করিয়াছেন, মনোনীত

করিয়াছেন) *লাকুম্ব* (তোমাদের জন্য) *দীনা* (দীনকে, ধর্মকে, নীতিকে) *ফালা* (সুতরাং না) *তাম্বতননা* (তোমরা মৃত্যুবরণ করিও) *ইন্না* (ব্যতীত) *ওয়াআনতুম্ব* (এবং তোমরা) *মুসলিমুন* (মুসলমান হওয়া, আত্মসমর্পণকারী হওয়া, অনুগত হওয়া, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করা, মতানুবর্তী হওয়া, অনুসরণকারী হওয়া)।

এবং ওসিয়ত করিয়াছিলেন এই সঙ্ক্ষে ইবরাহিম তাঁহার সন্তাদেরকে এবং ইয়াকুব। হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করিয়াছেন তোমাদের জন্য দীনকে সুতরাং তোমরা মৃত্যুবরণ করিও না মুসলমান হওয়া ব্যতীত।

এই আয়াতের দ্বারা ইহাই দিবালোকের মতো প্রমাণিত হলো যে, *দুনিয়াতে যত নবি এবং রসুলের আগমন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাদের অনুসারীদেরকে মুসলমান হবার উপদেশটি দিয়ে গেছেন।* এই মুসলমান শব্দটি কত ব্যাপক, কত বিস্তৃত, কত সার্বজনীন! এই মুসলমান হওয়াটা মোটেই নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাটাকেই মুসলমান হওয়া বোঝানো হয়েছে। ইহা কি মুখের আত্মসমর্পণ, নাকি কর্মের দ্বারা আত্মসমর্পণ? কেন এই আত্মসমর্পণ করতে হবে? এরকম শতশত প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু সবগুলো প্রশ্নের একটি উত্তর হলো : হে মানব, তোমার নফসের সঙ্গে কলুষিত প্রবৃত্তিটি তথা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তথা আমিতুকে তথা অহমকে তথা ইগোকে তথা হাম্বি-খুদিকে তাড়িয়ে দিয়ে নফসের নিকটে আল্লাহ যে বহুবচনের 'আমরা'-রূপটি ধারণ করে রুহ-রূপে অবস্থান করছেন উহাকেই নিজের মধ্যে পূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলার জন্য যুগে-যুগে, কালে-কালে দুই লক্ষ চক্ৰিশ হাজার নবি-রসুল তথা মহামানবেরা আস্তান করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং তার জাত-রূপটি নিয়ে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছেন। সঙ্গে নফস এবং খান্নাসও অবস্থান করছে। খান্নাস অপবিত্র, খান্নাস কলুষিত, খান্নাস মূল সত্তার পরিচয় হতে দূরে সরিয়ে রাখে নফসকে। নফস পবিত্র, নফস নিমল, নফস কলঙ্কহীন। কিন্তু যেইমাত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করে তখনই নফসটি কলুষিত হয়ে যায়। সুতরাং কর্ম বন্ধন নহে, কর্মের সঙ্গে খান্নাস নামক কামনার স্পর্শে কর্ম কলুষিত হয় এবং তখনই কর্ম বন্ধন হয়ে যায়। বন্ধনে মুক্তি নাই, মুক্তিতে বন্ধন নাই। এই অতীব মূল্যবান দর্শনটি প্রচার করে গেছেন নবি-রসুল এবং মহাপুরুষেরা। কেউ বুঝতে পারে, কেউ পারে না। এই পারা না-পারার ভেতরেও আরেকটি রহস্য লুকিয়ে আছে, যাহা বলা না বলা সমান কথা। কারণ বলা না-বলার আদেশ-উপদেশ এখানে কোনোই কাজে আসে না। তবে বহুরের পর বহুর ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে আল্লাহর 'রহিম'-রূপী দানের অবদানে সব কিছুই সম্ভব। সুতরাং চরম পর্যায়ের দর্শনে আল্লাহর মহান সৃষ্টিতে কোনো বিকৃতিমাত্র ভুল নাই।

১৩৩. *আম্ব* (অথবা, নয়তো) *কন্বতুম্ব* (তোমরা ছিলে) *শুহাদাআ* (উপস্থিত আছেন যারা, দৃষ্টিদানকারীগণ, সাক্ষ্যদানকারীগণ, শহিদগণ) *ইজ্জ* (যখন) *হাদারা* (হাজির হইয়াছিল, উপস্থিত হইয়াছিল) *ইয়াকুব* (ইয়াকুবের) *মাওত* (মৃত্যু, মরণ, প্রাণত্যাগ) *ইজ্জ* (যখন) *ফালা* ([ইয়াকুব] বলিয়াছিলেন) *লিওয়ানিহি* (তাঁহার ছেলেদের জন্য) *মা* (কাহার) *তাব্বদুন* (তোমরা এবাদত করিবে) *মিম্বাদি* (আমার পরে) *ফালু* ([ছেলেরা] বলিয়াছিলেন) *নাব্বদু* (আমরা এবাদত করিব) *ইলাহাকা* (আপনার ইলাকে) *ওয়া* (এবং) *ইলাহী* (ইলাহ) *আবাইকা* (আপনার পূর্বপুরুষদের) *ইবরাহিমা* (ইবরাহিমের) *ওয়া* (এবং) *ইসমাইলা* (ইসমাইলের) *ওয়া* (এবং) *ইসহাকা* (ইসহাকের) *ইলাহ* (ইলাহ) *ওয়াহেদান* (একই, এক) *ওয়া* (এবং) *নাহুনু* (আমরা) *লাহ* (তাঁহারই জন্য) *মুসলিমুন* (মুসলমান)।

□□ তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল ইয়াকুবের যখন তিনি বলিয়াছিলেন তাহার পুত্রদেরকে, তোমরা কাহার এবাদত করিবে আমার পরে? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এবাদত করিব আপনার ইলাহকে এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ইলাহকে, ইবরাহিমের এবং ইসমাইলের এবং ইসহাকের একই ইলাহ। এবং আমরা তাহারই জন্য মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।

□ এই আয়াতে হজরত ইয়াকুবের (আ.) নিকট মৃত্যু হাজির হবার সময়ে আল্লাহ কাদেরকে লক্ষ করে বলিলেন যে, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লক্ষ করে এই কথাটি বলা হয়ে থাকে তাহলে জম্মাত রবাদকে কেমন করে অস্বীকার করি? মানুষ পূর্ব হতেই যদি যে-কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে তখন সেই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে হাজারও দলিল উপস্থিত করলেও মনে নিতে কষ্ট হয়। ইহা মানবচরিত্রের একটি দুর্বলতম স্থানের উপর আঘাত করা। কত বকম ধানাইপানাই এবং মনগড়া কথা ও ব্যাখ্যা দিয়ে যে প্রতিষ্ঠা করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা! কারণ হজরত ইয়াকুবের (আ.) মৃত্যুঘটনার সময় আমরা কেমন করে উপস্থিত থাকতে পারি? যদি উপস্থিত শব্দটিকে সাক্ষী বলে চালিয়ে দিতে চাই তাহলেও তো ধোপে টেকে না, কারণ আমরা সেই সময়ে সেইখানে মৃত্যু ঘটান মুহূর্তে উপস্থিত না থাকলে সাক্ষীর প্রশ্নটি অব্যাহত হয়ে দাড়াইয়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো আর তা হলো, হজরত ইসহাক (আ.) হজরত ইসমাইল (আ.) এবং হজরত ইবরাহিম (আ.) - প্রত্যেক নবির ইলাহ একই ইলাহ এবং সমগ্র মানবজাতির ইলাহও একই ইলাহ। এই ইলাহের নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারলেই মুসলমান হওয়া যায়। যদিও মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তব স্বীকৃতিটি বাস্তবে ফুটিয়ে তোলাটাই হলো প্রকৃত স্বীকৃতি। শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় চাই বলে হাজারবার আউজবিল্লাহ পড়লেও শয়তান ছেড়ে দেয় না। তাহলে কী করলে, কেমন করে পড়লে, কী সব নিয়ম পদ্ধতি অবলম্বন করলে শয়তান আমাকে ছেড়ে দেবে এবং আমি মুসলমান হবো সেই শিক্ষাটি মূল এবং আসল শিক্ষা। ওয়াক্ফিয়া নামাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক বেশি। এবং দায়েমি সালাতের কথাটি হাদিসেও যেমন পাই, তেমনি সুরা মারেজ-এর ২৩ নম্বর আয়াতেও পাই। মুখে মুসলমান হয়ে গেলান্ন বললেই যে মুসলমান হওয়া যায় না, আগের এবং এই আয়াত দুটোতে পরিষ্কার বোঝা যায়। পরিষ্কার বোঝা যায়, কথা এবং কাজের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এক বিষয় নয়।

১৩৪. তিলকা (ওইটি, ওই) উম্মাতন (উম্মত) কাদ (অবশ্যই, নিশ্চয়ই) খালাত (অতীত হইয়াছে, গত হইয়াছে), লাহা (তাহার জন্য) মা (যাহা) কাসাবাত (সে অর্জন করিয়াছে, সে উপার্জন করিয়াছে) ওয়া (এবং) লাকুম (তোমাদের জন্য) মা (যাহা) কাসাততন (তুমি অথবা তোমরা উপার্জন করিয়াছ) ওয়া (এবং) লা (না) তাসআলিনা (তোমাকে অথবা তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাকে অথবা তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে) আম্মা (সেই সম্পর্কে, সেই বিষয়ে) কান (করিয়াছিল, করিয়া গিয়াছে) ইয়ামানুন (তাহার কাজ, তাহার কর্ম বিষয়ে)।

□□ ওই এক উম্মত নিশ্চয়ই অতীত হইয়াছে। তাহার জন্য যাহা সে অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ। এবং তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে না সেই বিষয়ে তাহারা (যে) কাজ করিয়াছিল।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি বৈষয়িক অথবা আধ্যাত্মিক যে-কোনো দর্শনের উপরেই বলা চলে। বৈষয়িক বিষয়টি নিয়েই আমাদের কাজ কারবার তাই বৈষয়িক ব্যাখ্যাটি অনেকে তথা বেশিরভাগ তফসিরকারক করে গেছেন।

হুজরত ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা আদর্শ উন্নতরূপে সেই যুগে, সেই কালে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে যারা মহাপুরুষ হয়েছিলেন তারা গত হয়েছেন। হুজরত ইবরাহিমের (আ.) অনুসারীরা তাঁদের মহৎকর্মের দ্বারা মহত্ব অর্জন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমরাও যে রকম কর্ম করে যাচ্ছি এবং যাব তার কর্মফল ভালো হোক অথবা মন্দ হোক উহা আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। হুজরত ইবরাহিমের (আ.) আদর্শ হতে ছুটে গিয়ে তার নামের উপর দল তৈরি করলেই সেই দল জগতের বুকে কোনো মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারে না এবং পারবেও না। ধর্ম-বিষয় হতে সত্যের আদর্শ যে যেমন অনুসরণ করবে সে তো তেমনই ফল পাবে। কেবল মহৎ নামটি সাইনবোর্ডরূপে ধরে রাখলেই চলবে না। কারণ এই রকম সাইনবোর্ড বুলিয়ে কৃতিত্ব এবং মজ্জি কোনোটাও অর্জন করা যায় না। উপস্থিত তথা জলজ্যাত একজন মহাপুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করে তথা মুসলমান হয়ে তার দেওয়া নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে খান্নাসমুজ্জির সাধনাটি করে যেতে হবে। নতবা দ্বাণ অথবা মজ্জি পাওয়া যায় না। এখানে উপস্থিত মহাপুরুষ কথাটি প্রজন্যই উল্লেখ করলাম যে, অনেককে উপস্থিত মহাপুরুষকে গ্রহণ না করে স্বপ্নে পাওয়া মহাপুরুষের মুরিদ ও খলিফা হয়ে গুরু সীজতে দেখি। এই জাতীয় গুরুদের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। অখণ্ড ভারতের গুরুবাদের যিনি সুলতান সেই খাজা মঙ্গনুদ্দিন চিশতি তো স্বপ্নে মুরিদ হন নি ও খেলাফত পান নি। তিনি তো পাক পাকিস্তানের যে-কোনো একজনের কাছে স্বপ্নে মুরিদ হওয়া ও খেলাফত পাবার কথাটি বলতে পারতেন। কারণ খাজা মঙ্গনুদ্দিন চিশতি মহানবির সরাসরি বংশের একজন মহামানবেরও মহামানব। খাজা মঙ্গনুদ্দিন চিশতি এমন একজন মহাপুরুষের কাছে মুরিদ হয়েছিলেন এবং খেলাফত পেয়েছিলেন যার মহানবির সঙ্গে রক্তের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। ওনার গুরু তথা পীরের নাম খাজা উসমান হারুনি। তাই আমরা আমাদের কর্মের দ্বারা যাহা অর্জন করে চলছি উহা আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। 'আমাদের কর্মফল' বাক্যটি বহুবচনে হলেও একবচনে বলতে হয় যে, আমার কর্মফল আমাকেই ভোগ করতে হবে এবং আমাকেই প্রশ্ন করা হবে।

১৩৫. ওয়া (এবং) কাল (তাহারা বলে) কন (তোমরা হও) হুদান (ইহদি) আও (অথবা) নাসারা (খ্রিস্টান) তাহতাদু (তোমরা হেদায়েত পাইবে) কল (বলো) বাল (বরং) মিল্লাতা (মিল্লাতের) ইবরাহিম (ইবরাহিমের) হানিফান (একনিষ্ঠ, একাগ্র, যে বিদ্রাস্তি এবং গোমরাহি ছাড়িয়া সোজা পথের দিকে বাকিয়া পড়ে, যে সত্য পথে চলে এবং বাতিল পথ পরিত্যাগ করে) ওয়া (এবং) মা (না) কানা (ছিল) মিনাল (অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্গত) মুশরিকিন (মুশরিকদের)।

এবং তাহারা বলে, তোমরা হও ইহদি অথবা খ্রিস্টান, (তাহা হইলে) হেদায়েত পাইবে। বলো, বরং ইবরাহিমের মিল্লাতকে একনিষ্ঠভাবে। এবং তিনি ছিলেন না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতে মিল্লাতে ইবরাহিমকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, যে গোমরাহি ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথে চলে, কারণ হুজরত ইবরাহিম (আ.) কখনই শেরেককারীদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। তাছাড়া একজন নবি ও রসুলের পক্ষে শেরেককারীদের অনুসরণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ নবির মাসুম। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইহদি এবং খ্রিস্টানরাও তো হুজরত মুসা (আ.) এবং হুজরত ইসা (আ.)-র উন্নত বলে দাবি করে। তাহলে আসলেই কি ইহদিরা মুসাকে অনুসরণ করে? এবং খ্রিস্টানেরাও কি হুজরত ইসা (আ.)-র অনুসরণ করে? যদি এরা সত্যিই নবির অনুসরণ করতো তাহলে দলীয় সাইনবোর্ডটি কেমন করে বুলতে পারে? যেহেতু মিল্লাতে ইবরাহিমের মধ্যে কোনো প্রকার দলীয় সাইনবোর্ড নাই তাই মিল্লাতে ইবরাহিম হলো একটি সার্বজনীন ধর্মদর্শন। যে-কোনো ধর্ম যখন দলীয়

সাইনবোর্ডের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন আর সার্বজনীনতা থাকে না, বরং থাকে দলীয় কতগুলো অনুষ্ঠান পালনের হস্তিত্ব। মুহিউদ্দিন ইব্রুল আরাবি এবং ম্যাগলানা জালালউদ্দিন রুমির প্রচারিত সুফিবাদ দর্শনটিতে দলীয় সাইনবোর্ডটি দেখা যায় না। সুতরাং সুফিবাদ সার্বজনীন। কোনো গণ্ডির ধর্মদর্শনের দ্বারা সুফিবাদ কখনই অচ্ছিন্ন হতে পারে না।

১৩৬. কুল (তোমরা বলো), আম্মান্না (আমরা ইমান আনিয়াছি) বিল্লাহি (আল্লাহর সহিত) ওয়া (এবং) মা (যাহা) উন্জিল্লা (নাযিল করা হইয়াছে) ইলান্না (আমাদের দিকে) ওয়া (এবং) মা (যাহা) উন্জিল্লা (নাযিল করা হইয়াছে) ইলা (দিকে) ইব্রাহিম্ম (ইব্রাহিমের) ওয়া (এবং) ইসমাইলা (ইসমাইলের) ওয়া (এবং) ইসহাক্কা (ইসহাকের) ওয়া (এবং) ইয়াকুবা (ইয়াকুবের) ওয়া (এবং) আস্বাতি (বংশধরদের) ওয়া (এবং) মা (যাহা) উতিয়া (দেওয়া হইয়াছে, দান করা হইয়াছে) মুসা (মুসাকে) ওয়া (এবং) ইসা (ইসাকে) ওয়া (এবং) মা (যাহা) উতিয়ান্ (দেওয়া হইয়াছে) নাবিইউনা (নবীদেরকে) মিন্ (হইতে) রাব্বিহিম্ (তাহাদের রব) লা (না) নুফাররিক্ (আমরা পার্থক্য করি, আমরা প্রভেদ করি, আমরা বিভিন্নতা করি, আমরা বৈসাদৃশ্য করি, আমরা মতভেদ করি, আমরা বিবাদ করি) বাইনা (মধ্যে, মাঝে) আহাদিন্ (কাহারও) মিন্হম্ (তাহাদের মধ্য হইতে) ওয়া (এবং) নাহনু (আমরা) নাহু (তাহারাই) মুসলিমিন্ (মুসলিম, মুসলমান)।

□□ তোমরা বলো, আমরা ইমান আনিয়াছি আল্লাহর সহিত এবং যাহা নাযিল করা হইয়াছে আমাদের দিকে এবং যাহা নাযিল করা হইয়াছে ইব্রাহিমের দিকে এবং ইসমাইলের এবং ইসহাকের এবং ইয়াকুবের এবং বংশধরদের এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে মুসাকে এবং ইসাকে এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে নবীদেরকে তাহাদের রব হইতে। আমরা পার্থক্য করি না কাহারও মাঝে তাহাদের মধ্য হইতে। এবং আমরা তাহারই জন্য মুসলমান।

□ এই আয়াতে নবি-রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করতে আল্লাহ সুরাসরি মানা করে দিয়েছেন। এমনকি কোনো অবস্থাতেই যেন পার্থক্য না করি। এবং পার্থক্য করার মন-মানসিকতা উকিঝুকি যেন না পারে তারই জন্য কিছু সংখ্যক নবীদের নামও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এবং নবীদের নুরের বংশধরদের বিষয়েও পার্থক্য করতে মানা করা হয়েছে। যেহেতু মানুষ পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটির দ্বারা যুক্ত অবস্থায় অবস্থান করে তাই পার্থক্য করার মন-মানসিকতাটি খান্নাসরূপী শয়তানই করে থাকে যাহা আমরা মূল চোখে দেখতে পাই না এবং পাবার কথাও নয়। খান্নাসের এই সুক্ষ্ম ধোকাটি পবিত্র নফসের সঙ্গে বাস করে দেওয়া হয় বলে ধরাটি খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ স্বভাবতই একটি দলগত গৃহপালিত সন্ত জন্মোয়ার। সন্ত এজন্যই বললাম যে কোনো জীবের মধ্যেই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয় নি, একমাত্র মানুষ এবং জিন ছাড়া। সুতরাং মানুষ নবীদের মাঝে ছোট-বড় করবেই এবং ছোট-বড় করে একটি তপ্তির ঢেঁকির তালে এবং মনে করে কত বড় বিরাট একটি মহৎ কাজ করে ফেললাম। অথচ ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে, মহানবির সামনে মহানবির অতীত প্রশংসা করাটি মহানবি পছন্দ করতেন না। যে নবি-রসুলেরা সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন সেই নবীদের কেমন করে ছোট-বড় করা যায়? প্রত্যেক নবি-রসুল পরিপূর্ণ নুরে মহান্মদিতে উদ্ভাসিত তথা একই নুর হতে প্রকাশিত এবং বিকশিত। সুতরাং নুরের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়? পার্থক্য করা যায় দেহগঠনের প্রশ্নে। একে নবির দেহগঠনের প্রশ্নে বিভিন্নতা থাকবেই। সুতরাং যদিও প্রত্যেক নবির দেহটি মহান্মদি নুরের দ্বারা আবৃত, কিন্তু নুর নুরই আর দেহ দেহই। মহানবি কি হজরত আবদুল্লাহ (আ.) এবং হজরত মা আমেনা (আ.)-এর ঔরসজাত

রুদ্ধ একটি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে বিরাজিত? মহানবি বলেন, 'আউয়ালুনা মুহাম্মদ, আওসাতুনা মুহাম্মদ, আখেরুনা মুহাম্মদ, কুললানা মুহাম্মদ। অর্থাৎ প্রথমেই আমরা মুহাম্মদ, মাঝখানেও আমরা মুহাম্মদ, শেষেও আমরা মুহাম্মদ এবং সর্বাবস্থায় আমরা মুহাম্মদ।

১৩৭. ফাইন্ (সূতরাং যদি) আম্মানু (তাহারা ইম্মান আনে) বিমিস্লে (সেইভাবে, সেই মতে) মা (যেমন) আম্মানুতুম (তোমরা ইম্মান আনিয়াছ) বিহি (ইহার উপর) ফাকাদিহ (সূতরাং নিশ্চয়ই) তাদাও (তাহারা সঠিক পথ পাইবে) ওয়া (এবং) ইন্ (যদি) তাওয়াল্লাউ (তাহারা মুখ ফিরায়ে) ফাইন্নাম্মা (সূতরাং নিশ্চয়ই) হুম্ম (তাহারা) ফি (মধ্যে) শিকাকিন্ (বিরোধিতা, মোকাবেলা, বিপরীত, বন্ধুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্যের পক্ষ অবলম্বন করা, বিরুদ্ধতাকারী, বিরুদ্ধভাবাপন্ন, বিচ্ছিন্নতা, অনেক্য, বিভেদ) ফাসাইয়াকফিকাহুম্ম (সূতরাং তাহাদের মোকাবেলায় তোমাদের জন্য যথেষ্ট) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়া (এবং) হুয়া (তিনি) সামিউন্ (শোনে) আলিমুন্ (জানেন)।

□ সূতরাং যদি তাহারা ইম্মান আনে সেইভাবে যেমন তোমরা ইম্মান আনিয়াছ, ইহার উপর সূতরাং নিশ্চয়ই তাহারা সঠিক পথ পাইবে। এবং যদি তাহারা মুখ ফিরায়ে সূতরাং নিশ্চয়ই তাহারা বিরোধের মধ্যে। সূতরাং তাহাদের মোকাবেলায় তোমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এবং তিনি শোনে, জানেন।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবির অনুসারীরা যেমন ইম্মানের কাজ করতেন, যারা বিরোধী যদি সে রকম ইম্মানের কাজ করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই তারাও সঠিক ছিলেন। আর যদি ইম্মানের কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য নানা রকম অসাড় কথাবাতা বলে তাহলে অবশ্যই তারা সত্যের বৃত্ত হতে বিচ্ছিন্ন। এরকম পুরিবেশে ইম্মানের অনুসারীকে বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূর্ণতা দিতে বেশি দেরি হয় না। ইম্মানের কাজ কতটুকু করা হচ্ছে তা দেখার জন্য আল্লাহ তার বিশেষ দুটি গুণের কথা এখানে বলেছেন : একটি গুণ হলো আল্লাহ শোনে এবং অপরটি হলো জানেন। আম্মানুগণ তথা ইম্মানদারেরা কিছু সময়ের জন্য হলেও সালাতের অনুশীলন করে থাকেন। এখানে সালাত অর্থাৎ আপন রবের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টা। কারণ আপন রবটি যে প্রতিটি মানুষের জীবন-রঙের নিকটেই অবস্থান করছেন 'জাত'-রূপে, কিন্তু মোটেই 'সেফাত'-রূপে নয়; কারণ আল্লাহর সৃষ্ট সব কিছুর সঙ্গেই আল্লাহ 'সেফাত'-রূপে বিরাজ করেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তিনি যে 'রব'-রূপে বিরাজ করেন উহা তার 'জাত'-রূপ। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যখনই আল্লাহ 'রব'-রূপ ধারণ করে অবস্থান করেন সেই রূপটি অবশ্যই বহুবচনে প্রকাশ করে থাকেন। তাই প্রথমেই 'আনা অ্যকরাব ইলাইহি হাবলিল ওয়াবিদ' বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে : 'নাহনু' তথা আমরা। আল্লাহ কখনই বহু আল্লাহ নহেন, বরং প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যখন 'রব'-রূপ ধারণ করে অবস্থান করেন তখনই এক আল্লাহর বহু রূপটি আমরা দেখতে পাই। একটি আলোতে বহু স্নোমবাতি আলোকিত করা যায়। আলো মূলত একটিই, কিন্তু বহু স্নোমবাতিতে মনে হয় বহু রূপ ধারণ করে আছে। ইহাই 'আমি' এবং 'আমরা'-র বহুসম্পূর্ণ একটি পবিত্র লীলাখেলা। তাই আমরা এক আল্লাহকে বিশেষ কয়েকটি ক্রেত্রে 'আমরা'-রূপে দেখতে পাই, তথা বহুবচনে দেখতে পাই। যেমন, আল্লাহর যেখানেই রেজেক বণ্টনের কথাটি আসবে সেখানেই 'আমরা'-রূপ ধারণ করেন। কুহ ফৎকার করার বেলায়ও 'আমরা'-রূপ ধারণ করেন এবং আরও বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি ক্রেত্রে। সালাতি তথা নামাজি তথা যোগাযোগ করার সাধনায় যারা রত তাদেরকে পরিপূর্ণতা দেবার

কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ইহার বিরোধিতা করে তারা ইহা হতে বঞ্চিত হয় - তারা দলগতভাবে হোক না ইহুদি অথবা খ্রিস্টান অথবা যে-কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত। যিনি বা যারা আল্লাহর সঙ্গে সালাত হেফাজত করার জন্য তথা যোগাযোগের প্রচেষ্টাটিকে স্থায়ী করার জন্য ধ্যানসাধনায় মশগুল থাকেন তারাই দায়েমি সালাত। তাই মহানবি বলেছেন, *আস্‌সালাতুদ্‌দাওয়ামি আফজালুম মিনান্‌ সালাতিল্‌ ওয়াক্‌তি* - অর্থাৎ, 'দায়েমি সালাত ওয়াক্‌তিয়া সালাত হতে অনেক মর্যাদাবান'। এই হাদিসটির দলিল আমরা *কোরান*-এর সূরা আল মারেক্‌জ-এর ২৩ নম্বর আয়াতে পাই। এই দায়েমি সালাতই বেহেশতের চাবি। এই দায়েমি সালাতই পবিত্র সালাত। তাই মহানবি বলেছেন, *মেকতাহল জালাতি আস্‌সালাত* অর্থাৎ, 'জান্নাতের চাবিটি হলো সালাত (তথা যোগাযোগ)'। এবং সালাতেরও যে চাবিটি আছে উহা আমরা অনেকেই জানি না। যেমন মহানবি বলেছেন, *মেকতাহ সালাতিত্‌ তহর* - অর্থাৎ, 'সালাতেরও যে চাবিটি আছে সেই চাবিটির নাম হলো পবিত্রতা'। ইহা কি দৈহিক পবিত্রতা? নাকি অন্তরের পবিত্রতা? পাঠক যেটা ইচ্ছা সেটাই গ্রহণ করতে পারে, তবে এর পেছনেও বিরাট একটা কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, জন্মের পূর্বেই তকদিরে যাহা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে উহাই ঘুরে-ফিরে গ্রহণ করে নিতেই হবে - কারণ মানুষ মূলত তকদিরের কাছে একদম অসহায়। হোক না সেই মানুষ যত বড়ই চেস্‌সি'স' খা, তৈমুর লঙ্, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, এডলফ হিটলার, ইয়াহিয়া খান এবং আরও অনেকে।

যারা আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগটি স্থায়ী করার ইচ্ছায় ধ্যানসাধনায় মশগুল থাকেন তাদেরকে সালাত তথা (দায়েমি) নামাজি বলা হয়। 'সালাত' শব্দটির বাঙলা অর্থটি হলো যোগা। যিনি যোগাযোগটি স্থায়ী করার ইচ্ছায় সাধন-ভজন করে যান তিনিই যোগী, তিনিই সালাতি, তিনিই নামাজি। সত্যি বলতে কি, যোগী শব্দটি এজন্যই ব্যবহার করি নি যে যোগী শব্দের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের গন্ধ পাই!

১৩৮. *সিফগাতা* (রঙ, বর্ণ) *আল্লাহি* (আল্লাহ) *ওয়া* (এবং) *মান* (কে) *আহসান* (উত্তম, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) *মিন* (হইতে) *আল্লাহি* (আল্লাহ) *সিফগাতান্* (রঙে) *ওয়া* (এবং) *নাহ্নু* (আমরা) *লাহ* (তাহারই জন্য) *আবিদুন* (এবাতদকারী)।

□□ আল্লাহর রঙ এবং কে আল্লাহর চাইতে রঙে উত্তম? এবং আমরা তাঁহারই জন্য এবাদতকারী।

□ এই আয়াতে এমন একটি সূক্ষ্ম এবং গোপনীয় কথাটি লুকিয়ে আছে যাহা সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয় আর সেই কথাটি হলো, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কেহ অস্তিত্বরূপে অবস্থান করলে তো রঙের কথাটি আসে এবং রঙের কথাটি আসলেই রঙের প্রদর্শন করার কথাটি আসে। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া তাঁর সৃষ্টিজগতে আর কোনো অস্তিত্বই নাই সেখানে অস্তিত্বের দাবি করার মতো কেহ নাই। সুতরাং যেখানে অস্তিত্বই নাই সেখানে রঙ এবং রঙের প্রদর্শন করার কথাটি একটি অবান্তর কথা। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে মনে হবে অনেকেই তো রঙ প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু এই অনেক একেরই প্রকাশ এবং বিকাশ। সুতরাং এবাদত করলেও তার, না করলেও তার।

১৩৯. *কুল* (বলুন) *আত্‌হাজ্জুনানা* (আমাদের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতেছ, আমাদের সহিত কি বাদ্‌ প্রতিবাদ করিতেছ?) *কি* (মধ্যে) *আল্লাহি* (আল্লাহর) *ওয়া* (এবং) *হয়া* (তিনি) *রাব্বুন* (আমাদের রব) *ওয়া* (এবং) *রাব্বুকুম* (তোমাদের রব) *ওয়া* (এবং) *লানা* (আমাদের জন্য) *আমালুনা* (আমাদের আমল) *ওয়া* (এবং) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *আহমালুকুম* (তোমাদের আমল)

ওয়া (এবং) নাহ্ন (আমরা) নাহ (তাহারই জন্য) মুখলিসুন (পরিণত, একনিষ্ঠ, অক্লিম, ছলনাহীন, খাঁটি, আন্তরিক)।

বলুন, আল্লাহর মধ্যে কি আমাদের সহিত বিবাদ করিতেছে? এবং তিনি আমাদের রব এবং তোমাদের রব এবং আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য এবং আমরা তাহারই জন্য আন্তরিক।

এই আয়াতে মহানবি বলছেন যে, তোমরা কি আল্লাহর মধ্যে তথা আল্লাহর বিধানের মধ্যে আমাদের সাথে ঝগড়া করছো? যিনি আমাদের রব তিনিই তো তোমাদেরও রব, কারণ রব তাঁ প্রতিটি মানুষের জীবন-রণের নিকটেই তথা শাহারণের কাছেই অবস্থান করেন। তাই রবের অবস্থান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্নে, একনিষ্ঠতার প্রশ্নে আমরা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছি। সুতরাং আমলের বেলায় মোটেই এক নহি। আমরাই পরিণত এবং খাঁটি – তাই বিশেষভাবে তাহারই জন্য।

১৪০. আম (অথবা, কি, নয় তো) তাকুননা (তাহারা বলে) ইন্ননা (নিশ্চয়, অবশ্য) ইবরাহিমা (ইবরাহিম) ওয়া (এবং) ইসমাইলা (ইসমাইল) ওয়া (এবং) ইসহাকা (ইসহাক) ওয়া (এবং) ইয়াকুবা (ইয়াকুব) ওয়া (এবং) আস্বাতা (বংশধরগণ, বংশধর, এক দাদার আওলাদ, নাতিপুত্রি), কান (ছিলো) ইহদান (ইহুদি) আও (অথবা) নাসারা (খ্রিস্টান) কুল (বলুন) আআনতুম (তোমরা কি) আলাম (জানো) আমি (অথবা) - নাহ (আল্লাহ) ওয়া (এবং) মান (কে) আজলাম (অধিকতর জালেম, অধিক জালেম) মিম্মান (তাহার চাইতে যে) কাতীমা (গোপন করে) শাহাদাতান (সাক্ষ্য, প্রমাণ) ইন্দাহ (তাহার নিকটে, তাহার কাছে) মিনাল্লাহ (আল্লাহ হইতে) ওয়া (এবং) মা (না) - নাহ (আল্লাহ) বিগাফিলিন (গাফেলের সহিত) আম্মা (সেই বিষয়ে, যাহা হইতে) তামলিন (তোমরা আমল করো, কুম করো)।

অথবা তোমরা বলো, নিশ্চয়ই ইবরাহিম এবং ইসমাইল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং বংশধরগণ ছিলো ইহুদি অথবা খ্রিস্টান। বলুন, তোমরা কি অধিকতর জানো অথবা আল্লাহ! এবং কে অধিক জালেম তাহার চাইতে যে গোপন করে সাক্ষ্য তাহার নিকট আল্লাহ হইতে। এবং না আল্লাহ গাফেল সেই বিষয়ে তোমরা (যাহা) আমল করো।

এই আয়াতে কেউ হজরত ইবরাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.) নবি এবং তাদের বংশধরদের কোনো মহাপুরুষকে ইহুদি, খ্রিস্টানি অথবা অন্য যে-কোনো দলীয় সাইনবোর্ডের নামে যাতে অভিহিত না করে এই আয়াতে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তাদের কাহাকেও কোনো দলীয় সাইনবোর্ডের মার্কায় চিহ্নিত করা যায় না। অজ্ঞ লোকেরাই এই রকম আজব-আজব চিত্তে চিহ্নিত করে থাকে। প্রতিটি মানুষের কাছে আল্লাহর যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর পরিচয় জানিবার বিষয়ে অলস, অমনোযোগী মানুষের নিকট আল্লাহর পরিচয় অথবা প্রমাণগুলো গোপন থেকে যায়। মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দরজা হতে আগত ধর্মরাশির মধ্যেই আল্লাহর পরিচয় নিহিত। যারা আপনার মাঝে আল্লাহর পরিচয়কে উন্মোচন করে না তথা উন্মুক্ত, অনাবৃত, প্রকাশ করে না তাঁরাই আপন-আপন পবিত্র নফসকে অনেক রকম শেরেক দিয়ে ভবিষ্যে রাখে তথা পূর্ণ করে রাখে। আপন পবিত্র নফসের সহিত যে খান্নাসরূপী শয়তানটি লুকিয়ে আছে উহাকেই জাগ্রত করে ফেলার নামই হলো শেরেকে ভুবে থাকা। তাই এরকম শেরেকে যারা ভুবে আছে তাদেরকেই জালেম বলা হইছে, কারণ জালেম হবার মূল কারণটি হলো তারা অলস, তারা গাফেল এবং অমনোযোগী তথা খেয়াল করে না। আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আছেন, কিন্তু যারা গাফিলতির ঘোর মায়ারূপ অন্ধকারে ভুবে আছে তারা আল্লাহর পরিচয়টি জানতে পারে না।

আলাহর পূর্ণ পরিচয়টি যে-মানুষের পবিত্র নফসের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সেই মানুষটিকে কোনো ধর্মের দলীয় সাইনবোর্ড দিয়ে পরিচয় করা যায় না, বরং সেই মানুষটি সার্বজনীন একজন মহাপুরুষ এবং এরকম সার্বজনীন মহাপুরুষকে যিরাই দলীয় সাইনবোর্ডের মধ্যে রেখে আত্মতৃপ্তি খোজে তারাই বোকীর স্বর্গে বাস করে - কোরান-এর এই আয়াতে এই মহামূল্যবান শিক্ষাটি আমরা জানতে পারলাম। ভূমির মানচিত্র টানা যায়, জলের মানচিত্র টানা যায় এবং গ্রহ-উপগ্রহের মানচিত্র টানা যায় অথবা আরও দূর এগিয়ে গিয়েও মানচিত্র টানা যায়, কিন্তু কোরান-এর বর্ণিত এরকম মহাপুরুষদেরকে মানচিত্রের অবগুণ্ঠনে গুণ্ঠিত করা যায় না। কোরান-এর বর্ণিত এরকম মহাপুরুষেরা মানব-রচিত মানচিত্রের গুণ্ঠিতে কখনই অবস্থান করে না। সেই মানচিত্রের ব্যাপকতা থাকতে পারে, বিশালতা থাকতে পারে, অসীম নাম ধারণ করে বিস্তৃতির মানচিত্র থাকতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় মহাপুরুষেরা লা-মোকামের বাসিন্দা। লা-মোকামে সূর্যও নাই, চন্দ্রও নাই, দিবারাত্রির ব্যুটিঝামেলাও নাই, ধর্মীয় ঝগড়াঝাটিও নাই, তাই এই মহাপুরুষদেরকে দেখতে পাই কখনো দুনিয়ার মানুষের তৈরি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত না থেকে উলঙ্গ অবস্থায়ও অবস্থান করতে। এই মহাপুরুষেরা সংসারজীবনে বাস করেও সংসারী নন - যেমন হাস জলে অবস্থান করলেও জলের স্পর্শ না নিয়ে ভূমিতে অবস্থান করে। ঘর ছেড়ে দিলেই সংসারবিরাগী হয় না, বরং খান্নাসিরূপী শয়তানকে নিজের পবিত্র নফস হতে তাড়িয়ে দিতে পারলেই হয় বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যসাধনই ইসলামের মূলমন্ত্র। কিন্তু এই বৈরাগ্য 'রোহবানিয়াত' নয়, কারণ রোহবানিয়াতের সঙ্গেও খান্নাসিরূপী শয়তানটি বহাল তব্বিয়তেই থাকে। রোহবানিয়াত হলো জোর করে তথা বলপ্রয়োগ করে সংসারজীবন হতে বিচ্ছিন্ন রাখা। সুতরাং ইসলামে কোনো জোরজবরদস্তি নাই। সুতরাং বৈরাগ্য আর রোহবানিয়াত কখনই এক বিষয় নয়।

১৪১. তিলকা (ওই, সেই) উম্মাতন (উন্নত) কাদ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যথেষ্ট) খালাত, (অতীত হইয়াছে, গতি হইয়াছে) লাহা (তাহার জন্য) মা (যাহা) কাসাবাত (সে অর্জন করিয়াছে, সে উপার্জন করিয়াছে) ওয়া (এবং) লাকম (তোমাদের জন্য) মা (যাহা) কাসাবতম (তোমরা অর্জন করিয়াছ) ওয়া (এবং) লা (না) তসআলনা (তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে) আম্মা (সেই বিষয়ে, সেই সম্পর্কে) কানইয়ামালন (তাহাদের কর্ম বিষয়ে, তাহারা কাজ করিতেছিল, তাহারা যাঁহা করিয়া গিয়াছে)।

□□ নিশ্চয়ই ওই উন্নত গত হইয়াছেন। তাহার জন্য আছে যাহা সে উপার্জন করিয়াছে এবং যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ (উহা) তোমাদের জন্য। এবং তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হইবে না সেই বিষয়ে যাহা তাহারা করিয়া গিয়াছে।

□ কোরান-এর এই আয়াতটি একশত চোত্রিশ নম্বর আয়াতের মতো।

১৪২. সাইয়াকুলশ (অচিরেই বলিবে, সত্তর বলিবে, শিগগির বলিবে, অনতিবিলম্বে বলিবে) সুফাহাত (নির্বোধেরা, অজ্ঞানেরা, মুর্খেরা, বুদ্ধিহীনেরা) মিনান (হইতে) নাসি (লোকেরা, মানুষেরা) মা (কিসে) ওয়াল্লাহম (তাহাদের মুখ ফিরাইল) আনু (হইতে) কিবলাতিহিম (তাহাদের কেবলা) আল্লাতি (যে, যাহা) কানু (ছিল) আলাইহা (যাহার উপরে) কল (বলুন) লিলাহিল (আলাহর জন্য) মাশরিক (পূর্ব) ওয়া (এবং) মাগরিব (পশ্চিম) ইয়াহদি (তিনি হেদায়েত দান করেন, তিনি সঠিক পথ দেখান) মান (যাহাকে) ইয়াশাত (তিনি চান) ইলা (দিকে) সিরাতিম (পথের) মুস্তাকিমিন (সঠিক)।

□□মানুষদের মধ্য হইতে অচিরেই মুখেরা বলিবে, তাহাদের কেবলা হইতে কিসে তাহাদের মুখ ফিরাইল, যে তাহারা ছিল যাহার উপরে? বলুন, (হে মুহাম্মদ) পশ্চিম এবং পূর্ব আল্লাহর জন্য। তিনি হেদায়েত করেন যাহাকে তিনি চান সুঠিক পথের দিকে।

□ তাকেই কেবলা বলা হয় যাকে উপলব্ধি হিসাবে গ্রহণ করা হয় আসল লক্ষ্যে তথা মূল বিষয়ের দিকে পৌছবার জন্য। হিজরতের পর তথা মক্কা হতে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় আসার পর মহানবি তার উম্মতদের শিক্ষাকে দ্রুতপে মদিনায় যে-মসজিদ তৈরি করেছিলেন উহাই প্রথম মসজিদ এবং এখানেই ওয়াক্ফিয়া নামাজ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেন। তখন জেরুজালেমে অবস্থিত মসজিদুল আকসাকে কেবলারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। আঠারো মাস পর ঐতিহ্য মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে মহানবি কেবলা পরিবর্তন করলেন। সেই সময়টা ছিল জোহরের নামাজের সময়। উত্তর দিক হতে দক্ষিণ দিকে কেবলামুখী হলেন। ইহাতে কেবলার পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু দুইটি কেবলার স্বীকৃতি পাওয়া গেল। সেই মসজিদটিকে মসজিদুল কেবলাতাইনে তথা দুই কেবলার মসজিদও বলা হয়ে থাকে। এই দিকপরিবর্তন করতে গিয়ে যারা এই দিকপরিবর্তনটিকে সহজে মেনে নিতে পারে নি কোরান-এ তাদেরকে নির্বোধ মুখ বলেছে। কারণ ঘরটি এখানে মুখ্য নয়, বরং যিনি ঘরের মালিক তিনিই মুখ্য। সুতরাং যারা মুখ্য বিষয়টি ঐড়িয়ে গিয়ে গোণ বিষয়ের গুরুত্ব অত্যধিক প্রদান করে তাদেরকেই নির্বোধ ও মুখ্য বলা হয়েছে। জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা এবং মক্কার কাবা দুটোই আল্লাহর ঘর। তবে দুটোই একদম মেজাজি ঘর, মেজাজি কেবলা। পক্ষান্তরে, একজন মহাপুরুষই হলেন আসল কেবলা। মেজাজি কেবলায় আল্লাহ সেফাতি-নুর রূপে বিরাজ করেন। তাই যেখানে আল্লাহ সেফাতি-নুর রূপে অবস্থান করেন সেই অবস্থানটিকে বলা হয় মেজাজি, কারণ একজন মহাপুরুষের মধ্যে আল্লাহ জাত-রূপে তথা মূলরূপে অবস্থান করেন বলেই উহা ইকিকি কেবলা তথা আসল কেবলা। কারণ আল্লাহ তিনটি স্থানে জাতরূপে অবস্থান করেন : একটি লা-মোকাম, অপর দুটি হলো জিন এবং মানুষের অন্তর। তাই জিন এবং মানুষের অন্তরে আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করার দরুণই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি। তাই মানুষ ছাড়া আল্লাহর জাতরূপটির পরিচয় পাওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক তেমনি মানুষ ছাড়া শয়তানের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। মানুষ আল্লাহর যেমন রহস্য তেমনি শয়তানেরও রহস্য। অনেক রকম অনুষ্ঠান এবং অনেক রকম নীতি আর আদর্শের ফলস্বরূপ দিয়ে এই রহস্য বোঝা যায় না। একমাত্র প্রেমই ইহার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং যার প্রেম যত গভীর সে ততটুকু আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। আবার পূর্ব দিকটিও আল্লাহর তেমনি পশ্চিম দিকটিও আল্লাহর জন্য। আসল কেবলাটির পরিচয় জানতে হলে আমাদের 'আম্মি' নামক পবিত্র নফস হতে খান্নাসরূপী ষড়রিপুর শয়তানের বন্ধন হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় সেই শিক্ষাটি একজন মহাপুরুষ হতে গ্রহণ করে নিয়ে নিজনে একাকী ধ্যানসাধনাটি করতে হয়। হেরাথুহায় মহানবির অবস্থানটি এই মহামূল্যবান শিক্ষাটি আমাদেরকে বাস্তবে দিয়ে গেছেন। এই রহস্যের জ্ঞান কেউ বুঝতে পারে আবার কেউ বুঝতে পারে না কেউ মেনে নিতে পারে আবার কেউ মেনে নিতে পারে না। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেন পারে না – তাহলে অধম লিখকের চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

১৪৩. ওয়া (এবং) কাজালিকা (ওইভাবেই) জাআলনাকুম (আমরা [আল্লাহ] তোমাদেরকে নির্বাচন করিয়াছি, আমরা তোমাদেরকে বানাইয়াছি, আমরা তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছি) উম্মাতান (উম্মত) ওয়াসাতান

(মধ্যপন্থী, দুই বিপরীত মত উপায় বা ভাবের মধ্যবর্তী মত উপায় বা ভাবের অনুসারী, নীরমপন্থী, ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বান, প্রত্যেক বস্তুর ঠিক মধ্যমাংশ, মধ্যখানে অবস্থানকারী) *লিতাকুন* (তোমাদের জন্য) *শুহাদাআ* (সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষকারী, বক্তৃত্ত্ব) *আলা* (উপর) *নাস* (মানুষ, মানব) *ওয়া* (এবং) *ইয়াকুনা* (হয়) *রাসুল* (রসুল) *আলাইকুম* (তোমাদের উপর) *শাহিদান* (সাক্ষী) *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *জাআলনা* (আমরা [আলাহ] নির্বাচন করিয়াছিলাম) *কিবলাতা* (কেবলা) *আল্লাতি* (যে, যাহা) *কুনতা* (আপনি ছিলেন) *আলাইহা* (যাহার উপর) *ইল্লা* (একমাত্র, ব্যতীত, কিন্তু) *লিনালামা* (আমরা [আলাহ] জানিতে পারি) *মাই* (কে) *ইয়াততাবিত্ত* (এত্তেবা করে, অনুসরণ করে) *রাসুলা* (রসুলকে) *মিম্মান* (কে উহা হইতে) *ইয়ানকালিব* (ফিরিয়া যায়) *আলা* (উপর) *আকিবাইহি* (তাহার দুই গোড়ালির, পশ্চাদিকে, পেছন দিকে, উল্টাদিকে) *ওয়া* (এবং) *ইন* (যদি) *কানাত* (তাহা ছিল) *লাকাবিলাতান* (অবশ্যই কতিন) *ইল্লা* (একমাত্র, ব্যতীত) *আলা* (উপর) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *হাদা* (হেদায়েত, সঠিক পথ দেখানো) *আলাহ* (আলাহ) *ওয়া* (এবং) *মা* (না) *কানালাহ* (আলাহ চাহেন) *লিইউদিয়া* (নষ্ট করা) *ইমানাকুম* (তোমাদের ইমান, তোমাদের বিশ্বাস), *ইননালাহা* (নিশ্চয়ই আলাহ) *মিননাসি* (মানুষের সহিত) *লারাউফুর* (বড় দয়ালু) *রাহিম* (দয়ালু)।

□ এবং ওইভাবেই আমরা [আলাহ] তোমাদেরকে নির্বাচন করিয়াছি ন্যায়পরায়ণ উন্নত যেন তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং তোমাদের উপর রসুল সাক্ষী হন। এবং আমরা [আলাহ] আপনার জন্য কেবলা নির্বাচন করিলাম যাহার উপর আপনি ছিলেন এই জন্য যে, যাহাতে আমরা [আলাহ] জানিতে পারি যে, কে রসুলের অনুসরণ করে (এবং) কে উহা হইতে পিছনের দিকে ফিরিয়া যায়। এবং আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করিয়াছেন সে ব্যতীত অন্যদের জন্য উহা কতিন। এবং আল্লাহ চাহেন না যে, তোমাদের ইমান নষ্ট হউক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষদের জন্য বড়ই দয়ালু (এবং) দয়ালু।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবির উন্নতদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস নামক কেবলা হতে কাবা শরিফের দিকে কেবলাটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। কেন করা হয়েছিল? কারণ আল্লাহর রসুলই আসল কেবলা, হাকিকি কেবলা, প্রকৃত কেবলা। এই কথাটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যই ইট-সুড়কির বানানো কেবলাটিকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। একজন মহাপুরুষই হলেন তার অনুসারীদের জন্য আসল কেবলা এবং আসল কাবা। এই নিবেট উল্লস সত্যটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই ইট-সুড়কিতে বানানো কেবলাটিকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। কারণ ইট-সুড়কির কেবলাটি হলো মেরাজি কেবলা এবং একজন রসুল তথা একজন মহাপুরুষ হলেন হাকিকি কেবলা তথা আসল কেবলা। যাহাতে যুগে-যুগে, কালে-কালে মানুষের মধ্যে যারা সত্যের অনুসন্ধান করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বাহিরের অনুষ্ঠানবাদকে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করলেই পিছিয়ে পড়তে হয় তথা আসল সত্য হয়ে ছিটকিয়ে পড়তে হয়, কারণ সত্য কখনই অনুষ্ঠানকে অনুসরণ করবে না, বরং অনুষ্ঠানই সত্যকে অনুসরণ করবে। আল্লাহর একজন ঠিকিকে ইট-সুড়কির বানানো কেবলাই অনুসরণ করবে। প্রতিটি অনুষ্ঠান সত্যকেই অনুসরণ করবে। এই কথা কয়টি রসুলের তথা মহাপুরুষের হেদায়েত না পাওয়া পর্যন্ত বোঝাটা কষ্টকর বৈ কি। কারণ আল্লাহর রসুলের অনুসরণ করাটাই হলো আল্লাহকে অনুসরণ করা। আল্লাহর রসুলকে অনুসরণ না করে যারা আল্লাহর অনুসরণ করতে চায় তারা বিভ্রান্ত, তারা পথহারা। কোনো প্রতীক সত্যের গুরুত্ব পোছিয়ে দিতে পারে না, বরং রসুলই পোছিয়ে দেন। কেবলার দিক পরিবর্তনের দ্বারা আল্লাহ দেখতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর

রসুলের প্রতি কতটুকু আনুগত্য থাকে। এই আনুগত্যের প্রমাণটি গ্রহণ করাই জর্নাই কেবলার পরিবর্তনটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৪৪. কাদ্ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যথেষ্ট) নারা (আমরা [আল্লাহ] দেখিতেছি, আমরা দেখিতে পাইব) তাকাল্লুবা (বারবার ফিরাইতে, ঘোরাফিরা করিতে) ওয়াজ্জিকা (আপনার চেহারা, আপনার মুখমণ্ডল) ফি (মধ্যে) সাম্মায়ি (আকাশ) ফালানুয়াল্লিলইয়ান্নাকা (সুতরাং আমরা [আল্লাহ] আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি) কিবলাতান (কেবলা [দিকে]) তারদেয়াহা (যাহাতে আপনি পছন্দ করেন) ফাওয়াল্লিলি (সুতরাং ফিরাইয়া লন) ওয়াজ্জিকা (আপনার চেহারা) শাতরা (দিকে, সামনের দিকে, অর্ধেক) মাসজিদি (মসজিদে) হারাম্মি (হারামের) ওয়া (এবং) হাইসু (যেখানেই) মাকনতম (তোমরা থাকো) ফাওয়াল্লিলি (সুতরাং তোমরা ফিরাইয়া লও) উজ্জহকিমু (তোমাদের চেহারাগুলি) শাতরাহি (তাহার দিকে) ওয়া (এবং) ইন্ননা (নিশ্চয়ই) লাজিনা (যাহারা) উত (দেওয়া হইয়াছে, দান করা হইয়াছে) কিতাবা (কিতাব) লাইয়ালাম্মনা (অবশ্যই তাহারা জানেন) আননাহ (নিশ্চয়ই উহা) হাকক (সত্য) মির (হইতে) রাব্বিল্হিম (তাহাদের রবের) ওয়া (এবং) মা (না) অল্লাহ (আল্লাহ) বিগাফিলিন (গাফেল, বেখবর) আম্মা (সেই বিষয়ে, সেই সম্বন্ধে) ইয়মাল্লন (তাহারা করিতেছে)।

□□ অবশ্যই আমরা (আল্লাহ) দেখিয়াছি আপনার চেহারা বারবার আকাশের মধ্যে ফিরাইতে। সুতরাং আমরা আপনাকে ফিরাইয়া দিতেছি কেবলার (দিকে), যাহা আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং ফিরাইয়া লন আপনার চেহারা মসজিদুল হারাম্মের দিকে। এবং যেখানেই তোমরা থাকো সুতরাং তোমরা ফিরাত্ত তোমাদের চেহারা তাহার দিকে। এবং নিশ্চয়ই যাহাদের কেতার দেওয়া হইয়াছে অবশ্যই তাহারা জানে নিশ্চয়ই উহা সত্য তাহাদের রব হইতে। এবং আল্লাহ বেখবর নহেন সেই বিষয়ে (যাহা) তাহারা করিতেছে।

□ এই আয়াতে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে, মহানবির পছন্দটি আল্লাহ কবুল করে নিলেন তথা গ্রহণ করে নিলেন। মহানবি বারবার আকাশের দিকে ফিরে-ফিরে যে তাকাতিলেন উহা আল্লাহর চোখে ধরা পড়লো। যদিও মসজিদুল আকসা একটি কেবলা, কিন্তু অল্লাহ মসজিদুল হারাম্মের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বলছেন। ইহাতে উল্লেখ্য যে মোহাম্মদকে বলা হলো, তারা যেন মসজিদুল হারাম্মকে মেজাজি কেবলারূপে গ্রহণ করে এবং যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তারা যেন মসজিদুল হারাম্মের দিকেই তাদের খেয়ালটুকু রাখে। স্থান-কাল এবং অনেক রকম অবস্থায় মানব মন কেবলই আনুষ্ঠানিক নামাজের সময় নয়, বরং সব সময় যেন মসজিদুল হারাম্মের দিকে তাদের নজর ও খেয়ালটুকু ধরে রাখে। আর যারা বেখবর তথা অলস এবং অমনোযোগী তাদের খেয়াল মসজিদুল হারাম্মের দিকে নজর রাখতে রাজি হয় না। তাই তাদের কোনো গাফিলতির সঙ্গে আল্লাহ থাকেন না।

আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী একজন মহাপুরুষকে অনুসরণ করতে গেল ধ্যানে-জ্ঞানে-কর্মে-কাজে সব সময় খেয়াল রাখিতে হয়। এই খেয়ালটুকুকেই বলা হয় চঞ্চল মনটিকে গুরুর প্রতি একাগ্রতার সাথে ধারিত করা। যে যে-ধ্যানেই থাকুক না কেন, সে সে-রকমই কর্মফল পায়। সেই কর্মফলটি কখনো ভ্রান্ত হয়। আবার প্রকারভেদে কখনো বিষে পরিণত হয়। যে দুনিয়ার দিকে মনটিকে ভবিষ্যে রাখে, সে দুনিয়ার কিছু না কিছু পায় এবং যে আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী কোনো মহাপুরুষকে অনুসরণ করার নিমিত্তে ধ্যানসাধনা করে, সে-ও রহস্যলোকের কিছু না কিছু জানতে পারে। তাসাকুরে শায়েখ, গুরুর ধ্যান, গুরুকে অনুসরণ করা, নিরিখ বাধা, বরজখ ঠিক রাখা - এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর ইঙ্গিত পাচ্ছি এই আয়াতে।

১৪৫. ওয়া (এবং) লাইন্ (অবশ্য যদি) আটাইতান্ (আপনি হাজির করুন, আপনি আনিয়া দিন) আল্লাজিনা (যাহাদের) উতল্ (দেওয়া হইয়াছে) কিতাবা (কেতাব) বিকুললি (সমস্ত) আয়াতিন্ (আয়াত, নিদর্শন) মা (না) তাবিড্ (তাহারা অনুসরণ করিবে, তাহারা আনুগত্য করিবে) কিবলাতাকা (আপনার কেবলা)।

□□এবং অবশ্য যদি আপনি যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে সমস্ত নিদর্শনের সহিত (তবুও) তাহারা আপনার কেবলাকে অনুসরণ করিবে না।

+ ওয়া (এবং) মা (না) আন্তা (আপনি) বিতাবিইন্ (অনুসারী) কিবলাতাহম্ (তাহাদের কেবলা)।

□□এবং আপনিও তাহাদের কেবলার অনুসারী হইবেন না (তথা অনুসরণকারী হইবেন না)।

+ ওয়া (এবং) মা (না) বাদহম্ (তাহাদের কেহ) বিতাবিইন্ (অনুসারী) কিবলাতা (কেবলার) বাদিন্ (কাহারও)।

□□এবং তাহারা কেহই কাহারও কেবলার অনুসারী নহে।

+ ওয়া (এবং) লাইন্ (অবশ্য যদি) ইততাবীতা (আপনি অনুসরণ করেন) আহওয়াআহম্ (তাহাদের খেয়ালখুশি, তাহাদের মনগড়া) মিন্বাদি (ইহার পুরেও) মা (যাহা) জাআকা (আপনার কাছে আসিয়াছে) মিনাল্ (হইতে) ইলমি (জ্ঞান)।

□□এবং অবশ্য যদি আপনি অনুসরণ করেন তাহাদের খেয়ালখুশির, ইহার পরেও যাহা আপনার কাছে আসিয়াছে জ্ঞান হইতে।

+ ইন্বাকা (নিশ্চয়ই আপনি) ইজাল্ (তখন, ওই সময়ে) লামিনাজ্ (অবশ্যই গণ্য হইবেন) জোয়ালিমিন্ (জালেমদের)।

□□নিশ্চয়ই আপনি তখন জালেমদের (মধ্যে) অবশ্য গণ্য হইবেন।

□ এই আয়াতে এই কথাটুকু বলা হয়েছে যে, যত বড় অকাট্য সত্যই আপনি হাজির করুন না কেন, তবু আপনার অনুসরণ কখনই করবে না। কারা করবে না? যাদেরকে পূর্বেই কেতার দেওয়া হয়েছিল। ইহাদি এবং খ্রিস্টানেরা এবং যে-কোনো ধর্মের অনুসারীরা আপনার দেওয়া কেবলাকে মেনে নেবে না। ঠিক সে-রকমভাবে আপনিও তাদের কেবলার অনুসরণ করবেন না। প্রত্যেক কেতাবধারীর নিজস্ব একটি কেবলা থাকে এবং কোনো কেতাবধারীই অন্য কোনো কেতাবধারীর কেবলাটিকে অনুসরণ করে না এবং করবেও না। আপনাকে জ্ঞানের মাধ্যমে যে-কেবলাটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে উহা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। যদি এই জ্ঞান যাহা আল্লাহ হতে পেয়েছেন উহা অমান্য করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি জালেমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বেন।

এই আয়াতের দ্বারা মানুষকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট আসলে তাকে কেবলারূপে গ্রহণ করতে। খেয়ালখুশির অনুসরণকারী তথা প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের অনুসারী যেন না হয়। কামেল মহাপুরুষদেরকেই কেবলারূপে গ্রহণ করে নিতে হয়, নতুবা ধোঁকায় পড়তে হয়।

পরিশেষে অধম লিখক অকপটে বলতে চাই যে, এই আয়াতের উপর অনেক পরিশ্রম এবং গবেষণা করেও এবং অনেক প্রকার ডিকশনারি দেখেও কিছুই সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম না। তাই যে-ব্যাখ্যাটুকু লিখে গেলাম উহা কিছুটা ধার করা আর কিছুটা আপন বিবেক হতে নিরপেক্ষভাবে আগত।

এই আয়াতে মেজাজি কেবলাটির প্রশ্ন আসলে অধম লিখকের পক্ষে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু হাকিকি কেবলার প্রশ্নে ব্যাখ্যা

লিখতে কোনো কষ্ট হয় না এবং সব কিছু মিলিয়ে দেওয়া যায়। কারণ হাকিকি কেবলা হলেন প্রতিটি আল্লাহ-ওয়ালী মহাপুরুষ।

১৪৬. *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আতাইনাহমুন* (আমরা [আল্লাহ] দিয়াছি তাহাদেরকে) *কিতাবা* (কেতাব) *ইয়ারিকুনাহ* (উহাকে তাহারা চিনে, তাহাকে তাহারা চিনে) *কামা* (যেমন, যেভাবে, যেহেতু) *ইয়ারিকুন* (তাহারা চিনে) *আব্বনাআহম* (তাহাদের পুত্রদেরকে, তাহাদের সন্তানদেরকে) *ওয়া* (এবং) *ইননা* (নিশ্চয়ই) *ফারিকান* (দল, জামাত) *মিনহম* (তাহাদের মধ্য হইতে) *লাইয়াকতুনান* (অবশ্যই গোপন করে, অবশ্যই লুকাইয়া রাখে, অবশ্যই গুপ্ত বা অব্যক্ত রাখে, অবশ্যই হৃদ্যবেশ পুরায়) *হাককা* (সত্য, প্রকৃত, যথার্থ, ঠিক, নির্ভুল) *ওয়া* (এবং) *হম* (তাহারা) *ইয়ালামুন* (জানে)।

□□যাহারা আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি তাহাদেরকে কেতাব তাহা তাহারা চিনে যেমন তাহারা চিনে তাহাদের পুত্রদেরকে এবং নিশ্চয়ই একদল তাহাদের মধ্য হইতে অবশ্যই গোপন করে সত্য এবং তাহারা জানে।

১৪৭. *আলহাক্ক* (একমাত্র সত্য) *মির* (হইতে) *রাব্বিকা* (আপনার রব) *ফালা* (সূতরাং না) *তাকুনান্না* (তোমরা হইবে) *মিনান* (হইতে) *মুমতারিনা* (সন্ধেহভীজনেরা, সন্ধিৎসুরা, সন্ধেহে পড়িয়াছে যাহারা, সংশয়ীরা, সত্যতা নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা আছে যাহাদের)।

□□একমাত্র সত্য আপনার রব হইতে সূতরাং সন্ধেহে পড়িয়াছে যাহারা (তাহাদের) দলভুক্ত তোমরা হইবে না।

□ এই আয়াতে যাদেরকে আল্লাহ কেতাবের অধিকারী করেছেন তারাই কেবলমাত্র কেবলা-বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তাঁদের অনুসারীদের মাঝে যারা তাদের পুত্রের রূপধারণ করেছেন তারাও নিজের কেবলার পরিচয় রাখেন। মহানবির দ্বারা কেবলা প্রতিষ্ঠার রহস্যটি মহাপুরুষেরা ভালো করেই জানেন। *গুরু অনুসারীদের মাঝে যারা সিদ্ধিলাভ করেছেন তথা গুরু আলোর সন্তান হয়েছেন, তাদেরকেই পুত্র বলা হয়।* কারণ তারা পুরুষ। গুলি-আল্লাহ, মস্তান-মজুবদের মধ্যে অনেকেই সত্যের পরিচয় পেয়েও সেই পরিচয় সাধারণ মানুষ হতে গোপন করে রাখেন। এমন কি কেহ-কেহ নিজের আপন পরিচয়টুকুও দিয়ে যান না। অবশ্য সমাজের মধ্যে অনেক রকম উল্টাপাল্টা পরিবেশের কারণেই এই রকমটি হয়ে থাকে।

একমাত্র সত্য মানুষের রব হতে তথা আপন গুরু হতেই এই সত্যটি এসে থাকে। তাই কেবলার বিষয়ে মানুষের কোনো সন্ধেহ পোষণ করাটা ঠিক নয়। এখানে একটি কথা বুলতেই হয় যে, আপন রব হতে সত্যের প্রকাশ ঘটে। প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ রব-রূপে অবস্থান করেন। এই রব মানুষের কলবে বাস করে না, কলবে বাস করে নফস এবং খান্নাসরূপী শয়তান তথা মায়া তথা ইলিউশন। এই রহস্যটি অনেকেরই জানা থাকে না তাই রবকেও কলবের বাসিন্দা বলে মনে করে থাকে। কিন্তু রব থাকে জীবন-রংগের নিকটে তথা আপন শাহারংগের নিকটেই অবস্থান করে। যেহেতু রব সৃষ্টা তাই কলবে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কলব সৃষ্টি এবং নফসও সৃষ্টি এবং খান্নাসরূপী শয়তানও সৃষ্টি। সূতরাং সৃষ্টির জীবন-রংগের নিকটেই থাকেন, তাই ইলাইহে বলা হয়েছে, কিন্তু ইনদা তথা ভিতরে শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যাটি অনেক ব্যাপক এবং অনেক বিস্তৃত। তাই এই আয়াতে এটুকু লিখেই ইতি টানতে বাধ্য হলাম।

১৪৮. *ওয়া* (এবং) *লিকুনলিন* (প্রত্যেকের জন্য) *উজ্জাতন* (একটি দিক, অভিমুখ, লক্ষ্য) *হয়া* (সে, তিনি) *মুয়াল্লিহা* (তাহার দিকে মুখ ফিরায়ে) *ফাস্তাবেকল* (সূতরাং তোমরা প্রতিযোগিতা কর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অগ্রবর্তী, আগের, সন্মুখস্থ) *খাইরাতি* (কল্যাণ, রহমত, নেক কাজগুলি, মঙ্গলসমূহ,

ভালো

মহিলারা, হিতসমূহ, কুশলাদি, সুখসমৃদ্ধিসমূহ) আইনাম্মা (যেখানেই) তাকব্ব (তোমরা থাকো) ইয়াতি (আনিবেন) বিক্ব (তোমাদেরকে) আল্লাহ (আল্লাহ) জামিয়ান (একত্রিত) ইন্নাল্লাহ (নিশ্চয়ই আল্লাহ) আলা (উপর) কুল্লি (সব, সমস্ত, প্রত্যেক, সকল) শাইয়িন (কিছুর, বস্তুর) কাদিরু (শক্তিমান, ক্ষমতাবান)।

এবং প্রত্যেকের জন্য একটি লক্ষ্য (একটি দিক) সে (সেই) লক্ষ্যের দিকে মুখ ফিরায় সূতরাং তোমরা প্রতিযোগিতা কর কল্যাণের। তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, প্রতিটি মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তি অনুসারে মনের একটি গতিপথ আছে এবং এই গতিপথটা থাকাই একান্ত স্বাভাবিক। এই দিকটিকে আরবি ভাষায় উজ্জাতুন বলা হয়। এই গতিপথের দিকেই অল্পসূর হওয়াটা স্বাভাবিক, তাই স্বভাবতই একটি দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। তাই নিজের যোগ্যতার মাপকাঠিতে কল্যাণের জন্য তথা রহমত পাবার জন্য প্রতিযোগিতা করাটি একটি সুন্দর এবং পবিত্র কতব্য। যে-সমস্ত কল্যাণ মৃত্যুঘটনা দিয়ে খণ্ডিত তথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় সেই কল্যাণ অস্থায়ী, যদিও উহা আপেক্ষিকতার দর্শনে ফলপ্রসূ। আর যে-কল্যাণের সাহায্যে মানুষ মরণকে জয় করে নিতে পারে তথা জন্মচক্রের ঘণায়মান বৃত্ত হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে উহাই আল্লাহর দৃষ্টিতে একমাত্র কল্যাণ তথা একমাত্র রহমত। উহাই আল্লাহকে পাবার পথে ধাবিত করে এবং পরিশেষে যাহা পাওয়া উচিত সেই রব্বিরূপী আল্লাহর সঙ্গে মিলনে একাকার হয়ে যায়। উহাই কল্যাণ তথা রহমতের চরম এবং পূরম পাওয়া। আল্লাহ তকদীরদাতার রূপটি ধারণ করে মহাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মহাকল্যাণ তথা মহারহমতটি যুগে-যুগে, কালে-কালে দান করে যাচ্ছেন। অবশ্য এই মহাকল্যাণটি পাওয়াও একটি তকদীরের বিষয়। তকদীরে না থাকলে শত মাথা কুটলেও এই মহাকল্যাণটি লাভ করা যায় না, কারণ উহা বস্তুলাভ করার কল্যাণ নহে, বরং বস্তুর যিনি সৃষ্টা সেই সৃষ্টার মহাকল্যাণটি লাভ করা।

মানুষের মাঝে যাদের দিক নাই তথা কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই তারা তো পাগল। উদ্দেশ্য বা দিকটি যদি বস্তুর দিকেও হয় উহা কমবেশি অর্জন করা যায়, কিন্তু আল্লাহকে পাবার লক্ষ্যটি তথা দিকটি যার আছে সে তো মহাভাগ্যবান, যদিও দুনিয়ার দৃষ্টিতে এই মহাভাগ্যবানদের ভাগ্যটিকে মাপা যায় না। কারণ মানুষ বস্তুর উপর নির্ভর করেই ভাগ্যটিকে পাল্লা-বার্টখারা দিয়ে মাপে। তাই আল্লাহ-ওয়ালাদের মহাভাগ্যটিকে বস্তুর পাল্লা-বার্টখারা দিয়ে মাপা যায় না।

১৪৯. ওয়া (এবং) মিন (হইতে, থাকিয়া) হাইস (যেখান) খারাসতা (তুমি বাহির হও) ফাওয়ালিলি (সূতরাং ফিরাও) ওয়াজ্জহা (চেহারা, মুখমণ্ডল) শাতরা (দিক, অর্ধেক) মসজিদ (মসজিদ) হারামি (হারাম) ওয়া (এবং) ইন্নাহ (নিশ্চয়ই উহা) লাল্হাকক (একমাত্র সত্য) মিন (হইতে) বাববিকা (তোমার রবের) ওয়া (এবং) মা (না) লাহ (আল্লাহ) বিগাফিলিন (বেখবর, গাফেল, অমনোযোগী) আম্মা (যাহাতে) তামালনী (তোমরা কাজ কর)।

এবং যেখান হইতেই তুমি বাহির হও সূতরাং ফিরাও তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে এবং নিশ্চয়ই উহা তোমার রব হইতে একমাত্র সত্য এবং আল্লাহ গাফেল (বেখবর) না, যাহা তোমরা কর।

এই আয়াতে যে-মসজিদুল হারামে আল্লাহ আশ্রয় নিতে বলছেন সেই মসজিদুল হারামের মেজাজি রূপটি হলো মক্কায় অবস্থিত কাবা শরিফ এবং হাকিকি রূপটি হলো, যে-কলবাটি দুনিয়ার সবপ্রকার বন্ধন হতে মুক্ত হতে

পেরেছে সেই কলবটিকে বুলা হয় মসজিদুল হারাম। একটি দেখা যায়, অপরটি দেখা যায় না। একটি মৃত, অপরটি বিমৃত। যেহেতু মানুষের মন মূর্তের দিকেই ধাবিত হয় তাই মসজিদুল হারাম বলতেই মক্কায় অবস্থিত কাবা শরিফটিকে বুঝে থাকে এবং এই বোঝাটাও একটি মেরাজি সত্য, একটি প্রতীকী সত্য। অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি যখন সমাজের বুকে ব্যাপকরূপে ধারণ করে তখনই আসল তথ্য হাকিকি বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। তারপরেও মেরাজি তথ্য রূপকের বিষয়টিকে কোনো অবস্থাতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ, রূপক না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে আসলটিও ধীরে-ধীরে ঢেকে যেতে থাকে। ইহাই মানুষের মন ও মানসিকতার প্রতিফলন। মানুষ দুনিয়ার বিষয়বস্তুর মধ্যে ডুবে থাকে এবং এই ডুবে থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। তাই আল্লাহ মসজিদুল হারামে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদুল হারামে একবার আল্লাহর রহমতে আশ্রয় নিতে পারে তাহলে কর্মগুলো সেই মানুষটির জন্য শেরেক না হয়ে বরং এবাদিতে পরিণত হয়ে যায়। মসজিদুল হারামে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকে না এবং থাকার বিধানটিও দেওয়া হয় নি। সুতরাং মসজিদুল হারামে অবস্থান করে যে-কোনো কাজই করুক না কেন, সেই কাজটিও বন্ধেগিরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং শেরেক ও বন্ধেগি উভয়ই বাহিরের বিষয় নয়, বরং একান্ত মনোজগতের বিষয়। মসজিদুল হারামের বাহিরে থেকেও যারা কাজ করছে এবং মসজিদুল হারামে অবস্থান করেও ওই একই কাজ করছে, কিন্তু কাজের বিষয়টি এক হলেও মসজিদুল হারামের বাহিরে থেকে করছে নাকি ভেতরে থেকে করছে ইহা বুঝাবার কোনো উপায় নাই। এই উপায় না থাকার দরুনই মানুষ বিভ্রান্তির ফাঁদে পড়ে যায়। সুতরাং বিভ্রান্তির ফাঁদে পড়াটাও তকদীর এবং নী পড়াটাও একটি তকদীর। এই অলঙ্ঘনীয় তকদীরটিকে আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া বদলানো অসম্ভব। যারা অমনোযোগী এবং অলস প্রকৃতির তারা মসজিদুল হারামে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। এই জন্যই তাদের কর্মগুলি শেরেকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং এই বিষয়ে আল্লাহ মোটেই বেখবর নহেন। কারণ, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রবরূপে প্রতিটি মানুষের জীবন-রংগের তথ্য শাহারগের নিকটেই জাতরূপে অবস্থান করেন। লা-মোকামে আল্লাহ যেমন জাতরূপে অবস্থান করেন ঠিক তেমনি প্রতিটি মানুষের শাহারগের নিকটেই জাতরূপে অবস্থান করেন। তাই মানুষকে আল্লাহ তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে অভিহিত করেছেন। ফেরেশতারা এত গুণে গুণাবিত যে বলে শেষ করা যায় না, অথচ সেই ফেরেশতাদেরকে মানুষ হতে অনেক নিম্নমানের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কথিত আছে যে, শহিদে আজম ইমাম হোসায়েন আলাইহে সালাতুস সালামের রওজা মোবারকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দণ্ডায়মান থাকে এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দণ্ডায়মান থাকে। ইহা অধম লিখকের বানানো কথা নয়, বরং এই কথাটি যিনি বলেছেন তিনি পারানে পার দস্তগীর মাহবুবে সুবহানি কতবে বুঝানি গাউসে সামুদানি শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি আল হাসানি ওয়াল হোসায়নি আলাইহে সালাতুস সালাম। কারণ আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নফসও দেন নাই এবং রুহও দেন নাই। নফস-এবং রুহ-বজিত ফেরেশতারা সেফাতি নুরের তেরি, সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কেমন করে হয়? অথচ আমরা দেখতে পাই, অনেকেই ফেরেশতাদের গুণগান গাইতে-গাইতে আহাদে আটখানা হয়ে পড়ে। আল্লাহ শেরেকের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই অবস্থান করেন না। এই কথাটি সর্বসম্মত সর্বঅবস্থায় মনে রাখতে হবে।

১৫০. ওয়া (এবং) মিন্ (হইতে) হাইস্ (যেইখান) খারাস্তা (তুমি বাহির হও) ফাওয়াল্লি (সুতরাং ফিরাও) ওয়াজ্জাহা (তোমার চেহারা) শাহরা (দিক, অভিমুখ) মাসজিদ্ (মসজিদ) হারামি (হারাম)।

এবং যেইখান হইতেই তুমি বাহির হও সুতরাং ফিরাও তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে।

+ ওয়া (এবং) হাইস্ (যেইখানেই) না (না) কুনতুম্ (তোমরা ছিলে, তোমরা হও) ফাওয়াল্লি (সুতরাং ফিরাও) উজ্জাহাকুম্ (তোমাদের চেহারা) শাহরাহ্ (উহার দিকে)।

এবং যেখানেই তোমরা থাকো না (কেন) সুতরাং ফিরাও তোমাদের চেহারা উহার দিকে।

+ লিআল্লা (জন্য না, জন্য নয় কি) ইয়াকুনা (তোমরা হও) লিন্নাসি (মানুষের জন্য) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) হজ্জাতুন্ (দলিল, প্রমাণ, সত্যসত্য বিচারের উপায় বা নিদর্শন, যাহা দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান লাভ করা যায়, বিশ্বাসের হেতু, নজির, যথার্থ জ্ঞান, নিশ্চয় বোধ)।

যাহাতে তোমরা মানুষদের জন্য তোমাদের উপর দলিল হইতে পার।

+ ইল্লা (ব্যতীত, ছাড়া) আল্লাজিনা (যাহারা) জোয়ালান্নু (জুলুম করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে) মিন্হুম্ (তাহাদের মধ্য হইতে)।

তাহাদের মধ্য হইতে, জালেমগণ ব্যতীত।

+ ফালা (সুতরাং না) তাকশাউ (ভয় করা) হম্ (তাহাদের) ওয়া (এবং) ইকশাউনি (আম্মাকেই ভয় করো)।

সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না এবং আম্মাকেই ভয় কর।

+ ওয়া (এবং) লিউতিম্মা (আম্মি পরিপূর্ণ করি) নিম্মাতি (আম্মার নেয়ামত) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) ওয়া (এবং) লাআল্লাকুম্ (সম্ভবত তোমরা, হয়তো তোমরা) তাহতাদন (সঠিক পথে চলা, হেদায়েত পাওয়া)।

এবং আম্মি পরিপূর্ণ করি আম্মার নেয়ামত তোমাদের উপর এবং হয়তো তোমরা হেদায়েত পাইবে।

এই আয়াতে নিজেকে চেনার ধ্যানসাধনায় নিজেকে মসজিদুল হারাম তৈরি করে উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করাটাই হলো আলাহ হতে আগত শর্ত। মেজাজি মসজিদুল হারামের কথাটি এই আয়াতে কতটুকু খাটে অথবা খাটে না সেই বিষয়ে আলোচনাটি করছি না। নিজের পবিত্র নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মাখনটিকে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় – সেই শয়তানটিকে বাহির করে দিতে পারলেই আপন নফসটি হাকিকি মসজিদুল হারামে পরিণত হয়। মুখের কথায় লাফালাফি করা যায়, কিন্তু পরিবর্তন আনতে হলে তথা খান্নাসিদ্ধ পবিত্র নফসটিকে মসজিদুল হারামে পরিণত করতে হলে বছরের পর বছর একাকী ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকতে হয়। এই মহামূল্যবান শিক্ষাটি মহানবি হেরাউহায় ধ্যানসাধনাটি করে আম্মাদেরকে বাস্তবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, এই রকম নির্জনে একাকী ধ্যানসাধনায় মুগ্ধ হতে পারলেই নফসটি পবিত্র হয়ে যায় এবং এই পবিত্র নফসটিকেই হাকিকি মসজিদুল হারাম বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানটি অবস্থান করে ততক্ষণ মনটি বিষয় হতে বিষয়াত্তরে ভ্রমণ করে। খান্নাসযুক্ত নফসটি চঞ্চল এবং অস্থির প্রকৃতির – গরুর বাছুর যে-রকম চঞ্চল প্রকৃতির এবং চঞ্চলতা ও অস্থিরতার মূর্ত প্রতীক। এই চঞ্চলতা ও অস্থিরতাটি তৈরি করে খান্নাসরুপী শয়তান। মুসা নবির (আ.) বিপরীতে যার অবস্থান সেই সাম্মিরি দর্শনটি হলো : দুনিয়ার সব কিছু চঞ্চল আর অস্থির হয়ে ভোগ করে যাও। তাই আম্মরা সাম্মিরিকে কোনো দেব-দেবার পূজা করতে না দেখে বরং গরুর বাছুরটিকে স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে পূজা করতে দেখি। লক্ষ করুন, সাম্মিরি গরুর পূজা অথবা ষাউ-গরুর পূজা না করে গরুর বাছুর তথা গরুর বাচ্চার পূজা করতে তার অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেছে।

দুনিয়ার জীবনটাকে চঞ্চলতার মধ্যে থেকে ভোগ করে যাও - ইহাই সামারির মূল দর্শন। তাই সামারি শয়তানের বুদ্ধির জীবন্ত প্রতীক হয়ে গরুর বাছুরের পূজা করতে উৎসাহিত করেছে - যদিও অবশেষে হজরত মুসা কালিমউল্লাহ (আ.) এহেন সামারিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। এই কথাগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তাই বিরত রইলাম। এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে, মানবমনটি যখন একটি বিষয়ের উপর কিছুকণ অবস্থান করার পর উঠা হতে বাহির হয়ে অন্য বিষয়ে ছোটাছুটি করে তখন মনটিকে মসজিদুল হারামের দিকে তথা আপন শুদ্ধ সত্তার দিকে ধ্যানস্থ হতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যেন ইন্দ্রিয়পথে নানা রকম খুটখামেলার উদয় এবং বিলয় না ঘটে।

আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই যে কিছুদিন আগে আল্লাহর ওলিরাও ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকতেন এবং অনুসারীদেরকেও ধ্যানসাধনার নিয়ম পদ্ধতিগুলো শিখিয়ে দিতেন। খাজা গরিব নেওয়াজের মতো বিশ্ববিখ্যাত ওলিও একটানা ১৩ বছর একটি পাহাড়ের গুহায় ধ্যানসাধনা করেছেন। গাউসুল আজম গাউসে পাক, বাহাউদ্দিন নকশেবান্দ, মুজাদ্দের আলফেসানি সেরহিন্দ, বাকিবিল্লাহ, জুনুন মিসরি - এভাবে হাজার হাজার আল্লাহর ওলিরা ধ্যান-সাধনায় নিজনে একাকী বছরের পর বছর ডুবে থাকতেন।

১৫১. কামা (যেমন, যেরূপ, যে-রকম, যথা, উদাহরণ স্বরূপ) আরসালনা (আমরা [আল্লাহ] পাঠাইয়াছি, আমরা প্রেরণ করিয়াছি) ফিকুম (তোমাদের মধ্যে, তোমাদের নিকট) রাসুলান (একজন রসুল) মিনকুম (তোমাদের মধ্য হইতে, তোমাদের নিকট হইতে) ইয়াতলু (তেলাওয়াত করেন, পাঠ করেন) আলাইকুম (তোমাদের উপর) আয়াতিনী (আমাদের [আল্লাহ] আয়াতসমূহ, আমাদের নিদর্শন, আমাদের পরিচয়) ওয়া (এবং) ইতজাকিকুম (তোমাদেরকে পবিত্র করেন, তোমাদেরকে পুরিশুদ্ধ করেন) ওয়া (এবং) ইউআল্লিমুকুম (তোমাদেরকে শিক্ষা দেন) কিতাবা (কেতাব) ওয়া (এবং) হিকমাতা (হেকমত, বিজ্ঞান, রহস্যের জ্ঞান) ওয়া (এবং) ইউআল্লিমুকুম (তোমাদেরকে শিক্ষা দেন) মা (যাহা) লাম (না) তাকুনু (তোমরা) তাআলিমুন (জানিতে)।

যেমন আমরা [আল্লাহ] পাঠাইয়াছি তোমাদের মধ্যে একজন রসুল তোমাদের মধ্য হইতে তেলাওয়াত করেন তোমাদের উপর আমাদের আয়াতসমূহ এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন কেতাব এবং হেকমত এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যাহা তোমরা জানিতে না।

১৫২. ফাজ্জুরু (সুতরাং তোমরা জিকির করো) নি (আমাকে) আজ্জুরু (আমি [আল্লাহ] জিকির করিব) কুম (তোমাদেরকে) ওয়া (এবং) ইশ্কুরু (শোকর করো, কৃতজ্ঞ হও) লি (আমার জন্য) ওয়া (এবং) লা (না) তাক্ফুরুন (তোমরা কফর করিও)।

সুতরাং তোমরা জিকির করো আমাকেই, আমি তোমাদেরকে জিকির করিব এবং শোকর করো আমার জন্য এবং তোমরা কফরি করিও না।

এই দুটি আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু সব কিছু খুলে বলতে পারলাম না। আমি অকপটে মেনে নিই যে, অনেক কিছুই বলা উচিত ছিলো, কিন্তু সামাজিক পরিবেশের শৃঙ্খলাটি অটুট রাখার জুনিয়

বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখতে পারলাম না। এজন্য প্রথমেই আমার পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে তোমাদের মধ্য হতে আমরা তথা আল্লাহ একজন রসুল পাঠিয়েছি। তোমাদের মধ্য হতে একজন রসুল যে পাঠানো হয়েছে, সেই তোমাদের মধ্য বলতে এখানে কি আরব ভাষাভাষীদের

লক্ষ করে বলছেন, নাকি সমগ্র বিশ্বমানবকে উদ্দেশ্য করে বলছেন? লক্ষ করার বিষয়টি হলো, এখানে একজন রসুলের কথা বলা হয়েছে। সেই একজন রসুল যিনি আয়াত তেলাওয়াত করেন তথা আল্লাহর পরিচয়গুলো বুঝিয়ে দেন তথা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন। তারপরেই বলা হয়েছে যে, সেই একজন রসুল তোমাদেরকে পাকপবিত্র করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। এই পাকপবিত্রতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কি দৈহিক পাকপবিত্রতা, নাকি সামাজিক পাকপবিত্রতা, নাকি নফসের তথা জীবাত্মার পাকপবিত্রতা?

আমি অধম লিখক এখানে বুঝতে চাই যে, এই তিনটি স্থানের পাকপবিত্রতার জন্যই একজন রসুলকে পাঠানো হয়েছে এবং যেহেতু রসুলের বহুবচনটি ব্যবহার না করে এক বচনে 'রসুলান' বলা হয়েছে সেই হেতু মহানবি মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। দৈহিক পবিত্রতার প্রেক্ষাপটটি একজন সর্পিণ জ্ঞানী অথবা একজন হেকিম অথবা একজন কবিরাজ অথবা একজন চিকিৎসক দিতে পারেন, তারপরেও আমরা দেখতে পাই, মহানবি দৈহিক পবিত্রতার প্রশ্নে হাদিসে অনেক কথাই বলেছেন। তারপর আসে সামাজিক পবিত্রতার কথাটি এবং এই বিষয়ে মহানবি হাদিসে অনেক কথা আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে বলেছেন। এখন নফসের পবিত্রতার কথাটি মনে হয় মূল বিষয় এবং মূল লক্ষ্য, কারণ নফস তথা জীবাত্মা তথা আমি স্বয়ং পবিত্র, কিন্তু নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটিকে তথা শয়তানটিকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সেই অপকর্মের হোতা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপনি সত্তা হতে তথা আপন নফস হতে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে সেই মহাশিক্সার মহাউপদেশগুলোকেই মূল শিক্ষা বলে মনে হয়।

কোরান-এ অন্যত্র এই কথাটিও বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ নবি-রসুলই 'উম্মি' তথা অক্ষরপরিচয়হীন। একজন অক্ষরপরিচয়হীন রসুল, যিনি আমাদের মধ্য হতেই আগমন করেছেন, তাকে আল্লাহ-প্রদত্ত কত বড় রহস্যের শক্তি দান করা হলে তিনি মানবজাতিকে পবিত্র করার তরে আগমন করেছেন। শুধু কি পবিত্রের কথাই? তারপর বলা হয়েছে 'কেতাব' শিক্ষা দেবার কথাটি। এই 'কেতাব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'কেতাব' বলতে যেমন **কোরান**-কে বোঝানো হয়ে থাকে তেমনই আল্লাহ-প্রদত্ত প্রতিটি আসমানি কেতাবকেও 'কেতাব' বলা হয়ে থাকে। আবার, আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের ধারাসমূহকেও 'কেতাব' বলা হয়ে থাকে। **কোরান**-এর প্রথমেই 'জালিকাল **কোরান**' না বলে 'জালিকাল কিতাব' বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, হেকমত শিক্ষা দেবার জন্য তথা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য তথা রহস্যের জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হয়েছে। এই বিজ্ঞান বলতে কি আধুনিক যুগের বিজ্ঞানকে ধরে নেব? নাকি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার রহস্যের জ্ঞানগুলো জ্ঞানবার বিষয়টি ধরে নেব? জীবাত্মা তথা নফস এবং পরমাত্মা তথা রূহ - এই দুটি বিষয়ের রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দেবার জন্যেই যুগে-যুগে, কালে-কালে নবি-রসুল-আবদাল-আরিফ এবং ওলি-আল্লাহদেরকে পাঠানো হয়েছিল এবং এই পাঠানোর প্রশ্নে একমাত্র নবীদের আগমনটি শেষ হয়ে গেছে। রহস্যের জ্ঞান তথা হেকমত মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয় আল্লাহকে পাবার বিভিন্ন কৌশল এবং অবলম্বন, যে-বিষয়টি আজও সুফিদের মধ্যে কমনবেশি পাওয়া যায়। তাই এই রহস্যময় জ্ঞানের অধিকারীদেরকে সুফি বলা হয় এবং সুফিদের এই রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের ব্যাখ্যাগুলোকে সুফিবাদ নামে অনেক ক্ষেত্রে আখ্যায়িত করা হয়। তাই পরিশেষে আল্লাহ আমাদেরকে জিকির করতে বলেছেন এবং আল্লাহও আমাদের জন্য জিকির করবেন বলেছেন। এই 'জিকির' শব্দটির শাব্দিক অর্থটি যাই হোক না কেন, কিন্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রশ্নে ব্যাপক এবং বিস্তৃত। তাই পরিশেষে আল্লাহ আমাদেরকে এই বলে উপদেশ দিচ্ছেন যে,

তোমরা কোনো অবস্থাতেই কুফরি করো না, বরং কৃতজ্ঞ হও এবং ধৈর্যের সহিত শোকর করো।

১৫৩. *ইয়াআইউহা* (ওহে, হে) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমান* (ইমান আনিয়াছ, বিশ্বাস করিয়াছ) *মাইনু* (তোমরা সাহায্য চাও) *বিসুওয়াবরি* (সবরের সহিত, ধৈর্যের সহিত) *ওয়া* (এবং) *সালাত্* (নামাজ) *ইন্ন* (নিশ্চয়ই) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *মাইনু* (সাথে) *সোয়াবেরিন্* (সবরকারীদের, ধৈর্যধারণকারীদের)।

☐ হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ (হে আমানুগণ) তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য ও নামাজের সহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে (আছেন)।

☐ এই আয়াতে যারা ইমান এনেছে কেবল তাদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য চাইতে। এই সাহায্য চাইবার নিয়মটিও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সেই নিয়মটি হলো : সালাত এবং সবর তথা নামাজ এবং ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে। তারপরেই আল্লাহ বলছেন যে, তিনি ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে নামাজ এবং ধৈর্যের দ্বারা। কিন্তু আয়াতের শেষে 'ওয়া মাল মুসলিন' তথা নামাজীদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন - এই কথাটি না বলে সবরকারীদের সঙ্গে আছেন বলে ঘোষণা করা হলো। পাঠকদের জ্ঞানার জন্য বলে রাখা ভালো যে, সমগ্র *কোরান*-এর একটি আয়াতেও আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে আছেন বলা হয় নি। আল্লাহ নামাজের উপর এত গুরুত্ব দেবার পূর্বও নামাজীদের সঙ্গে পুরো *কোরান*-এ কেন একবারও বলা হলো না যে, তিনি নামাজীদের সঙ্গে আছেন? অবাক হতে হয়, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যখন দেখতে পাই যে, পুরো *কোরান*-এ তনুতনু করে খুঁজেও এমন একটি আয়াত পেলাম না যেখানে আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে আছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও নামাজের দুইটি রূপ আছে : একটি ওয়াজ্জিয়ার রূপ, অপরটি দায়েমির রূপ। ওয়াজ্জিয়া রূপটি হলো কিছু সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং দায়েমি রূপটি হলো চব্বিশ ঘণ্টা নামাজে ডবে থাকা। তাই মহানবি বলেছেন, *আসসালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাস সালাতিল ওয়াজ্জি* - অর্থাৎ, ওয়াজ্জিয়া নামাজ হতে দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক বেশি। আরও বলা যায় যে, পুরো *কোরান*-এর একটি স্থানেও পাচ ওয়াজ্জ নামাজের দলিলটি পাওয়া যায় না, বরং পাচ ওয়াজ্জ নামাজের দলিলটি আমরা হাদিসে পাই। কিন্তু যেইমাত্র দায়েমি সালাতের কথাটি আসে তখন এই দায়েমি সালাতের দলিলটি হাদিসেও পাই এবং *কোরান*-এর ৭০ নম্বর সূরা মারেজ-এর ২৩ নম্বর আয়াতটিতে দায়েমি সালাতের কথাটি সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে যেমন : *আল্লাজিনা হুম আলা সালাতিহুম দায়েমুন* - অর্থাৎ, 'যাহারা দায়েমি সালাতের উপর, তাহারা (প্রকৃত মুসলি)।' দায়েমি সালাতের উপর যাহারা (অবস্থান করেন) তাহারা (প্রকৃত মুসলি)।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে থাকেন না? কারণ নামাজ দেখানো যায় রুকু-সেজদার মাধ্যমে, কিন্তু সবর তথা ধৈর্য দেখাবার কোনো আনুষ্ঠানিকতা নাই। একশো হাত দূরেও কেউ নামাজ পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, কিন্তু নিজের বোগলতলায় একজন সবরকারী অবস্থান করলেও কিছু বোঝা যায় না। তারপরেও কথা থেকে যায় যে, যদি নামাজীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন বা আছেন বলে ঘোষণা দেওয়া হতো তা হলে, এজিদের সৈন্যবাহিনীও কারবালার ম্যাঠে নামাজ আদায় করেছে, এজিদের তাবুতেও আজান, ইমাম হোসাইনের তাবুতেও আজান, এজিদের তাবুতেও রুকু-সেজদা, আওলাদে রসুল ইমাম হোসাইনের তাবুতেও রুকু-সেজদা তাই আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে না থাকার কথাটি ঘোষণা করেছেন। অনেকে এই কথাটি শোনার পর মনে ব্যথা পাইতে পারেন, কিন্তু অধম লিখকের কিছু করার নাই। যদিও অধম

লিখক চান্স, চাখারা, আউয়াবিন তাহাজ্জুদ, সালাতুল উম্মা - এই পাঁচ প্রকার নফল নামাজও আদায় করতাম। *অধম লিখকের মতে এবং দর্শনে সবচাইতে দরুহ এবং কঠিন কাজটি হলো নিরপেক্ষ হওয়া। আল্লাহর গুণে যিনি যত বেশি ঊর্ধ্বাশ্রিত হতে পারেন তিনি ততটুকু নিরপেক্ষ।* কারণ আল্লাহ সামাদ তথা আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন তাহাকে একবচনে নিরপেক্ষ বলা হয়। সুতরাং আল্লাহ নিরপেক্ষ। অধম লিখক আল্লাহর নিরপেক্ষতার সহিত 'মহা' শব্দটি যোগ করে নিলাম। এই 'মহা' শব্দটি লিখকের, *কোরান*-এর নয়। সুতরাং আল্লাহ মহানিরপেক্ষ। সুতরাং যিনি (আল্লাহ) মহানিরপেক্ষ তাহার বাণীসমূহও অবশ্যই মহানিরপেক্ষ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাই ইসলাম, ধর্মাক্রতা ইসলাম নয়। কারণ ধর্মাক্রতা মানুষকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করার কথাটি শেখায়।

১৫৪. *ওয়া (এবং) না (না) তাকুল (তোমরা বলিও) লিমাই (যাহারা) ইউকতাল (নিহত হয়, হত্যা করা হয়, কতল করা হয়) ফি (মধ্যে) সাবিন (পথে, বাস্তবায়) লিমাই (আল্লাহর) আমওয়াতুন (তাহারা মৃত, তাহারা মরিয় গিয়াছে) বাল (বরং) আহইয়াউন (তাহারা জীবিত) ওয়ালাকিন (কিন্তু, যদিও) না (না) তাসউরুন (তোমরা অনুভব কর, তোমরা বোঝো, তোমরা জানো, তোমরা খবর রাখো)।*

এবং তোমরা বলিও না, যাহারা নিহত হয় আল্লাহর পথের মধ্যে তাহারা মৃত। বরং তাহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা জানো না।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ এতই ব্যাপক যে, ইহার দ্বারা একটি ছোট বই লেখা যায়। কিন্তু এখানে আমরা সংক্ষেপে কিছু কথা বলেই শেষ করে দিতে চাই। প্রথমেই বলা হয়েছে 'এবং' শব্দটি যুক্ত করে যে, যাহারা আল্লাহর পথের মধ্যে তথা 'ফি' তথা 'ইলা' নয় তথা 'দিকে' নয় - নিহত হয়েছেন, তথা কতল হয়েছেন, তাদেরকে মৃত বলতে তথা 'মরে গেছে' বলতে একদম মানা করে দেওয়া হয়েছে। যদিও ধর্মযুদ্ধটিকে 'জেহাদ' বলা হয়, আসলে এই জেহাদটিকে ছোট জেহাদ বলা হয়েছে। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার

পর মহানবির কাছে আসার পর মহানবি বলেছিলেন যে, তোমরা ছোট জেহাদে জয়লাভ করেছ, এবার তোমরা বড় জেহাদের দিকে ধাবিত হও। প্রশ্ন উঠেছিল, বড় জেহাদ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? মহানবি বলেছিলেন, *আপন নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই হলো আসল জেহাদ তথা জেহাদে আকবর তথা বড় জেহাদ। কোরান* যতই রূপকতার আশ্রয় নিক না কেন, মূল কথাটি বলাই *কোরান*-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। মূল হতে বিচ্যুত হয়ে কোনো কথাই *কোরান*-এ বলা হয় নাই। সুতরাং আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাটাই মূল উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হলো, নফস তো পবিত্র, তাহলে নফসের বিরুদ্ধে কেমন করে এবং কেন জেহাদ করতে যাব? প্রতিটি নফসের সঙ্গে শয়তানকে খান্নাসরূপে একান্ত পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এই খান্নাসটিকে নফস হতে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনাটিকেই জেহাদ বলা হয়েছে। ধর্মযুদ্ধের জেহাদটি এখানে গোণ এবং আপন নফসের মধ্যে অবস্থিত খান্নাসরূপী শয়তানটির বিরুদ্ধে জেহাদ করাটি হলো মুখ্য। এই গোণ এবং মুখ্য উভয় বিষয়টিকে একত্র করে অতলনীয় সূত্র করে *কোরান*-এ যে-বাক্যটি গঠন করা হয়েছে ইহা কোনো মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে যে-রকম বুঝে থাকে সে সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যাটি লিখে থাকে। তাই দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনটি একেক জনের একেক রকম হয়।

অধম লিখক এখানে আল্লাহর ওলিদের জেহাদের কথাটি বলতে চাই। কারণ আল্লাহর ওলিরা আপন নফসের অভ্যন্তরে শয়তানের অবস্থানটিকে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে যে-ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকেন সেই ধ্যানসাধনাটিকেই

বলা হয় জেহাদে আকবর তথা শ্রেষ্ঠ জেহাদ। মহানবি বলেছেন, *মৃত কাবলা আনতামৃত* তথা 'মরার আগে মরে যাও।' মৃত্যু নামক ঘটনাটি প্রতিটি মানুষকে একবারই চাখতে হয় তথা টেস্ট করতে হয়। সুতরাং যিনি বা যারা মরার আগেই মৃত্যুর স্বাদটি আনন্দন করেছেন তাদের আর মরণ নাই। কারণ দুইবার মরণের স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নাই। সুতরাং *মৃত কাবলা আনতামৃত* তথা মরে যাবার আগে মৃত্যুবরণ করার অর্থই হলো অপর নফস হতে খালীসরূপী শয়তানটিকে বিভাজিত করা। ইহাই মরার আগে মরে যাওয়ার রহস্য। সুতরাং আল্লাহর ওলিরা যেহেতু মরার আগেই মরে গেছেন, সুতরাং তাহাদের আর মরণ নাই। মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ঘণায়মান। আল্লাহর পথের মধ্যে যারা কতল হয়ে গেছেন তাঁরা চিরজীবন্ত এবং জন্মচক্রের বুকের মধ্যে তথা চক্রের মধ্যে আর আবর্তিত হন না। এইরূপ আল্লাহর ওলিদেরকে সাধারণ মানুষ চিনতেও পারে না এবং বুঝতেও পারে না। তাহাঁড়া জীবাত্মার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে জীবাত্মাটিকে বাসিয়ে দিলেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে জীবাত্মাটিকে চেনা যায় এবং সামান্য কিছুটা বোঝাও যায়, আল্লাহর এই রূপের খেলাটি 'ওয়াহেদ'-রূপে নয়, বরং এই রূপের খেলাটি 'আহাদ'-রূপেই খেলে চলছেন। এই 'ওয়াহেদ' এবং 'আহাদ'-রূপটি সবার চোখে ধরা পড়ে না। এবং ধরা পড়াটাও তকদির এবং না পড়াটাও তকদির। সুতরাং চরম পযায়ে আল্লাহর সৃষ্টির এই বিকাশমান খেলার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভ্রুটি-বিচ্যুতি নাই - তথা কোনো ভুল নাই। ভুলের অবস্থানটি মনের মাঝে। ভুলের গভীরতার মাপকাঠিতেই মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন রকম ভুল ধরে থাকে এবং ভুল ধরতে চেষ্টা করে। ইহাই রহস্যময় তকদিরের লীলাখেলা।

১৫৫. ওয়া (এবং) *লানাবলওয়ান্নাকুম* (আমরা [আল্লাহ] অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করিব) *বিশশায়িন্* (কিছু বস্তু দিয়া, কিছু জিনিস দিয়া) *মিনাল্* (হইতে) *খাওফি* (ভয়, শঙ্কা, ভীতি) *ওয়া* (এবং) *জুয়ি* (ক্লধা) *ওয়া* (এবং) *নাকসিন্* (ক্ষয়ক্ষতি, আপদ, রোগে ধ্বংস করা, দুষ্টিনা ঘটাইয়া) *মিনাল্* (হইতে) *আমওয়াল্* (অর্থসম্পদ, মাল, ধনসম্পদ) *ওয়া* (এবং) *আনফসি* (নফসের, জীবনের) *ওয়া* (এবং) *সামারাতিল্* (ফলসমূহ, ফলফলাদি, ফলশস্য) *ওয়া* (এবং) *বাসশিরিশ্* (সুসংবাদ দাও) *সোয়ীবেরিন্* (সবরকারীদের, ধৈর্যশীলগণকে, ধৈর্যধারণকারীদের)।

এবং অবশ্যই আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করিব কিছু বস্তু দিয়া ভয় এবং ক্লধা এবং ক্ষয়ক্ষতি হইতে, অর্থসম্পদ এবং নফসের এবং ফলফলাদি হইতে এবং ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দাও।

এই আয়াতে যারা আল্লাহর উপর ইম্যান এনেছে, বিশেষ করে তাদেরকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে তাঁদেরকে পরীক্ষা বিহনে বিশ্বাসের দৃঢ়তাটি কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উহা দেখার জন্যে। আল্লাহর এই পরীক্ষাটি কেমন করে নেওয়া হবে তার একটি ছোটখাট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যেমন ভয়ভীতি, ক্লধা ও দারিদ্র্য ধনসম্পদ, জীবন এবং ফলফলাদির উপর পরীক্ষাটি নেওয়া হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

এ সমস্ত জিনিসের বিপর্যয় ঘটলে জীবনের উপর স্থিরতাটি টলটলায়মান হয়ে ওঠে। এই রকম কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিটি ইমানদার মানুষের। এই এত কষ্টের পরীক্ষার মাঝেও যারা ধৈর্যধারণ করে তাদেরকেই আল্লাহ সুসংবাদটি দিতে বলেছেন। পরের তিনটি আয়াতে সুসংবাদের বিষয়টি কী হবে তা বলে দেওয়া হয়েছে।

১৫৬. *আল্লাজিনা* (যাহারা) *ইজ্জা* (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) *আসাবাতহম্* (তাহাদের কাছে পৌছাইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে) *মুসিবাতুন*

(দুঃখ, কষ্ট, দুঃখ দেয় এমন জিনিস, বিপদ) কাল (তাহারা বলে) ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) লিলাহি (আল্লাহরই জন্য) ওয়া (এবং) ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) উলাইহি (তাহারই দিকে) রাজিউন (প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা, প্রত্যগমন, যাহারা ফিরিয়া যায়)।

□□ যাহারা তাহাদের উপর যখন দুঃখ-কষ্ট আসিয়া পড়ে তাহারা বলে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহারই দিকে ফিরিয়া যাওয়া।

১৫৭. উলাইকা (উহারাই তাহারা) আলাইহিম (তাহাদের উপর) সালাওয়াতুন (নামাজসমূহ, রহমতসমূহ, দোয়াসমূহ, বিপুল অনুগ্রহ, দয়াসমূহ) মির (হইতে) রাব্বিহিম (তাহাদের রবের, তাহাদের প্রতিপালকের, তাহাদের সদাপ্রভুর) ওয়া (এবং) রাহ্মাতুন (রহমত, দয়া) ওয়া (এবং) উলাইকা (উহারাই তাহারা) হম (তাহারা) মুহতাদুন (হেদায়েতপ্রাপ্ত, সঠিক পথ পাইয়াছে)।

□□ উহারাই তাহারা রহমতসমূহ তাহাদের উপর তাহাদের রব হইতে এবং রহমত এবং উহারাই তো তাহারা সঠিক পথ পাইয়াছে তাহারা।

□ এই দুটি আয়াতে যাদের উপর বিপুল অনুগ্রহ এবং দয়া বর্ষিত হয় তাদেরকেই আল্লাহ সঠিক পথ পেয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন – যারা অনেক রকম বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদে পড়েও বিরাট ধৈর্যধারণ করে বলতে পারে যে আমরা আল্লাহরই জন্য এবং অবশ্যই আমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব। মানুষ যখন বিপদ-আপদে পড়ে যায় তখন প্রায়ই দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং ধৈর্যধারণের প্রশ্নে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। আমরা দেখতে পাই, ধৈর্যধারণের বদলে ধৈর্যচ্যুতিটাই বেশি। কিন্তু যারা এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থান করেও ধৈর্যধারণ করে বলতে পারে যে, এই বালা-মুসিবত তো আল্লাহ হতেই এসেছে এবং আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে – যারা এই বালা-মুসিবতে পড়েও বিরাট ধৈর্যধারণ করে এরকম কথাগুলো বলতে পারে তাদের উপর তাদের রব হতে বিপুল অনুগ্রহ এবং দয়া বর্ষিত হবার কথাটি আল্লাহ ঘোষণা করেছেন এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ একথাটিও বলেছেন যে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত তথা সঠিক পথে অবস্থান করছে। দুনিয়ার জীবনটা এমনই এক অদ্ভুত জীবন যেখানে প্রতিটি মানুষই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চায় এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে দূরে অবস্থান করতে চায়। কিন্তু যারা সুখে থাকার মাঝেও সহসা বালা-মুসিবতের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্যধারণ করে বলতে পারে যে, আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং একদিন আল্লাহরই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে – কথাটি সহজ, কিন্তু বালা-মুসিবতে পড়ার পরেও যারা এ রকম কথাটি বলতে পারে তারা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। তাই আল্লাহ এদেরকে সঠিক পথে অবস্থান করছে বলে ঘোষণা করলেন এবং বিপুল অনুগ্রহ এবং দয়া যে অপেক্ষা করছে সেই কথাটিও ঘোষণা করলেন।

রেলওয়ে স্টেশনে যখন পরিবার-পরিজন নিয়ে বহুদূরে যাবার আশায় হাজির হয়েছে তখন জানতে পারলো যে মিনিট তিনেক আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে। পুত্রকন্যারা পিতার এই সামান্য দেরি করার দরুন নানা রকম কথা শোনার পরেও পিতা বললেন যে, আল্লাহ যা করেছেন তা ভালোর জন্যই করেছেন। পিতার এ রকম কথাটি পুত্র-কন্যাদের মোটেই পছন্দ হয় নি, কিন্তু পরের দিন যখন জানতে পারল যে সেই ট্রেনটি অ্যাকসিডেন্ট করেছে তখন পিতাকে সবাই প্রশংসা করেছে। আপাতত দুঃখ, কিন্তু পরিণামটি যে কত বড় সুখকর হয়ে আছে এটা সবার জানা থাকার কথা নয়। দুঃখের পাশেই সুখ এবং সুখের পাশেই যে দুঃখ জড়িয়ে থাকে এটা কয়জন বুঝতে পারে? যারা বুঝতে

পারে, নিশ্চয়ই তারা ধৈর্যশীল এবং এই ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই যে আল্লাহ আছেন বা থাকেন এই কথাটি কোরান-এ কয়েকবার বলা হয়েছে।

১৫৮. ইননা (নিশ্চয়ই) সাফা (সাফা) ওয়া (এবং) মারওয়াতা (মারওয়া) মিন (হইতে) শাহাদীরি (নিদর্শনসমূহ, উদাহরণসমূহ, দৃষ্টান্তসমূহ, প্রমাণসমূহ, উল্লেখসমূহ, চিহ্নসমূহ) আল্লাহি (আল্লাহ) ফামান্ (সুতরাং যে) হাজ্জা (হজ করিবে) বাইতা (ঘরের) অথবা (অথবা) বা, ইচ্ছামাফিক (কিছু যখন, যদিও, কি) ইতামারা (ওমরা করিবে) আইয়াততাতাওয়াফা (তওয়াফ করিতে, ঘোরাফিরা করিতে, দোড়াইতে) বিহিমা (তাহাদের দুইজনের মধ্যে, তাহাদের দুইজনের সঙ্গে, তাহাদের দুইজনের ব্যাপারে, ইহার দুইয়ের মাঝে, তাহার দুইয়ের মাঝে) ওয়া (এবং) মান্ (যে কেহ) তাতাতাওয়া (সে আপন খুশিতে নেক কাজ করিয়াছে, সে নিজের আগ্রহে নেক কাজ করিয়াছে, সে অতিরিক্ত নেক কাজ করিয়াছে, সে স্বেচ্ছায় করে, খুশি মনে করে) খায়রান্ (উত্তম, ভালো, নেক কাজ, যাহা সকলে পছন্দ করে) ফাইননালাহা (সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ) শাকিরূন্ (মর্যাদাদানকারী) আলিমূন্ (জাননেওয়ালী, সব বিষয়ে বুজুর্গ, সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, বিজ্ঞ, খুব অবহিত)।

■ নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হইতে। সুতরাং যে ঘরের হজ করিবে অথবা ওমরা করিবে সুতরাং নাই কোনো গুনাহ তাহার উপর ইহার দুইয়ের মাঝে দোড়াইতে। এবং যে কেহ আপন ইচ্ছায় কল্যাণ করে সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ মর্যাদাদানকারী, জাননেওয়ালী।

■ মস্কার সামান্য দূরে অবস্থিত সাফা এবং মারওয়া নামক দুইটি ছোট পাহাড়। আরব দেশে প্রাচীন কাল হতেই এই দুটি পাহাড়কে পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সাফা এবং মারওয়া নামক পাহাড় দুটি হজ পালনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জড়িয়ে দিয়ে ইহাদের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড় দুটি নামের যে-সৌন্দর্য বহন করছে সেই সৌন্দর্যটিকে আনুষ্ঠানিক হজের সঙ্গে একত্রে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে পবিত্রতা এবং মনুষ্যত্ব প্রতিটি হজরত পালনকারীর মধ্যে ফটে উঠুক এবং পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হোক। অনেককে তো মা হাজেরার দোড়াদোড়িকে লক্ষ করে অনেক রকম কথাই বলতে শুনি। আরবি ভাষায় সাফা শব্দের অর্থটি হলো পরিষ্কার তথা শুদ্ধি এবং মারওয়া শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় মনুষ্যত্ব, নিম্নলতা, বিপুলতা, মানবিক বীরতা। সাফা এবং মারওয়া দুইটি পাহাড়ের প্রতীক রূপের অভ্যন্তরে শুদ্ধি এবং মনুষ্যত্বের বিষয়টি লুকিয়ে আছে। জাহের এবং বাতেনের মিলনে কী অপূর্ব উপস্থাপন, যাহা কোনো মানবের পক্ষে করা মোটেই সম্ভবপর নয়। গায়ের জোরে গুপ্তা হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। গুরু হতে হলে মাথার জোরের প্রয়োজন এবং মহাগুরু হতে হলে আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন। পাহাড় কখনো আল্লাহর পরিচয় দেবার মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। হজ পালনকারী সাধকদের শেরেকমুক্ত মন তথা খান্নাসরূপী শয়তান হতে মুক্ত অসম্মি শূন্যতায় যে নফসটি অবস্থান করে ইহাই আল্লাহর প্রতীক চিহ্ন। উহাই আল্লাহর পতাকাবহনকারী খান্নাসরূপী শয়তানমুক্ত মহাশূন্যে ভাসমান একটি পবিত্র নফস তথা 'আম্মি'। আম্মি কখনই কলুষিত নই। যখন 'আম্মি'-র সঙ্গে খান্নাসরূপ ধারণ করে শয়তানটি যুক্ত হয় তখনই হয় আম্মিত। এই আম্মিতই শেরেক তথা অংশীদার হবার ঘোষণাটি দেয়। মুখে-মুখে অংশীদারিত্বের কথাটি ঘোষণা করলেই শেরেক হয় না, বরং পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসকে জড়িয়ে রেখে কর্ম করাটাই হলো প্রকৃত শেরেক।

কাবা হলো মানবদেহের প্রতীক ঘর। এই মানবদেহের কাবা নামক প্রতীক ঘরে হিজরি সনের ধারণায় তিনশ মিনিট সর্ব সময় বিরাজ করে। লোভ, মোহ, ক্রোধ, হিংসা এবং দ্বেষ ইত্যাদি কলুষকালিমার তিনশ মিনিট (হিজরি

সনের মাপকাঠিতে) মূর্তি মানবদেহে বিরাজ করে। এই মূর্তিগুলিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবার নামই হলো হুজ। তওয়াফের মাধ্যমে বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শনের দ্বারা পরিপূর্ণ হতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এই আয়াতে।

১৫৯. **ইন্ননা** (নিশ্চয়ই) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **ইয়াকুন্ননা** (গোপন করে, লুকাইয়া রাখে, আবৃত করে, ঢাকিয়া রাখে) **মা** (যাহা) **আনজালনা** (আমরা [আল্লাহ] নাজিল করিয়াছি), **মিনান্** (হইতে) **বাইয়িনাতি** (দলিল, প্রমাণ, উজ্জ্বল প্রমাণ, খোলা চিত্তসমূহ) **ওয়া** (এবং) **হদা** (হেদায়েত) **মিম্বাদি** (ইহার পরেও) **মা** (যাহা) **বাইয়ান্নাহ** (আমরা [আল্লাহ] তাহা স্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছি) **লিন্নাসি** (মানুষদের জন্য) **কিল্কিতাবি** (কিতাবের মধ্যে)।

[[নিশ্চয়ই যাহারা গোপন করে যাহা আমরা নাজিল করিয়াছি উজ্জ্বল প্রমাণ হইতে এবং হেদায়েত ইহার পরেও যাহা আমরা [আল্লাহ] তাহা স্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছি মানুষদের জন্য কেতাবের মধ্যে।

+ **উলাইকা** (উহারাই তাহারা) **ইয়ালআনহুমু** (তাহাদেরকে লানৎ [অভিশাপ] করেন) **আল্লাহ** (আল্লাহ) **ওয়া** (এবং) **ইয়ালআনহুমু** (তাহাদের লানৎ [অভিশাপ] করেন) **লাইননা** (অভিশাপকারীগণ [যাহারা অভিশাপ দেওয়ার অধিকারী তথা মানুষ এবং ফেরেশতা])।

[[উহারাই তাহারা, তাহাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দেন এবং তাহাদেরকে অভিশাপ দেন অভিশাপকারীগণ (যাহারা অভিশাপ দেওয়ার অধিকারী তথা মানুষ এবং ফেরেশতা)।

[[এই আয়াতে সঠিক পথে অগ্রসর হবার কথাটি এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেবার পরও যারা উহাকে গোপন করে, মানবজাতিকে সঠিক পথটি ইচ্ছা করে যারা দেখায় না, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপকারীগণও তাহাদেরকে অভিশাপ দেয়। এখানে গোপন করার অর্থটি হলো মানুষের মাঝে প্রকাশিত অধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার করা। বস্তুবাদের পূজারিরা সহজে অধ্যাত্মবাদকে মেনে নেয় না এবং মেনে নিতে চায় না। এই অধ্যাত্মবাদটি দিবালোকের মতো সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়লেও অনেকেই ইচ্ছা করে ধরতে চায় না এবং গোপন রাখতেই ভালোবাসে। বস্তুর প্রতি মোহটি জীবাত্মা দেহ ধারণ করলেই উপস্থিত হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ জীবাত্মার দেহের সঙ্গে বস্তুমোহটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এই বস্তুমোহ হতে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করাটি একটি বিরাট সাধনার বিষয়। যদিও ইহা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আত্মার কোনো অঙ্গ থাকে না, বরং অঙ্গসৌষ্ঠবের মাঝে আত্মাটিকে স্থাপন করলেই সেই অঙ্গসৌষ্ঠবের দ্বারাই আত্মার পরিচয়টি পাওয়া যায়।

১৬০. **ইল্ললান্** (একমাত্র, ছাড়া, কিছু, ব্যতীত) **লাজিনা** (যাহারা) **তাবু** (তওবা করিয়াছে, অনুশোচনা করিয়াছে, অনুতপ্ত হইয়াছে) **ওয়া** (এবং) **আস্লাহ** (সংশোধিত হইয়াছে, সংশোধন করিয়াছে, উন্নতি লাভ করিয়াছে) **ওয়া** (এবং) **বাইয়ানু** (বয়ান করিয়াছে, ব্যাখ্যা দিয়াছে, বিবরণ দিয়াছে, বর্ণনা করিয়াছে)

বিস্তৃত পরিচয়দান করিয়াছে) **ফাউলাইকা** (সূতরাং উহারাই তাহারা) **আতুবু** (ক্লামাশীল হওয়া, ক্লামাশীল হওয়া, ক্লামাবানি হওয়া) **আলাইহিম্** (তাহাদের উপর) **ওয়া** (এবং) **আনা** (আমি) **তাউয়াবু** (তওবাকারী, তওবা গ্রহণকারী, অত্যন্ত ক্লামাশীল) **রাহিম্** (রহিম, ক্লামাপূর্ণ, করুণাময়, ক্লামাশীল, মেহেরবান, দয়ালু)।

[[একমাত্র যাহারা অনুশোচনা করিয়াছে এবং সংশোধন করিয়াছে এবং বয়ান করিয়াছে (ব্যাখ্যা দিয়াছে, বর্ণনা করিয়াছে) সূতরাং উহারাই তাহারা, তাহাদের উপর আমি ক্লামাশীল হইব। এবং আমি তওবা গ্রহণকারী রহিম।

১৬১. *ইননা ল্লাহিনা* (নিশ্চয়ই যাহারা) *কাফারু* (কুফরি করিয়াছে) *ওয়া* (এবং) *মাতু* (মরিয়া গিয়াছে) *ওয়া* (এবং) *হুমু* (তাহারা) *কুফকারুন* (কাফের) *উলহিকা* (উহারাই তাহারা) *আলাইহিম* (তাহাদের উপর) *লানাতলাহি* (আল্লাহর অভিশাপ) *ওয়া* (এবং) *মালাইকাতি* (ফেরেশতাদের) *ওয়া* (এবং) *নাসি* (মানুষদের) *আজ্জমাইন* (তাহারা সবাই, সকলেরই)।

□□ নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং মরিয়া গিয়াছে এবং তাহারা কাফের উহারাই তাহারা তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের।

□ এই দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে যদি কেউ তওবা করে তথা অনুশোচনা করে তথা অনুতপ্ত হয় তাহলে আল্লাহও তার উপরে মুখ ফেরান তথা করুণা করেন তথা তার উপর ক্ষমার দৃষ্টি দান করেন। কারণ আল্লাহ তওবা গ্রহণকারীদের কাছে 'রহিম'-রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু 'রহমান'-রূপে নয়। যদিও 'রহমান' এবং 'রহিম' দুইটি শব্দ দিয়েই দয়ালুই বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে 'রহমান'-রূপে সাধারণ দান এবং 'রহিম'-রূপে বিশেষ দান। তথা ক্ষমার পর যে-দানটি করা হয় উহা 'রহিম'-রূপী দান। তাই আল্লাহ 'গফুর'র রহমান নহেন, বরং 'গফুর'র রহিম।

তারপর বলা হয়েছে, যারা কুফরি করে এবং কুফরির অবস্থাতেই মারা যায় তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। শুধু কি আল্লাহরই অভিশাপ? না। বরং ফেরেশতাদের এবং সমগ্র মানবজাতির সমবেত অভিশাপ।

১৬২. *খালেদিনা* (তাহারা বাস করিবে, তাহারা জাঁকাইয়া থাকে, তাহারা স্থায়ী হইবে) *ফিহা* (উহার মধ্যে) *লা* (না) *ইউখাফফাকু* (লঘু করা, কম করা, হাস করা, সহজ করা, হালকা করা) *আনহুমু* (তাহাদের হইতে) *আজ্জাব* (শাস্তি, সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *হুমু* (তাহাদের) *ইউনজাকুন* (দেখা হইবে, অবসর দেওয়া হইবে, নজর দেওয়া হইবে)।

□□ তাহারা বাস করিবে উহার মধ্যে সহজ করা হইবে না তাহাদের হইতে শাস্তি এবং তাহার অবসর দেওয়া হইবে না।

১৬৩. *ওয়া* (এবং) *ইলাহকুম* (তোমাদের ইলাহ, তোমাদের কর্তা, তোমাদের অধিকারী, তোমাদের মাবুদ, সৃষ্টা, প্রভু, মনিব, প্রণেতা, নিমাতা) *ইলাহন* (ইলাহ) *ওয়াইদন* (এক) *লা* (নাই) *ইলাহা* (কোনো ইলাহ) *ইন্না* (একমাত্র, ছাড়া, ব্যতীত) *হয়া* (তিনি) *আর রাহমানু* (একমাত্র রহমান) *আর রাহিমু* (একমাত্র রহিম)।

□□ এবং তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই (এবং) একমাত্র রহমান এবং একমাত্র রহিম।

□ এই দুটি আয়াতের মধ্যে উপরের আয়াতে বর্ণিত যারা কাফের তাদের শাস্তির বিষয়টি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা বাস করবে উহার মধ্যে তথা 'ফিহা' তারা আজ্জাবের মধ্যে বাস করবে যারা কুফরি করেছে এবং এই আজ্জাব তথা শাস্তিটি মোটেই সহজ করা হবে না। এই শাস্তি ভোগ করার সময়ে যে সকল যন্ত্রণার চিৎকার করা হবে তা ফিরেও তাকিয়ে দেখবেন না আল্লাহ। তারপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে তোমাদের উপাস্য হলো একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই। মানুষের মনের মাঝে অনেক রকম ইলাহের উদ্ভব হয় এবং অল্প যায় এবং এই ইলাহগুলো মানুষের মনের মধ্যেই বাস করে। এই ইলাহগুলো আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও বাস করে না, কারণ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁহিঁদে বাস করে এবং যাহা তাঁহিঁদে বাস করে উহাই মুসলমান। এই মুসলমান শব্দটি *কোরান*-এর বর্ণিত গুণের মুসলমান এবং মোটেও ইহা নামের মুসলমান নয়। অন্ধ ছেলের নাম পদ্বলৌচন রাখলেই চক্কুমান যেমন হয় না, তেমনি নামের মুসলমান যে-পর্যন্ত *কোরান*-এ

বর্ণিত গুণের মুসলমান না হয় সেই পর্যন্ত নামসর্বস্ব হয়েছে থাকে। তাই আল্লাহ একমাত্র রহমান তথা দয়ালু এবং একমাত্র রহিম তথা দয়ালু। রহমানও দয়ালু, রহিমও দয়ালু। রহমান নামক দয়ালু রূপটি সবার জন্য, কিন্তু রহিম-রূপটি দয়ালু রূপটি হলো, অমিত হতে মৃত্তির ধ্যানসাধনায় যিনি রত তাকে মৃত্তি দেওয়াটাই রহিম-রূপটি দান তথা ক্ষমার পরে দান। তাই আমরা কোরান-এ দেখতে পাই, একটি বারের তরেও গফুর রহমান শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, বরং ব্যবহার করা হয়েছে গফুর রহিম।

সাধক যখন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে তথা আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে তখনই সাধক রহমান এবং রহিম দুইটি রূপের পরিচয় জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং চিনতে পারে। এই ধ্যানসাধনাটি যে কত বড় মহামূল্যবান বিষয় উহা মহানবি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন নির্জনে একাকী অন্ধকার হেরাওয়ায় পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করে। মহানবির জন্য এই ধ্যানসাধনাটির কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আদম যখন মাটি ও পানিতে ভাসমান তখনও মহানবি নবি, সুতরাং মহানবি তাঁর প্রাণপ্রিয় উম্মতদেরকে এই ধ্যানসাধনাটির শিক্ষা দিয়ে গেলেন, যাহা আগেকার ওলিদেরকে করতে দেখি। আফসোস! এই বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর ওলিদের মধ্যে কয়জন এই মহামূল্যবান ধ্যানসাধনার কথাটি গুরুত্ব সহকারে বলেন উহা অধম লিখকের জানি নাই।

১৬৪. ইন্না (নিশ্চয়ই) ফি (মধ্যে) খালকি (সৃষ্টিতে) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহ) ওয়া (এবং) আরদি (পৃথিবীর) ওয়া (এবং) ইখতিলাফ (মতভেদ, দ্বিবারাত্রি, একটার পিছনে আরেকটির আগমন, আবর্তন, পরিবর্তন) লাইলি (রাতের) ওয়া (এবং) নাহারি (দিনের) ওয়া (এবং) ফুলকি (নৌকাগুলি, ডিঙ্গিসমূহ [অনেকে অতিরিক্ত জজবায় এবং অতিরিক্ত হালে মশগুল হয়ে জাহাজ শব্দটিও ব্যবহার করে এবং ইহা একটি মারাত্মক ভুল, কারণ জাহাজের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে]) আন্লাতি (যাহা) তাজ্জিরি (প্রবাহিত হয়, চলে, বহমান) ফি (মধ্যে) বাহারি (নদী, সাগর, সমুদ্র, বস্তুর আধিক্য, জ্ঞানের আধিক্য আছে, বিদ্যাসাগর) বিম্মা (যাহা) ইয়ানফাউ (সে উপকার করে, সে হিতসাধন করে, সে কল্যাণ করে) নাসা (মানুষদের) ওয়া (এবং) মা (যাহা কিছু) আনজালা (নাঙ্গল করিয়াছে, অবতরণ করা হইয়াছে) আল্লাহ (আল্লাহ) মিন্ (হইতে, থেকে) সাম্মায়ি (আকাশ) মিন্ (হইতে) মাইন (পানি) ফাওয়াইয়া (সুতরাং জীবিত করেন) বিহি (উহার দ্বারা, ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে) আরদা (মাটি, জমিন, পৃথিবী, দেহ) বাদা (পরে) মুউতিহা (তাহার মরণ, তাহার মৃত্যু) ওয়া (এবং) বাসসা (সে ছাড়াইয়া দিয়াছে, বাতাসে ধূলা উড়ানো, দুঃখে অস্থির হইয়া যাওয়া, গোপন রহস্যের প্রকাশ, বিস্তার করেন) ফিহা (উহার মধ্যে) মিন্ (হইতে) কুল্লি (সব, সমস্ত প্রত্যেক) দাব্বাতিন্ (প্রাণী, জীবজন্তু, পশু, বিচরণকারী, হাম্মাগুলি দিয়া চলে যে, একটি বিশেষ প্রাণী যাহা কেয়ামতের আগে সাফা নামক পাহাড় ফাটিয়া বাহির হইবে এবং তাহা মানুষের সঙ্গে কথা বলিবে এবং কে মোমিন এবং কে কাফের তাহা চিহ্নিত করিবে)।

□□ নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে এবং দিন ও রাত্রির আবর্তনের এবং নৌকাগুলি যাহা চলে নদীর মধ্যে যাহা মানুষদের উপকার করে এবং যাহা কিছু আল্লাহ নাঙ্গল করেন আকাশ হইতে, পানি হইতে সুতরাং জীবিত করেন তাহা দিয়া মাটিকে তাহার মৃত্যুর পরে এবং উহার মধ্যে ছড়াইয়া দেন প্রত্যেক জীবজন্তু হইতে।

+ ওয়া (এবং) তাসরিফি (প্রবাহ) রিইয়াহি (বাতাস, বায়ু, সম্মীরণ) ওয়া (এবং) সাহাবি (মেঘ, বাদল - মেঘের মধ্যে পানি থাকুক বা না থাকুক মেঘকে 'সাহাব' বলা হয়। কখনো 'সাহাব' বলতে ছায়া এবং অন্ধকারকে মনে করা হয়) মুসাখখারি (বাধ্য করা হইয়াছে যাহাকে, নিয়ন্ত্রণ করা, কাহাকেও আহ্বানক বানানো, বাধ্য করিয়া কোনো কাজ করানো) বাইনা (মধ্যে, দুইটি বস্তুর মধ্যে অবস্থার বর্ণনা করা) সাম্মায়ি (আকাশে) ওয়া (এবং) আরদি (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ) লাআয়াতিন্ (অবশ্যই নিদর্শনাদি, অবশ্যই পরিচয়গুলি) লিকাউমিন্ (কণ্ডমের জন্য, সম্প্রদায়ের জন্য, জাতির জন্য) ইয়াকিনুন (জ্ঞানী, জ্ঞানবান, তত্ত্বজ্ঞ)।

এবং বাতাসের প্রবাহে এবং পৃথিবী এবং আকাশের দুইয়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘ (এবং) অবশ্যই জ্ঞানী কণ্ডমের জন্য (জ্ঞানীজাতির জন্য) এবং অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

এই আয়াতটির মাধ্যমে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বৈষয়িক জ্ঞানেরও যে প্রয়োজন আছে সেই কথা বলা হয়েছে। এই বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞানী জাতি ইহার রহস্য বুঝতে পারে এবং বুঝবার দরুণ বিভিন্ন প্রকার নতুন-নতুন আয়াতগুলির তথা নিদর্শনগুলোর রহস্য আবিষ্কার করে চলছেন। এই আবিষ্কারটি মোটেই চাটুখানি কথা নয় বরং বিরাট একটি গবেষণার বিষয় এবং এই গবেষণায় যে জাতি যতটুকু অগ্রসর হতে পারে সেই জাতি ততটুকু পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। ইহা কোনো ব্যক্তি বিশেষের মনগড়া কথা নয়, বরং কোরান-এরই একটি জুলন্ত ঘোষণা। কোরান-এর এই জুলন্ত ঘোষণাটি বুকে ধারণ করে যে-জাতি পৃথিবীতে অগ্রসর হতে পারে সেই জাতিকেই কোরান জ্ঞানী কণ্ডম বলে ঘোষণা করেছে। বৈষয়িক বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোরান মানুষকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন এবং এই উৎসাহকে যে-সকল জাতি তথা কণ্ডমেরা অবহেলা করেছে এবং অবজ্ঞায় পৃষ্ঠপদর্শন করেছে সেই-সব জাতিকে জ্ঞানী জাতির নিকট মাথা নিচু করে থাকতে হয়। এই অপ্রিয় সত্যদর্শনটি পৃথিবীর বুকে আমরা দেখে আসছি এবং বাস্তবতার কশাঘাতে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলোকে জর্জরিত এবং অপমানিত হতে দেখছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রশ্নে কী সুন্দর করে আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে! তাই কোরান বলছে, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর রহস্যটুকু গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে চেষ্টা কর এবং দিন ও রাতের আবর্তনের মাঝে যে-রহস্যগুলো লুকিয়ে আছে সেগুলো বুঝতে চেষ্টা কর, যে-নৌকাগুলো নদীতে অথবা জাহাজের আকারে বিরাট নৌকাগুলো যে সাগরে বিচরণ করছে সেই রহস্যগুলো বুঝতে চেষ্টা কর। আকাশ হতে যে-পানি বর্ষণ করা হচ্ছে এবং মৃত জমিন কৈমন করে জীবন্ত হয়ে ফটে উঠছে এবং প্রতিটি জীবজন্তু যে বিচরণ করছে সেই রহস্যের জ্ঞানে জ্ঞানী ইবার আশ্রান জানানো হয়েছে। মেঘমালা এবং বায়ুর পরিবর্তনের মাঝেও যে বিরাট-বিরাট রহস্যের জ্ঞান লুকিয়ে আছে উহা আবিষ্কার করার আশ্রান জানানো হচ্ছে তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবার নিদেশ মানবজাতিকে দেওয়া হচ্ছে। তাই এই আয়াতে নিদর্শনগুলো বুঝবার জন্য, জ্ঞানবার জন্য, গবেষণা করার জন্য সুমুগ্ন মানবজাতিকে আশ্রান করা হয়েছে। এই আশ্রানটি কোনো ধর্মীয় ঘোমটার মধ্যে সম্মাবদ্ধ রাখা হয় নি, বরং আশ্রানটি মহাসার্বজনীন, মহাবিস্তৃত এবং মহামানবতার উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ আশ্রান।

এই বিজ্ঞানের অবদানে মুসলমানেরাও অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। বিজ্ঞানে মুসলমানের দান কথাটি কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং একটি বাস্তব স্বাক্ষর। কিন্তু আফসোস! আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে সাতার্নটি মুসলিম দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোথায় দাড়িয়ে আছে উহা নিজের বিবেককেই প্রশ্ন

করুন। এই বিবেকের প্রশ্নের উত্তরটি আপনার তকদিরের অবশ্যস্বাবী বৃত্তের অবগুণ্ঠনে ঘূর্ণায়মান।

১৬৫. ওয়া (এবং) মিনান্ (মধ্য হইতে) নাসি (মানুষদের) মাই (যে) ইয়াত্‌তাখিজ্ (মনে করে, ধারণা করে, গ্রহণ করে, উপলব্ধি করে, সিদ্ধান্ত নেয়, নির্ধারণ করে) মিনদানি (ব্যতীত, ছাড়া, একমাত্র) আল্লাহি (আল্লাহ) আন্দাদান্ (প্রতিপক্ষ, সম্মপর্ষায়, সমতুল্যরূপে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে) ইউহিব্বুনাহম্ (তাহারা তাহাদেরকে ভালোবাসে) কাহববি (যেমন ভালোবাসা, ভালোবাসার ন্যায়) আল্লাহি (আল্লাহর)।

এবং মানুষদের মধ্যে যে গ্রহণ করে আল্লাহ ছাড়া সমতুল্যরূপে তাহারা তাহাদেরকে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসে আল্লাহকে।

+ ওয়া (এবং) আল্লাজিনা (যাহারা) আমনি (ইমান আনে) আশাদ্দু (খুব খতিন, শক্ত, দৃঢ়) হুব্বান্ (ভালোবাসা) লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য)।

এবং যাহারা ইমান আনে (তাহাদের) ভালোবাসা আল্লাহর জন্য দৃঢ়।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) ইয়ারা (দেখিত, দেখিতে পাইত) আল্লাজিনা (যাহারা) জালাম্ (জুলুম করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে) ইজ্ (যখন) ইয়ারাউনা (তাহারা দেখিবে) আজাবা (আজাব)।

এবং যদি দেখিত যাহারা জুলুম করিয়াছে যখন তাহারা দেখিবে আজাব।

+ আননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) কুয়াতা (শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল) লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য) জামিয়ান্ (সমস্ত, সবটুকু)।

নিঃসন্দেহে সমস্ত শক্তি আল্লাহর জন্য।

+ ওয়া (এবং) আননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে)-নাহা (আল্লাহ) শাদিদু (কঠিন, কঠোর, শক্ত, দৃঢ়, ভীষণ, দুঃসহ) আজাবি (শাস্তি দিতে, শাস্তি দানে)।

এবং অবশ্যই আল্লাহ শাস্তি দিতে কঠোর।

যদিও আমরা জানি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো অস্তিত্বই নাই, তারপরেও এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে কিছু লোক অন্য কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে নেয়। এই সমকক্ষরূপে গ্রহণ করাটা একান্ত মনের ব্যাপার, কারণ মনের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি জড়িয়ে আছে। যদিও আমরা জানি, আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো শেরেক নাই তথা অংশীদার নাই – কিন্তু এই শেরেক, এই অংশীদারিত্বটি মনের মধ্যে বিরাজ করে একমাত্র শয়তানের প্ররোচনায়। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ হতেই আগত। তাই সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহর সেফাত তথা গুণাবলিরূপে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহর এই গুণাবলিকে শয়তান মনের মধ্যে আল্লাহর সমকক্ষরূপে দাঁড় করায়। ইহা মানুষের মনের ভুল, কারণ আল্লাহর সৃষ্টিতে বিহীন ভুলের কোনো অবকাশ থাকতেই পারে না। যেহেতু মনের মাঝে শয়তান অবস্থান করে সেই হেতু আল্লাহর সৃষ্টিকেও অনেক সময় আল্লাহর সমকক্ষরূপে দেখার প্ররোচনা দেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তি শয়তানের দেওয়া বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি কখনই নফস হতে আগত নয়। কারণ বারবার বলা হয়েছে যে নফস পবিত্র, কিন্তু নফসের সঙ্গে যখন শয়তানের অবস্থানটি থাকে তখনই দৃষ্টির দর্শনে অনেক রকম কলুষতা দেখা দেয় এবং তখনই শেরেক আর তাগুতের মধ্যে মানুষ মনের অজ্ঞান হাবুডুব খায়। অন্যথায় আল্লাহর সমকক্ষ পাওয়া তো বহু দূরের কথা, বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অস্তিত্বেরও আল্লাহ হতে আলাদা বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু মানুষ যখন ইমানের কাজটি করে তথা ইমান আনয়ন করে তখনই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাটি সুদৃঢ় হয়। পরিশেষে যারা জালেম তথা অত্যাচারী যদি তারা এই আজাবের, এই শাস্তির ভয়াবহতাটি প্রত্যক্ষ করত তাহলে তারাও এই বলে ঘোষণা করত যে আল্লাহ সমস্ত শক্তির অধিকারী।

১৬৬. **ইজ্জ** (যখন) **তাবাররা** (সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, সম্পর্কের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে, সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে, দায়িত্ব অস্বীকার করিবে, সংস্রব ত্যাগ করিবে, যোগাযোগ ছিন্ন করিবে, আত্মীয়তা অস্বীকার করিবে, সংযোগ ছিন্ন করিবে) **আললাজিনা** (যাহারা) **তবিউ** (অনুসরণ করা হইত, অনুগমন করা হইত, অনুকরণ করা হইত) **মিন্** (হইতে) **আললাজিনা** (যাহারা) **ইত্তাবাউ** (অনুসরণ করিত) **ওয়া** (এবং) **রাআউ** (দেখিবে, দেখে, দেখিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিবে, দর্শন করিবে, তাকাইবে, প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবে) **আজাবা** (আজাব, শাস্তি, দণ্ড) **ওয়া** (এবং) **তাকাত্তোয়াআত** (বিচ্ছিন্ন হইবে, ছিন্ন করিবে, ভাঙ্গিয়া যাইবে, কাটিয়া যাইবে, টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবে, কণ্টন করিবে, সংযোগ ছিন্ন করিবে, বিচ্ছিন্ন করিবে, কাটিয়া বাদ দিবে) **রিহিমু** (তাহাদের সহিত) **আস্বাত** (যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সকল প্রকার উপায়-উপকরণ, রশিসমূহ, যোগসূত্র, সমস্ত সম্পর্ক)।

□□ যখন যাহারা অনুসরণ করিত (তাহারা) সম্পর্ক ছিন্ন করিবে যাহারা (অনুসরণকারীদের) হইতে অনুসরণ করিত এবং দেখিতে পাইবে আজাব এবং ছিন্ন করিবে তাহাদের সহিত সকল প্রকার যোগসূত্র।

১৬৭. **ওয়া** (এবং) **কাল** (বলিবে) **আললাজিনা** (যাহারা) **আততাবাউ** (অনুসরণ করিত) **লাউ** (যদি) **আননা** (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) **লানা** (আমাদের জন্য) **কাররাতান্** (একবার, পুনরায় করা) **ফানা তাবাররা** (সুতরাং আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম) **মিন্হম্** (তাহাদের থেকে, তাহাদের হইতে) **কাম্মা** (যেমন) **তাবাররাউ** (তাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে) **মিন্না** (আমাদের হইতে, আমাদের থেকে)।

□□ এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল (তাহারা) বলিবে যদি আমাদের জন্য একটিবার (সুযোগ থাকিত তাহা হইলে) সুতরাং আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম তাহাদের থেকে যেমন আমাদের থেকে তাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

+ **কাজালিকা** (ওইরূপভাবেই) **ইউরিহিমু** (তাহাদেরকে দেখাইবেন) **আলাহ** (আলাহ) **আমালাহম্** (তাহাদের অমিলগুলি, তাহাদের কর্মসমূহ) **হাসারাতিন্** (আক্ষেপরূপে, পরিতাপরূপে, আফসোস, দুঃখ, লজ্জা) **আলাইহিম্** (তাহাদের উপর)।

□□ ওইরূপভাবেই আলাহ তাহাদের আমলগুলিকে তাহাদের দেখাইবেন পরিতাপরূপে তাহাদের উপর।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (না) **হম্** (তাহারা) **বিখারিজিনা** (বাহির হইতে পারিবে) **মিন্** (হইতে) **নারি** (আপ্তন)।

□□ এবং তাহারা বাহির হইতে পারিবে না আপ্তন হইতে।

□ এই দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার পর পরিস্কার অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা শাস্তির উদ্ভাবনতাটি দেখতে পাই এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন সম্পর্ক এমনকি আত্মীয়তার বন্ধনগুলোও ছিন্ন হয়ে যায়। আত্মডোলা মানুষ এই শাস্তি এবং এই দুঃখকষ্টগুলো অনুভব করতে পারে না। সাধকেরা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যটি জীবিত অবস্থায়ও সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারে তথা বুঝতে পারে। মিথ্যা মায়ার খান্নাসা বোকায়ে পড়ে মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি অন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা এই মোহটি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন যাদেরকে অনুসরণ করে এ-হেন অবস্থায় পতিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাটি ব্যক্ত করা হয়। মিথ্যা মায়ার অনুসারীরা যে আক্ষেপের হাহুত্যাশে জ্বলতে থাকে ইহাই আলাহর দেওয়া এক ধরনের সূক্ষ্ম শাস্তি। যারা এই দুনিয়ার মোহমায়ার আঙনে জ্বলেছে

এবং তাদেরকে আশ্রয় করেছো তারাই আক্ষেপের ভাষায় বলতে থাকবে যে এই মোহমায়ার আশ্রয় হতে যারা মুক্ত ছিল তাদেরকে কেন অনুসরণ করলাম না! কিন্তু এই আক্ষেপের ভাষা, এই বিলাপের কান্না, এই কীতর ক্রমা-প্রার্থনার কথাগুলো তখন আর কোনো কাজেই আসবে না বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

১৬৮. *ইয়াআইউহান্* (ওহে, হে) *নাস্* (মানবজাতি, মানবসকল) *কুল্* (তোমরা খাও) *মিম্মা* (যাহা) *ফি* (মধ্যে) *আরদি* (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ) *হালালান্* (হালাল) *তাইয়েবান্* (পবিত্র)।

□□ পৃথিবীর মধ্যে যাহা হালাল (এবং) পবিত্র (তাহা) তোমরা খাও।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তাত্তাবিউ* (তোমরা অনুসরণ করিও) *খুতুয়াতিস্* (পদক্ষেপসমূহ, পদাঙ্কগুলি, পদচিহ্নসমূহ, পা ফেলার দাগগুলি, পদধ্বনিসমূহ, ধাপসমূহ, গতিক্রম) *শাইতোনানি* (শয়তানের)।

□□ এবং তোমরা অনুসরণ করিও না শয়তানের পদচিহ্নগুলি।

+ *ইননাহ্* (নিশ্চয়ই সে) *লাকুম্* (তোমাদের জন্য) *আদুডুডুন্* (শত্রু, প্রতিপক্ষ, বৈরী, দুশমন) *মুবিনুন্* (প্রকাশ্য, প্রকাশিত, প্রকাশযোগ্য, দৃষ্টিগোচর)।

□□ নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. *ইননাম্মা* (নিশ্চয়ই) *ইয়ামুরুকুম্* (তোমাদেরকে হকুম করে, তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়, তোমাদেরকে যে আদেশ-নির্দেশ দেয়) *বিস্‌সুয়ে* (খারাপ কাজের দিকে, পাপ কাজের দিকে, মন্দ কাজের দিকে, অশীল কাজের দিকে, কুৎসিতের দিকে, জঘন্যের দিকে, কুরুচিপূর্ণের দিকে, লালসাপূর্ণের দিকে, কলুষতার দিকে, অশুভের দিকে)।

□□ নিশ্চয়ই (শয়তান) তোমাদেরকে হকুম দেয় অশীলতা এবং পাপকাজের দিকে।

+ *ওয়া* (এবং) *আন্* (যে, এই যে, হইতে) *তাকুল্* (বলে) *আনাল্লাহে* (আল্লাহর উপর) *মা* (যাহা) *লা* (না) *তায়ালামুনান্* (তোমরা জান)।

□□ এবং বলে যে আল্লাহর উপর যাহা তোমরা জান না।

□□ এই আয়াত দুইটিতে সমগ্র মানবজাতিকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে যাহা কিছু পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র এবং হালাল উহাই ভক্ষণ করতে হবে। যদিও এই আয়াতের মধ্যে খাদ্য কথাটির উল্লেখ করা হয় নাই স্তরাং ইহার দ্বারা কেবল খাদ্য ভক্ষণ করাই বোঝায় না, বরং সকল প্রকার বিষয়ের উপরেও ভোগ করার কথাটি বোঝানো হয়েছে। হারাম খাদ্য ছাড়া তথা অবৈধ উপায়ে অর্জন করা খাদ্য ছাড়া বৈধভাবে উপার্জিত অথবা সংগৃহীত খাদ্য হালাল খাদ্য। এই হালাল খাদ্য ভোগ করা যায়, কিন্তু পবিত্র ভোগ করা যায় না। কারণ যারা আল্লাহর পথের ধ্যানসাধনায় তথা মোরাক্বা-মোশাহেদায় মশগুল থাকেন সেই সকল সাধকেরাই কেবলমাত্র পবিত্র ভোগটি করে থাকেন। স্তরাং পবিত্র ভোগটি উপভোগে রূপান্তরিত হয়। যিনি পবিত্র হয়ে সকল কিছু ভোগ করে থাকেন তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত মোমিন। তিনি আমান নহেন, কারণ আমান এবং মোমিনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা সর্বসময়ে সালাতের মধ্যে থেকে পবিত্র ভোগ করা যায়। নতুবা সর্বপ্রকার বিষয়-আশয় পবিত্র করে ভোগ করা যায় না। নফস পবিত্র, কিন্তু খান্নাস অপবিত্র। *খান্নাসের ধর্মই হলো বিষয়াগ্ৰবে দ্রুত ধাবিত করা*। স্তরাং এই শয়তানই মানুষকে মোমিন হবার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শয়তানই হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই এই শয়তানের অনুসরণ এবং অনুকরণ না করি সেই বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং বারবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াত দুটিতে ভালো করে

লক্ষ করে দেখেন যে শয়তান প্রতিটি আপন-আপন পুত্র নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ শয়তানকে কেবলমাত্র তার সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের দুইটি স্থানে বসবাস করার অধিকার দিয়েছেন। সেই দুইটি স্থানের নাম হলো : একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর বিহনে শয়তানের থাকবার আর কোনো স্থান আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয় নাই। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তওহিদে বাস করে, কেবলমাত্র দুইটি স্থানে তওহিদ শব্দটি বারবার প্রস্তুত হতে থাকে। আল্লাহর উপর মানুষ এবং জিন কেহই বিদ্রোহের সূরে কথা বলে না এবং বিদ্রোহের সূরে কথা বলার প্রস্তুতি ওঠে না, কিন্তু এই শয়তান প্রতিটি নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার দরুণই বিদ্রোহ করে এবং যত রকম মন্দ এবং অশুভতার মধ্যে ডুবে থাকার বারবার প্ররোচনা দিয়ে থাকে এই শয়তান। সুতরাং এই শয়তান আমাদেরকে ভোগবাদী বানাতে চায় এবং ভোগী হবার অসীম প্ররোচনায় বস্তুমোহের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং এই বস্তুমোহই হলো সকল প্রকার অপবিত্রতার উৎস। এই ভোগের মাঝে পবিত্রতা আনতে না পারলে সকলই মন্দ হয়ে যায় এবং তখনই মানুষ আপন-আপন প্রবৃত্তির পুজায় বিভোর হয়ে থাকে। অবশেষে আল্লাহ বারবার আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, শয়তান হলো প্রতিটি মানুষের জন্য প্রকাশ্য শত্রু তথা দূশমন। মহানবি বলেছেন, দায়েমি সালাতের মর্যাদাটি ওয়াস্তিয়া সালাত হতে অনেক বেশি আফজাল : *আসসালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাস সালাতিল ওয়াস্তি*। এই মহামূল্যবান মহানবির হাদিসটি ওহাবি সম্প্রদায় কখনই প্রচার করতে চায় না, কারণ দায়েমি সালাতের স্বীকৃতি দিলেই সুফিবাদ অবধারিতরূপে এসে যায়। এই দায়েমি সালাতের প্রকাশ্য দলিলটি আমরা *কোরান*-এর ৭০ নম্বর সূরা আল মারিজ-এর ২৩ নম্বর আয়াতে পাই। এই ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : *আল্লাজিনা হম্ম আলা সালাতিহিম দায়েমুন* - অর্থাৎ, যাহারা দায়েমি সালাতের উপরে অবস্থান করেন তাহারাও মুসলি। ওয়াস্তিয়া সালাতের প্রশ্নে *কোরান* কায়েম শব্দটি ব্যবহার করেছে, কিন্তু দায়েমি সালাতের বেলায় 'আলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আলা' অর্থ উপরে তথা যারা দায়েমি সালাতের উপর আছে তাহারাও মুসলি। *কোরান*-এর এই আয়াতটিকে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা ভীষণ ভয় পায়, কারণ অনুষ্ঠানের উপাসনা করাটাই তাদের একমাত্র দর্শন।

১৭০. *ওয়া* (এবং) *ইজা* (যখন) *কিলা* (বলা হয়) *লাহম্ম* (তাহাদের জন্য) *ইত্তাবিউ* (তোমরা এত্তেবা কর, তোমরা অনুসরণ কর, তোমরা আনুগত্য কর, তোমরা অনুগমন কর, তোমরা অনুকরণ কর) *মা* (যাহা) *আনজালী* (নাফেল করিয়াছেন) *আলাহ* (আল্লাহ) *কাল* (তাহারা বলে) *বাল* (বরং, পক্ষান্তরে, অপরদিকে, পরন্তু, অন্যদিকে) *নতিতাবিউ* (আমরা অনুসরণ করিব) *মা* (যাহা) *আলফাইনা* (আমরা পাইয়াছি) *আলাইহি* (তাহার উপর) *আবাবানা* (আমাদের বাপ-দাদাদের)।

এবং যখন তাহাদের জন্য বলা হয় আল্লাহ যাহা নাজিল করিয়াছেন (তাহা) তোমরা অনুসরণ কর, বরং তাহারা বলে আমরা অনুসরণ করিব যাহা আমরা পাইয়াছি আমাদের বাপ-দাদাদের উপর।

+ *আউযালাও* (কি এবং যদিও) *কানা* (ছিল) *আবাত* (বাপ-দাদারা) *হম্ম* (তাহাদের) *লা* (না) *ইয়াকিলুনা* (তাহারা বুঝিত) *শাইয়ান* (কিছুই) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইয়াহতাদুন* (তাহারা সঠিক পথে চলিত)।

কি এবং যদিও তাহাদের বাপ-দাদারা ছিল তাহারা কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সঠিক পথে চলিত না।

এই আয়াতে সমগ্র মানবজাতিকে বিরাট একটি চপেটাঘাত দিয়ে আল্লাহ বলছেন যে, বাপ-দাদাদের অনুসরণ-অনুকরণ এবং আনুগত্য প্রদর্শন করাটি

ধর্মজীবনে সত্যের সঠিক পথে অগ্রসর হবার ইচ্ছায় একটি প্রবল বাধা, একটি প্রচণ্ড অগ্রবায়ু, একটি শক্ত দেয়াল। আজও এই বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতেও অতি উচ্চশিক্ষিতদেরকেও বাপ-দাদাদের ধর্ম বিষয়ে অনুসরণ করার প্রশ্নে বিভ্রান্ত হতে দেখি। কেবল বিভ্রান্তিই নয়, বরং বাপ-দাদাদের ধর্মদর্শনটিকে সঠিক এবং অনুসরণযোগ্য বলে অনেক প্রকার বইপুস্তক লিখেও সত্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা চালায়। বংশ পরম্পরায় যে-ধর্মদর্শনটির প্রচলন হয়ে এসেছে সেই ধর্মদর্শনটি সঠিক হোক আর ভুলই হোক তার জন্য আজও প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে গলাবাজি করতে কষ্ট দেখি না। প্রত্যেক কণ্ঠস্ব এবং প্রত্যেক জাতিতে তার নিজস্ব ধর্মদর্শনটিকে ধর্মদর্শনের ছকে না ফেলে সংস্কৃতির ঘোমটা পরিয়ে ঐতিহ্যের বিকাশ বলে গর্ব করতে দেখি। ধরুন পিতা যদি মুসলমান হয় তাহলে পুত্রকেও মুসলমান হতে হয় এবং এটাই যেন মনে হয় বিধির একটি অমোঘ বিধান। মুসলমান পুত্রটিকে - যেহেতু বাপ-দাদারাও মুসলমান ছিল তাই - কোরান-হাদিস, ঈজমা-কেয়াস ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়তে হয় এবং পড়ার পর যে-ধারণা অর্জিত হয় উহা প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে না। কেন? যেহেতু বাপ-দাদারা মুসলমান তাই তিনিও মুসলমান। আবার যদি বাপ-দাদারা হিন্দু-ধর্মের অনুসরণ করে আসছে তাহলে ছেলেটিও বাপ-দাদাদের ধর্মটিকে অনুসরণ করবে এবং বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করার পর নিজেদের ধর্মটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে অনেক পরিশ্রম করতেও দ্বিধা করবে না এবং মানুষকে বোঝাতে চাইবে যে, তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অনুসরণ করার জন্য পৃথিবীকে আশ্বাস জানাবে। এরকমভাবে খ্রিস্ট-ধর্মে জন্মগ্রহণকারী তার বাপ-দাদাদেরকেই অনুসরণ করবে। আবার ইহুদি-ধর্মের অনুসারী তার বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা ধর্মটিকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জনতাকে আশ্বাস জানাবে। আবার জৈনধর্মের অনুসারী তার বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা জৈনধর্মটিকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণ করতে চাইবে এবং দুনিয়ার মানুষকে আশ্বাস জানাবে। আবার বৌদ্ধধর্মের অনুসারী তার বাপ-দাদাদের অনুসৃত বৌদ্ধধর্মটিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে চাইবে এবং জনতাকে সত্য ধর্ম বলে গ্রহণ করার তরে আশ্বাস জানাবে। আবার কনফুসিয়াস-ধর্মের অনুসারীদের বাপ-দাদাদের অনুসৃত কনফুসিয়াস-ধর্মটিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে এবং জনতাকে আশ্বাস জানাবে। এভাবে পৃথিবীতে বহু ধর্ম বিরাজ করছে এবং সবাই নিজেদের বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মালা পরিয়ে প্রচার করে চলছে। তাই প্রথমেই এই আশ্রিতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে বলতে হলো যে, পিতৃপুরুষের অনুসরণ এবং অনুকরণ করবার অভ্যাস ধর্মজীবনে সত্যলান্ডের পথে সত্যিই একটি শক্তিশালী বাধা। আমার এই কথাগুলো মেনে নিলেও আমার বলার কিছু নেই এবং না মানলেও বলার কিছু থাকে না। তাই মানুষ স্বভাবতই পিতৃপুরুষদের দোহাই দিয়ে ধর্মের মাঝে মিশ্রিত্যাকে প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। যারা জীবন-ভর মনুষ্যজীব হয়েও জৈবিক ভোগের ধারাটিকেই অনুসরণ করেছে তাদের ধর্মটি ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরা কোনো দিন কোনো কালেও বিষয়মোহ হতে মুক্তিলাভ করে কেমন করে আত্মপরিচয়টি জানা যায় সেই বুদ্ধি এবং সেই জ্ঞান খাটায় নাই। সে জন্যই এই জাতীয় মানুষের কাছে হেঁদায়েত পাওয়াটি হয় সুদূর পরাহত। মুখের বিলুপ্তিলিখে লিখনির মারপ্যাচে ধর্মের নামে ভোগবাদী দর্শনটিকে দাড় করানো হয় এবং এ জন্যই কোরান দুঃখ করে বলছে যে, এরা সত্য এবং সঠিক পথ পাবার জন্য বুদ্ধি খাটায় নাই। প্রতিটি মানুষ জানে যে, পৃথিবীতে কিছু দিন অবস্থান করার পর মরে যেতে হবে এবং এত বড় নির্জলা সত্যটি জানবার পরও না জানার ভান

করে ভোগবাদী দর্শনটিকে ধর্মের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

১৭১. ওয়া (এবং) মাসালু (তুলনা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, উপমা, নজির, সাদৃশ্য, এমন কথা যার অন্য কথার সহিত সামঞ্জস্য আছে, একটা হইতে অন্যটার অবস্থান পরিষ্কার হইয়া যায়, দ্বিতীয়টার ছবি প্রথমটার দ্বারা সামনে আসিয়া যায়) লাজিনা (যাহারা) কাফার (কাফের, কুফরি করে, অস্বীকার করে, অমত প্রকাশ করে, অসম্মতি প্রকাশ করে, প্রত্যাখ্যান করে) কামাসালি (এইরূপ, ইহার মতো, অবস্থা) আললাজি (যাহারা) ইয়ানইক (চীৎকার করিয়া ডাকে, হুকডাক দেয়) বিমা (যাহা) না (না) ইয়াস্মাউ (শোনা) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) দোয়াআন (ডাকা, আস্থান, চাওয়া, প্রার্থনা করা) ওয়া (এবং) নিদাআন (আওয়াজ, চীৎকার)।

এবং যাহারা কাফের (তাহাদের) উদাহরণ এইরূপ যাহারা চীৎকার করিয়া ডাকে যাহা শুনে না একমাত্র ডাক এবং আওয়াজ ছাড়া।

+ সম্মম (বধির, শ্রবণশক্তিহীন, কালা, অমনোযোগী, শুনিত্তে নারাজ) বুকমুন (বোবা, মুক, বাকশক্তিহীন, প্রকাশের অস্বাধ্য, চাপা, নীরব) উমইউন (কুনি, অন্ধ, এখানে চোখের অন্ধ এবং অন্তর্দৃষ্টিহীন দুইটাকেই বোঝানো হইয়াছে, অজ্ঞান, বিচার-বিবেচনাহীন অদূরদর্শী, বিচারবুদ্ধিহীন, বেপরোয়া) ফাহম (সুতরাং তাহারা) লা (না) ইয়াকিলুন (তাহারা বুঝে না)।

সুতরাং তাহরাই বধির, বোবা, অন্ধ – তাহারা বুঝে না।

এই আয়াতে যারা কাফের তথা অস্বীকার করে তাদের নমুনা তো অনেকটা এই রকম যে তাদের ডাকলে শোনে, কিন্তু সত্যের ডাক দিলেই আর শোনে না তথা সত্যকে গ্রহণ করে নেবার শ্রবণশক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রবণশক্তিটি কাজ করে না। এই মূল্যবান কথাগুলো বোঝাবার জন্যই রূপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কারণ রূপক কথাটি এজন্যই বলা হলো যে, তারা মোটেই বধির নয়, বরং সব কিছু শুনতে পায়, কিন্তু সত্যের ডাক দিলেই এরা অটোম্যাটিক বধির হয়ে যায়। সেই একই রকমভাবে তারা মোটেই বোবা নয়, কিন্তু আল্লাহর অবস্থানের প্রশ্নে তারা বোবার ভূমিকা পালন করে। তেমনি তারা মোটেই অন্ধ নয়, কিন্তু সত্যের আস্থানটি করতে গেলেই তারা অন্ধের অভিনয় করে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, ‘লা ইয়াকিলুনা’ – সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না তথা বুঝবার চেষ্টাটুকু করতে চায় না। যারা প্রথমেই সত্যকে অস্বীকার করে তথা কাফের তারা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিটি প্রয়োগ করতে পারে না, বিশেষত ধর্ম-বিষয়ের প্রশ্নে। কারণ ধর্মদর্শনের রহস্য বুঝবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে এই কারণে যে জগতের মায়াকীননের মায়ায় ডুবে থেকে মায়ার মাঝেই অন্ধ, বধির আর বোবা হয়ে যায়। জগতসংসারে এই মায়াজালের এত সাংঘাতিক অদৃশ্য শক্তি থাকে যে আল্লাহর নিরেট সত্যটিকে মনেপ্রাণে বুঝবার এবং জানবার ধ্যানসাধনা করার শক্তি, সামর্থ্য এবং আগ্রহটুকুও হারিয়ে ফেলে। তখন মনে করে, এই মায়ার জগতটাই তো একটি বাস্তব সত্য আর পরকালে ধর্মদর্শনের সত্যটিকে গুরুত্ব দেওয়া তো অনেক দূরের কথা, বরং দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না এবং কিছু বলার থাকলেও বলতে চায় না। মায়ার জগতের আবরণটি ছিন্ন করে সত্যসাগরে অবগাহন করার তরে ধ্যানসাধনা করাটিকে গ্রহণ করে নিতে চায় না, বরং আপাতমধুর সুখের সংসারে জীবনের মায়ামমতায় ডুবে থেকে এবার আবার মুনগুড়া কথার দর্শন বানিয়ে নিয়ে অন্য মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে। নিয়তির এই নির্ভুর খেলাটি কত দিন চলবে অধম লিখকের জানা নাই।

১৭২. ইয়াআইউহা (ওহে, হে) আললাজিনা (যাহারা) আমানু (ইমান আনিয়াছে) কল (তোমরা খাও) মিন (হইতে) তাইয়েবাতি (পবিত্র জিনিসসমূহ, উত্তম জিনিসগুলি, পবিত্র জিনিসপত্র, উত্তম বস্তুসমূহ) মা (যাহা)

রাজাকনাকুম (আমরা [আল্লাহ] তোমাদেরকে রেজেক দিয়াছি) ওয়াশকুরু (শোকর কর, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য) ইন্ (যদি) কনতুম (তোমরা হও) ইয়াহ (কেবল তাহাকেই, শুধু তাহাকেই) তাবুদুনা (তোমরা এবাদত কর)।

□□ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছ, পবিত্র জিনিসগুলি হইতে তোমরা খাও যাহা আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে রেজেক দিয়াছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (শোকর কর) আল্লাহর যদি তোমরা একমাত্র তাহারই এবাদত করিয়া থাক (অথবা এবাদত কর)।

□ এই আয়াতে কেবলমাত্র যারা ইমান এনেছে তাদেরকেই এই বলে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসগুলো রেজেকরূপে দান করেছি উহা তোমরা ভক্ষণ কর। একটি ভালো করে লক্ষ করে দেখুন যে, এই উপদেশটি আল্লাহ 'আমরা'-রূপ ধারণ করে যারা ইমান এনেছে তাদেরকেই দিচ্ছেন। এই উপদেশ মানবজাতিকে পাইকারিভাবে দেওয়া হচ্ছে না, বরং যারা ইমান এনেছে তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হচ্ছে। তারপরেই আল্লাহ বলেছেন, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তথা শোকর কর আল্লাহরই জন্য। অবশেষে ইমানদারদেরকে লক্ষ করে আরও একটি মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন : কেবল তাহাকেই যদি এবাদত করে থাক। কেবল তাহাকেই শব্দটিকে 'ইয়াহ' বলা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, ইমানদারেরা তো আল্লাহরই এবাদত করে থাকেন, তাহলে 'ইয়াহ' কেবলমাত্র তাহাকেই বলার মাঝে কী এমন রহস্য লুকিয়ে আছে? আমরা জানি, যিনি ইমানদার তিনি তো কেবল আল্লাহরই এবাদত-বন্ধেগি করে থাকেন। তাহলে 'ইয়াহ' তথা কেবলমাত্র তাহাকেই কথাটি দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? ইহা মোটেই কোনো আত্মবিরোধী উক্তি নহে, বরং এই কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যারা একদম নতুন ইমান এনেছে তাদেরকেই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কারণ ইমান আনার পরে আবার ইমান ভেঙে যেতে পারে। নতুন ইমানদার যারা, তাদের ইমান ভেঙে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকার দরুনই 'ইয়াহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক অনুবাদকারী আগা-মাথা, ভালো-মন্দ বিচার না করেই এই 'আমান' অনুবাদ করতে গিয়ে 'মোমিন' শব্দটি লিখে ফেলেন। ইহা একটি মারাত্মক এবং জঘন্য ভুল। এবং এই ভুলের পথ দিয়ে সাধারণ মানুষ সব কিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। শুদ্ধেই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আল কোরআনুল কারিম নামক অনুবাদ গ্রন্থে 'আমান'-দেরকে 'হে মুমিনগণ' কেমন করে লিখে ফেললেন ইহা দেখে এবং পড়ে অবাকের উপর অবাক হতে হয়। শুদ্ধেই এতগুলো মহাপণ্ডিত মিলে কেমন করে আমানদেরকে 'হে মুমিনগণ' বলে অনুবাদ করে ফেললেন! এই শুদ্ধেই গুণাজনদের হাতগুলো কি কেঁপে উঠল না? কারণ লক্ষ-লক্ষ মানুষ এই অনুবাদ পড়বে এবং বিরাট একটি ভুল শিক্ষা লাভ করবে। আরও একটি কথা বলা দরকার মনে করছি যে, আমানদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি পুরা কোরান-এর একটি জায়গাতেও নাই, অথচ মোমিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন এবং থাকেন বলে কোরান-এর সূরা আনফাল-এর ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়া আন্বাল্লাহা মা আল মুমিনিন্ - অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনদের সহিত রহিয়াছেন। এত বড় উল্লেখ সত্যটি জানবার পরেও এত বড় মারাত্মক এবং জঘন্য ভুলটি কেমন করে করা হয় তা অধম লিখকের জানা নেই।

১৭৩. ইন্নামা (নিশ্চয়ই) হাররামা (হারাম করা হইয়াছে, নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, বারণ করা হইয়াছে, নিষেধ করা হইয়াছে, মানা করা হইয়াছে, নিবারণ করা হইয়াছে) আলাইকুমুল (তোমাদের উপর) মাইতাতা (মৃত জন্তু, মড়া, মারা গিয়াছে এমন) ওয়া (এবং) দাম্মা (রক্ত, খুন, শোণিত, ক্রোধ) ওয়া (এবং) লাহ্মান্ (মাংস, গোشت, জীবদেহের চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী কোমল

অংশবিশেষ) *খিনজিরি* (শুকরের, বরাহের, শুয়োরের) *ওয়া* (এবং) *মা* (যাহা) *উহিল্লা* (ডাকা, নাম দেওয়া হইয়াছে, নামে) *বিহি* (তাহার সঙ্গে, ইহা দিয়া, উহার দ্বারা) *লিগাইরি* (ব্যতীত, ছাড়া) *আলাহ* (আল্লাহ)।

□□ নিশ্চয়ই তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছে মরা (জন্তু) এবং রক্ত এবং শুয়োরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ ব্যতীত নাম দেওয়া হইয়াছে উহার দ্বারা (অথবা – এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যাহা [জবেহ] করা হইয়াছে)।

+ *ফামানিদ* (সূতরাং যে) *তবরা* (নিরুপায় হইয়া, অনন্যোপায় হইয়া, অপারগ হইয়া) *গাইরা* (না) *বাগিন* (বিদ্রোহী হইয়া, সে সীমা অতিক্রম করে, যে আদেশ অমান্য করে, যে নাকরমানি করে) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *আদিন* (সীমালঙ্ঘনকারী, যে বাড়াবাড়ি করে, যে জুলুম করে) *ফালা* (সূতরাং নাই) *ইসমা* (গুনাহ, দোষ, অপরাধ, পাপ) *আলাইহি* (তাহার উপর)।

□□ সূতরাং যে নিরুপায় হইয়া নাকরমানি না করিয়া এবং সীমালঙ্ঘন না করিয়া সূতরাং নাই কোনো গুনাহ তাহার উপর।

+ *ইন্নাল্লাহা* (নিশ্চয়ই আল্লাহ) *গাফুরুন্* (ক্লমাশীল) *রাহিম* (রহিম)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্লমাশীল রহিম।

□ এই আয়াতের মর্মটি আমাদের মোটেই বোধগম্য নহে। সূতরাং যাহা বোধগম্য নহে উহার ব্যাখ্যা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ বোধগম্য হলে তো ব্যাখ্যাটি দিতে পারতাম।

১৭৪. *ইন্না* (নিশ্চয়ই) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *ইয়াকতমুনা* (গোপন করে, গোপন রাখে, লুকাইয়া রাখে) *মা* (যাহা) *আনজিলি* (নাজিল করিয়াছেন, অবতীর্ণ করিয়াছেন) *আলাহ* (আল্লাহ) *মিনাল* (হইতে) *কিতাবি* (কেতাব) *ওয়া* (এবং) *ইয়াস্তাকুনা* (তাহারা বিনিময় গ্রহণ করে, তাহারা ক্রয় করে, মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে, তাহারা কেনে) *বিহি* (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) *সামানান* (মূল্য, বিক্রয়কারী ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের বিনিময়ে যাহা পায় তাহা, আর্থিক লাভ, আয় মুনাফা) *কালিলান* (সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ, বাজে, গণনার অযোগ্য)।

□□ নিশ্চয়ই যাহারা গোপন করে যাহা নাজিল করিয়াছেন আল্লাহ কেতাব হইতে এবং তাহারা বিনিময় গ্রহণ করে ইহা দিয়া তুচ্ছ মূল্যে।

+ *উলাইকা* (উহারাই তাহারা) *মা* (না) *ইয়াকুলুনা* (তাহারা খায়, তাহারা ভক্ষণ করে) *ফি* (মধ্যে) *বুতনিহিম* (তাহাদের পেটে) *ইল্লা* (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) *নারা* (আপ্তন, অগ্নি) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইউকাললিমুহমু* (তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন) *আলাহ* (আল্লাহ) *ইয়াওমাল* (দিনে) *কিয়ামাতি* (কেয়ামতের) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইউজাককিহিম* (তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন, তাহাদেরকে পরিশুদ্ধ করিবেন, পূর্ণ করিবেন, বিশুদ্ধ করিবেন, শোধন করিবেন, ডেজাল হইতে বিমুক্ত করিবেন)।

□□ উহারাই তাহারা, তাহারা খায় না তাহাদের পেটের মধ্যে আপ্তন ছাড়া এবং তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলিবেন না কেয়ামতের দিনে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন না।

+ *ওয়া* (এবং) *লাহম* (তাহাদের জন্য) *আজাবুন* (আজাব, শাস্তি) *আলিমুন* (দুঃখজনক, কঠিন)।

□□ এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুঃখজনক আজাব (শাস্তি)।

□ এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, কেতাব হতে যাহা নাজিল করা হয়েছে উহা যাহারা গোপন করে এবং উহাকে অল্প মূল্যে যারা বিক্রয় করে উহারাই তো তাহারা যাদের পেট আপ্তন দ্বিগুণ করে। তাহলে এখানে দুটো বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একটি কেতাব যাহা নাজিল করা হয়েছে তাকে গোপন করি তথা লুকিয়ে রাখা। এই গোপন করা অর্থটি সম্ভবত খুব ব্যাপক অর্থেই

ব্যবহার করা চলে। অপরাধটি হলো ওই আল্লাহর দেওয়া কেতাবের কালামকে অতি তচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করার অপরাধ। এই তচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করার অপরাধ কথাটিকেও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আমরা এখানে ব্যাপক অর্থটিতে না গিয়ে অতি সংক্ষেপে বলছি যে, যারা আল্লাহর কেতাব হতে যা নাফেল করা হয়েছে উহা গোপন করে এবং অতি তচ্ছ দামে সেই কালাম যারা কেনাবেচা করে তাদের পেট আগুন ছাড়া আর কিছুই খায় না, তাই উহারাই তাহারা তথা 'উলাইকা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যারা এই দুটি অপকর্মে লিপ্ত থাকে তাদেরকে কঠিন শাস্তির কথাটিও শোনানো হয়েছে। কেবল কি শাস্তিরই কথা? না, বরং কেয়ামতের দিনে তাদের সঙ্গে আল্লাহ কোনো কথাই বলবেন না। এই কেয়ামত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কি ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামত? নাকি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করার কেয়ামত? জ্ঞানী পাঠকেরা সহজেই এই বিষয়টি বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। তারপর আরও বলা হয়েছে যে এদেরকে পবিত্রও করা হবে না তথা 'ইউজাককিহিম'। আয়াতের প্রথমে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তারপর বলা হয়েছে, তাদেরকে পবিত্রও করা হবে না। যাদের পেট আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এই দুটি কারণে তাদের সঙ্গে কেয়ামতের দিনে কথা না বলার মাঝে কি রহস্যপূর্ণ কিছু কথা থেকে যায় না? যারা পেটের মধ্যে আগুন নিয়ে মারা যাবে এবং মারা যাবার পরেই কেয়ামতের কথাটি আসে, সুতরাং কেয়ামতের পরে মহাপাপীদেরকে কেমন করে পবিত্র করার প্রশ্নটি আসে, যদি না পুনর্জন্মবাদকে মেনে নেওয়া হয়? অবশেষে এই বলেই শেষ করছি যে, এই আয়াতের অর্থগুলো বড়ই ব্যাপক এবং বিস্তৃত এবং মৃত্যুর পরেও যে মহাপাপীকে পবিত্র করা যায় ইহার পূর্ণ ইঙ্গিতটি দিনের আলোর মতো সত্য বলে মনে হয়।

১৭৫. **উলাইকা** (উহারাই তাহারা, তাহারা সুবাই) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **ইশতারাত** (তাহারা ক্রয় করিল, তাহারা খরিদ করিল, তাহারা বিক্রয় করিল, তাহারা কিনিল, তাহারা কিছুর বিনিময়ে অর্জন করিল, তাহারা মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করিল) **দালালাতা** (বিভ্রান্তি, রাস্তা হইতে বিচ্যুত হওয়া, সঠিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়া, ভ্রান্ত পথ, গোমরাহী, ভ্রান্তি, ভুল, ভুল ধারণা) **বিল** (বদলে, পরিবর্তে, বিনিময়ে) **ইদা** (হেদায়েতের, সঠিক পথের, ঠিক রাস্তায়, পথের নির্দেশনার) **ওয়া** (এবং) **আজাব** (শাস্তি, আজাব, সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ, পশ্চাদ, যন্ত্রণার হেতু) **বিল মাগফিরাত** (ক্ಷমার বদলে, ক্ক্ষমাশীলতার বদলে)।

উহারাই তাহারা যাহারা খরিদ করিয়াছে ভুল পথ সঠিক পথের বিনিময়ে এবং ক্ক্ষমার বদলে শাস্তি।

+ **ফাম্মা** (সুতরাং কতই না) **আস্বারা** (সবর করিবে, ধৈর্যধারণ করিবে, ধৈর্যশীল হইবে) **হম** (তাহারা) **আলা** (উপর) **নারি** (আগুনে)।

সুতরাং আগুনের উপর তাহারা কতই না সবর করে!

১৭৬. **জালিকা** (ওইটা, সেইটা, উল্লিখিতটা, সম্মুখস্থটা) **বিয়ান্না** (এই জন্য যে) **আল্লাহা** (আল্লাহ) **নাফ্ফালী** (নাফেল করিয়াছেন, অবতারণ করিয়াছেন) **কিতাবা** (কেতাব) **বিলহাককি** (সত্যের সহিত)।

ওইটা এইজন্য যে আল্লাহ নাফিল করিয়াছেন কেতাব সত্য সহকারে।

+ **ওয়া** (এবং) **ইন্না** (নিশ্চয়ই) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **ইকতালফ** (মতভেদ করিয়াছে, মতনৈক্য করিয়াছে, মতের অমিল হইয়াছে, বিপরীত মত পোষণ করিয়াছে) **ফিল** (মধ্যে) **কিতাবি** (কেতাবের) **লাফি** (অবশ্যই) **শিকাকিন** (বিরোধিতা, মোকাবেলা, বিপরীত, অনেক, বিভেদ) **বাইদিন** (দূরে)।

□□ এবং নিশ্চয়ই যাহারা বিপরীত মত পোষণ করিয়াছে কেতাবের মধ্যে অবশ্যই (তাহারা সত্য হইতে) বিরোধিতা (করিয়া) দূরে (অবস্থান করে)।

□ এই দুটো আয়াতের মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে যারা আল কেতাব হতে সত্যটিকে মোখিকভাবে জানবার পরেও গ্রহণ করে নিতে পারে না অথবা গ্রহণ করে নিতে গভির্মসি করে এবং দুনিয়ার মায়ার জালের মধ্যে আটকা পড়ে যায় অথবা দুনিয়ার লোভনীয় চাঁওয়া-পাওয়ার মাঝে মত্ত থাকে তারা এই দুনিয়ার জুজাল হতে মুক্তির হেদায়েতের বিনিময়ে বিভ্রান্তিগুলোকে গ্রহণ করে নেয়। এই বিভ্রান্তিগুলোই মুক্তির পথ না দেখিয়ে এবং বিভ্রান্তি হতে মুক্তি পাবার ক্রম্যার পরিবর্তে শাস্তিটিকে মনের অজান্তে অথবা জেনেও গ্রহণ করে নেয় এবং এই গ্রহণ করে নেওয়াটাকেই কোরান-এর ভাষায় কিনে নেওয়া বলা হয়েছে তথা ক্রয় করে নেয় বলা হয়েছে। আল কেতাব হতে এত সুন্দর মুক্তির বারতা জানবার এবং বুঝবার পরও মানুষ কেমন করে লোভ-মোহের মাঝে ডুবে থাকতে পারে - উহী দেখেই আল্লাহ অবাক হয়ে যান এবং এই দুনিয়ার লোভ-মোহটিকে জাহান্নামের আগুন বলে কোরান ঘোষণা করছে এবং এই জাহান্নামের আগুনের ওপর দাড়িয়ে কেমন করে মানুষ ধৈর্যধারণ করতে পারে এটাও একটা আশ্চর্য বিষয় বলে আল্লাহ মনে করেন। এইরূপ জাহান্নামের জ্বালা-যন্ত্রণা হতে মানুষ কেমন করে মুক্তি পাবে আল কেতাবের মাঝে আল্লাহ সত্যসহ সব কিছুই খুলে বলে দিয়েছেন। তারপরেও যারা বুঝেও না বোঝার ভান করে, দেখেও না দেখার ভান করে, শুনেও না শোনার ভান করে তারাই আল কেতাবের মধ্যে মতভেদ তৈরি করে এবং এই মতভেদের দরুন অনেক মানুষ তাদের নীতিবাক্যের ফাদে পড়ে যায় এবং মিষ্টি-মিষ্টি আদর্শবাদের কথা বলে-বলে মানুষদেরকে পথহারা করতে সঠিক পথ হতে সরিয়ে দেওয়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাটি করে রাখে। যার ফলে সরল-সহজ মানুষগুলো তো হেদায়েত হতে দূরে সরে পড়ে এবং যারা এই মতভেদ তৈরি করেছে বা করছে তারাও মনের অজান্তে অথবা জেনেও জেনেও হেদায়েত হতে বহুদূরে ছিটকিয়ে পড়ে যায়। এই সবগুলো কথার মাঝেই একটি মূল কথা হলো, আপন-আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে সেই পরীক্ষায় পাশ না করে তথা মুক্তিলাভ না করে ফেল করে ফেলি তথা আগুনের ওপর বাস করি। বেশি অবাক হবার কথাটি হলো এই যে, এই আগুন ঘরবাড়ি জ্বালায় না, এই আগুন পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্য কোনো বস্তুকেই জ্বালায় না এবং জ্বালাবার ক্রম্যতাও দেওয়া হয় নি। এই আগুন কেবলমাত্র একটি জিনিসই জ্বালিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয় এবং পোড়াতে ভালোবাসে আর সেই স্থানটির নামই হলো প্রতিটি মানুষের অন্তর।

১৭৭. লাইসা (নাই, হয় নাই) বিররা (নৈকি, পুণ্য, সদাচরণ, উপকার করা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা) আন (যে, এই যে, হইতে) তয়ালুল (তোমরা ফিরাও) উজ্জাহকুম (তোমাদের চেহারাগুলি, তোমাদের মুখমণ্ডলগুলি) কিবলান (দিক, পশি, মোকাবেলা করার ক্রম্যতা, বদলানো, পাল্টানো, ঘোরানো, ফেরানো, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া) মাশরিকি (পূর্ব) ওয়া (এবং) মাগরিকি (পশ্চিম) ওয়ালাকিননা (কিন্তু, বরং) বিররা (পূর্ণ, নৈকি) মান (যে) আমানা (ইমান আনিয়াছে) বিল্লাহি (আল্লাহর সঙ্গে, আল্লাহর সহিত) ওয়া (এবং) ইয়াওমিন (দিনে, কালে) আখিরি (আখেরাতের) ওয়া (এবং) মালাইকাতি (ফেরেশতাদের) ওয়া (এবং) কিতাবি (কেতাবের) ওয়া (এবং) নাবিইনা (নবিদের)।

□□ পুণ্য নাই তোমাদের চেহারাগুলি তোমরা যেকোনো ফিরাও পূর্ব এবং পশ্চিমে বরং পুণ্য (হইবে) আল্লাহর প্রতি যে ইমান আনিলা এবং আখেরাতের দিকে এবং ফেরেশতাদের এবং আল কেতাবের সঙ্গে এবং নবিদের সঙ্গে।

+ ওয়া (এবং) আতাল (দান করা, দেওয়া) মালা (মাল, সম্পদ) আলা (উপর) হববিহি (তাহার প্রেমের, তাহার ভালোবাসার, তাহার মহব্বতের) জাওইল (ওয়ালগণ) কুব্বা (নিকট, কাছে, আশ্রয়) ওয়া (এবং) ইয়াতাম্মা (এতিমদেরকে) ওয়া (এবং) মাসাকিনা (মিসকিনদের) ওয়া (এবং) আব্বাসসাবিল (পথের পথিকদেরকে) ওয়া (এবং) সায়েলিনা (সাহায্যপ্রার্থীদেরকে, যাহারা সাহায্য চায়) ওয়া (এবং) ফিররিকাবি (দাসমুক্তির মধ্যে, বন্দিদের মধ্যে)।

□□ এবং মাল দান করে তাহার ভালোবাসার উপরে নিকটওয়ালাদেরকে এবং এতিমদেরকে এবং মিসকিনদেরকে এবং পথের পথিকদেরকে এবং যাহারা সাহায্য চায় তাহাদেরকে এবং বন্দিদের মধ্যে।

+ ওয়া (এবং) আকাম্মা (কায়েম করে) সালাতা (নামাজ) ওয়া (এবং) আতা (আদায় করে) জাকাতা (জাকাত)।

□□ এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে।

+ ওয়া (এবং) মুফুনা (পূর্ণ করিয়া দেন, পূর্ণপ্রাপ্যদেনেওয়াল) বিআহুদি (ওয়াদার সহিত, প্রতিশ্রুতির সহিত, অঙ্গীকারের সহিত) হিম (তাহাদের) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) আহাদু (ওয়াদা করে)।

□□ এবং ওয়াদা পূর্ণ করে তাহাদের যখন তাহারা ওয়াদা করে।

+ ওয়া (এবং) সোয়াবিরিনা (ধৈর্যধারণ করে, সবরকারী) ফি (মধ্যে) বাসায়ি (দারিদ্র, কাঠিন্য, দুঃখকষ্ট) ওয়া (এবং) দাররাযি (কষ্ট, কাঠিন্য, সংকট, অভাব, রোগ, মুসিবত) ওয়া (এবং) হিনা (সময়, কাল, মুদুৎ) বাসি (যুদ্ধ, দাপট, কঠিন, অপদ, কঠিন যুদ্ধ)।

□□ এবং দারিদ্রের মধ্যে ধৈর্যধারণ করে এবং মুসিবতের মধ্যে এবং যুদ্ধের সময়ে।

+ উলাইকা (উহারাই তাহারা) আনুলাজিনা (যাহারা) সাদাকু (সত্যবাদী)।

□□ উহারাই তাহারা যাহারা সত্যবাদী।

+ ওয়া (এবং) উলাইকা (উহারাই তাহারা) হম (তাহারা) মুতাকুনা (মোতাকি, যাহারা তাকওয়ায় রত থাকেন)।

□□ এবং উহারাই তাহারা, তাহারা মুতাকি।

□ এই আয়াতটিতে যাহারা মুতাকি তাদের পরিচয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই-এই কাজগুলো যারা করতে পারে তাদেরকেই কোরান-এ মুতাকি হবার সংজ্ঞাটি পেলাম। এই আয়াতের বর্ণিত মুতাকি হবার যে-কয়টি শর্ত দেওয়া হয়েছে উহা হতে একটি বা দুটি যদি কোনোক্রমে না থাকে তাহলে মুতাকি হবার যোগ্যতা হারাবে। কারণ মুতাকি হওয়াটা কোনো মামুলি বিষয় নয়। এ জন্য মামুলি বিষয় নয় বললাম যে, মুতাকিদের সঙ্গে আল্লাহ সব সময় আছেন এবং থাকেন। সমগ্র কোরান-এ দেখা যায়, আল্লাহ মাত্র চার জনের সঙ্গে আছেন এবং থাকেন। মোমিনের সঙ্গে যে আল্লাহ আছেন তার দলিলটি আগেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মুতাকিদের সঙ্গে যে আল্লাহ আছেন এবং থাকেন তার দলিলটি

সূরা তওবা-র ৩৬ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, আনুলালাহা মাআল মুতাকিনা - অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুতাকিদের সাথেই আছেন। এই আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো, খ্রিস্টানেরা বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে উপাসনা করেন এবং মুসলমানেরা মসজিদুল হারাম তথা কাবা শরিফকে কেবলা করে উপাসনা করেন। কারণ উপাসনার দিকটি পূর্ব হতে পারে আবার কারণ উপাসনার দিকটি পশ্চিম হতে পারে। এই পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ করে উপাসনা করলেই যে পূর্ণ হবে সেটা প্রথমেই একদম না করে দিয়েছেন। সুতরাং এই পূর্ব-পশ্চিম নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করাটাও নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়,

বরং এই আয়াতে বলা হয়েছে, যে-কোনো ব্যক্তি যে আল্লাহতে ইমান এনেছে এবং আখেরাতের কালে বিশ্বাস করে এবং ফেরেশতী, আল কেতাব এবং নবিদের উপর বিশ্বাস রাখে – এই বিশ্বাসগুলোর সঙ্গে আরও যুক্ত করা হয়েছে এবং মাল দান করে তার ভালোবাসার উপরে নিকটওয়ালাদেরকে এবং প্রতিমদেরকে এবং মিসকিনদেরকে এবং পথের পথিকদেরকে এবং যারা সাহায্য চায় তাদেরকে এবং বন্দিদের মধ্যে। এখানেই শেষ নয়, বরং আরও বলা হয়েছে যে, ‘যারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে।’ এই সালাত এবং জাকাতের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে অনেক কথা লিখতে হয়। আরও শর্ত দেওয়া হয়েছে, আর সেই শর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো, যারা কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় সেই প্রতিশ্রুতিটি পরিপূর্ণভাবে পালন করে এবং যত বড় দুঃখ-কষ্ট এবং যাতনার জাতকলেই নিশ্চেষ্ট হোক না কেন তবু ধৈর্যধারণ করে একমাত্র আল্লাহর দিকে চেয়ে এবং যত রকম রোগশোক, বালিম্বিসিবতই আসুক না কেন তাতেও ধৈর্যধারণ করে। এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে ধৈর্যধারণ করাটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যুদ্ধ দুই প্রকার : একটি অস্ত্রের যুদ্ধ এবং অপরটি আপন পবিত্র নুফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দিনের পর দিন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তাড়িয়ে দেবার কঠিন যুদ্ধ। একটি যুদ্ধ দেখা যায়, অপরটি অনুভব করতে হয়। কারণ ধ্যানসাধনার যুদ্ধটি একটি বিমূর্ত যুদ্ধ আর অপরপক্ষে অস্ত্রের যুদ্ধটি হলো একটি মূর্ত যুদ্ধ। যেমন, মিসকিন শব্দটির অর্থটি যদি করা হয় তাহলে যাদের আর্থিক সম্পদ বলে কিছুই নেই তারা যেমন মিসকিন, তেমনই যারা আল্লাহর মজুব ওলি-আল্লাহ তাদেরও কিছুই থাকে না। সুতরাং মজুব ওলি-আল্লাহরা দিনিয়ার ধনসম্পদের প্রশ্নে মিসকিনেরও মিসকিন, এমনকি পরিধেয় বস্ত্রটি পর্যন্ত টুটাফাটা, ময়লা এবং অনেক সময় এই টুটাফাটা বস্ত্রটিও থাকে না। এই রকম মজুব ওলি-আল্লাহদেরকে আর্থিক সাহায্য করাটা একটি বিরাট পুণ্যের কাজ। সুতরাং এই আয়াতের বর্ণিত সবগুলো গুণ যার মাঝে ফুটে উঠেছে তিনিই মুত্তাকি এবং এই মুত্তাকিদের সঙ্গে আল্লাহ সব সময় আছেন অথবা থাকেন।

১৭৮. *ইয়া আইউহাল্ (ওহে) লাজিনা (যাহারা) আম্মান (ইমান আনিয়াহ্) কুতিবা (ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল, ফরজ করিয়া দেওয়া হইল, ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, লেখা হইল, জন্মের পূর্বেই ভাগ্য লেখা হইয়াছিল, ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া, সোমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) কিসাসু (খনের বদলে খন, সমকক্ষতা, সম্মান করা, প্রতিশোধ) ফিল্ (মধ্যে) কীতলী (হত্যার, খুনের)।*

□□ওহে যাহারা ইমান আনিয়াহ্, ফরজ করা হইয়াছে তোমাদের উপর খনের বদলে খন হত্যার মধ্যে।

+ *আলহরক্ (আজাদ, মুক্ত স্বাধীন) বিল্ (সহিত, বদলে) হরবে (স্বাধীন, মুক্ত, আজাদ) ওয়া (এবং) আবদু (দাস, গোলাম, বান্দা) বিল্ (বদলে) আবদি (দাস) ওয়া (এবং) উন্সা (নারী, মহিলা) বিল্ (বদলে) উন্সা (নারী, মহিলা)।*

□□স্বাধীনের বদলে স্বাধীন এবং দাসের বদলে দাস এবং নারীর বদলে নারী।

+ *ফাম্মান্ (সুতরাং যে) উফিয়া (ক্ষমা করা হইয়াছে, সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হ্রাস করা হইয়াছে, লাঘব করা হইয়াছে, উপশম করা হইয়াছে, অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে) লাহ্ (যাহাকে) মিন্ (হইতে) আখিহি (তাহার ভাইয়ের) শাইউন্ (কিছু, বস্তু) ফাততিবাউন্ (সুতরাং অনুসরণ কর) বিল্ (সহিত) মারুফ্ (ভালো কাজ, নরম কথা) ওয়া (এবং) আদাউন্ (দাবি পূরাপূরি আদায় করা এবং পৌছাইয়া দেওয়া, আদায়*

করা) *ইলাইহি* (তাহার দিকে, তাহার প্রতি) *বিল্ ইহসান* (এহসানের সহিত, কৃতিপূরণ করা, খেসারত দেওয়া)।

□□ সুতরাং যে মাফ করে তাহার ভাইয়ের (পক্ষ) হইতে যাহাকে কোনো কিছু (অথবা) কিছুটা সুতরাং অনুসরণ করে ভালো কাজের সহিত এবং এহসানের সহিত আদায় কর তাহার (নিকট হইতে)।

+ *জালিকা* (ওইটা) *তাখফিযুন* (হালকা করা, সহজ করা) *মির* (হইতে) *রাব্বিকুম* (তোমাদের রব) *ওয়া* (এবং) *রাহমাতুন* (রহমত, অনুকম্পা, করুণা, ক্রমশালিতা, ঐশ্বরিক করুণা)।

□□ ওইটাই তোমাদের রব হইতে সহজ এবং রহমত।

+ *ফামানি* (সুতরাং যে) *ইতাছা* (সীমালঙ্ঘন করে, সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, মাত্রা ছাড়াইয়া যায়) *বাদা* (পর) *জালিকা* (ওইটা) *ফালাহ* (সুতরাং তাহার জন্য) *আজাবুন* (শাস্তি, দণ্ড) *আলিমুন* (দুঃখজনক, কঠিন, গুরুতর)।

□□ সুতরাং যে মাত্রা ছাড়াইয়া যায় (সীমালঙ্ঘন করে) ওইটার পর সুতরাং তাহার জন্য কঠিন (দুঃখজনক) শাস্তি।

১৭৯. *ওয়া* (এবং) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *ফি* (মধ্যে) *কিসাসি* (কিসাসের) *হায়াতুন* (জীবন) *ইয়া* (হে) *উলিল* (লোকেরা) *আলবাব* (মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, আকলসম্পন্ন, বুদ্ধিসম্পন্ন, বোধসম্পন্ন, ম্বেধাসম্পন্ন) *লীআলিলাকুম* (সম্ভবত তোমরা) *তাওতাকুন* (সংযত থাকিও, বিরত থাকিও, ভয় করিও, সাবধান হইও, কর্তব্যপরায়ণ হইও)।

□□ এবং তোমাদের জন্য রহিয়াছে কিসাসের মধ্যে জীবন, হে ম্বেধাসম্পন্ন (মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন) লোকেরা, সম্ভবত তোমরা সাবধান থাকিও।

□ এই আয়াত দুটোর বিষয়ে কিছু বলার আগে প্রথমেই বলে নিতে হয় যে, আরবদের মধ্যে গোত্র-গোত্র প্রতিহিংসা এবং খুনখারাপি বছরের পর বছর চুলতো। এই আয়াতের দ্বারা খুনখারাপির প্রশ্নে প্রচণ্ডভাবে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত রাখার জন্য তাদেরকে সংযম এবং সীমিত করার ব্যবস্থাটি করে দেওয়া হলো। ইহাতে আবার ক্রমা করার ব্যবস্থাটিও রাখা হলো। তারপরেও বলা হচ্ছে,

একান্তই যদি ক্রমা করা না যায় অথবা সম্ভবপর না হয় তাহলে সমপরিমাণ প্রতিশোধের ব্যবস্থাটি দেওয়া হলো। এতে হত্যার প্রতিশোধমূলক শত্রুতা দিনে-দিনে না বেড়ে সীমার মধ্যে অবস্থান করে সেই কথাটুকুও বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা হত্যা সীমাবদ্ধ হবে এবং রহমত বৃদ্ধি পাবে। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে, আল্লাহর দেওয়া এই বিধানটি যারা মানবে না অথবা এড়িয়ে যাবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথাটি বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তারপরের আয়াতে 'উলিল আলবাব'-দেরকে তথা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে যে এই কেসাসের বিধানটি পালন করতে পারলে হিংসাত্মক এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা ও খুনখারাপির জঘন্য জিঘাংসটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমাজ-জীবনে একটি প্রশান্তির ছায়া ফুটে উঠবে তথা সমাজ জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই বিধানের মূল্যটি তথা গুরুত্বটি কেবলমাত্র উলিল আলবাবরাই তথা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে।

১৮০. *কতিবা* (ফরজ করা হইয়াছে) *আলাইকুম* (তোমাদের উপর) *ইজা* (যখন) *হাদোয়ারা* (আসিয়াছে, হাজির হইয়াছে, উপস্থিত হইয়াছে) *আছদা* (যে কেহ, কাহারও) *কুম* (তোমাদের) *মাউত* (মৃত্যু) *ইন* (যদি) *তারাকা* (ছাড়িয়া যাওয়া, রাখিয়া যাওয়া) *খাইরান্* (উত্তম, কল্যাণ, ভালো, নেক কাজ, সকলে পছন্দ করে)।

□□ তোমাদের উপর ফরজ করা হইয়াছে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু হাজির হয়। যদি কল্যাণ উত্তম ছাড়িয়া যায়।

+ *ওয়াসিয়াত* (ওসিয়ত করে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর আগের নির্দেশ যাহা তাহার বিষয়সম্পত্তি এবং কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে হয়ে থাকে, মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় বলে যাওয়া) *লিন* (জন্য) *ওয়ালিদাইনি* (পিতা-মাতা) *ওয়া* (এবং) *আকবাবিনা* (নিকটবর্তীগণ) *বিন* (সহিত) *মারুফি* (ভালো কাজ, নরম কথা)।

□□ পিতা-মাতার জন্য ওসিয়ত করে এবং নিকটবর্তীদের (জন্য) ভালোর সহিত।

+ *হাক্কান* (একটি সত্য) *আলা* (উপরে) *মুঠাকিনা* (মুঠাকিদের)।

□□ মুঠাকিদের উপর (ইহাই) একটি সত্য।

১৮১. *ফামান* (সুতরাং যে) *বাদ্দালাহ* (তাহা পরিবর্তন করিয়া দেয়, তাহা বদল করিয়া দেয়) *বাদা* (পরেও) *মা* (যাহা) *সামিয়াহ* (শ্রবণ করিয়াছে, শুনিয়াছে) *ফাইননামা* (সুতরাং নিশ্চয়ই) *ইসমুহ* (তাহার অপরাধ, তাহার গুনাহ) *আলা* (উপরে) *আলিলাজিনা* (যাহারা) *ইউবাদ্দিনুনাহ* (উহা পরিবর্তন করে)।

□□ সুতরাং যে তাহা পরিবর্তন করিয়া দেয় ইহার পরেও যাহা শ্রবণ করিয়াছে সুতরাং নিশ্চয়ই তাহার অপরাধ (তাহার) উপর যাহারা পরিবর্তন করিয়াছে।

+ *ইননা* (নিশ্চয়ই) *আল্লাহা* (আল্লাহ) *সামিউন্* (শোনেন) *আলিমুন্* (জানেন)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনেন, জানেন।

১৮২. *ফামান* (সুতরাং যে) *খাফা* (ভয় করে) *মিন* (হইতে) *মুসিন* (ওসিয়তকারী - মৃত্যুর আগে ওয়ারিশদেরকে কিছু করতে উপদেশ দেওয়াকে ওসিয়ত বলে) *জানফান* (পক্ষপাতিত, বাকা চোখে দেখা, বিচারে পক্ষাবলম্বন, জুলুম) *আত্ত* (অথবা) *ইসমান* (পাপ, গুনাহ, অন্যায়) *ফাআসলাহা* (সুতরাং ক্ষমাংসা করিয়া দেয়) *বাইনাহম* (তাহাদের মধ্যে) *ফালা* (সুতরাং নাই) *ইসমা* (কোনো গুনাহ, পাপ) *আলাইহি* (তাহার উপরে)।

□□ সুতরাং যে ভয় করে ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত হইতে অথবা অন্যায়ের সুতরাং ক্ষমাংসা করিয়া দেয় তাহাদের মধ্যে সুতরাং নাই গুনাহ তাহার উপর।

+ *ইন্নাল্লাহা* (নিশ্চয়ই আল্লাহ) *গাফুরুর* (ক্ষমাশীল) *রাহিমুন্* (রহিম)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল রহিম।

□ এই আয়াত তিনটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হচ্ছে যে, মৃত্যুর আগে নিজের অর্জন করা ধনসম্পদ হতে ব্যয় করবার জন্য যে-সমস্ত ওসিয়ত করবার জন্য অথবা লিখিত মোখিক উইল করবার অধিকার রাশি চালু রয়েছে, এই আয়াতগুলো সেই দিকের ইঙ্গিত বহন করে না। সুতরাং এই আয়াত তিনটি ধনসম্পত্তির ওসিয়ত নয়, বরং জ্ঞানবিষয়ক ওসিয়ত। এই কথাগুলো সাধারণ মানুষের মনমগজে মোটেই স্থান পাবার কথা নয়, বরং জ্ঞানীরা ইহার আসল রহস্যটি বুঝতে পারেন, যদিও জ্ঞানীদের জন্য বুঝবার বিষয়টির বিস্তারিত অথবা ছোট করে ব্যাখ্যাটি লিখলাম না। কারণ এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে সুফিকুলশিরোমণি হুজুরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফতহাতে মক্কিয়া* অথবা শাই সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত *কোরান দর্শন* নাম দিয়ে যে তিন খণ্ডে তফসির করা হয়েছে উহা পাঠ করলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

এই আয়াত তিনটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই সুন্দর একটি হৌচট খেলান। কারণ অনেক তফসিরকারী বলে থাকেন যে ইহা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। আবার অন্য আরেকদল তফসিরকারী বলে থাকেন যে এই আয়াত

মোটাই মানসুখ হয় নাই, বরং এই আয়াত সম্পদ-বণ্টনের ব্যাখ্যারূপে বহাল রয়েছে। তাই ইহার সার সংক্ষেপ হলো, ওসিয়ত করে যাওয়াটা তোমাদের জন্য ফরজ করা হলো। যেহেতু তিনটি আয়াত সম্পদ-বণ্টন ও মামাংসা বিষয়ের সঙ্গে স্থল দৃষ্টিভঙ্গিতে জড়িত সেই হেতু তফসিরকারীদের মধ্যে মতভেদ থাকারাই একান্ত স্বাভাবিক। তাই কেহ বলেন ইহা মানসুখ, আবার কেহ বলেন ইহা মোটেও মানসুখ হয় নাই। যেহেতু বৈষয়িক লেনদেন, বৈষয়িক যে-কোনো বিষয়ের জটিলতাটি পূর্ব হতেই টলে আসছে, সুতরাং অধম লিখক এর বেশি এগিয়ে গিয়ে কিছু একটা লিখতে চাই না।

১৮৩. *ইয়াআইউহাল্ (ওহে) লাজিনা (যাহারা) আম্মান্ (ইম্মান আনিয়াছ) কতিবা (ফরজ করা হইয়াছে) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) সিয়াম্ (রোজা) কাম্মা (যেমন) কতিবা (ফরজ করা হইয়াছিল) আলা (উপর) আল্লাজিনা (যাহারা) মিন্ (হইতে) কালিকুম্ (তোমাদের পূর্বে) লাআল্লাকুম্ (হয়তো তোমরা, সম্ভবত তোমরা) তাত্তাকিন্ (তোমরা তাকওয়া কর)।*

□□ওহে যাহারা ইম্মান আনিয়াছ, ফরজ করা হইয়াছে তোমাদের উপর রোজা, যেমন ফরজ করা হইয়াছিল তাহাদের (যাহারা) উপর তোমাদের পূর্ব হইতে, হয়তো (সম্ভবত) তোমরা তাকওয়াকে (গ্রহণ) করিবে।

১৮৪. *আইয়াম্মান্ (কয়েকটি দিন) মাদুদাতিন্ (গণনাকৃত, নির্দিষ্ট)।*

□□গণনাকৃত দিনগুলি।

+ *ফাম্মান্ (সুতরাং যে) কানা (হয়, হইবে, ছিল) মিন্ কুম্ (তোমাদের মধ্যে) মারিদান্ (অসম্ভ) আও (অথবা) আলা (উপরে) সাকীবিন্ (ভ্রমণ, সফর) ফাইদুদাতিন্ (সুতরাং সংখ্যা) মিন্ (হইতে) আইয়ামিন্ (দিনগুলিতে) উখারা (আরেক, অন্য, এইটা)।*

□□সুতরাং যে তোমাদের মধ্যে হয় অসম্ভ অথবা ভ্রমণের উপর সুতরাং (তাহার) সংখ্যা অন্যান্য দিনগুলি হইতে (পরিবর্তীকালে গ্রহণীয়)।

+ *ওয়া (এবং) আলা (উপর) আল্লাজিনা (যাহারা) ইউতিকালাহ (সে তাহার ক্ষমতা রাখে) ফিদিয়াতিন্ (যাহা জীবন বাঁচাইবার জন্য দেওয়া অথবা নেওয়া হয়, বিনিময় দেওয়া) তায়াম্মুন (খাদ্য দান করা) মিসকিনিন্ (যাহার কিছুই নাই, সর্বহারা, নিঃস্ব, মিসকিন)।*

□□এবং যাহাদের উপর সামর্থ্য আছে একজন মিসকিনকে বিনিময় দিবে খাদ্য।

+ *ফাম্মান্ (সুতরাং যে) তাতাউওয়া (সে আপন খুশিতে নেক কাজ করিয়াছে, খুশি মনে করা, স্বেচ্ছায় করা) খাইরান্ (উত্তম, কল্যাণ) ফাহয়া (সুতরাং তাহা) খাইরুল্ (উত্তম) লাহ (তাহার জন্য)।*

□□সুতরাং যে আপন ইচ্ছায় করে কোনো উত্তম (কাজ) সুতরাং তাহা উত্তম তাহার জন্য।

+ *ওয়া (এবং) আন্ (যে, এই যে) তাসম্ম (রোজা রাখ, সিয়াম কর) খাইরুল্ (উত্তম) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) ইন্ (যদি) কুনতুম্ (তোমরা) তাআলামুন (জানিতে)।*

□□এবং তোমরা রোজা রাখ, তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

□ এই আয়াত দুইটিতে যারা ইম্মান এনেছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, রোজা রাখার আদেশটি পালন করতে। আলাহকে খুশি করার জন্য রোজা হলো একটি মাধ্যম। সহজ কথায় রোজা হলো রোজার সময়ে পানাহার এবং যোনি ক্রিয়া হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। এই রোজার মাধ্যমে জীবাত্মার সঙ্গে যে-খান্নাসটি থাকে সেই খান্নাসটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বভাবের পরিবর্তন আসে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের আগের উন্নতদের উপরেও রোজা ফরজ করে দেওয়া হইয়াছিল। আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে

খান্নাসটিকে দুর্বল করার জন্য এটা একটি মূল্যবান শিক্ষণীয় আদর্শ। আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করতে তথা মুসলমান বানাবার উদ্দেশ্যে আত্মাদেবকে পরীক্ষা করার জন্যই পাঠানো হয়েছে। যেহেতু প্রতিদিন রোজা রাখাটা কষ্টকর তাই সীমিত কয়েকটি দিনের জন্য রোজা রাখার নিয়মটি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে যারা ইমান এনেছিল তাদের উপর প্রতি মাসে মাত্র তিন দিন রোজা রাখার বিধানটি আসার পর উহা বাতিল হয়ে যায়। অসুস্থ অবস্থায় এবং ভ্রমণে থাকা অবস্থায় রোজা রাখা কষ্টকর বলেই পরে সেই রোজাগুলো আদায় করে নেবার কথাটিও বলা হয়েছে। যারা সুস্থ এবং রোজা রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে পারে না তারা যেন এক রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে পেট পূর্ণ করে খেতে দেয়। আর যদি কয়েকজন মিসকিন খাওয়াতে পারে, তাহলে তো উহা আরও উত্তম।

অপরপক্ষে এই আয়াতদুটির অতিউচ্চস্তরের ব্যাখ্যাটি হলো, যারা ইমান এনেছে তাদেরকেই বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানবসত্তার সঙ্গে সিয়াম জড়িয়ে আছে এবং অমনোযোগী লোকেরা উহা বুঝতে পারে না। যদিও সবাই জানে যে মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা আপন নফস হতে দেহ-মন বারবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েই চলেছে। এই সিয়ামটি কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং সর্বকালের সর্বমানুষের জন্য প্রযোজ্য। যারা দেহ-মন হতে আপন সত্তার ভেতরে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে তারাই কামিয়াব হয়েছেন। হযরত রিপুর মাধ্যমে যাহা মনমগজে বাসা বাধতে থাকে উহাই একটি একটি করে হিসাব করে বজ্রন করে দেবার সাধনার নামটি হলো সিয়াম। পরিশেষে যদি কেহ সিয়ামের মর্যাদা বুঝতে পেরে সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সিয়াম সাধনায় দৃঢ়ভাবে লিপ্ত থাকে তবে উহা তার জন্য অবশ্যই উত্তম। কারণ আপন নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উহাই লোভ, মোহ, মাৎসর্য, ক্রোধ এবং অহঙ্কার নামক আবজনাগুলো মানুষকে সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই এই ষড়রিপুর বন্ধনটিকে সম্পূর্ণরূপে উপড়িয়ে ফেলার জন্য সিয়ামও একটি উপযুক্ত এবং সুন্দর মাধ্যম।

১৮৫. শাহরু (মাস) রামাদান (রমজান) আললাজি (যাহা) উনজিলা (নাঙ্গেল করা হইয়াছে) ফিহি (ইহার মধ্যে) কোরআন (কোরান) হুদাল (সঠিক পথ) লিনুনাসি (মানুষের জন্য) ওয়া (এবং) বাইয়ানাতিন (দলিল, প্রমাণসমূহ, সুস্পষ্ট নিদর্শন) মিনান (হইতে) হুদা (সঠিক পথ) ওয়া (এবং) ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)।

রমজান মাস যাহা নাঙ্গেল করা হইয়াছে ইহার মধ্যে কোরান মানুষের জন্য একটি হেদায়েত এবং সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণসমূহ হইতে হেদায়েত এবং ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)।

+ ফামান (সুতরাং যে) শাহিদা (পাইল, সাক্ষ্য দিল) মিনকুম (তোমাদের মধ্যে) শাহারা (এই মাস) ফালইয়াসুমহ (সুতরাং সে যেন সিয়াম পালন করে, সুতরাং সে যেন রোজা রাখে)।

সুতরাং যে তোমাদের মধ্যে পাইবে এই মাস সুতরাং সে যেন রোজা রাখে।

+ ওয়া (এবং) মান (যে) কানা (হবে, ছিল) মারিদান (অসুস্থ) আও (অথবা) আলা (উপর) সাফারিন (ভ্রমণের, সফরের) ফাইদদাতন (সুতরাং সংখ্যা) মিন (হইতে) আইয়ামিন (দিনগুলি) উখারা (আরেক, অন্য, এইটা)।

এবং যে অসুস্থ হয় অথবা ভ্রমণের উপরে আছে সুতরাং দিনগুলি হইতে অন্য সংখ্যা (গণনা করিয়া লয়)।

+ ইউরিদু (ইচ্ছা করা, চাওয়া) আল্লাহ (আল্লাহ) বিকুম (তোমাদের সহিত) ইফসরা (সহজ) ওয়া (এবং) লা (না) ইউরিদু (ইচ্ছা করা, চাওয়া)

বিক্রম (তোমাদের সহিত) উসরা (কঠিন, মশকিল, অভাব, কষ্ট) ওয়া (এবং) লিতকমিনু (তোমরা যেন সম্পূর্ণ করিতে পার) ইদদাতা (সংখ্যা) ওয়া (এবং) লিতকাব্বিরু (তোমরা বড় বলিয়া মনে কর, তোমরা বড়াই কর, তোমরা মহিষ্ঠ প্রকাশ কর)-লাহা (আলাহ) আলা (উপর) মা (যে) হাদাকুম (তোমাদেরকে তিনি সঠিক পথ দেখাইয়াছেন) ওয়া (এবং) লাআল্লাকুম (হয় তো তোমরা, সম্ভবত তোমরা) তাশকুরুনা (তোমরা শোকর কর, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।

আলাহ চাহেন তোমাদের জন্য সহজ করিতে এবং তিনি চাহেন না তোমাদের জন্য কষ্টকর করিতে (কঠিন করিতে) এবং তোমরা যেন সম্পূর্ণ করিতে পার সংখ্যা এবং আলাহকে বড় বলিয়া মনে কর (এইজন্য) যে তোমাদেরকে হেদায়েতের উপরে রাখিয়াছেন এবং সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

১৮৬. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) সালাকা (আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করে) ইবাদি (আমার বান্দারা, আমার বান্দাগণ) আন্নি (আমার সম্পর্কে) ফাআন্নি (সুতরাং আমি) কারিবু (নিকটে, কাছে)।

এবং যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে (প্রশ্ন করে) আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে সুতরাং নিশ্চয়ই আমি নিকটেই (আছি)।

+ উজিবু (আমি কবুল করিব, আমি সাড়া দিব, আমি জবাব দিব) দাওয়াতা (ডাকা, আশ্বান করা, দোয়া) দায়ি (আশ্বানকারী, প্রার্থনাকারী) ইজা (যখন) দায়ানি (আমাকে ডাকে) ফালইয়াসতাজিবু (সুতরাং তাহারাও সাড়া দিক) লি (আমার জন্য) ওয়া (এবং) ইউমিনুবি (তাহারা ইমান আনুক) বি (আমার প্রতি) লাআল্লাহম (সম্ভবত তাহারা, হয়তো তাহারা) ইয়ারুদুনা (সঠিক পথে চলিতে পারে, সুপথপ্রাপ্ত হইতে পারে)।

আশ্বানকারী (যে ডাকে) ডাকে আমি জবাব দেই যখন আমাকে ডাকে, সুতরাং তাহারাও সাড়া দিক আমার জন্য এবং তাহারা ইমান আনুক আমার প্রতি, সম্ভবত তাহারা সঠিক পথ পাইতে পারে।

এই দুটি আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই উচ্চস্বরের দর্শনটি তলে ধরলাম, কারণ সাধারণ ব্যাখ্যাটি যে-কোনো কোরান তফসির হতে কল্পবৈশি পাইতে পারেন। কোরান নাজেল হওয়ার কথাটি সর্বকালীন এবং সার্বজনীন একটি রহস্যময় বিষয়। যিনি অতি উচ্চস্বরের ধ্যানসাধনার মাধ্যমে সাধক হয়েছেন, তার নিজের ভেতরের পূর্ণাঙ্গ দর্শনটির যে-পাঠ উহা হতে নাজেল হয় তথা বাহির হয় তাকেই বলা হয়েছে কোরান। সমস্ত অতি উচ্চস্বরের সাধকদের যিনি প্রধান তথা সরদার সেই মহানবি মুহাম্মদ মোম্বফা (আ.)-র নিকট যে আরবি ভাষায় কোরান-টি নাজেল হয়েছে উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। হজরত ইসা (আ.)-র নিকট যে হিব্রু কোরান নাজেল হয়েছে এবং হজরত দাউদ (আ.)-এর নিকট তার অকলের ভাষায় যে জবুর নামক কোরান নাজেল হয়েছে এবং হজরত মুসা (আ.)-এর নিকট যে তাওরাত নামক কোরান-টি নাজেল হয়েছে, এবং নমি-না-জানা ১০৪টি সহিফা নামক কোরান নাজেল হয়েছে, এই সমস্ত সহিফা নামক কোরান-গুলো হতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরান-টি হলো আরবি কোরান। অধম লিখক আপন জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মের সাইনবোর্ডটি ফেলে দিয়েই একদম নিরপেক্ষ হয়ে এই কথাগুলো মানুষদেরকে জানিয়ে দিলাম। জীব-প্রকৃতির চেহারা-সুরতে যাদেরকে মানুষ বলা হয় তাদের কাছে এই কোরান মোটেই বোধগম্য নয়। তারপর আসে সিয়াম পালনের কথা। সিয়াম করার অর্থটি হলো, মানব ইচ্ছাপথে যা-কিছু বিষয়বস্তু মাথার মধ্যে প্রবেশ করে উহার মোহটি কেবল বর্জন করতে হয়। এই বর্জনের সিয়ামের গুরুত্বটি রহস্যময়। এই রহস্যময় সিয়ামের আসল পরিচয়টি যদি কেউ জানতে

চায় তাহলে খাজা গরিব নেওয়াজের ফারসি ভাষায় রচিত *সিব্বুল আসরার* কেতাবটি পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যাবে অথবা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত *সিয়ামদর্শন* নামক বইটি পড়লেও সিয়ামের রহস্যটি বোঝা যাবে বৈকি।

আল্লাহ সকল মাসের মধ্যে রমজান মাসকে উপযুক্ত মনে করে এই রমজান মাসেই *কোরান* নাজেল করেছেন। তাছাড়া হাদিসেও বলা হয়েছে যে, এই মাসেই আল্লাহ অন্যান্য নবিদেরকেও অন্যান্য অনেক সহিফা নামক *কোরান* নাজেল করেছেন। আরেকটি নির্ভরযোগ্য দলিলে বলা হয়েছে যে *সহিফায়ে ইব্রাহিম* রমজানের প্রথম রাতে নাজেল হয়েছে এবং রমজানের ৬ তারিখে *তাওরাত* নাজেল হয়েছে এবং রমজানের ১৩ তারিখে *ইঞ্জিল* নাজেল হয়েছে এবং *সহিফায়ে আকবর কোরানুল করিম* রমজানের ২৪ তারিখে নাজেল হয়েছে। হজরত দাউদ (আ.)-এর নিকট যে *জুবুর* নামক সহিফাটি নাজেল হয়েছিল তাহাও এই রমজান মাসের ১২ তারিখে। *ইন্না আনজালনাহ ফি লাইলাতুল কাদরি* - অর্থাৎ, 'আমরা *কোরান*-কে শক্তিশালী রাত্রিতে নাজেল করেছি।

যারা মশরিক এবং কাফের তারা বলতো, সমগ্র *কোরান* কেন একবারেই নাজেল করা হলো না? এই কাফেরদের কথাটিরও সুন্দর উত্তর আল্লাহই দিয়েছেন। যিনি শুদ্ধ অন্তরে নিরপেক্ষ হয়ে *কোরান* গবেষণা নিয়ে এবং চিন্তা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই হেদায়েতের রহমতটি পেয়েছেন। কারণ *কোরান* গবেষণা ও চিন্তার দ্বারা সব রকম গোমরাহি দূর করে দেয় এবং সঠিক পথের সন্ধানদাতা এবং জটিলতা এবং বহুতাবিরোধী হক ও বাস্তবের পার্থক্যকারী তথা হালাল-হারামের মধ্যে প্রভেদকারী।

১৮৭. *উইল্লা* (বৈধ করা হইয়াছে, হালাল করা হইয়াছে, বিধিসম্মত করা হইয়াছে, ন্যায্য করা হইয়াছে, যথোচিত করা হইয়াছে) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *লাইলাতা* (রাতে, রাত্রিতে, রজনীতে, নিশীথে) *সিয়ামি* (রোজা) *রাফাসু* (যোনমিলন, স্ত্রীমিলন, মহিলার সঙ্গে যোনিকর্ম করা, মহিলাদের সঙ্গে মেলানো করা, মহিলাদের সঙ্গে উলঙ্গ হওয়া, মহিলার প্রতি আকর্ষণ হওয়া, অশ্লীল কথা বলা, বেপরোয়া হওয়া, স্ত্রীকে কাছে ডাকা, যোনিক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করা, যোনমিলনের ইঙ্গিত দেওয়া) *ইলা* (দিকে, সঙ্গে, পর্যন্ত) *নিসায়িকুম* (তোমাদের স্ত্রীদের)।

বৈধ করা হইয়াছে তোমাদের জন্য রোজার রাতে যোনমিলন তোমাদের স্ত্রীদের দিকে।

+ *ইম্না* (তাহারা) *লিবাসুন* (পোশাক, লেবাস, পরিচ্ছদ, জামা-কাপড়) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *ওয়া* (এবং) *আনতুম* (তোমরা) *লিবাসুন* (পোশাক) *লাইননা* (তাহাদের জন্য)।

তাহারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাহাদের জন্য পোশাক।

+ *আলিমা* (জানেন) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *আননাকুম* (নিশ্চয়ই তোমরা) *কুনতুম* (ছিলে) *তাখতাননা* (খেয়ানত করিতেছিলে, অবিচার করিতেছিলে) *আরফসাকুম* (তোমাদের নফসের) *ফাতাবা* (সুতরাং সে তওবা করিল, সে ফিরিয়া আসিল, সে পাপ পরিহার করিল, সে আল্লাহমুখী হইল, সে ক্ষমা করিল, সুতরাং দৃষ্টিপাত করিলেন) *আলাইকুম* (তোমাদের উপর) *ওয়া* (এবং) *আফা* (ক্ষমা করিলেন, ক্ষমা করিলেন) *আনকুম* (তোমাদের নিকট হইতে)।

আল্লাহ জানিয়াছিলেন যে তোমরা খেয়ানত করিয়াছিলে তোমাদের নফসের, সুতরাং তিনি তোমাদের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদিগের হইতে ক্ষমা করিলেন।

+ *ফালআনা* (সুতরাং এখন) *বাশিরুননা* (তোমরা ওই সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গম কর/ যোনমিলন কর/ সহবাস কর) *ওয়া* (এবং) *ইবতাত্ত* (তোমরা

সন্ধান কর, তোমরা তালাশ কর, তোমরা খোঁজ) মা (যাহা) কাটা বা (লিখিয়া দিয়াছেন, অকাট্য আদেশ দান করা, অলঙ্ঘনকারী ফায়সালা করা, নির্দিষ্ট করা হয় তাহা, যে কাজের পিছে দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, দৃঢ় ইচ্ছা করা, কোনো আদেশকে অলঙ্ঘনীয় করা, ফরজ করিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, আলাহর হুকুম দেওয়া, ওহি পাঠানো, আবশ্যকীয়করণ, সাবেতকরণ, একত্রীকরণ, নকশা অঙ্কণ, দুই টুকরা চামড়াকে একত্রে সেলাই করিয়া দেওয়া) আলাহ (আলাহ) লাকুম (তোমাদের জন্য)।

☐☐ সুতরাং এখন তোমরা ওই সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে সঙ্গম কর এবং তোমরা সন্ধান কর যাহা তোমাদের জন্য আলাহ লিখিয়া দিয়াছেন।

+ ওয়া (এবং) কুল (তোমরা খাও, তোমরা ভক্ষণ কর) ওয়া (এবং) ইশরিব (তোমরা পান কর) হাতত (যতক্ষণ না) ইয়াতাবাইয়ানা (স্পর্শ হইয়া যাওয়া, প্রকাশ হইয়া যাওয়া, পরিষ্কার হইয়া যাওয়া, প্রতিভাত হইয়া যাওয়া) লাকুমল (তোমাদের জন্য) খাইতল (রেখা, সূতা, তাগা) আবইয়াদ (সাদা) মিনাল (হইতে) খাইতিল (রেখা, সূতা, তাগা) আসওয়াদি (কালো) মিনাল (হইতে) ফাজরি (ফজর, ভোর, সকলি, প্রভৃতি)।

☐☐ এবং তোমরা খাও এবং তোমরা পান কর যতক্ষণ না স্পর্শ হইয়া যায় তোমাদের জন্য সাদা রেখা হইতে কালো রেখা ভোর হইতে।

+ সম্মা (তারপর) আতিম্মুস (তোমরা পূর্ণ কর) সিয়ামা (রোজা) ইনাল (দিকে) লাইলি (রাত্রি)।

☐☐ তারপর তোমরা পূর্ণ কর রোজা রাত্রির দিকে।

+ ওয়া (এবং) লা (না) তবাসিরু (তোমরা সহবাস কর) হননা (তাহাদের সহিত) ওয়া (এবং) আনতম (তোমরা) আকিফনা (এতেকাফ করা) ফি (মধ্যে) মাসজিদ (মসজিদ সমূহের, মসজিদগুলির)।

☐☐ এবং তোমরা সঙ্গম করিও না তাহাদের সহিত যখন তোমরা এতেকাফ কর মসজিদের মধ্যে।

+ তিলকা (ওই, ওইটি) হুদুদ (সীমা, সীমারেখা, চৌহদ্দি) আলাহি (আলাহ) ফালা (সুতরাং না) তাকীরাবহা (তোমরা উহার নিকটে যাইবে)।

☐☐ ওইটি আলাহির সীমারেখা সুতরাং তোমরা উহার নিকটে যাইবে না।

+ কাজালিকা (ওইরূপভাবেই) ইউবাইয়িন (স্পর্শ বর্ণনা করা) আলাহ (আলাহ) আইয়াতিহি (তাহার আয়াতগুলি) লিননাসি (মানুষের জন্য) লাআল্লাহম (সম্ভবত তাহারা) ইয়াতাকুন (তাকওয়াকে গ্রহণ করে নেওয়া, তাকওয়া অবলম্বন করা)।

☐☐ ওইরূপভাবেই আলাহ স্পর্শ বর্ণনা করেন তাহার আয়াতগুলি মানুষদের জন্য সম্ভবত তাহারা তাকওয়া গ্রহণ করিবে।

☐ এই আয়াতে আলাহ রোজাদারদেরকে একটি বিশেষ সুযোগ দান করেছেন। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রথম যখন রোজা পালনের আদেশ দেওয়া হয় তখন রাতে ঘুমা-সুপাটি বৈধ ছিল না এবং ভোর রাতে উঠে যে সেহরি খাওয়া হয় সেই বিধানটিও ছিল না। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে যতক্ষণ রোজাদার জেগে থাকতে পারতো ততক্ষণই খাবার বিধানটি ছিল। কোনোক্রমে একবার ঘুমিয়ে পড়লে এবং পরে জেগে উঠলেও খাদ্যগ্রহণ করাটি নিষিদ্ধ ছিল এবং এতে দেখা যেত যে অনেকেই নিয়মটি ভঙ্গ করে অপরাধ করে ফেলত। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে মহানবি একটি-একটি করে তিনটি ব্যবস্থার উল্লেখ করে ইহাদের মধ্য হতে যে-কোনো একটি ব্যবস্থা ব্যক্তিবিশেষে দান করা হলো। যেমন একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী মুক্ত করে দেওয়া, অথবা ষাটজন ক্রধার্তকে দুবেলা পেট ভরে খাদ্য দেওয়া, অথবা রমজান মাসের পর ষাট দিন একাধারে রোজা পালন করা। অনেকেই শারীরিক পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসতো এবং পানাহারের

পূর্বেই ঘুমিয়ে যেত। ইহার ফলে সেই রাত্রির জন্য আর পানাহারটি করা যেত না এবং ইহাতে অনেকেই প্রচণ্ড ক্রোধ-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। আর গরমের দিন হলে তো আরও ভয়ঙ্কর কষ্ট হতো। এই কারণে আবুলাহ সিয়াম পালনের আনুষ্ঠানিক বিধানটিকে সহজ করে দিলেন এবং রাতে স্বা-সঙ্গের অনুমতি এবং সেহরি খাওয়ার সুযোগ-সুবিধাটি এই আয়াতে নাজেল করলেন।

হজরত আবু জর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবি বলেছেন, “আম্মার উন্নত যত দিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করে ইফতার করবে এবং দেহিতে সেহরি খাবে ততদিন মুঙ্গলের মধ্যে থাকবে।” মহানবির এই হাদিসটিকে আনুষ্ঠানিক রোজা, আনুষ্ঠানিক ইফতার এবং আনুষ্ঠানিক সেহরি খাওয়ার সাথে কোনো মতোই মেলানো যায় না এবং মেলাবার প্রশ্নই উঠে না, তারপরেও যারা গায়ের জোরে মেলাতে চেষ্টা করেন তাদের মস্তিস্কবিকৃতির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হতে চায়। হজরত আবু জরের (রা.) বর্ণিত এই হাদিসটিতে অধ্যাত্ম-বিষয়ের প্রতি পূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কারণ মোরাকাবা-মোশাহেদার তথ্য ধ্যানসাধনায় রূপিত থাকা সাধকেরা যে-সিয়ামটি পালন করে যায় সেই সিয়ামের সঙ্গে ইফতার এবং সেহরির কথাটি একদম মিলে যায়। এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত জ্ঞানবার আগ্রহ থাকলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত বিশ্বযুগের অমর গ্রন্থ *সিয়াম দর্শন* নামক বইটি পড়তে একান্ত অনুরোধ করছি।

এই আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে স্বামী এবং স্বা একজন আরেকজনের সহায়ক এবং আনন্দের ভূমিকা পালন করে। পোশাক যেমন শীত হতে রক্ষা করে তেমনি একজন আরেকজনের মানসঙ্গান রক্ষা করে। সুতরাং ইসলামের বিধানটি হলো একে অন্যকে পোশাকের মতো সাজিয়ে রাখা। আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার নামই হলো সিয়াম এবং এই সিয়ামের পথে যারা অগ্রসর হয় তারা ই হলো প্রকৃত সায়েম। প্রকৃত শব্দটি এজন্যই ব্যবহার করলাম যে, *মেজাজি সিয়ামের বিধানটি অবশ্যই থাকতে হবে, নতবা হাকিকি সিয়ামের বিষয়টি বিমুতই থেকে যাবে।* মেজাজি তিনটি শয়তানকে যদি হজরত পালনকারী হাজ্জিদের পাখর ছুঁতে মারার বিধানটি না রাখা হতো তাহলে আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে যে-শয়তানটিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই শয়তানকে হাকিকি পাখর মারার বিষয়টি বিমুতই থেকে যেত এবং জ্ঞানী লোকেরা এই বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারতো না। আপন নফস হতে শয়তানকে বিচ্ছিন্ন করার নামটিই হলো *মরণ কোরান-এর ভাষায় এই মরণকে বলা হয় ‘মৃত্যুর আগে মরিয়া যাওয়া’*। আপন দেহসত্তাটি হলো লোভ-মোহ নামক ষড়ারিপুর একমাত্র ঘাটি। এই ঘাটি হতে শয়তানকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যই এত আদেশ-উপদেশের আয়োজন। অসংখ্য অগণিত কথার মূল বিষয়টি হলো আপন পবিত্র নফস হতে শয়তানটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ধ্যানসাধনাটি করা। মহানবি পবিত্র হেরাণ্ডহায় যে দীর্ঘ পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন সেই ধ্যানসাধনাটি মোটেও মহানবির জন্য নহে, বরং পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতির আত্মিক মুক্তির জন্য। কারণ সত্য বলতে কি, পৃথিবীতে বাস করা ছয়শো কোটি মানুষের মধ্যে একজনেরও বকে হাত রেখে বলবার সাহসটুকুও নেই যে আমি সর্বাদিক দিয়ে এবং সর্বঅবস্থায় সুখী আর সুখী। তাই অবশেষে সুলতানুল হিন্দ আতায়ের রসুল হজরত মঈনুদ্দিন চিশতির একটি কথা বারবার মনে পড়ছে আর সেই কথাটি হলো, “সেই মানুষটি আরামে আছে যে জীবনেও আরাম পায় নি” - *আরাম উস দিলকো মিলা যিস দিলকো কাভি আরাম নাহি মিলা।*

১৮৮. ওয়া (এবং) লা (না) তাকুল (তোমরা খাইও) আমওয়ালাকুল (তোমাদের মাল, তোমাদের ধনসম্পদসমূহ) বাইনাকুল (তোমাদের পুরস্পরের, তোমাদের একের সঙ্গে অন্যের, উভয় বা অনেকের মধ্যে) বিন্বাতিনি

(অন্যায়ের সহিত, অন্যায়ভাবে) *ওয়া* (এবং) *তদনু* (তোমরা টানিয়া লইবে, তোমরা পৌছাইবে, বালতি ছাড়িয়া দেওয়া, কোনো বস্তুকে চালিয়া দেওয়া, তোমরা উপস্থাপন করিও, তোমরা পেশ করো) *বিহা* (উহাকে) *ইলাল* (দিকে) *উককামি* (বিচারকের, হাকিমের) *লিতাকুন* (তোমরা ভোগ করিবার জন্য, তোমরা খাইবার জন্য) *ফারিকান* (কিছু অংশ, কিয়দংশ, একটি অংশ) *মিন* (হইতে) *আমওয়ালিন* (ধনসম্পদ) *নাসি* (মানুষদের) *বিলইস্মি* (গুনাহের সহিত, পাপের সহিত) *ওয়া* (এবং) *আনতুম* (তোমরা) *তায়ালানুন* (জানো, বোঝো)।

এবং তোমরা খাইও না তোমাদের পরস্পরের ধনসম্পদগুলিকে অন্যায়ের সহিত এবং তোমরা উপস্থাপন করিও না উহাকে বিচারকের দিকে তোমরা ভোগ করিবার জন্য মানুষদের ধনসম্পদের কিছু অংশ হইতে গুনাহের সহিত এবং তোমরা জানো।

এই আয়াতে মানুষের ধনসম্পদের প্রতি যে অতিরিক্ত লোভ থাকে এবং সেই লোভের বশবর্তী হয়ে একে অপরের ধনসম্পদকে ক্রমশ করে নিজের দখলে আনবে এবং বিচারককে প্রভাবিত করার জন্য যে হীনমন্যতার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে সেই কথাটি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আবার এও আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা সবই বোঝ তথা বুঝবার পরেও লোভ মানুষকে এতটুকু নিচে নামিয়ে দেয় যে অন্যায় করা হচ্ছে বলে জানবার পরেও ওই অন্যায় কাজটি লোভের গোলামিতে পড়ে করতে চায়। এই ধনসম্পদ কোনো আমান অথবা মুসলমান অথবা কোনো মুমিন অথবা কোনো আলবাবকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি, বরং ‘আমওয়ালি লিননাসি’ তথা ‘মানুষদের ধনসম্পদ’-এর কথাটি বলা হয়েছে তথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কথাটি বলা হয়েছে। একটি মানুষ জানে যে এই কাজটি করা অন্যায় – তবু বিচারককে ছলচাতুরি অথবা উৎকোচের তথা ঘুষ দেবার মাধ্যমে প্রভাবিত করতে সামান্য বিবেকটিকে দংশন করে না। আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে তেমনি অহংকার মানুষের মানবীয় গুণগুলোকে খেয়ে ফেলে, তেমনি ধনসম্পদের লোভটি মানুষকে হীনমন্যতার চরমে নিয়ে যায় এবং এই কাজটি যে হীনমন্যতার কাজ ইহা জানবার পরেও, বুঝবার পরেও করতে সামান্য দ্বিধাবোধ করে না।

তুমি যে আত্মসাৎ করার জন্য এই আকাম-ককাম করছো এবং তুমি বিচারে জিতবার জন্য যে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করছো উহাই এই আয়াতে এক কথায় মানা করা হয়েছে। কোনো বিচারকের রায় দিয়ে আল্লাহর হুকুমটিকে পরিবর্তন করা যায় না, কারণ যাহা হারাম উহা বিচারকের রায়ে কখনই হালাল হয় না। তেমনি যাহা হালাল উহাও বিচারকের রায়ে কখনই হারাম হয় না। যদি অন্যায়কারী ঘুষ প্রদান করতে বিচারকের রায় অন্যায়ভাবে তার দিকে চলে যায় তাহলে উভয়েই শাস্তি ভোগ করবে। কারণ আল্লাহকে ফাকি দেবার প্রশ্নই ওঠে না, যদিও অনেকেই মনে করে যে আল্লাহকে ফাকি দেওয়াটা সবচাইতে সহজ কাজ, কারণ আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে সঙ্গে-সঙ্গে এর প্রতিকার করেন না। কিন্তু অন্যায়কারীর বাকি জীবনের উপর যে কত রকম বালান্মসিবত নাজেল হতে থাকে উহা টেরই পায় না।

পরিশেষে আল্লাহর একজন ওলি যে একটি অতি চমৎকার কথা বলে গেছেন সেই কথাটি জানিয়ে দিলাম। সেই আল্লাহর ওলি বলেছেন, ‘মশারির দেহতর, জিকির করা সহজ, কিন্তু ধনসম্পদের উপর বসে জিকির করা খুবই কঠিন। তারপর আল্লাহর আরেকজন ওলি বলে গেছেন যে, ‘সোনা খাটি কিনা আগুনে দিলেই ধরা পড়ে, আর মানুষ খাটি কিনা সোনা হাতে দিলেই ধরা পড়ে।

১৮৯. *ইয়াসআলুনাকা* (আপনাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করে) *আনিল* (হইতে, বদলের জন্য, সম্পর্কে, সম্বন্ধে) *আহিল্লাতি* (নূতন চাদ)।

□□আপনাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে।

+ কুল (বলো) *হিইয়া* (ইহা, তাহা) *মাওয়াকিত* (সময় চিনিবার বিভিন্ন উপায় উপকরণ, যাহা কোনো কাজের জন্য নির্ধারিত হইয়া থাকে, সময়ের নির্দেশক) *লিননাসি* (মানুষের জন্য) *ওয়া* (এবং) *হাজ্জি* (হজের)।

□□আপনি বলুন, ইহা সময় চিনিবার বিভিন্ন উপায়-উপকরণ মানুষদের এবং হজের জন্য।

+ *ওয়া* (এবং) *লাইসা* (নাই) *বিরকু* (সোয়াব, পুণ্য, কল্যাণ, সদাচরণ করা, উপকার করা) *বিয়ান* (নিশ্চয়তার সঙ্গে, ইহাতে যে) *তাত* (তোমরা আসো) *বুয়তা* (ঘরগুলিতে, ঘরসমূহে) *মিন* (হইতে) *জহরি* (পিছন দিক, পশ্চাৎ দিক) *হী* (নও, দাও) *ওয়া* (এবং) *লাকিননা* (কিছু, বরং) *বিররা* (পুণ্য, সোয়াব) *মানিত* (যে কেহ) *তাকা* (তাকওয়া অবলম্বন করা)।

□□এবং নাই পুণ্য ইহাতে যে তোমরা ঘরগুলি হইতে আসো পিছন দিক হইতে, বরং পুণ্য (রহিয়াছে) যে কেহ তাকওয়া অবলম্বন করার (মধ্যে)।

+ *ওয়া* (এবং) *আতল* (তোমরা আসো) *বুইউতা* (ঘরগুলি, ঘরসমূহ) *মিন* (হইতে) *আবওয়াবিহী* (ইহার সামনের দরজাসমূহ)।

□□এবং তোমরা আসো ঘরসমূহের সামনের দরজাগুলি দিয়া।

+ *ওয়া* (এবং) *ইততাকু* (ভয় কর) *আল্লাহা* (আল্লাহকে) *লাআল্লাকুম* (সম্ভবত, আসা করা যায়) *তফলিহনা* (তোমরা সফল হইবে)।

□□এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে আশা করা যায় (সম্ভবত) তোমরা সফল হইবে।

□ এই আয়াতে মোটামুটিভাবে স্থল অর্থে এই বোঝা যায় যে, আল্লাহ চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের সময় নির্ধারণের জন্য। একটু খণ্ডিত চিন্তা নিয়েই না হয় বলি যে, চাঁদ দেখে রোজা রাখা এবং চাঁদ দেখে রোজা শেষ করার মাঝেও মুসলমানদের জন্য সময় নির্ধারণের বিষয়। অখণ্ড দর্শনের মাপকাঠিতে যদি আত্মস্বান করা হয় তাহলে সমগ্র মানবজাতিকেই উদ্দেশ্য করে আত্মস্বান করতে হয়। কিছু পরক্ৰমে যদি খণ্ডিত দর্শনে আত্মস্বান করা হয় তাহলে বিশেষ একটি শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, যেমন আমানুদ্বেরকে উদ্দেশ্য করে বলা অথবা মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা অথবা জ্ঞানীদেরকে তথা আলবাবদের উদ্দেশ্য করে বলাটিকে খণ্ডিত দর্শন নাম দিতে বাধ্য হলাম। কারণ এই আত্মস্বান সবার জন্য নয় তথা অখণ্ড আত্মস্বান নয়। অধম লিখকের মনে হয়, ঘরসমূহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করার অর্থটি অজ্ঞানতার সাথে আত্মদর্শনের চেষ্টা করা। আপন দেহের মাঝে প্রবেশ করেই আত্মদর্শনের শিক্কাটি গ্রহণ করে নিতে হয় এবং ইহাতে শিক্কাদাতা অথবা গুরু প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞ শিক্কাদাতার নির্দেশিত পথে জ্ঞানের আত্মদর্শনে এগিয়ে যাবার মাঝেই বিশেষ রহস্যটি লুকিয়ে থাকে। অভিজ্ঞ শিক্কাদাতা হজরত আলুমা ইকবাল তাই আপন দেহটিকে লক্ষ করে বলেছেন যে, তোমার আপন দেহটিই হলো মিম্বের স্মরণ, তোমার আপন দেহটিই হলো মেরাজের বোরাক, তোমার আপন দেহটিই হলো সব রকম আধ্যাত্মিক রহস্যের ভাণ্ড। তোমার আপন দেহটির ভেতরে যা আছে তা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। হজরত শাহ সুফি আলুমা ইকবালের এই কথাগুলো সাধকদের জন্য অতিমূল্যবান উপদেশ। সৃষ্টিজগতের সব কিছুকে একই পাল্লায় মাপা যায় না। মাপতে হবে ঠিকই তবে মাপার পাল্লাটির অবশ্যই প্রকারভেদ থাকতে হবে। খড়ি মাপার পাল্লায় সোনা মাপা যায় না, আবার সোনা মাপার পাল্লায় খড়ি অথবা অন্য কোনো স্থল জিনিস মাপা যায় না। জ্ঞানের প্রকারভেদ অনেক রকম। তাই অনেক রকম জ্ঞান মাপার বিধানটি দেখা যায়।

১৯০. ওয়া (এবং) কাতিলু (তোমরা হত্যা কর, তোমরা হত্যা কর) ফি (মধ্যে) সাবিলি (পথে) আল্লাহি (আল্লাহর) আল্লাজিনা (যাহারা) ইউকাতিলুনাকুম (তোমাদেরকে হত্যা করে) ওয়া (এবং) না (না) তাতাদু (তোমরা সীমানা অতিক্রম কর, তোমরা বাড়াবাড়ি কর, তোমরা সীমানা ডিঙাইয়া যাও, তোমরা সীমানা অতিক্রম কর, তোমরা সীমানা অমান্য কর)।

□□ এবং তোমরা হত্যা কর আল্লাহর রাস্তায় যাহারা তোমাদেরকে হত্যা করে এবং তোমরা সীমা অতিক্রম করিও না।

+ ইননালাহা (নিশ্চয়ই আল্লাহ) না (না) ইউইব্বু (ভালোবাসেন) মুতাদিনা (সীমা অতিক্রমকারীদেরকে)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

১৯১. ওয়া (এবং) ইকতলু (হত্যা কর) হুম (তাহাদেরকে) হাইসু (যেখানে, সেখানে) সাকিফতুম্ (তোমরা ধর) হুম (তাহাদেরকে) ওয়া (এবং) আখলিজু (বাহির কর) হুম (তাহাদেরকে) মিন (হইতে) হাইসু (যেখান) আখরাজু (তাহারা বাহির করিয়াছে) কুম (তোমাদের) ওয়া (এবং) ফিতনাতু (ফিতনা) আশাদদু (খুব কঠিন, গুরুতর, জঘন্যতম) মিনান্ (হইতে) কাতলি (হত্যা)।

□□ এবং হত্যা করা তাহাদেরকে যেখানেই তোমরা নাগাল পাও তাহাদেরকে এবং বাহির কর তাহাদেরকে যেখান হইতে বাহির করিয়াছে তাহারা তোমাদের এবং ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর।

+ ওয়া (এবং) না (না) তকাতিলু (হত্যা কর) হুম (তাহাদের) ইন্দা (নিকটে, কাছে) মাসজিদিল হারামি (মসজিদে হারামের) হাত্তা (যে পর্যন্ত না, যতক্ষণ না) ইউকাতিলু (তাহারা হত্যা করে) কুম (তোমাদের) ফিহি (ইহার মধ্যে)।

□□ এবং হত্যা করিও না তাহাদের মসজিদে হারামের (কাবা ঘরের) নিকটে যে পর্যন্ত না তাহারা তোমাদেরকে ইহার মধ্যে হত্যা করে।

+ ফাইনু (সুতরাং যদি) কাতালু (তাহারা হত্যা করে) কুম (তোমাদের) ফা (সুতরাং) ইকতলু (তোমরা হত্যা কর) হুম (তাহাদেরকে)।

□□ সুতরাং যদি তাহারা হত্যা করে তোমাদের সুতরাং তোমরা হত্যা কর তাহাদেরকে।

+ কাজালিকা (ওইরূপভাবেই) জাজাউল (প্রতিদান, বদলা, শাস্তি দেওয়া, ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা, মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া, বিনিময়) কাফিরিনা (কাফেরদের)।

□□ ওইরূপভাবেই কাফেরদের বিনিময় দেওয়া হইবে।

১৯২. ফাইনিন (সুতরাং যদি) তাহাও (তাহারা বিরত হয়) ফাইননা (সুতরাং নিশ্চয়ই) আল্লাহি (আল্লাহ) গাফুরুর (রুম্মাশীল) রাহিম (রহিম)।

□□ সুতরাং যদি তাহারা বিরত হয় সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ রুম্মাশীল রহিম।

১৯৩. ওয়া (এবং) কাতিলু (তোমরা হত্যা কর) হুম (তাহাদেরকে) হাত্তা (যে পর্যন্ত) না (না) তাকুনী (থাকে) ফিতনাতন্ (ফেতনা) ওয়া (এবং) ইয়াকুনী (হয়) দীনুল্লাহি (আল্লাহর দ্বীনের জন্য)।

□□ এবং তোমরা হত্যা কর তাহাদেরকে যতক্ষণ না ফেতনায় থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য।

+ ফাইনিন (সুতরাং যদি) তাহাও (তাহারা বিরত হয়) ফালা (সুতরাং না) উদওয়ানা (জুলুম, অত্যাচার, জ্বরদস্তি) ইল্লা (ব্যতীত) আলী (উপর) জোয়ালিমিনা (জালেমদের)।

□□সূতরাং যদি তাহারা বিরত হয় সূতরাং নাই জুলুম একমাত্র জ্বালেমদের উপর ছাড়া।

□ এই চারটি আয়াতের ব্যাখ্যা লেখা তো অনেক দূরের কথা অধম লিখক এই আয়াত চারটির মর্মার্থই বুঝতে পারি নি তথা বোধগম্য নয়। সূতরাং যাহা বোধগম্য নহে উহার ব্যাখ্যা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। অর্থাৎ বোধগম্য হলে তো ব্যাখ্যাটি দিতে পারতাম। অধম লিখকের নিজস্ব সংগ্রহে কম করে হলেও ৩০টি কোরান-এর তফসির আছে এবং গাধার খাটুনি দিয়ে এত পড়ার পরেও এই আয়াত চারটির মর্ম আমার বোধগম্য নহে।

পরিশেষে, একজন কবির সুন্দরতম উপদেশটি আজও মনের মাঝে বাসা বেঁধে আছে আর সেই কবির রচিত দুটি লাইন লিখে দিলাম :

সকলেই জেনে যায়; আমি শুধু অপলক, দু-চোখে বিস্ময়;
জানি - কিছু জানি নাই, ঢেনীকেও গভীর অচেনা মনে হয়।

১৯৪. আশশাহাকুল (মাস, বৎসরের বার ভাগের এক ভাগ, ত্রিশ দিন) হারাম (হারাম, নিষিদ্ধ, সম্মানযোগ্য, সম্মানিত, আল্লাহর বাধ্যবাধকতা, জোরপূর্বক বাধা, সকলের দিক হইতে বাধা) বিশশাহারিন্ (মাসের সঙ্গে, মাসের বিনিময়ে) হারামে (নিষিদ্ধ) ওয়া (এবং) হরমাত (সম্মান, সম্মানসমূহ) কিসাসুন (বদলা, প্রতিশোধ, খনের বদলে খন, হত্যার বদলে হত্যা)।

□□নিষিদ্ধ মাসের সঙ্গে নিষিদ্ধ মাস এবং সম্মানই বদলা (প্রতিশোধ)।

+ ফামানিত (সূতরাং যে) তাদা (বাড়াবাড়ি করা) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ফাতাদ (সূতরাং তোমরাও বাড়াবাড়ি কর) আলাইহি (তাহাদের উপর) বিমিসলি (অনুরূপের সহিত, ওইরূপভাবে) মা (যেমন) তাদা (বাড়াবাড়ি করিয়াছে) আলাইকুম (তোমাদের উপর)।

□□সূতরাং যে বাড়াবাড়ি করিবে তোমাদের উপর সূতরাং তোমরাও বাড়াবাড়ি কর তাহাদের উপর ওইরূপভাবে বাড়াবাড়ি করিয়াছে তোমাদের উপর।

+ ওয়া (এবং) ইততাক (তোমরা ভয় কর) আল্লাহ (আল্লাহকে) ওয়া (এবং) ইলাম (জানিয়া রাখি) আননাল্লাহ (নিশ্চয়ই আল্লাহ) মাআন্ (সাথে, সঙ্গে) মুতাকিনা (মুতাকিদের)।

□□এবং ভয় কর আল্লাহকে এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুতাকিদের সঙ্গে আছেন।

১৯৫. ওয়া (এবং) আনফিক (তোমরা ব্যয় কর, তোমরা খরচ কর) ফি (মধ্যে) সাবিলি (রাস্তা, পথ) লিল্লাহি (আল্লাহর) ওয়া (এবং) লা (না) তলুক (তোমরা নিক্ষেপ কর, ক্লেপণ কর, হুড়িয়া ফেল, ত্যাগ কর, অর্পণ কর) বিআইদিকুম (তোমরা নিজেদের হাতে) ইলাহ (দিকে) তাহনুকাতি (ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া, বিনাশ, সর্বনাশ)।

□□এবং তোমরা ব্যয় কর আল্লাহর রাস্তার মধ্যে এবং তোমরা নিক্ষেপ করিও না তোমাদের নিজেদের হাতে (নিজেদেরকে) সর্বনাশের দিকে (ধ্বংস)।

+ ওয়া (এবং) আহসিনু (তোমরা ভালো কাজ কর, তোমরা এহসান কর, তোমরা সৌন্দর্যের অনুশীলন কর)।

□□এবং তোমরা ভালো কাজ কর।

+ ইননাল্লাহ (নিশ্চয়ই আল্লাহ) ইউউহিবু (ভালোবাসেন) মুহসিনিনা (ভালো কাজ যাহারা করে)।

□□নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো কাজ যাহারা করেন (তাহাদেরকে) ভালোবাসেন।

□ এই আয়াত দুইটি দু-রকম অর্থ বহন করে : একটি জাগতিক অর্থে এবং অপরটি আধ্যাত্মিক অর্থে। এখানে আপন সত্তার মধ্যে যে-খান্নাসরুপী

শয়তানটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, উহা হতে মুক্তিলাভের অর্থটি প্রাধান্য পেয়েছে। নিষিদ্ধ মাস অর্থ হলো পবিত্র মাস। যে-মাসে দুনিয়ার লোভ-মোহে ডুবে থাকা এবং অন্যায় অবিচার করা হারাম তাকেই নিষিদ্ধ মাস বলা হয়েছে। আরব জাতি চারটি মাসে যুদ্ধ এবং কোনো প্রকার ছোট সংঘাতেও জড়িত হতো না। তারা এই মাসগুলোকে পবিত্ররূপে গ্রহণ করে এই মাসগুলোতে যুদ্ধ এবং কোনো প্রকার সংঘাতে যাওয়া হারাম বলে মনে করতো। এই জন্যই এই মাসগুলোর নামের আগে হারাম মাস দেওয়া হয়। মাসগুলো হলো : বুজব মাস, জেলকদ মাস, জেলহজ মাস এবং মোহরম মাস। আরব জাতি এই নিষিদ্ধ মাসের সঙ্গে ধর্মঅনুশীলনের তথা সালাতের কথাটি জড়িয়ে দিয়ে নিজেদের ধ্বংস হতে মুক্তির দিক-নির্দেশনা মানবজাতিকে দান করেছেন। উহাও মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র সামাজিক নিষিদ্ধতা পালনের মাঝে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ওয়া আনফিক তথা তোমরা ব্যয় কর - এই কথার দ্বারা কেবলমাত্র ধনসম্পদ ব্যয় করার কথাটি প্রাধান্য পায় নাই, বরং ছয় বিপুল শক্ত বন্ধন যাহা মাথার মধ্যে বাসা বাঁধে তাহাকেও ফেলে দেবার আদেশটি দেওয়া হয়েছে এবং উহা ফেলে দিতে হলে দায়েমি সালাতের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই মহানবি ওয়াক্ফিয়া সালাত হতে দায়েমি সালাতের গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন এবং আল্লাহও কোরান-এর সূরা মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতে দায়েমি সালাতের মধ্যে যারা আছেন তাদেরকেই মুত্তাকি বলেছেন। জাগতিক ব্যয় মানব-সমাজকে সুন্দর করে তোলে এবং ছয় বিপুল বন্ধন হতে মুক্তির জন্য ধ্যানসাধনায় কিছু সময় ব্যয় করতে পারলে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করা যায়। এই দুটির একটিও যদি না করা হয় তাহলে নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস আনয়ন করা হয়। হাত শব্দটি হলো শক্তির প্রতীক। ছয় বিপুল বন্ধনটাই শিরক। এই শিরক নিজের ভেতরেই অবস্থান করে। বাহিরে উত্তহিদ আর তত্তহিদ। বাহিরে শিরকের কোনো অবস্থানটি নাই। এই শিরকের গুদামটি হলো আপন নফসের অভ্যন্তরে খান্নাসরূপী শয়তানটি। এই শিরকের জনকই হলো খান্নাস। সুতরাং এই শিরক হতে মুক্তিলাভের আশায় সৌন্দর্যের অনুশীলন তথা দায়েমি সালাতের নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। এই দায়েমি সালাতটি হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে নিজের ধ্বংস নিজেই মনের অজান্তে ডেকে আনে। সুতরাং যারা দায়েমি সালাতের অনুশীলন করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

মহানবি কখনো নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যুদ্ধ করতেন না। অবশ্য মুসলমানদের সাথে এই নিষিদ্ধ মাসগুলিতে যদি কাফেরেরা যুদ্ধ করতে আসতো তাহলে মহানবিও যুদ্ধ করতেন। আবার এমনও দেখা গেছে যে, যুদ্ধ করতে-করতে নিষিদ্ধ মাসটি এসে গেলে নিষিদ্ধ মাসটিতে বিরতি দিয়ে যুদ্ধ করতেন। মুশরিকদের উপরেও যে অদৃশ্য ন্যায়বিচারটি লুকিয়ে আছে এই কথার দ্বারা যে তোমাদের উপর যতটুকু জুলুম করবে সেই পরিমাণের বাইরে যেতে মানা করা হয়েছে। যেমন অনগ্রি আল্লাহ বলেছেন, তারা তোমাদেরকে যতটুকু যন্ত্রণা দেবে তোমরাও তাদেরকে ততটুকুই যন্ত্রণা দাও এবং বেশি করো না। অন্যায়ের বিনিময়ে ততটুকুই করবে যতটুকু তারা করেছে।

১৯৬. ওয়া (এবং) আতিমমুল (তোমরা পূর্ণ কর, সম্পাদন কর, সম্পূর্ণ কর, নিখুঁত কর, শেষ কর) হজ্জা (হজ) ওয়াল্ (এবং) ওমরাতা (ওমরাই) লিল্লা (আল্লাহর জন্য)।

□□ এবং তোমরা পূর্ণ কর হজ্জ এবং ওমরা আল্লাহর জন্য।

+ ফাইন (সুতরাং যদি) উহসির (বাধা পাও, বাধাপ্রাপ্ত হও, বাধাগ্রস্ত হও, প্রতিকূদ্ধ হও, ব্যাহত হও, ঢুকিতে না পাও) তুমু (তোমরা) ফামাস (সুতরাং যাহা) তাইসারা (ওইটা সহজ হইল, সম্ভব হইল) মিনাল (হইতে) হাদই (উৎসর্গ, কোরবানি, হেদায়েত, ত্যাগ)।

□□ সুতরাং যদি বাধা পাও তোমরা সুতরাং যাহা সহজ হয় উৎসর্গ হইতে।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাহলিক (তোমরা মণ্ডন কর), কুসাকুম (তোমাদের মাথা) হাততা (যতক্ষণ পর্যন্ত না) ইয়াবলুগাল (পৌছে) হাদইউ (উৎসর্গ, কোরবানি) মোহিনলাহ (তাহার স্থানে, কোরবানির স্থান, যেখানে কোরবানির পণ্ড জবেহ করা হয়)।

□□এবং তোমরা মণ্ডন করিও না তোমাদের মাথা যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎসর্গটি পৌছায় তাহার স্থানে।

+ ফামান (সূতরাং যে) কানা (হয়) মিনকুম (তোমাদের মধ্যে) মারিদান (অসুস্থ, পীড়িত) আও (অথবা) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) আকান (অসুখ, কেশ) মিরাসিহি (তাহার মাথা হইতে) ফাকিদিয়াতন (সূতরাং ফিদিয়া) মিন (হইতে) সিয়ামিন (একটি রোজা) আও (অথবা) সাদাকাতিন (সদকা) আও (অথবা) নসুকিন (কোরবানি)।

□□সূতরাং যে হয় তোমাদের মধ্যে অসুস্থ অথবা তাহার সঙ্গে অসুখ তাহার মাথা হইতে সূতরাং ফিদিয়া একটি রোজা হইতে অথবা সদকা অথবা কোরবানি।

+ ফাইজা (সূতরাং যখন) আমিনতুম (তোমরা নিরাপদ হও)।

□□সূতরাং যখন তোমরা নিরাপদ হও।

+ ফামান (সূতরাং যে) তামাততা (লাভবান হইতে চায়, ফায়দা লইতে চায়, সুযোগ লাভ করিতে চায়) বিনউমরাতি (ওমরার দ্বারা) ইলান (দিকে) হাজ্জি (হজ্জ) ফামাস (সূতরাং যাহা) তাইসারা (সহজ হয়, সম্ভব হয়, সহজসাধ্য হয়, সহজলভ্য হয়) মিনান (হইতে) হাদই (উৎসর্গ, কোরবানি)।

□□সূতরাং যে লাভবান হইতে চায় ওমরার দ্বারা হজ্জের দিকে সূতরাং যাহা সহজ হয় কোরবানি হইতে।

+ ফামান (সূতরাং যে) লাম (না) ইয়াজিদ (পায়) ফাসিয়াম (সূতরাং সিয়াম পালন করে) সালাসাতি (তিন) আইয়ামিন (দিন) ফিন (মধ্যে) হাজ্জি (হজ্জের) ওয়া (এবং) সাবআতিন (সাত) ইজা (যখন) রাজাতুম (তোমরা ফিরিবে)।

□□সূতরাং যে পায় না সূতরাং রোজা রাখিবে তিন দিন হজ্জের মধ্যে এবং যখন তোমরা ফিরিবে সাত (দিন)।

+ তিলকা (ওই, ওইটা, ওইটাই) আশারাতন (দশ) কামিলাতন (পূর্ণ, পুরা, ভরতি, কুমতি বা ঘাটতি নাই এমন, সিদ্ধ, অখণ্ড, সমস্ত)।

□□ওইটাই পূর্ণ দশ।

+ জালিকা (ওইটা) লিমান (যাহার তাহার জন্য) লাম (না) ইয়াকুন (হয়) আহলহ (তাহার পরিবারবর্গ) হাদিরিন (বাসিন্দা) মাসজিদি (মসজিদে) হারামি (হারামের)।

□□ওইটা তাহার জন্য যাহার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।

+ ওয়া (এবং) ইততাক (ভয় কর) আল্লাহ (অল্লাহকে) ওয়া (এবং) ইলাম (জানিয়া রাখ) আননাল্লাহ (নিশ্চয়ই অল্লাহ) শাদিদুল (শক্ত) ইকাবি (শাস্তি দানে, আজাব দিতে)।

□□এবং ভয় কর আল্লাহকে এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে শক্ত।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি প্রায় ক্রেই মেক্জাজি বিষয়, তাই এই মেক্জাজি বিষয়ের অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও ইহার ব্যাখ্যাটি লিখতে মন চায় না। কারণ আল্লাহর গুণে গুণায়িত হয়ে যাওয়াটাই হলো হজ্জ। হজ্জ বিষয়টি একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। এই হজ্জের পরিপূর্ণতা লাভ করার যারা আশা রাখেন তাদেরকে অবশ্যই ধ্যানসাধনার মোরাক্বা-মোশাহেদায় ধৈর্য সহকারে কিছু কাল অতিবাহিত করতে হবে। বন্ধনটিকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে হবে এবং ইহা ধীরে-ধীরে অভ্যাসের মাধ্যমে ধ্যানসাধনাটি করে যেতে হবে। মাথা মণ্ডন

করাটা হজের একটি অবশ্য পালনীয় মেজাজি অনুষ্ঠান। ইচ্ছিয়দারপথে মাথায় যে ষড়রিপুর বোঝার আগমনটি ঘটে, ধ্যানসাধনের অনুশীলনের মাধ্যমে এই শিরকগুলো মাথা হতে মুছে ফেলতে হবে। *মাথা হতে ষড়রিপুর যে শিরকগুলো গজিয়ে উঠছে উঠাকে ফেলে দেবার মেজাজি কর্মটি হলো মস্তক মুণ্ডন তথা মাথা ন্যাড়া করা।* মাথার মধ্যে ছয় রিপুর শিরকের বোঝাটি ফেলে দেবার মূর্ত প্রতীক হলো – তথা ইঙ্গিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে – মস্তক মুণ্ডন করে ফেলা। যাদের অন্তর অসুস্থ এবং যাদের মাথায় অনেক দিনের একটা ক্রেশ আছে তারা ছয় রিপুর বন্ধনের শিরকগুলো উচ্ছেদ করতে অনেকটা অক্লমতার ভূমিকা পালন করে। তাই তাদের হজ-সাধনাটি অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ সাধকদের জন্য একটা সিয়াম, একটা সদকা এবং একটা কোরবানির অনুশীলন করবার আদেশটি দেওয়া হয়েছে, যাতে হজের পূর্ণতার মধ্যে খুড়িয়ে-খুড়িয়ে পৌছাতে পারে। হজের পূর্ণতা লাভের চেষ্টার পর যখন মনের নিরাপত্তা অর্জিত হয়ে যায় তখন সহজভাবেই ওমরা এবং হজ পালন করার নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। তারপর ওমরা তথা ছোট হজ হতে বড় হজের দিকে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে – যাতে হজ সম্পাদন করা সহজসাধ্য হয়, কারণ ওমরা করা ব্যতীত হজ সম্পন্ন করা যায় না। লোভ-মোহ-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ-অহঙ্কার – এই জাতীয় শিরকগুলো হতে নিরাপত্তা অর্জন করতে না পারলে সেই ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক হজের মধ্যেই তিন দিন সিয়াম পালন করার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। পরিজনবর্গ মসজিদুল হারাম এলাকায় যদি উপস্থিত না থাকে তবে তাকে সাত দিন সিয়াম করবার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। কারণ সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই ধীরে-ধীরে হজের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আল্লাহ যে শক্ত পরিণতি উহা জীবনভর মনে রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছানো অত্যন্ত শক্ত বিষয় এবং উহা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আত্মদর্শনের হজটি সম্পাদন না করা পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মেজাজি হজের বিষয়ে একবোঝা কথা আর একবোঝা দলিল হাজির করে পাঠকদেরকে জটিলতার মাঝে ফেলে দিতে চাই না।

১৯৭. *আলহাজ্জ* (একমাত্র হজ) *আশহরুম* (মাসগুলি) *মালুমাতু* (জ্ঞাত, যে সমস্ত বিষয় জানা যায়, নির্দিষ্ট, সুবিদিত, পরিজ্ঞাত)।

□□ একমাত্র হজ যে-সমস্ত বিষয় জানা যায় মাসসমূহের (মধ্যে)।

+ *ফামান* (সুতরাং যে) *ফারাদা* (ইচ্ছা করা, নিয়ত করা, কোনো পুরু কঠিন বস্তুকে ফাটাইয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট করা, নিজের জন্য অবশ্যকর্তব্য করিয়া নেওয়া, ওয়াজিব করা) *ফিহিন্নাল* (উহার মধ্যে) *হাজ্জা* (হজ করার) *ফালা* (সুতরাং না) *রাফাসা* (স্বী-সহবাস করা, যৌনমিলন করা) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ফসুকা* (ফাসেকি কাজ করা, অন্যায় আচরণ করা, গুনাহ, পাপ) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *জিদানা* (কলহবিবাদ করা, ঝগড়াবিবাদ করা, পরস্পর ঝগড়া করা, একে অন্যের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করার আলোচনা, রশিকে পেচানো, কুস্তি করা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া) *ফিল* (মধ্যে) *হাজ্জি* (হজের)।

□□ সুতরাং যে নিয়ত করিল উহার মধ্যে হজ করিতে সুতরাং যৌনমিলন করিবে না (স্বী-সহবাস করিবে না) এবং ফাসেকি কাজ করিবে না এবং ঝগড়াবিবাদ করিবে না হজের মধ্যে।

+ *ওয়া* (এবং) *মা* (যাহা) *তাকআলু* (তোমরা কর) *মিন* (হইতে) *খাইরি* (উত্তম, কল্যাণ, সংকর্ম) *ইয়ালামহ* (তাহা জানেন) *আল্লাহ* (আল্লাহ)।

□□ এবং যাহা তোমরা কর কল্যাণ হইতে তাহা জানেন আল্লাহ।

+ ওয়া (এবং) তাজাউওয়াদ (তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর, পথের খরচ লও) ফাইননা (সুতরাং নিশ্চয়ই) খায়রা (উত্তম) জাদিত (পাথেয়) তাকওয়া (তাকওয়া)।

এবং তোমরা পথের খরচ লও সুতরাং নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় (হইল) তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা)।

+ ওয়া (এবং) ওয়াততাকনি (আমাকে তোমরা ভয় কর) ইয়া (হে) উলিলআলবাব (জ্ঞানী লোকেরা, বুদ্ধিমান লোকেরা, জ্ঞানবানেরা, তত্ত্বজ্ঞেরা)।

এবং আমাকে তোমরা ভয় কর, হে জ্ঞানী লোকেরা।

শাওয়াল, জেলকদ, জেলহজ্জ - এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। হজ্জের এই মাসগুলিতে এহরাম বাধা উত্তম - যদিও অন্যান্য মাসেও এহরাম বাধা যায়। তবে সুনির্দিষ্ট মাসগুলিতেই পূর্ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও এই আয়াতে হজ্জের মাসগুলি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তবুও বছরের যে-কোনো মাসে এহরাম বাধা যেতে পারে। মেজাজি হজ্জের প্রশ্নে অবশ্য কিছুটা মতভেদ আছে এবং এই মতভেদটাই সৌন্দর্যবর্ধন করেছে। যেমন, মেজাজি হজ্জের প্রশ্নে হজ্জের এহরাম হজ্জের মাসগুলিতেই বাধতে হবে। অন্য যে-কোনো মাসে হজ্জের এহরাম বাধলে ঠিক হবে না বলেছেন। নির্দিষ্ট মাসগুলির আগে এবং পরে এহরাম বাধলে উহা ঠিক হবে না, বরং বাতিল বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং মেজাজি হজ্জের প্রশ্নে এই কথাটুকু বলা যায় যে, হজ্জের সুনির্দিষ্ট মাসগুলি ছাড়া এহরাম শুদ্ধ হবে না।

হজ্জের এহরাম বাধা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস তথা যৌনমিলন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে যে-কোনো পাপকাজ এবং যে-কোনো ঝগড়া-বিবাদও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে হজ্জরত পালন করতে গেলে - তথা সেটা মেজাজি হজ্জই হোক অথবা হাকিকি হজ্জই হোক - পাথেয় প্রয়োজন হয়। তবে সবচেয়ে বড় পাথেয়টি হলো তাকওয়া নামক পাথেয়টি। এই উত্তম তাকওয়া নামক পাথেয়টিতে বৈষয়িক বাটঝামেলা বহন করতে হয় না এবং এ রকম হজ্জরত পালনটি একমাত্র আল্লাহর ওলিরাই উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ পাথেয়রূপে গ্রহণ করে নেয়। এই আয়াতে মোহম্মদ কর্ম করার শিক্ষাটি দেওয়া হয়েছে, কারণ কোনো কর্মই বন্ধন নয়, বরং কর্মের মাঝে মোহ জড়িয়ে গেলেই কর্মটি বন্ধনে রূপান্তরিত হয়। তাই শাওয়াল, জেলকদ এবং জেলহজ্জ এই তিনটি মাসকে মোহ হতে মুক্তি লাভ করার জন্য মেজাজি হজ্জটি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে একটি কথা বলেই এখানে শেষ করতে চাই আর সেটা হলো : হয় রিপূর বন্ধন হতে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় লেগে থাকার নামই হলো হজ্জের দিকে অগ্রসর হবার সুন্দর পাথেয়।

১৯৮. নাইসা (নাই) আলাইকুম (তোমাদের উপর) জুনাহন (গুনাহ, পাপ) আন (যে) তাততাত (তোমরা সন্ধান কর, তোমরা তালিশি কর, তোমরা খোজ) ফাদলান (ফজিলত, অনুগ্রহ) মির (হইতে) রাববিকুম (তোমাদের রবের, তোমাদের প্রতিপালকের)।

নাই তোমাদের উপর গুনাহ যে তোমরা তালিশি কর ফজিলত (অনুগ্রহ) তোমাদের রব হইতে।

+ ফাইজা (সুতরাং যখন) আফাদতুম (তোমরা ফিরিয়া আসিবে, তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে) মিন (হইতে) আরাকাতিন (আরাফাত) ফাজকুরু (সুতরাং তোমরা জিকির কর, তোমরা স্মরণ কর) আলাহা (আলাহকে) ইন্দাল (নিকটে, কাছে) মাশআরিল (মাশারিল) হারামি (হারামের [মুজদালিফা])।

সুতরাং যখন তোমরা ফিরিয়া আস আরাফাত হইতে সুতরাং তোমরা জিকির কর আলাহকে মুজদালিফার নিকটে।

+ ওয়াজ্জ (এবং) কুরুই (তাহাকে জিকির কর) কাম্মা (যেমন, এইরূপভাবে, যেহেতু) হাদাকুম (তোমাদেরকে হেদায়েত করা হইয়াছে)।

□□এবং তাকে জিকির কর এইরূপভাবে যে রূপভাবে তোমাদেরকে হেদায়েত করা হইয়াছে।

+ ওয়া (এবং) ইন (যদি) কুনতুম (তোমরা ছিলে) মিন্কাবলিহি (পূর্ব হইতে) লামিনাদ (অবশ্যই অস্তিত্ব) দোয়াল্লিলনা (বিপথগামী, গোমরাহী, পথভ্রষ্টদের)।

□□এবং যদিও তোমরা ছিলে পূর্ব হইতে বিপথগামী।

□□এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রভুর দেওয়া তথা আল্লাহর দেওয়া ফজিলত তথা অনুগ্রহ তালাশ করার মাঝে কোনো পাপ নেই। জাহেলিয়াতের যুগে উকাজ, মজিননা এবং জুলমাজাজ নামে তিনটি বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা হতো। মুসলমানেরা সেই সব বাজারগুলোতে ব্যবসা করতে গভির্মাসি করতো। তাই আল্লাহ বলছেন যে, যে-কোনো বাজারেই হোক অথবা যে-কোনো স্থানেই হোক, অনুগ্রহ তালাশ করার মাঝে কোনো প্রকার গুনাহ নাই। 'মাশযেরেল হারাম'-এর নিকটে এ-জন্যই আল্লাহ জিকির করতে বলছেন যে, হজের মধ্যমণিটি হলো আরাফাত। হজের মধ্যমণি যে আরাফাত ইহা মহানবিও তিন-তিনবার বলেছেন তাই আমরা আরাফাত নামক স্থানটির আরও কয়টি নাম দেখতে পাই, যেমন - মাশআরুল আকসা এবং জাবালুর রহমত এবং ইলাল-ও বলা হয়ে থাকে।

হাকিকি হজের কথা বলতে গেলে, যাদের ইচ্ছিয়গুলি পবিত্র হয়ে গেছে তারাই 'মাশযেরেল হারাম' তথা 'পবিত্র ইচ্ছিয়সমূহ'। যারা তাদের ইচ্ছিয় হতে দুনিয়ার লোভ-মোহ হারাম করে পুতপবিত্র হয়েছেন তারাই 'মাশযেরেল হারাম'। বিষয়-মোহের অজ্ঞানতা দূর করে দেবার সাধনা এবং ছয় রিপূর মোহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রচেষ্টাটির নামই হলো হাকিকি হজ।

১৯৯. সম্মা (তারপর) আফিদ (তোমরা অন্যদিকে ফির, তোমরা প্রবাহিত কর) মিনু (হইতে) হাইস (যেখানে, সেখানে) আফাদান (সে ফিরিয়া গেল, সে পৃথক হইয়া গেল, পানি ঢালিয়া দেওয়া, উপর হইতে পানি পড়িয়া প্রবাহিত হওয়া) নাস (মানুষেরা, লোকেরা) ওয়া (এবং) ইস্তাফির (তোমরা ক্ষমা চাও, তোমরা ক্ষমা চাও) আলাহ (আল্লাহ)।

□□তারপর তোমরা অন্যদিকে ফির যেখান হইতে ফিরিয়া গেল মানুষেরা এবং তোমরা ক্ষমা চাও আল্লাহর (কাছে)।

+ ইন্নাল্লাহা (নিশ্চয়ই আল্লাহ) গাফুর (ক্ষমাশীল) রহিম (রহিম)।

□□নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল রহিম।

□□এই আয়াতে অন্যদিকে ফেরার কথাটিতে বোঝানো হয়েছে যে, শেরেকের আবজনা যেন মাথায় জমা হতে না পারে, বরং খান্নাসের মোহময় জটলা হতে মন মহাশূন্যতার মাঝে আগমন করে। যারা মোহের সঞ্চয় হতে খালি হয়ে যায় তোমরাও সেরকম খালি হয়ে যাবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকো। এই মোহমায়ার মধ্যে পুনরায় যাতে না জড়ানো হয় তারই জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তবেই আল্লাহকে ক্ষমাশীল 'রহিম'-রূপে পাবে। মোহমুক্ত হৃদয় ও মন না হলে আল্লাহকে 'রহিম'-রূপে পাওয়া যায় না, বরং 'রহমনি'-রূপেই পাওয়া যায়।

২০০. ফাইজা (সুতরাং যখন) কাদাইতুম (যখন তোমরা পূর্ণ করিয়া ফেল, তোমরা সমাপ্ত কর, তোমাদের ধর্মনিষ্ঠান সম্পন্ন কর, যখন তোমরা নামাজ শেষ করিয়া ফেল) মানাসিকাকুম (তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি, তোমাদের হজের অনুষ্ঠানাদি) ফাজ্জকুল্লাহা (সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিকির কর) কাজ্জিকরিকুম (ওইরূপভাবে তোমরা জিকির কর, ওইরূপভাবে তোমরা উপদেশ দাও, ওইরূপভাবে তোমরা আলোচনা কর) আবাবাকুম

(তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে) *আত্ত* (অথবা) *আশাদ্দা* (শক্ত এবং কঠিন, অধিকতর মনেপ্রাণে) *জিক্রান* (জিকির)।

☐☐ সুতরাং যখন তোমরা পূর্ণ করিয়া ফেল তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি সুতরাং তোমরা আলাহর জিকির কর, ওইরূপভাবে তোমরা জিকির কর, তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে অথবা শক্ত এবং কঠিন জিকির।

+ *ফামিনান্নাসি* (সুতরাং মানুষদের মধ্য হইতে) *মাই* (যাহারা) *ইয়াকুল* (বলে) *রাব্বানা* (হে আমার রব) *আতিনা* (আমাদেরকে দাও) *ফিদদুনিয়া* (দুনিয়ার মধ্যেই) *ওয়া* (এবং) *মাই* (নাই) *লাহ* (তাহাদের জন্য) *ফিলআখিরাতি* (আখেরাতের মধ্যে) *মিনখালাকিন* (কোনো অংশ)।

☐☐ সুতরাং মানুষদের মধ্য হইতে যাহারা বলে, হে আমাদের রব আমাদেরকে দাও দুনিয়ার মধ্যেই এবং নাই তাহাদের জন্য আখেরাতের মধ্যে কোনো অংশ।

☐ এই আয়াতটির ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকম করে দিয়েছেন, সুতরাং আমার দেওয়া ব্যাখ্যাটির কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে উহা পাঠকদের হাতেই তুলে দিলাম। অনেকেই এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে মেরাজি হজের কথাটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। অথচ এই আয়াতে মেরাজি এবং হাকিকি উভয় হজের বিদ্যমান গুরুটিও পেলান না। বারবার চেষ্টা করেও প্রচলিত তফসিরকারকদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যদিও শানে নজুল-এ মেরাজি হজের ঘটনাগুলো এসে পড়ে, কিন্তু সার্বজনীনতার প্রশ্নে মেরাজি হজের কথাগুলো এখানে তুলে ধরার গুরুত্ব কতখানি উহা আমার জানা নাই। যারা জানেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 'কাজা' শব্দটির অর্থ হলো বিচারের রায় ঘোষণা করা। কিসের বিচার? কেন এই বিচার? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরটি হলো, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যে-খান্নাসরুপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে উহাকে কে কতটুকু তাড়িয়ে দিতে পেরেছে সম্ভবত এই বিষয়েরই বিচার সম্পন্ন করাটিকে বোঝানো হয়েছে। যে-মায়ার বন্ধনে প্রতিটি মানুষ আচ্চেপ্টে বাঁধা আছে সেই মায়ার বন্ধনের মূল বিষয়টি হলো প্রত্যেকের নিকটআয়ীদেরকে স্মরণ করা এবং স্মরণে রাখা। এই বন্ধনটিকে ছিন্ন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কিন্তু যারা আলাহর জিকিরে তথা স্মরণে দৃঢ় এবং শক্ত ভূমিকাটি পালন করতে পারে তাদের জিকিরটি কায়েম হয়ে যায় তথা স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রতিটি মানুষ ভালো করেই জানে এবং বোঝে যে আপন পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যার আত্মীয়তার বেঁটনাটি যে কত শক্ত এবং দৃঢ় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ মৃত্যু নামক ঘটনা দ্বারা প্রত্যেককেই অপর হতে আলাদা হয়ে যেতে হয়। এত বড় নির্মম সত্যটি জানবার পরেও, বুঝবার পরেও জানা হয় না, বোঝা হয় না। কেন? এটাই দুনিয়ার বন্ধনের একটি অতি আকর্ষণীয় মায়া। এই মায়াটি ত্যাগ করে আপন হৃদয়ে আলাহকে স্থান দেওয়া মোটেই সহজ কথা নয়। অথচ এই আয়াতের শেষে যারী বলে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া' তারাই নিশ্চিত ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়। আবার লক্ষ করুন, অন্যত্র বলা হয়েছে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া'র সঙ্গে 'হাসানাতাও' শব্দটি যোগ করে দিলেই পতনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। 'ফিদদুনিয়া' বললেই ধ্বংস অথচ 'ফিদদুনিয়া'র সঙ্গে 'হাসানা' শব্দটি যোগ করলেই ধ্বংসের রূপটি আর থাকে না। কারণ 'হাসানা' শব্দটির অর্থ হলো সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই সৌন্দর্যমণ্ডিত, দুনিয়াটি, চাইবার শিক্কাটিও আলাহ নিজেই দিয়েছেন। সুতরাং 'হাসানা' তথা সৌন্দর্যমণ্ডিত শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং বহুবিস্তৃত। সুতরাং চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই পদে-পদে ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। দুনিয়া চাও, কিন্তু চাইবার সময় বলতে হবে সৌন্দর্যমণ্ডিত দুনিয়া চাই। যদি সৌন্দর্যমণ্ডিত শব্দটি বাদ দিয়ে দুনিয়া চাও তাহলে তুমি 'মুরদুদ'। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে,

‘আততালেবুদ্দুনিয়া মরদুদ’ তথা যে বা যিনি কেবল দুনিয়াই চাইল, সে বা তিনি একজন মরদুদ তথা শয়তানের একটি বিশী রূপ।

পরিশেষে আরেকটি কথা না বললেই নয় যে, এই আয়াতটিকে মেনজাজি হজ পালনের অনুষ্ঠানের বলয়ের মধ্যে অনেক তফসিরকারক এনে ফেলেন, কারণ আয়াতের ইবহ অর্থটি করতে গেলে হজ পালনের অনুষ্ঠানের নাম-গন্ধটিও পাওয়া যায় না, কিন্তু শানে নজুলের ওপর ভিত্তি করেই আনুষ্ঠানিক হজ পালনের বিষয়টিকে সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। এভাবেই হয়তো কোরান-এর প্রতিটি সার্বজনীন সত্য কথাগুলোকে সংকীর্ণতার বলয়ে অবস্থিতি করে রাখে। পরিশেষে সংকীর্ণ দর্শনটি শেকড় গেড়ে বটবৃক্ষের মতো ডালপালা প্রসারিত করে থাকে এবং সার্বজনীন সত্য দর্শনটিকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। ইহাই নিয়তির নিম্নম পরিহাস। কারণ এই সত্য কথাটি বলতে গেলে আপনাকেই পদে-পদে অপমানিত হতে হবে।

২০১. ওয়া (এবং) মিনহম (তাহাদের মধ্যে) মাই (যাহারা) ইয়াকুল (বলে) রাব্বানা (হে আমাদের রব) আতিনা (তোমাদেরকে দাও) ফিদদুনিয়া (দুনিয়ার মধ্যে) হাসানাতাও (সুন্দর, মঙ্গল, নৈক, নেয়ামত, উত্তম, সঠিক, কল্যাণ, শুভ, প্রচুর, পর্যাপ্ত) ওয়া (এবং) ফিল (মধ্যে) আখিরাত (আখেরাতের) হাসানাতাও (অর্থ আগে দেওয়া হয়েছে) ওয়া (এবং) কিনা (আমাদেরকে রক্ষা করো, আমাদেরকে বাঁচাও, আমাদেরকে পরিদ্রাণ করো, আমাদের উদ্ধার করো, আমাদের নিস্তার করো, আমাদের সংরক্ষণ করো) আজাবা (শাস্তি, আজাব, যন্ত্রণা, উৎপীড়ন, সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ) নার (আপ্তন, অগ্নি)।

এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দাও দুনিয়ার মধ্যে হাসানাত এবং আখেরাতের মধ্যেও হাসানাত দাও এবং আমাদেরকে বাঁচাও আপ্তনের আজাব হইতে।

২০২. উলাইকা (উহারাই তাহারা, তাহারা সবাই) লাহম (তাহাদের জন্য) নাসিবুন (অংশ, হিস্যা) মিমমা (যাহা) কাসাবু (তাহারা উপার্জন করিয়াছে)।

উহারাই তাহারা, তাহাদের জন্য রহিয়াছে অংশ যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে।

+ ওয়া (এবং) আলাহ (আলাহ) সারিউল (তাড়াতাড়ি, দ্রুত, শীঘ্র) হিসাব (হিসাব, গণনা, জমারখরচ, মূল্যবিচার)।

এবং আলাহ তাড়াতাড়ি হিসাব লইতে (সকল)।
যাদের চাওয়া-পাওয়াটি সৌন্দর্যমণ্ডিত তথা নিখুঁত অথবা দায়েমি সালাতমণ্ডিত তারা জাহান্নাম বিষয়ে সর্বসময়ে সজাগ থাকেন। তাই তারা জাহান্নামের জ্বালা-যন্ত্রণা হতে মুক্তি চান। তারা দুনিয়া ও আখেরাত তথা জাহান্নাম ও জান্নাত এই দুটো বিষয়ের প্রশ্নে ধর্ম-বিষয়ে সৌন্দর্যের অনুশীলনের প্রচেষ্টায় রত থাকেন। তাই তাদের এরকম কর্মকাণ্ড হতে আখেরাতের জন্য উপার্জন হতে একটি অংশ থাকে। কারণ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সব রকম কর্মফল আলাহ অতি তাড়াতাড়ি দান করে থাকেন। পরিশেষে যারা অন্তরটিকে কলুষমুক্ত করে পরিব্র হওয়ার অনুশীলনে নিয়োজিত, জিহ্বার মাঝে বোবা ভাষায় আলাহর জিকিরে মগ্ন এবং ধৈর্যধারণের ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সব রকম মঙ্গল পাবার সম্ভাবনাটি আছে এবং কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করারও সম্ভাবনাটি থেকে যায়। এ জন্যই সম্ভাবনা শব্দটি ব্যবহার করলাম যে আলাহর বিশেষ রহমত ছাড়া এই সমস্ত ব্যুৎপাদন হতে মুক্তি পাওয়াটি মোটেই সম্ভবপর নয়। আরও উল্লেখ করার বিষয়টি হলো, এরা আমানু, এরা লাউয়ামা নফসের অধিকারী তথা

জেহাদে রত থাকে। নিঃসন্দেহে এই প্রকৃতির মানুষেরা অতি উন্নত মানের আম্মান, কিন্তু ভুলেও ইহারা মোমিন নহে। অনেকে ভুল করে এদেরকে 'মোমিন' বলে আখ্যায়িত করার দরুন কোরান-এর ব্যাখ্যাগুলো অবশেষে লেজে-গোবরের অবস্থা হয় তখনই উল্টা-পাল্টা দোহাই, এটা-সেটার পংক্ত দলিলগুলো হাজির করতে চায় এবং করে। এ জন্যই মহানবি বলেছিলেন যে, আল এলমুল হেজাবুল আকবর - তথা এই জ্ঞানই কখনও-কখনও আল্লাহকে পাবার পথে সবচেয়ে বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। আম্মরা দেখতে পাই, জ্ঞান মানুষকে যে-রকম বিনয়ী করে তোলে আবার এই জ্ঞানই মানুষকে ভয়ঙ্কর অহংকারী বানিয়ে ছাড়ে।

২০৩. ওয়া (এবং) ইজ্জুক (তোমরা জিকির কর, সংযোগ-সাধনা কর) আলাহা (আল্লাহর) ফি (মধ্যে) আইয়ামিন্ (দিনগুলিতে) মাদদাতিন্ (গোনা কয়েকটি দিন, অল্প কয়েক দিন, নির্দিষ্ট সংখ্যক, গণিত, যাঁহা গণনা করা হইয়াছে, গণনা করা কয়েকটি দিন)।

□□ এবং তোমরা জিকির কর আল্লাহর গণিত দিনগুলির মধ্যে।

+ ফাম্মান্ (সূতরাং যে) তাআজ্জালান্ (সে জলদি করে, সে তাড়াহুড়া করে, সে তাড়াতাড়ি করে) ফি (মধ্যে) ইয়াওমাইনি (দুই দিনের) ফালান্ (সূতরাং নাই) ইস্মান্ (কোনো পাপ, কোনো গুনাহ) আলাইহি (তাহার উপর)।

□□ সূতরাং যে তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যে সূতরাং নাই কোনো গুনাহ তাহার উপর।

+ ওয়া (এবং) মান্ (যে) তাআখখারান্ (সে পিছে পড়িয়া থাকিল, সে পিছে থাকিল, সে দেরি করিল, সে বিলম্ব করিল) ফালান্ (সূতরাং নাই) ইস্মান্ (কোনো পাপ, কোনো গুনাহ) আলাইহি (তাহার উপর) লিমানিত্ (ইহা তাহার জন্য) তাকু (যে তাকওয়া করে, যে তাকওয়া অবলম্বন করে)।

□□ এবং যে দেরি করে সূতরাং নাই কোনো গুনাহ তাহার উপর ইহা তাহার জন্য যে তাকওয়া (অবলম্বন) করে।

+ ওয়া (এবং) ইততাকু (তাহারা ভয় পাইয়াছে, পরহেজগারি অবলম্বন করিয়াছে, তাকওয়া কর) আলাহা (আল্লাহর) ওয়া (এবং) ইলান্ (তোমরা জানিয়া রাখ) আননাকুম্ (নিশ্চয়ই তোমাদেরকে) ইলাইহি (তাহার দিকে) তুহশাকুন্ (হাশর [একত্রিত] করা, সমবেত হওয়া)।

□□ এবং তাকওয়া কর আল্লাহর এবং জানিয়া রাখ যে তোমাদেরকে তাঁহারই দিকে একত্রিত করা হইবে।

□ এই আয়াতে মেজাজি হুজ পালনের পর তিন দিন মক্কাতে থাকবার অবশ্য পালনীয় নির্দেশটি রয়েছে, কিন্তু যদি একান্ত প্রয়োজনের কারণে কেহ দুই দিন অথবা তিন দিন পরে চলে আসে তবে তার উপরে কোনো অপরাধ বা পাপটি বর্তাবে না যদি সে মোস্তাকি হয়ে থাকে। যদিও ধর্মীয় পরিভাষায় ইহাকে 'আইয়ামে তাশরিক' বলা হয়। এই তিনটি দিন আন্তর্জাতিক ভাব ও মনের কথা বিনিময় করার এবং ভাই-ভাইয়ের সম্পর্কটি মজবুত করার জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অথচ এই দিনগুলিকে কেন গণনার দিন বলা হলো? যদি সাধক তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে না থাকে তবে ধ্যানকেন্দ্রিক নিজের পরিবেশ হতে মেলামেশার পরিবেশে প্রবেশ করলে গণনা করে রাখাটি কষ্টকর হবে। সেই অবস্থায় আবার তাকওয়ার অনুশীলনের আদেশটি দেওয়া হয়েছে।

২০৪. ওয়া (এবং) মিনান্ (মধ্যে) নাসি (মানুষ) মাই (যে, যিনি) ইউজিবুকান্ (তোমার পছন্দ লাগিবে, তোমার ভালো লাগিবে, তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া তুলিবে, তোমাকে চমৎকৃত করে) কাউলুহ (তাহার কথাবার্তা) ফি (মধ্যে) হায়াতি (জীবনে) দুনিয়া (দুনিয়া) ওয়া (এবং) ইউশহিদ্ (সে সাক্ষী রাখে)-লাহা (আল্লাহ) আলা (উপর) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) কালবিহি (তাহার কলবে, তাহার অন্তরে) ওয়া (এবং) ইয়া (সে)

আলাদুদ (কঠিন, ঝগড়াটে - ইহা 'লাদুদুন' শব্দ হইতে আগত। 'লাদুদুন' শব্দের অর্থ ঝগড়া করা) খিসাম্মি (ঝগড়া করা, ঝগড়াকারী)।

এবং মানুষের মধ্যে যে তোমাকে অবাক করিবে তাহার কথাবার্তা দুনিয়ার জীবনের মধ্যে এবং সে সাক্ষী রাখে আল্লাহর উপর যাহা তাহার কলবের (অস্তরের) মধ্যে আছে এবং সে ঝগড়াটে, ঝগড়াটে।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, এমন বৈশিষ্ট্য কিছু মানুষ পাওয়া যায় যারা এই দুনিয়ার জীবনে তাদের কথাবার্তায় মানুষদেরকে ধানিয়ে দেয় এবং চমৎকাবিত্বের ফাদে ফেলে দিতে চায়, কারণ এদের কাছে দুনিয়ার পার্থিব জীবনটাই সব কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং ধর্মটি যে মোখিক এবং মোটেই আন্তরিক নয় এই জন্য এই প্রকৃতির লোকেরা বারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে কথার জাল বুনে যায়। এদেরকেই আরবি ভাষায় কঠিন ঝগড়াটে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঝগড়াটে' শব্দটি এ জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে যে, আখেরাতের বিষয়টি উত্থাপন করতে গেলেই এদের আসল রূপটি ধরা পড়ে এবং তখনই ঝগড়া শুরু করে দেয় এবং এই ঝগড়াটি যেনতেন প্রকারের ঝগড়া নয়, বরং কঠিন ঝগড়াটে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা মুখে-মুখে আল্লাহর দোহাই দেয় তথা মানুষকে বুঝাতে চায় যে তারা কত ধার্মিক আসলে এই জাতীয় মানুষদের ধর্মের অনুসরণ-অনুকরণটি দেখতে ভালোই মনে হয়, আসলে এরই ধর্মের লেবাস পরিধান করে ধর্ম-বিষয়টিকে হালকা করে তোলে এবং জনসাধারণ এইসব লোকের এ হেন আচরণ দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কথিত আছে যে আখুনাস ইবনে শরিক সাকফি নামক একজন এই জাতীয় লোক মহানবির নিকট এসে মুসলমানের জাহির করতো এবং এটাসেটা বলতো, কিন্তু মনেপ্রাণে এই লোকটি ছিলো কট্টর ইসলাম-বিরোধী। ধর্মের লেবাস পরিধান করে হজরত খুবাইর এবং তার সঙ্গীসাথীদেরকে ধর্মের নামে প্রচারিত করেছিল এবং পরিশেষে তাদেরকে বাজি নামক একটি স্থানে এনে শহিদ করে ফেলে। হজরত খুবাইর এবং তার সঙ্গীসাথীরা এইসব ধর্মীয় লেবাসধারী এবং অনুষ্ঠানিক ধর্মপালনকারী মোনাফেকদেরকে সরলভাবে বিশ্বাস করেছিল এবং সেই সরল বিশ্বাসের পরিণতিটি যে কী নিম্নম, কী নিহর ছিল তা ইসলামের ইতিহাসে লিখা আছে।

২০৫. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) তাওয়াল্লাহ (ফিরিয়া আসা, ঘটিয়া যাওয়া, ফিরিয়া লওয়া, কর্তৃত্ব পাওয়া) সাআ (সে চেষ্টা করে, সে দোঁড়ায়, সে কাম্বাই করে) ফিল (মধ্যে) আরদি (পৃথিবী, জমিন, দেহ) লিউউসিদা (ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য) ফিহা (উহার মধ্যে) ওয়া (এবং) ইউউহলিকাল (ধ্বংস করিতে) হারসা (শস্যক্ষেত্র) ওয়া (এবং) নাস্লা (আওলাদ, বংশ)।

এবং যখন সে কর্তৃত্ব পায় সে চেষ্টা করে দেহের মধ্যে (এখানে পৃথিবী শব্দটি ব্যবহার করলে অর্থের গভর্মিল হয়ে যায়) ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য উহার মধ্যে এবং ধ্বংস করে শস্যক্ষেত্র এবং আওলাদ।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) লা (না) ইউউহিবুল (ভালোবাসা) ফাসাদা (ফ্যাসাদ, ঝামেলা, ঝগড়া)।

এবং আল্লাহ ভালোবাসেন না ফ্যাসাদ (ঝামেলা, ঝগড়া)।

এই আয়াতটিতে জাহের এবং বাতেনের এমনই মিলন ঘটানো হয়েছে যে, ইহার ব্যাখ্যা লেখাটা খুবই কষ্টকর। মানুষ যখন আপন কর্তৃত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে তখন সেই কর্তৃত্বই অনেক রকম ফ্যাসাদের জন্ম দেয়। কর্তৃত্ব যখন মানুষ আল্লাহর দেওয়া বলে ভুলে যায় তখনই কর্তৃত্বটি সর্বঅবস্থায় কলুষিত হয়ে পড়ে। এই কথাটির দলিল দেবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আপন কর্তৃত্ব মানুষকে কতটুকু জঘন্য উন্মাদ এবং লালসার ঘেরাটোপে বেধে ফেলে

ইতিহাসে তার ভূরিভূরি প্রমাণ রয়ে গেছে। জীবনের সব রকম সৌন্দর্য এদের হাতেই বিনষ্ট হয় এবং এই জাতীয় অংশীবাদী মানুষের রক্তের স্রোতধারা হতে যে-আওলাদের জন্ম হয় এরাও অনেক ক্ষেত্রে মানবৈতর পর্যায়ে নেমে আসে। তবে ইহাও সত্য যে, আওলাদ মাতা এবং পিতার আর্ট-আনু করে পায় বলে অনেক সময় মাতার মহৎপ্রণে সন্ধানটিও আধাআধি চরিত্রটি পায়। সুতরাং যেমন বৃক্ষ তেমন বীজ এই কথাটি মোটেই খাটে না, যদিও কথাটি শুনতে ভালো লাগে। বৃক্ষ এবং মানুষের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইহা অনেক গবেষকই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রহস্যটি না বুঝে বলে থাকেন। অবশ্য এই বলার মাঝেও দোষণীয় করতে চাই না।

২০৬. ওয়া (এবং) ইউজা (যখন) কিল্লা (বলা হয়) লাহ (তাহাকে) তাকি (ভয় কর) আলাহা (আলাহকে) আখাজাতহ (ইজ্জত, মানসন্মান) বিলুইসুমি (পুনঃসহিত, পাপের সহিত) ফাহাসবুহ (সুতরাং তাহার জন্য যথেষ্ট) জাহান্নাম (জাহান্নাম)।

এবং যখন বলা হয় তাহাকে, ভয় কর আলাহকে তাহাকে ধরিল ইজ্জত পাপের সহিত সুতরাং তাহার জন্য যথেষ্ট জাহান্নাম।

+ ওয়া (এবং) লাবিসা (অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট) মিহাদ (বিছানা, ঠিকানা, অবস্থান করা, সমুদল স্থান, ওজর শোনা, ওজর গ্রহণ করা)।

এবং অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট বিছানা।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, যে-ব্যক্তি সামাজিক সন্মানটিকে তুলে ধরে, এটা যে নিছক সাময়িক মিথ্যার মায়া সে তখন তা বুঝতে পারে না। কারণ আলাহর প্রতি যে ভয় করাটি কর্তব্য ছিল, উহা ভুলে যাবার পরই এ-রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তাই আলাহ কোরান-এ কী অপূর্ব ভাষায় বলছেন যে, সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আবার আলাহ বলছেন, 'কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।' অনেক সময় দুনিয়াতে বাস করেও এই নিকৃষ্ট ঠিকানাটির হাতে-হাতে প্রমাণ পাওয়া যায় আর মূরে যাবার পরে কী হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দুনিয়াতে এই জাতীয় মানুষদেরকে দুনিয়াতেই দেখতে পাই কত অস্থির, মাথার মধ্যে কত চিন্তা গিজগিজ করছে, ঘুম নাই, শান্তি নাই অথচ বাহ্যিক সব কিছুই আছে। এ যেন সব কিছু থেকেও কী এক অজানা বোবা বেদনায় তিলে-তিলে বোবার মতো ছটফট করা।

২০৭. ওয়া (এবং) মিনান (মধ্য হইতে) নাসি (মানুষদের) মাই (যে) ইয়াশরি (বিলাইয়া দেয়) নাকসাহব (তাহার নফস অর্থাৎ তাহার প্রাণ বা জীবন) ইবতেগা (চাওয়া, তাল্লাশ করা, সন্ধান করা) মারদাতি (পছন্দ করা, খুশি হওয়া, আনন্দ, সন্তুষ্টি, রাজি হওয়া) আলাহি (আলাহর)।

এবং মানুষদের মধ্য হইতে যে বিলাইয়া দেয় তাহার নফসকে (প্রাণকে) আলাহর সন্তুষ্টির সন্ধান।

+ ওয়া (এবং) আলাহ (আলাহ) রাউফুম (মহেরবান, দয়াবান, প্রেমবিগলিত) বিলুইবাহি (বান্ধাদের সহিত)।

এবং আলাহ বান্ধাদের সহিত মহেরবান (প্রেমবিগলিত)।

এই আয়াতে নফসকে তথা প্রাণকে আলাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে বিলিয়ে দেবার কথাটি বলা হয়েছে। যেহেতু মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করে সেই হেতু মানুষের নফসটি স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাচারী এবং ভালোমন্দ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মানুষের নফস হতে এই মন্দ জিনিসটিকে তথা এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে এবাদতের মাধ্যমে মুক্ত করে বিলিয়ে দিতে পারলেই আলাহ সেই বান্ধার উপর মহেরবান রূপে ধরা দেয়। বিষয় মান্ন একটি আর সেই বিষয়টি হলো, আপন নফস হতে খান্নাসকে মুক্ত করা। তাই কোরান এই খান্নাসকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে দেন বারবার অনেক রকম বাচনভঙ্গিতে। তবু মানুষ অনেক সময় বুঝেও বুঝে না, জেনেও

না জানার ভান করে দুনিয়ার বস্তুমোহের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে মুখে আল্লাহর নাম, লৌকিক উপাসনা আর উপবাসের মাধ্যমে বোঝাতে চায় যে আল্লাহর মেহেরবানী পাবার উপযুক্ত। আসলে আল্লাহই জানেন কে মেহেরবানী পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে আর কে করে নাই। এই যোগ্যতা মাপার মানদণ্ডটি নিজের হাতে তুলে নিলেই হয় বিরাট ভুল এবং মেকি আত্মতৃপ্তি পাওয়া। তাই আপন নফসকে বিলিয়ে দেবার অর্থটিই হলো নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটিকে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাসটিকে এবাদতের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্যটির অর্থ হলো নিয়ত। এই নিয়তই যদি অন্য রকম হয় তবে সব রকম এবাদত-বন্দেগি যে নিষ্ফলে পরিণত হয় সেই কথাটিও *কোরান*-এ বারবার আম্মাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ত যদি আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে তাহলে আম্মলগুলোও সং বা মতং হতে বাধ্য। এইরূপ মানুষদের সঙ্গে আল্লাহ যে মেহেরবান তথা প্রেমবিগলিত অবস্থায় ধরা দেন সেটা সেই নফসটিই (প্রাণটি) বুঝতে পারে যে-নফস আল্লাহকে পাবার জন্য ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে। ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ইহা সমাজকেন্দ্রিক নয়। যখন অধিকাংশ মানুষ আপন-আপন নফসটিকে (প্রাণটিকে) বিলিয়ে দেয় তখনই সমাজ-জীবনে সত্যিকার শান্তির ভাবসাম্যটি বজায় থাকে। নতবা জোর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই হিতে যে কখনো-কখনো বিপরীত হয়ে যায় তার ভুরি-ভুরি প্রমাণ প্রাচীন ইতিহাসে রয়েছে। আজও এর নগ্ন রূপটি দেখতে পাই।

২০৮, *ইয়া আইউহাল্ (ওহে) লাজিনা (যাহারা) আম্মানুদ (ইম্মান আনিয়াছ), খুলু (দাখিল হও, প্রবেশ কর, ভিতরে গমন কর) ফিস্ (মধ্যে) সিলমি (ইসলামের, আত্মসম্মপণের, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার) কাফ্ফাতান্ (পরিপূর্ণরূপে, সম্পূর্ণরূপে, পূর্বোপরিভাবে)।*

□□ওহে যাহারা ইম্মান আনিয়াছ, প্রবেশ কর ইসলামের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে।

+ *ওয়া (এবং) না (না) তাত্ তাবিউ (তোমরা অনুসরণ কর) খতয়াতিশ্ (পদাঙ্কগুলির, পদচিহ্নগুলির, পা ফেলার দাগগুলির) শাইতায়ানি (শয়তানের)।*

□□এবং তোমরা অনুসরণ করিও না শয়তানের পদচিহ্নগুলির।

+ *ইননাহ্ (নিশ্চয়ই সে) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) আদুউম্ (শত্রু, দুশমন) মুবিন্ (প্রকাশ্য, খোলাখলি, দৃশ্যমান)।*

□□নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য দৃশ্যমান (প্রকাশ্য) শত্রু।

□ এই আয়াতে বিশেষভাবে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো যে, অন্য কাহাকেও আল্লাহ আত্মদান না করে কেবলমাত্র যারা ইম্মান এনেছে তাকেরকেই ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে (দাখিল হতে) উপদেশ দিচ্ছেন। এখন প্রশ্ন আসে যে, ইম্মানদার হলোই কি ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হওয়া যায় না? *কোরান* তো সেই কথাটিই বলছে এবং এই আয়াতে তারই স্পষ্ট নিদর্শনটি দেখতে পাই। তা না হলে কেন ইম্মানদারদেরকে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার আদেশটি দেওয়া হয়েছে? সতরাং ইম্মানদার হওয়া এবং ইসলামে পরিপূর্ণরূপে পবেশ করাটি এক বিষয় নয়। যেমুন 'আম্মান' এবং 'মোমিন' দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই আম্মানকেই না বুঝে, না শুনে মোমিন বানিয়ে ফেলে। তারপরের আয়াতেই আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা কোনো অবস্থাতেই শয়তানের আনুগত্য করবে না তথা শয়তানকে অনুসরণ করবে না। যেহেতু প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই একটি করে শয়তান দিয়ে দেওয়া হয়েছে – এই কথাটি মহানবির একটি বিখ্যাত হাদিস, সেই শয়তানটি প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই অবস্থান করার দরুনই এই আয়াতে বলা হলো, তোমরা কোনোভাবেই

শয়তানের অনুসরণ করো না। **লোভ-মোহ-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ-অহঙ্কার** - এগুলোর মিলিত ফসলের নামই হলো শয়তান। শয়তান বিষয়টি এতই সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় যে কোনটা শয়তানের কাজ আর কোনটা শয়তানের কাজ নয় ইহা পরিষ্কারভাবে সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। **লোভ-মোহ-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ** এবং **অহঙ্কার** - এই ছয়টি একেকটি অতি শক্তিশালী ডিশ অ্যান্টেনা। এই ডিশ অ্যান্টেনাগুলো মন এবং মাথায় প্রতিনিয়ত কুমন্ত্রণার ফুক দিচ্ছে এবং এই কুমন্ত্রণার ফুক হতে বেঁচে থাকা চারটিখানি কথা নয়। এই লোভনীয় পিচ্ছিল কুমন্ত্রণাগুলো একটি সুন্দর মানুষকে যে পশুর চেয়েও অধম বানিয়ে ছাড়ে তার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বরং ইতিহাসই তার জুলন্ত সাক্ষী। তাই মহানবিকে এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার সঙ্গে কি একটি শয়তান দেওয়া হয়েছে?' মহানবি বললেন, 'হ্যা, আমার সঙ্গেও একটি শয়তান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উহাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি। এই কথাগুলো, এই আদেশ-উপদেশগুলো কখনই ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে মোটেই আবদ্ধ করা যায় না, যদিও ধর্মের নামে ধর্মীয় গবেষকেরা সংকীর্ণতার বৃত্তে ধরে রাখতে চায়। এই আয়াতে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হওয়ার আস্থানটি একটি সার্বজনীন আস্থান। পৃথিবীর যে-কেহ আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলেই এই আস্থানটি তথা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হওয়ার কথাটি প্রযোজ্য। এই আস্থান কোনো গণ্ডির বারান্দায় দাঁড়িয়ে গণ্ডির দর্শন প্রচার করা নয়, বরং সার্বজনীনতার বিশাল প্রান্তরে অবস্থান করে একটি সার্বজনীন বিশাল আস্থান। আবার বলা হয়েছে এই আয়াতে যে, এই শয়তানটি কিছু গোপন শত্রু নয়, বরং প্রকাশ্য শত্রু। মানুষ যদিও বুঝতে পারে যে কোনটা শয়তানের কাজ আর কোনটা শয়তানের কাজ নয়, তবু জেনেপ্তরে শয়তানের দেওয়া বিষটুকু পান করে ফেলে। তাই **কোরান**-এ বারবার আমাদেরকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, জেনে রাখ, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তথা কোনোদিন, কোনো কালেও তোমাদের মঙ্গল চাওয়া তো দূরে থাক, বরং অধঃপতনের শেষ সীমায় নিয়ে যাবে।

২০৯. **ফাইন্** (সূতরাং যদি) **জালালতুম্** (তোমাদের অধঃপতন, তোমাদের পদস্থলন, তোমরা ঠকুর খাইলে, তোমরা কাপিতে লাগিলে, তোমরা হোচট খাইলে) **মিম্বাদি** (ইহার পরেও) **মা** (যাহা) **জাআতকুমন্** (তোমাদের কাছে আসিয়াছে) **বাইইনাহ্** (দলিল-প্রমাণাদি, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা) **ফাআলাম্** (সূতরাং তোমরা জানিয়া রার্থ) **আন্না** (যে)-**আল্লাহ্** (আল্লাহ) **আজ্জিকুন** (সর্বোচ্চ, মহাপরাক্রমশালী, অপরাহ্মেয়, শক্তিশালী, জবরদস্ত, মূল্যবান, অনুকরণপ্রিয়, কঠিন, মিশরের বাদশার উপাধি) **হাকিমুন** (হেকমতের অধিকারী, বিজ্ঞানময়, বিচারক, বিজ্ঞানময় বিচারক, মহাবিজ্ঞ, হেকমতওয়ালা)।

□□ সূতরাং যদি তোমাদের অধঃপতন হয় ইহার পরেও যাহা তোমাদের কাছে আসিয়াছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা (দলিল-প্রমাণাদি) সূতরাং তোমরা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ সর্বোচ্চ হেকমতের অধিকারী।

□ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে তোমাদের কাছে এত পরিষ্কার দলিল-প্রমাণ আসার পরেও কেমন করে তোমাদের অধঃপতন হয়? ভাবতেও অবাক লাগে কতভাবে, কত বাচনভঙ্গিতে তোমাদেরকে শয়তান বিষয়টিতে বারবার সাবধান করে দেবার পরও পতনের দিকেই ধাবিত হও। শয়তানের পথগুলো আপাতঃ চাকচিক্যময়, লোভনীয় এবং আকর্ষণীয়। তাই এই আকর্ষণের জালে আটকা পড়ে অসহায় মাহের মতো হা করে মৃত্যুবরণ করতে হয়। যারা নিজের ভেতরে অবস্থান করা শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পেরেছেন কেবল তাদেরকেই বলা হয় ইনসানে কাম্মেল, পীরে মোগা, কাম্মেল পীর, সম্ম্যক গুরু ইত্যাদি। এই ইনসানে কাম্মেলের নিকট বহুরের পর বহুর অবস্থান করে কেমন করে শয়তানটিকে মুসলমান বানানো যায় অথবা তাড়িয়ে দেওয়া যায় সেই

শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে বারবার কেয়ামতের মুখোমুখি হতে হবেই। তাই হজরত বাবা মুনসুর হাল্লাজের পীর হজরত বাবা জোনায়েদ বোগদাদী এই বলে সবাইকে উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, যার পীর নাই, শয়তানই হলো তার পীর।

২১০. হাল (কি) ইয়ানজুরুনা (তাহারা দেখে, তাহারা অপেক্ষমান, তাহারা হয়তো দেখিতেছে, তাহারা দেখিতে থাকিবে, তাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা দেখিবে) ইল্লা (একমাত্র) আন (যে) আইয়াতিয়াহমুল (তাহাদের উপর আসে)-লাহ (আলাহ) ফি (মধ্যে) জুলালিন্ (ছায়ার) মিনাল্ (হইতে) গামামি (মেষ, শাদা মেষ) ওয়াল (এবং) মালাইকাতু (ফেরেশতারা) ওয়া (এবং) কুদিয়া (মীমাংসা করা, ফয়সালা করিয়া দেওয়া, বয়সের মেয়াদ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইত, ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত) আমরু (কাজের, সমস্ত কর্মের, সববিষয়ে, সব কাজের)।

তাহারা কি দেখে যে একমাত্র তাহাদের উপর আসে আলাহ ছায়ার মধ্যে মেষ হইতে এবং ফেরেশতারা এবং মীমাংসা করিয়া দিবেন কাজের।

+ ওয়া (এবং) ইলা (দিকে)-লাহি (আলাহর) তবজাউল্ (প্রত্যাবর্তন করা হয়, ফিরিয়া আসা) উমুরু (সকল বিষয়, সব ব্যাপার)।

এবং আলাহর দিকে ফিরিয়া আসিবে সকল বিষয়।

এই আয়াতে প্রশ্ন করা হচ্ছে এই বলে যে, মেঘের ছায়ার মধ্যে আলাহ এবং ফেরেশতাগণ আসবেন এবং মানুষের সকল প্রকার কাজের মীমাংসাটি করে দেবেন। এখানে আলাহকে আসতে হলে জাতরূপেই আসতে হয়, কিন্তু জাতরূপে আলাহ তার সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে দুইটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও অবস্থান করেন না, সেই হেতু মেঘের ছায়ার মধ্যে আলাহর আগমনটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ফেরেশতা যেহেতু সেকাতি (প্রণবীচক) নুরের তৈরি সেই ফেরেশতারা যদি সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও আগমন করেন তাহলে অবাক হবার কিছুই নাই, কারণ ফেরেশতা যেখানে-সেখানে, যখন-তখন যে-কোনো রূপ ধারণি করে আগমন করতে পারেন সেটা আমরা আগেই জেনে এসেছি, কিন্তু আলাহর জাতরূপে আসাটি কল্পনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, কারণ আলাহ জাতরূপে তিনটি স্থানে অবস্থান করেন : প্রথমটি লা-মোকাম, দ্বিতীয়টি জিনের অন্তর এবং তৃতীয়টি মানুষের অন্তর। এখানে আলাহ অন্তরের ভেতর অবস্থান করেন নাকি শাহারগের নিকটে অবস্থান করেন এই মতভেদটি কোনো মতভেদই নয়, কেবল বলা যায় একটু এদিক-সেদিক চিন্তা করা। মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের সুরাহা যদি আলাহই করে দেন তাহলে ভালো-মন্দ বলে যে-কথাটির প্রচলন আছে উহা থাকে না, কারণ আলাহ কখনই মন্দ কাজ করেন না। তাছাড়া মানুষের সব কাজগুলো মীমাংসা করে দিতে গেলে পরীক্ষা করার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে দাড়ায়। মানুষের কর্মকাণ্ডের সুবিচার করার জন্য ফেরেশতাদের সঙ্গে আনবার আলাহর কোনো প্রয়োজন হয় না, বরং আমাদের সকল কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক নিয়মেই আলাহর দিকে ফিরে যায়। মুক্তিপথে অগ্রসর হতে চাইলে আমাদের কাজ-কর্মের আশ্রয়কেই সুসম্পন্ন করতে হবে এবং এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত ধারণা যে আলাহ তার দলবলসহ এসে সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে দেবেন।

২১১. সাল (তুমি জিজ্ঞাসা করো, তুমি জানিতে চাও, তুমি প্রশ্ন করো) বানি (বানি) ইসরাইলা (ইসরাইলদেরকে) কাম (কত, কী পরিমাণ) আতাইনাহম্ (আমরা তাহাদেরকে দিয়াছি) মিন (হইতে) আয়াতিম্ (আয়াত, নিদর্শন) বাইয়েনাতিন (দলিল, প্রমাণাদি, সুস্পষ্ট)।

বানি ইসরাইলগণকে জিজ্ঞাসা করো, আমরা তাহাদেরকে কত আয়াত (এবং) সুস্পষ্ট দিয়াছি।

+ ওয়া (এবং) মাউ (যে) ইউবাদ্দি (পরিবর্তন করে, বদলাইয়া দেয়) নিমাতা (নেয়ামত, অনুগ্রহ) আলাহি (আলাহর) মিম্বাদি (তাহার পরে) মা (যাহা) জাআতহ (তাঁহার কাছে আসিয়াছে) ফাইননা (সুতরাং, নিশ্চয়) আলাহা (আলাহ) শাদিদুল (শক্ত, মজবুত, পাক্কা, কঠিন, কঠোর) ইকাব (শাস্তিদানে)।

এবং যে বদলাইয়া লয় আলাহর নেয়ামত তাহার পরে যাহা তাহার কাছে আসিয়াছে সুতরাং নিশ্চয়ই আলাহ শাস্তিদানে কঠোর।

এই আয়াতে বনি ইসরাইল শব্দের দু-রকম অর্থ করা যায় : একটি হলো সমগ্র বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করে এবং অপরটি হলো বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তাদেরকে লক্ষ করে। কারণ যারা সিদ্ধপুরুষ তথা কামালিয়াত হাসিল করেছেন তাঁরাই কেবল আলাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনের তথা আয়াতের তথা পরিচয়ের একমাত্র অধিকারী। আলাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের পরিচয় আমজনতার পক্ষে জানা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই যদিও বনি ইসরাইল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তথাপি যারা বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের মাঝে সিদ্ধপুরুষ তথা কামালিয়াত হাসিল করেছেন তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা যায় এবং জিজ্ঞাসা করার কথাটি এসেছে। কারণ আলাহর নিয়ামত যারা বহন করেন তাঁরাই মহাপুরুষ তথা সিদ্ধপুরুষ তথা কামেল। এই মহাপুরুষদের আগমন চিরন্তন। কোনো কালের গণ্ডি দিয়েই এদের থামিয়ে দেওয়া যায় না তথা বিরতি ঘটে না। জীবনটিকে কাঁধে পরিচালিত করতে হবে তাঁহার শিক্ষাটি উপস্থিত মহামানব হতেই গ্রহণ করে নিতে হয়। এই মহামানবদের দেওয়া প্রেসক্রিপশনটি যারা কাটছাট করে নেয় অথবা বদলিয়ে নেয় তাদের পরিণতিটি যে কঠিন হবে ইহা সহজেই বোঝা যায়। আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে যে জিজ্ঞাসা করো। এই জিজ্ঞাসাটি কি মহানবিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে নাকি মহানবির অনুসারীদেরকে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে? যদি কেহ মনে করেন যে মহানবিকেই প্রশ্ন করা হয়েছে – তাতেও বলার কিছু নাই, আবার যদি কেহ মনে করে থাকেন যে ইহা মহানবির অনুসারীদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে – তাতেও বলার কিছু নাই। আবার পরক্ষণে কেহ যদি বলেন যে হজরত মুসাকে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দান করা হয়েছিলো – যেমন, হাতের তালুতে নূরানি আলোর আলক, লাঠি সর্প হয়ে যাবার মোজ্জা, সমুদ্রকে দুই টুকরা করা, খুব গরমের সময়ে মেঘের ছায়া দান এবং বেয়ারা উম্মতদেরকে বেহেশতি খানা খাওয়ানো এবং মান্না ও সালওয়া বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। আমভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে উপরে বলা শেষের অংশটি ভালো মানায়। আর যদি কেহ আলাহর রহস্যের নিদর্শনসমূহ জানতে চায় তাহলে বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ তথা কামেল পুরুষদের নিকট হতে জেনে নেবার কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং সিদ্ধপুরুষ সর্বকালে সর্বসময়ে সর্বস্থানে কেউ না কেউ অবস্থান করে থাকেন।

২১২. জুইইনা (সাজানো হইয়াছে, সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হইয়াছে, সজ্জা করা হইয়াছে, সুশোভিত করা হইয়াছে, পরিশোভিত করা হইয়াছে, চাকচিক্যময় করা হইয়াছে, প্রলুব্ধ করা হইয়াছে, মগ্ন করা হইয়াছে, লোভ দেখাইয়া বশে আনা হইয়াছে) লিল্লাজিনা (তাঁহাদের জন্য) কাফারুল (কুফরি করিয়াছে) হায়াতহ (জীবন) দুনিয়া (দুনিয়া, পার্থিব) ওয়া (এবং) ইয়াসখারুনা (ঠাট্টা করে, মজা করে, বিদ্রূপ করে, পরিহাস করে) মিনাল্লাজিনা (যাহারা) আম্বানু (ইমান আনিয়াছে)।

চাকচিক্যময় করা হইয়াছে তাহাদের জন্য (যাহারা) কুফরি করিয়াছে দুনিয়ার জীবনে এবং ঠাট্টাবিদ্রূপ করে যাহারা ইমান আনিয়াছে।

+ ওয়াল্ (এবং) লাজিনাত্ (যাহারা) তাকাও (তাকুওয়াকারীগণ, তাকওয়া অবলম্বন করা) ফাওকাহম্ (তাহাদের উপর) ইয়াওমান্ (দিনে) কিয়ামাত্ (কেয়ামতের)।

এবং যাহারা তাকওয়াকারী কেয়ামতের দিনে তাহাদের (কাফেরদের) উপর।

+ ওয়া (এবং)-লাহ্ (আল্লাহ) ইয়ারজুক্ (রেজেক দেন) মাই (যাহাকে) ইয়াশাহ্ (তিনি চান) বিগাহরি (বেহিসাব, অপরিমিত, অফুরন্ত, যাহা শেষ হয় না, ব্যতীত) হিসাবিন (হিসাব, গণনা)।

এবং আল্লাহ রেজেক দেন যাহাকে তিনি চান বেহিসাব রেজেক।

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, যারা কফরি করে তথা যারা কাফের তাদের দুনিয়ার জীবনটা একটা চাকচিক্যময় চোখ-ধাধানো জীবন। এই বাক্যটির অর্থ বোঝা মোটেও কোনো কষ্টকর বিষয় নয়, কিন্তু যারা কাফের তাদেরকেই দুনিয়ার পরিশোধিত জীবনটি দেওয়ার মাঝে কী এমন রহস্যটি লুকিয়ে আছে তা অধম লিখকের বুঝে এসেও আসতে চায় না। অনেক কথাই লিখা যায়, কিন্তু আত্মবিরোধের বাড়িতে না অবশেষে পরিণত হয় সেই ভয়ে উচ্চবাচ্য করছি না। তারপরে বলা হয়েছে, যারা ইমান আনে কাফেরেরা তাদেরকে ঠাট্টাবিদ্ভূপ করে। তাহলে কি ইমান আনার সঙ্গে-সঙ্গেই দুনিয়ার পরিশোধিত জীবনটির অবসান হয়ে যায়? এখানে আম্মানদের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মোমিনদের কথা বলা হয় নি। অনেক অনুবাদকু তো মাথায় গিজগিজ করা জ্ঞানের বহরের তৈলায় আম্মানকেও মোমিন বানিয়ে ফেলেন। আল্লাহ বলছেন আম্মান আর মাথা ভরা গিজগিজ করা জ্ঞানে আল্লাহর দেওয়া আম্মানকেই মোমিন বানিয়ে ফেলেন। সাবাস অনুবাদক, সাবাস! আপনাদের এরকম চোঙ্গা-ফোঙ্গা-মার্কি কত ডিজাইনের যে অনুবাদ কাগজের উপর বসি করে সুরল-সহজ কাচাগলা মানুষগুলোকে ভুল শিখিয়ে চলছেন তাহার হিসাবটি কি রেখেছেন? তারপরে এই আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাকওয়াকারী তাদের কেয়ামত কাফেরদের উপরেই থাকবে। এখানে বৈষয়িক মানমযাদাটিকে তাকওয়াকারীদের মানমযাদার চেয়ে নিচুতেই রাখা হয়েছে। তারপর এই আয়াতে বেহিসাব রেজেকের কথাটি বলা হয়েছে। এই বেহিসাব রেজেকটি মোটেও বৈষয়িক ধনসম্পদের রেজেক হতেই পারে না, কারণ সমগ্র দুনিয়ার ধনসম্পদের হিসাবটি আধুনিক কম্পিউটার অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে পারে। সতরাং সমগ্র দুনিয়ার সম্পদের যেখানে হিসাবটি করা যায় সেখানে বেহিসাব রেজেক বলতে আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যময় নেয়ামতপূর্ণ কদরতি রেজেক। এই কদরতি রেজেকটিকে কোনো হিসাব দিয়েই মাপা যায় না। পরিশেষে অপ্রিয় সত্য কথাটি হলো যে, যারা সত্যিই আল্লাহর নেকচ্য কামনা করেন তাদের দুনিয়ার জীবনটি চাকচিক্যময় হবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং শাদামাঠা অথবা আরেকটু উচ্চতর অবস্থান করার কথাটি আসতে পারে। তারপরেও একটি কথা থেকে যায় যে, কামনা পবিত্র কর্মকে কলুষিত করে এবং কলুষিত প্রতিটি কর্ম একেটি বন্ধন। কর্মের ভেতরে যখন কামনাটি আর থাকে না তখনই কর্মটি বন্ধন না হয়ে আশাবাদে পরিণত হয়। সতরাং কোন কর্মটি কামনার ঘোমটায় ঢেকে আছে আর কোন কর্মটি কামনার ঘোমটায় ঢাকা নাই এই বিষয়গুলো তারাই বুঝতে পারেন যারা কোরান-এর দৃষ্টিতে মোমিন, কিন্তু আম্মান নন। কারণ আম্মান এবং মোমিন-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পরিশেষে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে চাইলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত মুসজিদ দর্শন নামক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তারপরেও কথায়-কথায় একটি কথা বলতে চাই যে, গাউসুল আজম গাউসে পাক, যিনি দুনিয়ার সমস্ত ওলি-গাউস-কুতব-আবদাল-আরিফের সরদার তথা প্রধান, তিনি যে চাকচিক্যময় অত্যন্ত মূল্যবান জাম্বাকাপড় পরিধান করতেন, যা দেখে আব্বাসীয় রাজবংশের

খলিফারাও চমকে যেতেন এবং ম্যাওলানা জওজি তো প্রথম দর্শনে যা-তা মনে করেছিলেন (অবশ্য পরে তিনি বড় পীর সাহেবের মুরিদ হয়ে যান), সেই চাকচিক্যময় দামি পোশাকের ভেতর নিজে কে লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে কেহ বড় পীর সাহেবের অফুরন্ত ক্ষমতার কথাটি না বুঝতে পারেন। আবার পরক্ষণে বাংলাদেশের আবদুহ ইজরত বাবা সোলায়মান শাহ লেংটা উলঙ্গতার ঘোমটায় আবদুহর মহাশক্তিটিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লুকিয়ে রাখার ঘোমটাটি কখনো খুবই চাকচিক্যময় হয়, আবার কখনো বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। গাউসুল আজম গাউসে পাক মাস্তুর, হালে বলেছিলেন যে, 'আল্লাহ, জ্ঞান সৃষ্টি তোমার, কিন্তু হকমে চলে আমরা।' ওহাবিরা এই কথাটি শুনলে কাটা মুরগীর মতো ছিলবিলিয়ে উঠবে। কিন্তু ইহারও দলিল *কোরান*-এ আছে। ইজরত সোলায়মান (আ.)-এর মতো নবির নিয়ন্ত্রণে যদি রহমতের বাতাসটি দেওয়া হয়ে থাকে, সেই সোলায়মান নবি মহানবির উন্নত হতে চেয়েছিলেন, আর পরক্ষণে গাউসুল আজম গাউসে পাক মহানবির ডাইরেক্ট বংশধর তথা ইমাম মুসা কাজেম হতে আগত এবং এই কথাটি বলা তো তার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেই এর রহস্য না বুঝে উল্টাপাল্টা যা-তা মন্তব্য করে বসেন। না জানা থাকলে চপ করে থাকতে হয়, তখন মন্তব্য করতে গেলে রেয়াদবির ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। পরিশেষে ছোট একটি ইশারা দিয়ে গেলাম। যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এই ইশারাটি যথেষ্ট, আর তা হলো - গাউসুল আজম গাউসে পাক প্রথমে মহানবির আওলাদ, তারপরে উন্নত।

২১৩. কানান (ছিল) নাসু (মানুষেরা) উন্নত (উন্নত, জাতি) ওয়াহিদাতান (এক)।

মানুষেরা ছিল একই উন্নত (জাতি)।

+ ফারীআসা (সূতরাং উখিত করেন, সূতরাং পাঠাইলেন) আল্লাহ (আল্লাহ) নাবিয়িনা (নবিদেরকে) মুবাশশেরিনা (সুসংবাদদাতা) ওয়া (এবং) মুন্জেরিনা (সাবধানকারী, সতর্ককারী, ভয়প্রদর্শনকারী)।

সূতরাং আল্লাহ উখিত করিলেন (পাঠাইলেন) নবিদেরকে সুসংবাদদাতা এবং সাবধানকারী (রূপে)।

+ ওয়া (এবং) আনজালা (নাজিল করিলেন) মাআহমুল (তাহাদের সহিত, তাহাদের সাথে) কিতাব (কেতাব) বিলহাকিক (সত্যসহ) লিইয়াহকুম্বা (মীমাংসার জন্য, ফয়সালার জন্য, হকুম দেওয়ার জন্য) বাইনা (মধ্যে, মাঝে) নাসি (মানুষদের, লোকদের) ফিমা (যাহার মধ্যে) ইখতলাফ (তাহারা বিপরীত মত পোষণ করিয়াছে, তাহারা মতভেদ করিয়াছে) ফিহি (ইহার মধ্যে)।

এবং নাজিল করিলেন তাহাদের সহিত কেতাব সত্যসহ মীমাংসার জন্য মানুষদের মধ্যে যাহার মধ্যে তাহারা বিপরীত মত পোষণ করিয়াছিল ইহার মধ্যে।

+ ওয়া (এবং) মা (নাই) ইখতলাফা (মতভেদ করে) ফিহি (ইহার মধ্যে) ইল্লা (একমাত্র) আল্লাজিনা (যাহাদের) উতহ (তাহা দেওয়া হইয়াছিল) মিম্বাদি (তাহার পরে) মাজ্জাতহমুল (তাহাদের কাছে আসিয়াছে যাহা) বাইয়িনাত (স্পষ্ট নিদর্শনগুলি) বাগিয়াম (বাড়াবাড়ির কারণে, পাপের কারণে, পাপী) বাইনাহম (তাহাদের মধ্যে)।

এবং তাহাদের মধ্যে মতভেদ করে নাই একমাত্র যাহাদের তাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরে যাহা তাহাদের কাছে আসিয়াছে স্পষ্ট দলিল (স্পষ্ট নিদর্শন) তাহাদের মধ্যে বাড়াবাড়ির (কারণে)।

+ ফাহাদা (সূতরাং হেদায়েত দান করিলেন) আল্লাহ (আল্লাহ) আল্লাজিনা (যাহারা) আমীনু (ইমান আনিয়াছে) লিমা (যাহা, বিষয়ে) ইখতলাফ

(তাহারা ইখতিলাফ মতভেদ করিয়াছিল) *ফিহি* (ইহার মধ্যে) *মিনাল্* (হইতে) *হাক্কি* (সত্য) *বিইজ্জনিহি* (নিজ ইচ্ছায়, নিজ অনুগ্রহে)।

□□ সুতরাং হেদায়েত দান করিলেন আল্লাহ যাহারা ইমান আনিয়াছে (যে-) বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছিল ইহার মধ্য হইতে তাহার ইচ্ছায় সত্য (দান করিলেন)।

+ *ওয়া* (এবং) *আল্লাহু* (আল্লাহ) *ইয়াহুদি* (হেদায়েত দান করেন) *মাই* (যাহাকে) *ইয়াশাউ* (তিনি চাহেন) *ইলা* (দিকে) *সিরাতিম্* (পথের, রাস্তার) *মুস্তাকিম্* (সঠিক)।

□□ এবং আল্লাহ হেদায়েত দান করেন যাহাকে তিনি চান সঠিক পথের দিকে।

□ এই আয়াতে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, সকল মানুষই একই জাতি হতে আগমন করেছে। তারপর আল্লাহ নবিগণকে সুসংবাদদাতা এবং সাবধানকারীরূপে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, কিসের সুসংবাদ এবং কোন্ ভয়ভীতি হতে সাবধান করা। *আপন নফসের অভ্যন্তরে যে হয় বিপর মিলিত খান্নাসরুপটি মতভেদ তৈরি করে এবং বিভিন্ন প্রকার মায়ার জটিলতায় আবদ্ধ করে উহা হতে মুক্তিদানের জন্যই নবিদেরকে পাঠানো হয়েছে বলে এই আয়াতে বলা হয়েছে।* এখানে আরেকটু লক্ষ করার বিষয় হলো যে কেবলমাত্র এই আয়াতে নবিগণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য কারো কথা বলা হয় নাই। প্রত্যেক নবি কেতাবিপ্রাপ্ত। সেই কেতাব কখনো লিখিত আকারে পাওয়া যায়, যাকে 'সহিফা' বলা হয় এবং কখনো লিখিত আকারে পাবার নিদর্শনটি আমরা দেখতে পাই না। নবিরে আল্লাহর অনুগ্রহে পাওয়া মানুষদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার মতভেদগুলো দেখা যায় সেই মতভেদগুলোর মীমাংসা করে দেবার জন্যই আল্লাহ নবিদেরকে কেতাবসহ পাঠিয়ে থাকেন। এত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ পাবার পরেও অধিকাংশ মানুষ খান্নাসের ধোকায় পড়ে মতভেদের মধ্যে ডুবে থাকে। তারপর আবার বলা হয়েছে যে, যারা আমান তথা ইমান এনেছে তারা যে-সব বিষয়ে পূর্বে মতভেদ তৈরি করেছিল সেই ইমানদারদেরকে আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় সত্য এবং সঠিক পথে হেদায়েত দান করেছেন এবং করেন। সুতরাং আল্লাহর সত্য ও সঠিক পথে অগ্রসর হতে হলে প্রথমেই আল্লাহর উপর ইমান আনতে হবে তথা আমান হতে হবে। আল্লাহর উপর ইমান আনয়ন করা ছাড়া সঠিক পথে অগ্রসর হতে গেলেই পদে-পদে ভুল করার সম্ভাবনাটি থেকে যায়, কারণ আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আপন নফসের অভ্যন্তরে খান্নাসটিকে দুর্বল করা মোটেও সম্ভবপর নয়। এই আয়াতে সঠিক পথ দেখানো কথাটি বলতে গিয়ে আল্লাহ কেবলমাত্র নবিদের কথাটি উল্লেখ করেছেন। এখানে রসুল, মোমিন, আবদুহ, আল্লাহর ওলি এবং আল্লাহর যে-কোনো অনুগ্রহভাজনদের কথা উল্লেখ করা হয় নি।

২১৪, *আম্ম* (কি) *হাসিবুতম্* (তোমরা মনে কর, তোমরা ধারণা কর) *আন্* (যে) *তাদখলুন* (তোমরা প্রবেশ করিবে) *জান্নাতা* (জান্নাতে, বেহেশতে) *ওয়া* (এবং) *লমিন্না* (এখনও, তাহা পারে না, নাই) *ইয়াতিকুম্* (তোমাদের নিকট আসে নাই) *মাসালুল* (মেসাল, উদাহরণ, অবস্থা, দৃষ্টান্ত) *লাজিনা* (যাহারা) *খালাত* (তাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একা হইয়া গিয়াছে, তাহারা পূর্বে ছিল) *মিন্কাবলিকুম্* (তোমাদের পূর্ব হইতে, তোমাদের পূর্বে)।

□□ তোমরা কি মনে করিয়াছ যে তোমরা প্রবেশ করিবে জান্নাতে এবং এখনও তোমাদের নিকট আসে নাই (সেই) অবস্থা যাহারা গত হইয়াছে তোমাদের পূর্ব হইতে।

+ *মাসসাতহমুল্* (তাহাদের স্পর্শ করিয়াছিল) *বাসাউ* (কাঠিন্য, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, দুঃখ-বিপদ, দুঃখ-ক্লেশ) *ওয়া* (এবং) *দররাউ*

(কষ্ট, কাঠিন্য, সংকট, অভাব, রোগ, ভয়-ভীতি, মুসিবত, বিপদ-আপদ) ওয়া (এবং) জুলজিলু (তাহারা প্রকম্পিত হইল, তাহারা হেলিতে লাগিল, তাহারা কম্পিত হইল) হাততা (যতক্রম পর্যন্ত, যখন) ইয়াকুলার (বলিল) রাসুল (রসুল) ওয়া (এবং) আললাজিনা (যাহারা) আম্মানু (ইম্মান আনিয়াছে) মাআহি (তাহাদের সাথে) মাআ (কখনও) নাসরু (সাহায্য) আল্লাহ (আল্লাহর)।

□□ তাহাদেরকে স্পর্শ করিয়াছিল অভাব-অনটন এবং বিপদ-আপদ এবং তাহারা কাপিতে লাগিল যখন রসুল বলিলেন এবং যাহারা ইম্মান আনিয়াছে তাহার সাথে কখন আল্লাহর সাহায্য (আসিবে)।

+ আলা (হিম্মার ইহুয়া যাও, জানিয়া রাখ, জুনিয়া লও) ইন্ননা (নিশ্চয়ই) নাসরা (সাহায্য) আল্লাহি (আল্লাহর) কারিবুন (নিকটে)।

□□ জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।

□ এই আয়াতে মহানবির অনুসারীদেরকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে যে যখন মহানবির অনুসারীরা দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হতবিস্ত্রল হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ আগের রসুল এবং আম্মানুদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবতের উদাহরণটি উল্লেখ করে এই বলে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। খান্নাসের বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করতে চাইলে খান্নাসের বানানো শেরেকগুলো হতে মুক্ত হতে হয়। নিজেকে খালি করার অর্থটি হলো খান্নাসমুক্ত হবার ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে ফানাকিল্লীর মোকামে আসতে হলে প্রতিটি সাধককে পদে-পদে দুঃখ-যাতনা এবং ভয়-ভীতির পরিবেশের মখোমুখি হতে হয়। এই ধ্যানসাধনার পথে সমস্ত রকম বিপদ-আপদের মাঝেও যদি ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে আল্লাহর সাহায্য যে অতি নিকটে অবস্থান করছে তখন বুঝতে পারা যায়।

আল্লাহ অন্যস্থানে বলেছেন যে, মানুষেরা কি মনে করে যে, আমরা ইম্মান এনেছি? এবং এই রকম কথা বললেই কি তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে কি পরীক্ষা করা হবে না? অবশ্যই প্রতিটি আম্মানুকে পরীক্ষা করা হবে, কারণ আল্লাহর এই পরীক্ষাটি একদম নতুন নয়, বরং আগেকার নবিদের উম্মতদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাই অবশ্যই কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী ইহা পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ করা হবে। এই 'সত্য', এই 'মিথ্যা', এই 'পরীক্ষা' শব্দগুলো কেন আসে? কারণ প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটিকে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই এই সমস্ত শব্দের আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এত চিল্লাচিল্লি, এত ভয়ভীতি, এত দুঃখ-কষ্টের মূলে তো একমাত্র প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটি আছে বলেই এবং আছে বলেই জগতের বুকে যুগে-যুগে নবি-রসুল, মুনি-খাম্বি, ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালু-আরিফদের মাধ্যমে এই মায়ার বন্ধন হতে, এই ষড় রিপূর বর্জন হতে, এই খান্নাসরূপী অদৃশ্য মূর্তিগুলো হতে মুক্তির বারতা আল্লাহ দিয়ে আসছেন। আল্লাহর বাণী কেহ বোঝে, কেহ বোঝে না; কেহ অস্বীকার করে, আবার কেহ মোখিক স্বীকার করলেও আন্তরিকতার অভাবটি দেখতে পাই কেবলমাত্র আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসটির অবস্থানের দরুন।

মেকাজ্জি কাবায় যে ৩৬০টি মূর্তির অবস্থানের কথাটি আমরা জেনে এসেছি উহা চক্ৰ বছরের গণনায়, কিন্তু সৌর বছরের গণনাটি যদি আরবদেশে প্রচলিত থাকতো তাহলে অবশ্যই বলা হতো যে মেকাজ্জি কাবায় ৩৬৫টি মূর্তি অবস্থান করেছে। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লোভ-মোহ-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ-অহঙ্কার নামক মূর্তিগুলো হাকিকি কাবায় অবস্থান করছে বলেই মেকাজ্জি এবং হাকিকি কাবার সৌন্দর্যটিকে একত্রিত করে আল্লাহ মহাবিজ্ঞানের ভাষায় আম্মাদেরকে বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

২১৫. **ইয়াসআলুনাকা** (আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে) **মাজ্জা** (কী) **ইউনফিকুনা** (তাহারা ব্যয় [খরচ] করে)।

□□ তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে, কী তাহারা ব্যয় করিবে।

+ **কল্** (বলুন [হে মহানবি]) **মা** (যাহা) **আনফাকতুম্** (তোমরা ব্যয় করিবে) **মিন্** (হইতে) **খাইরিন্** (উত্তম, ভালো, নেক, অনেক ধনসম্পদ, মালসম্পদ) **ফালিলুওয়ালিদাইনি** (সুতরাং বাবা-মায়ের জন্য) **ওয়াল** (এবং) **আকুবাবিনা** (নিকট-আত্মীয়, যাহারা আপনজন বলিয়া বিবেচিত, আত্মীয়স্বজন) **ওয়াল** (এবং) **ইয়াতামা** (এতিম) **ওয়াল** (এবং) **মাসাকিনি** (মিসকিনেরা, সর্বহারারা, যাহাদের কিছুই নাই তাহারা, নিঃস্ব) **ওয়া** (এবং) **ইবনিস্** (পুত্র, সন্তান) **সাবিলি** (পথের, রাস্তার)।

□□ আপনি বলুন, যাহা তোমরা খরচ কর ধনসম্পদ হইতে সুতরাং বাবা-মার জন্য এবং নিকট-আত্মীয় এবং এতিমদের এবং মিসকিনদের এবং পথের সন্তানদের (মুসাফিরদের)।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (যাহা) **তাক্বআল্** (তোমরা কর) **মিন্** (হইতে) **খাইরিন্** (উত্তম, ভালো) **ফাইননা** (সুতরাং নিশ্চয়ই) **আল্লাহ্** (আল্লাহ) **বিহি** (সেই বিষয়ে) **আলিমুন্** (জানেন, জ্ঞাত আছেন)।

□□ এবং যাহা তোমরা কর উত্তম (কর্ম) হইতে, সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।

□ এই আয়াতে ধনসম্পদের কতটুকু খরচ করবে এবং সেই খরচের ব্যাপারে কীরূপ পণ্ডা অবলম্বন করতে হবে এবং পরবর্তী দুইশত উল্লিখ নম্বর বাক্যে সেই বিষয়ে অতীব সুন্দর উপদেশ দান করা হয়েছে। প্রথমে উদ্ভূত আয় হতে ব্যয় করার হুকুম দিচ্ছেন এবং তারপরই বলা হয়েছে যে এই ব্যয়গুলো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হবে। আবার কল্যাণকর ব্যয়ের প্রশ্নে কয়েকটি বিশেষ পথ দেখানো হয়েছে, যেমন বাবা-মা, নিকট-আত্মীয়স্বজন, এতিমগণ এবং মিসকিনদের এবং পথের সন্তানদের (মুসাফিরদের)। এই বুকম ভালো-ভালো কাজে যাহা কিছু ব্যয় করা হয় তথা খরচ করা হয় সেই দিকগুলোর প্রতি আল্লাহ বিশেষ নজর দেন তথা দৃষ্টি রাখেন।

পরিশেষে মহানবির হাদিস হতে আমরা পাই, মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও নিকট-আত্মীয়দের প্রথমে দান করার উপদেশটি। আবার ইহাও পাই যে যারা নিকট-আত্মীয়দের এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরকে দান না করে দূরের মানুষদেরকে দান করেন তাদের এই দানের ফলটি কেবল শূন্যই নয়, বরং পাপ বলে গণ্য করা হয়। তেহাম্মা পর্বতের মতো নেকি অর্জন করার পরেও আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপ্রতিবেশীদেরকে অবহেলা এবং অবজ্ঞা করে দূরে দানখরাত যারা করে তাদেরকে মহানবি জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করেছেন। (এই বিষয়ে

বিস্তারিত জ্ঞানতে হলে আমার রচিত **মাবেফতের গোপন কথা** নামক বইটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।)

২১৬. **কুতিবা** (ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল, ফরজ করিয়া দেওয়া হইল, ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল, লেখা হইল, জন্মের পূর্বেই ভাগ্য লেখা হইয়াছিল, বিধানরূপে দেওয়া হইল, নির্দেশ দেওয়া হইল) **আলাইকুম্** (তোমাদের উপর) **কিতালে** (যুদ্ধ, জেহাদ, লড়াই, সংগ্রাম) **ওয়া** (এবং) **ইয়া** (উহা) **কল্** (অপহৃদনায়, অপ্রিয়, ঘণার বস্তু) **লাকুম্** (তোমাদের জন্য)।

□□ ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল তোমাদের উপর যুদ্ধকে (জেহাদ) এবং উহা অপহৃদনায় তোমাদের জন্য।

+ **ওয়া** (এবং) **আসা** (সম্ভবত, হয়তো, সন্দেহ, খটকা, নিকটে, শীঘ্রই) **আন** (যে) **তাক্বাহ্** (তোমরা অপহৃদ কর) **শাইয়ান্** (কোনো জিনিস, কোনো বস্তু, কোনো কিছু, কোনো বিষয়) **ওয়া** (এবং) **ইয়া** (উহা) **খাইরল্** (উত্তম কল্যাণকর, মঙ্গলজনক) **লাকুম্** (তোমাদের জন্য)।

□□এবং সম্ভবত যে তোমরা অপছন্দ কর কোনো কিছু এবং উহা তোমাদের জন্য।

+ ওয়া (এবং) আসা (সম্ভবত, হয়তো) আন (যে) তহিব্ব (তোমরা ভালোবাসো) শাইয়ান (কোনো কিছু) ওয়া (এবং) ইয়া (উহা) শারিকল (মন্দ, অকল্যাণকর, ক্ষতিকর) লাকুম (তোমাদের জন্য)।

□□এবং সম্ভবত তোমরা ভালোবাসো যে-কোনো কিছু এবং উহা মন্দ (অকল্যাণকর) তোমাদের জন্য।

+ ওয়া (এবং) আলাহ (আলাহ) ইয়ালানু (জানেন) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) লা (না) তয়ালানু (জানো)।

□□এবং আলাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলেই দুই রকম চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। কারণ, যেহেতু যুদ্ধ এবং জেহাদের কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং যুদ্ধ এবং জেহাদের বিষয়টি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবুকের যুদ্ধ হতে বিজয় লাভ করার পর সাহাবারা তথা মহানবির মুরিদেয়া (ঐহাবিরা মহানবির মুরিদ বললে তেলে-বেগুনে জলে ওঠে) মহানবির নিকট যখন কথাটি বলছিলেন তখন মহানবি মহাউপদেশ দিয়ে সাহাবাদেরকে বললেন যে, তোমরা ছোট জেহাদ হতে বিজয়ী হয়েছ, এবার তোমরা বড় জেহাদের দিকে অগ্রসর হও। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, বড় জেহাদ কাকে বলে? মহানবি বললেন, আপন নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করাটাই হলো সবচাইতে বড় জেহাদ (জেহাদে আকবর)। সুতরাং জেহাদ দুই প্রকার : প্রথমটি বাহিরের শত্রু হতে আপন ভুখণ্ডকে উদ্ধার করার জেহাদ আর দ্বিতীয়টি হলো আপন নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরুপী শয়তানটি বহাল তবিয়ে অবস্থান করছে, উহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। কারণ, শয়তানকে আলাহ দুইটি স্থান ছাড়া আর কোথাও অবস্থান করার অনুমতি দান করেন নি, অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের কোথাও শয়তানের থাকবার অনুমতি নাই একমাত্র জিন এবং মানুষের অন্তর ছাড়া। তাই জিন এবং মানুষের অন্তরটি যখন খান্নাসরুপী শয়তান হতে মুক্ত হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহখানি পাকপবিত্র হয়ে যায় এবং এই কথাটিও আমরা মহানবির হাদিস হতে পাই। কেহ বুঝতে পারে, কেহ বুঝতে পারে না। বুঝতে পারাটাও তকদির এবং না-পারাটাও তকদির। কারণ, জন্মের আগেই প্রত্যেকের তকদির নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামের চরম দর্শনে কোনো গালি নাই, কোনো ভুল-ত্রুটির বিদ্যমান অবকাশ নাই।

মহানবির মদিনার সনদ নামক চুক্তিটিতে দেখতে পাই যে, সংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানদের স্থানটি ছিল সম্ভবত তৃতীয় স্থানে। মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়েও মদিনার চুক্তিটি ভঙ্গ করেন নি। সত্যিই মদিনার সনদটি একটি অভাবনীয় বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে চিরদিন। হাদিসে আছে, যে-ব্যক্তি জেহাদ না করে এবং নিজেকে জেহাদের জন্য তৈরি না রেখে মারা গেল, সে জাহেলের মৃত্যুবরণ করলো। এই জেহাদটি তলোয়ার হতে শুরু করে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের জেহাদও হতে পারে, আবার আপন-আপন অন্তরে বাস করা শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার কথাটিও হতে পারে। খান্নাসের জজাল তথা লোভ-মোহ-মাৎসর্য-কাম-ক্রোধ-অহঙ্কার নামক শয়তানের এই মাথাগুলোকে কেটে ফেলার জন্য যে-দায়েমি সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে উহা অত্যাবশ্যক। দায়েমি সালাতের মাধ্যমে শয়তানের মোহমায়ার জাল কেটে ফেলবার জন্য তথা একদম শূন্য করে ফেলবার জন্যই এই আয়াতের মূল বক্তব্য। এই শয়তানকে লা-করবার তথা নাই করে দেবার সাধনায় অগ্রসর হতে থাকলে হয়তো শীঘ্রই আপন-আপন দেহে নিহিত রুহরুপী শক্তিটি, যে ক্রাচ্ছেই অবস্থান করছে, উহা জাগ্রত হয়ে যায়। এ জন্যই আলাহ আশ্বাস দিচ্ছেন এই বলে যে, কতলের পথে এগিয়ে যাও। শীঘ্রই জানতে পরিবে ইহাতে

কৃত বড়, কত বিস্ময়কর কল্যাণটি তোমারই মাঝে নিহিত আছে। যদিও ইহা প্রথমে তোমাদের কাছে ভালো লাগবে না তথা অকৃতিকর বলে মনে হবে এবং পছন্দও করতে চাইবে না।

২১৭. *ইয়াসআলুনাকা* (তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে) *আনিস্* (সম্পর্কে, সম্বন্ধে) *শাহরিল্* (মাস) *হারামি* (হারাম, নিষিদ্ধ) *কিতালিন্* (যুদ্ধ করা, জেহাদ করা) *ফিহি* (ইহার মধ্যে)।

□□ আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে হারাম মাস সম্পর্কে ইহার মধ্যে যুদ্ধ করিতে।

+ *কুল* (বলুন) *কিতালুন* (যুদ্ধ করা) *ফিহি* (ইহার মধ্যে) *কাবিরুন্* (বড়)।

□□ আপনি বলুন, ইহার মধ্যে যুদ্ধ করা বড় (গুনাহ)।

+ *ওয়া* (এবং) *সাদ্দুন্* (বাধা দান, বাধা প্রদান, বাধা দেওয়া, থামিয়া যাওয়া, নিষেধ করা) *আন্* (হইতে) *সাবিলিন্* (পথ, রাস্তা) *লিল্লাহি* (আল্লাহর) *ওয়া* (এবং) *কুফরুন্* (কুফরি করা, অস্বীকার করা) *বিহি* (তাহার সাথে) *ওয়াল্* (এবং) *মাসজিদিন্* (মসজিদ) *হারামি* (হারাম)।

□□ এবং বাধা দেওয়া হয় আল্লাহর পথ হইতে এবং তাহার সাথে কুফরি করে এবং মসজিদুল হারামে (প্রবেশের জন্য)।

+ *ওয়া* (এবং) *ইখরাজ্* (বাহির করা, বহিস্কার করা) *আহলিহি* (ইহার অধিবাসীদের, ইহার বাসিন্দাদের) *মিন্* (উহা হইতে) *আক্বারু* (বড়) *ইন্দা* (নিকটে, কাছে)-*ল্লাহি* (আল্লাহর)।

□□ এবং ইহার অধিবাসীদেরকে উহা হইতে বাহির করা বড় (গুনাহ) আল্লাহর নিকটে।

+ *ওয়াল্* (এবং) *ফিতনাত্* (ফেতনা, আপদ, মুসিবত, ফ্যাসাদ, উত্তপ্ত করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ করা, গৃহকোন্দল, কষ্ট দেওয়া, প্রবল আলোড়ন, বিক্ষোভ, দাঙ্গা, প্রবল আবেগপূর্ণ অবস্থা, পীড়ন, অত্যাচার, কোলাহল) *আক্বারু* (বড়) *মিনাল্* (হইতে) *কার্জিলি* (হত্যা, খুন)।

□□ এবং ফিতনা বড় (গুনাহ) হত্যা হইতে।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইয়াজালুনা* (তাহারা সর্বদা থাকিবে) *ইউকাতিলুনাকুম্* (তোমাদেরকে কতল করিবে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করিবে) *হাতুতা* (যত্নরূপ না) *ইয়ারুদুদু* (ফিরাইতে পারিবে) *কুম্* (তোমাদেরকে) *আন্* (হইতে) *দ্বানিকুম্* (তোমাদের দ্বীন) *ইনিস্* (যদি) *তাভাত্* (তাহারা করিতে পারে)।

□□ এবং তাহারা সর্বদা থাকিবে না তোমাদেরকে কতল করিবে যত্নরূপ না তোমাদেরকে ফিরাইতে পারিবে তোমাদের দ্বীন হইতে যদি তাহারা করিতে পারে।

+ *ওয়া* (এবং) *মান্* (যে) *ইয়ারতাদিহু* (ফিরিয়া যাওয়া) *মিনকুম্* (তোমাদের মধ্য হইতে) *আন্* (হইতে) *দ্বানিহি* (তাহার দ্বীন) *ফাইয়মিত্* (সূতরাং মারা যাইবে) *ওয়া* (এবং) *হয়া* (সে) *কাফিরুন্* (কাফের) *ফাউলাইকা* (সূতরাং উহারাই তাহারা) *হাবিতাত্* (বরবাদ হইয়া যাওয়া, নষ্ট হইয়া যাওয়া, বেকার হইয়া যাওয়া, মুহিয়া যাওয়া) *আম্বানহম্* (তাহাদের আমলগুলি, তাহাদের কাজকর্ম) *ফি* (মধ্যে) *দ্বনিয়া* (দুনিয়া) *ওয়া* (এবং) *আখিরাতি* (আখেরাত)।

□□ এবং যে-কেহ ফিরিয়া যাইবে তোমাদের মধ্য হইতে তাহার দ্বীন হইতে সূতরাং মৃত্যুবরণ করিবে এবং সে কাফের সূতরাং উহারাই তাহারা, নষ্ট হইয়া যাইবে তাহাদের আমলগুলি দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে।

+ *ওয়া* (এবং) *উলাইকা* (উহারাই তাহারা) *আস্হাবুন্* (অধিবাসী) *নারি* (আপুনের)।

□□এবং উহারাই তাহারা আগুনের অধিবাসী হইবে।

+ ইম (তাহারা) ফিহা (উহার মধ্যে) খালিদুনা (স্থায়ী হইবে)।

□□তাহারা উহার মধ্যে স্থায়ী হইবে।

□ এই আয়াতে 'কতল' শব্দটি সাধারণভাবে হত্যা অথবা যুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হলেও কোরান ইহাকে লা-মোকামে যোগ্য করার অর্থেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন। সাধারণ যুদ্ধে অথবা জেহাদে যে কতল হয়ে থাকে তাতে কিছু নুফসই কতল হয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে আল্লাহ কতরূপে যে জীবন-রণের নিকটেই থাকেন তিনি সব মরী-বাচার বহু উর্ধ্বেই থাকেন। হারাম মাসের মাঝে কতল করা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মহানবি বললেন, এই চার মাসের মধ্যে কতল করা কবিরী গুনাহ। অপরদিকে কাফেরেরা এই হারাম মাসে কতল করলে তাহা হয় অত্যন্ত জঘন্য অপরাধের বিষয়। কাফেরদের আসল উদ্দেশ্যটাই হলো হারাম মাসগুলোকে অমান্য করে চলা। কতলের অপরাধে অপরাধ করে মানুষ কাফেরে পরিণত হয়ে থাকে। প্রতিটি মানবদেহ একে একটি হাকিকি কাবার প্রতীক। এই মানবদেহের ভিতরে খান্নাস নামক শয়তানের অবস্থানটি দায়েমি সালাতের ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিতে পারলে অথবা কাবু করে ফেলতে পারলে সব রকম শেরেক হতে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা এই জাতীয় শেরেক হতে মুক্ত হতে পেরেছেন তাদেরকেই এখানে আমরা মহাপুরুষ নামে আখ্যায়িত করেছি। সুতরাং প্রতিটি এই জাতীয় শেরেকমুক্ত মহাপুরুষেরাই হলেন হাকিকতের মসজিদুল হারাম। জমিনে অবস্থান করা মসজিদুল হারামটিকে মনেপ্রাণে মসজিদুল হারাম রূপেই অবশ্যই মেনে নিতে হয়, কারিগ্ন মূর্তির প্রকাশ না থাকলে বিমূর্ত অঙ্ককারের গর্ভে ঢেকে থাকে। এজন্যই জমিনে অবস্থান করা মসজিদুল হারামে এসে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে পরিত্যাগ করতে হবে তথা শেরেক হতে মুক্তি লাভ করা যাবে তারই একটি বিরাট মহড়ার আয়োজন করা হয়। দায়েমি সালাতের ধ্যানসাধনায় সাধকদের বিরাট ধৈর্যধারণ করে নিজেদেরকে কেমন করে হাকিকি মসজিদুল হারামে পরিণত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবার আস্থানটি জানানো হয়েছে। ইমান এবং কুফরির এই দ্বাদ্বিক দর্শনটি চিরন্তন। বিরোধীদের চাপে পড়ে আমান যদি মসজিদুল হারামের মহড়া ত্যাগ করে এবং এই নীতি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তো তার দীন ইতেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হলো এবং সেই অবস্থায় যদি দ্বারা যায় তবে সে কাফের। কাফেরদের দ্বিনিয়া ও আখেরাতের কোনো আমলই আর কাজে আসে না এবং এদেরকেই আগুনের অধিবাসী বলা হয়েছে।

পরিশেষে কিছু অত্যন্ত গোপনীয় রহস্যময় কথা থেকে যায় যাহা মোটেই বর্ণনা করা যায় না এবং ইহার জলন্ত উদাহরণটি হলো বুখারি শরিফ-এর হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে : আমি মহানবির কাছ থেকে দুইপাত্র জ্ঞান লাভ করেছি। একটি আমি প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে গেলাম। অন্যটি বললে আমার গলা কাটা যাইবে। পাঠক বাবা-মায়েদেরকে একান্ত অনুরোধ করছি বুখারি শরিফ-এর হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি বারবার পড়ুন, চিন্তা করুন এবং গবেষণা করতে থাকুন। তাহলেই সব কিছু আপনার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে - তবে যদি তকদিরে লেখা থাকে।

২১৮. ইন্নাল (নিশ্চয়ই) লাজিনা (যাহারা) আমানু (ইমান আনিয়াছে) ওয়াল (এবং) লাজিনা (যাহারা) হাজারু (হিজরত করা, আপন অবস্থান ত্যাগ করা, স্বদেশ ত্যাগ করা, দেশান্তরিত হওয়া, নির্বাসিত হওয়া, আপন দেশ হইতে বহিস্কৃত হওয়া) ওয়া (এবং) জাহাদু (জেহাদ করে) ফি (মধ্যে) সাবিলিল (পথে)-ল্লাহি (আল্লাহর) উলাইকা (উহারাই তাহারা) ইয়ারজুউনা

(আশা করে, ভয় করে, বিশ্বাস করে, আশা রাখে) *রাহ্মাতান* (রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, করুণা, ক্রমাশীলতা, ঐশ্বরিক করুণা) - *লাহি* (আল্লাহ)।

□□ নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে এবং জেহাদ করে আল্লাহর পথের মধ্যে উহারাই তাহারা আশা করে আল্লাহর রহমত।

+ *ওয়াল* (এবং) - *লাহি* (আল্লাহ) *গাফুর* (ক্রমাশীল, অপরাধ মার্জনাকারী, তিতিক্রাবান, সহিষ্ণু, ক্রমাগত পূর্ণ) *রাহিমুন* (রহিম)।

□□ এবং আল্লাহ ক্রমাশীল রহিম।

□□ এই আয়াতে আল্লাহর রহমত পাবার কারা আশা করে, কী কী গুণ একটি মানুষের মধ্যে থাকিলে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে সেই গুণ কয়টি কোনো মানুষের মধ্যে থাকিলেই সেই মানুষটি আল্লাহর রহমত আশা করতে পারে বলে এই আয়াতে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। সেই গুণগুলোর মধ্যে যে-গুণটি একটি মানুষের প্রথমেই থাকতে হবে উহা হলো ইমান আনা তথা আমান হওয়া। ইমান আনার গুণটি এই আয়াতে সর্বপ্রথম এ জন্যই বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সমস্ত গুণাবলির মূল ভিত্তিটাই হলো ইমান আনা। এই আয়াতটিতে পৃথিবীর সকল মানুষদেরকে আল্লাহ আহ্বান করছেন - কোনো গোষ্ঠি, কোনো দল, কোনো গোত্র, কোনো কালো-শাদার ভেদাভেদ করে বলা হয় নি, বরং একদম নিরেট সার্বজনীন এই আহ্বানটি। ইমান আনার পরের গুণটি হলো হিজরত করা। হিজরত করার অর্থটি ব্যাপক অর্থে বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে নিজের স্থান হতে অন্যত্র গমন করাটিকেই হিজরত বলে ধরে নিলাম। দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে গেলেও নিজের অবস্থান হতে অন্যত্র যেতে হয়। এই কথাটি এতই সহজ সরল এবং পরিষ্কার যে ইহার ব্যাখ্যা লেখার প্রয়োজন মনে করি না। এবং তারপরের গুণটি হলো জেহাদ করা। এই জেহাদ কোনো অস্ত্রের জেহাদ যে মোটেই নয়। তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। বরং আপন নফসের সঙ্গে যে-শয়তানটি খান্নাসরূপে অবস্থান করছে সেই পবিত্র নফসের সঙ্গে থাকা অপবিত্র শয়তানটি বশীভূত করা তথা মুসলমান বানিয়ে ফেলা তথা তাড়িয়ে দেবার জেহাদের কথাটি বলা হয়েছে। কারণ এই জেহাদটিকেই মহানবি 'জেহাদে আকবর' অথবা 'জেহাদে কবির' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই দুনিয়াতে যত রকম আকাম-কুকামের মূল হোতা যে সেই হলো শয়তান এবং এই শয়তান যখন প্রতিটি মানুষের পবিত্র নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তখনই শয়তানের চেহারাগুলো ধরা পড়তে থাকে। যে-নফসের সঙ্গে শয়তান গভীরভাবে জড়িয়ে আছে সেই নফসটি ভয়ঙ্কর। তখন সেই নফসটি একটি মূর্তিমান শয়তানরূপী খান্নাস। জনাব হিটলার, জনাব মুসোলিনি, জনাব সামরি, জনাব চেক্সি খা, জনাব হালাকু খা, জনাব হাজ্জাজ বিন ইউসুফ - এইগুলি একেকটি পবিত্র আপন-আপন নফসের সঙ্গে বিরাজ করা বটবৃক্ষের মতো মূর্তিমান শয়তান। তাই ইহাদেরকে ঐতিহাসিক শয়তান বলা হয়। কারণ মানুষ ছাড়া শয়তানের পরিচয় পাবার বিধানটি আল্লাহ রাখেন নি। কারণ শয়তানকে অনুমতিই দেওয়া হয়েছে মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করতে। সেই স্থান দুইটির নাম হলো : একটি মানুষের অন্তর এবং অপরটি জিনের অন্তর। এই বিষয়টি সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শয়তানের অবস্থানটি কোথায়। এ যেন অন্ধের হিসাবের মতো। এই হিসাবের বাহিরে গিয়ে যদি কিছু বলা হয় উহাই মেকি, উহাই জাল, উহাই ধোকাবাজি, উহাই প্রতারণা, উহাই মরাটিকার প্রেতনৃত্য। সুতরাং যারা ইমান আনার পূর আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার দায়েমি সালাতের ধ্যানসার্থনায় মগ্ন হয়ে আছে তাদেরকেই আল্লাহ রহমত পাবার আশার বাণীটি শোনাচ্ছেন এবং পরিশেষে আল্লাহ বলছেন যে ওই সাধকদেরকে ক্রমা করি। সেই ক্রমাটি 'রহমান'-রূপে নয় তথা সাধারণরূপে

নয়, বরং 'রহিম'-রূপ ধারণ করেই সাধকদেরকে ক্লমা করা হয় তথা আল্লাহ খাসসুল খাস রহিম-রূপটি ধারণ করেই সাধকদেরকে ক্লমা করে থাকেন। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয় নি 'গাফুরর রহমান', বরং বলা হয়েছে 'গাফুরর রহিম'। মনে রাখতে হবে যে, যেখানেই ক্লমার প্রশ্নটি বিশেষভাবে আসে তখনই ক্লমার পাশে আল্লাহকে 'রহিম'-রূপে দেখতে পাই। সুতরাং কোরানুল হাকিম-এর একটি স্থানেও 'গাফুরর রহমান' পাবেন না, কারণ 'রহমান' হলো সাধারণ দান, বরং পাবেন 'গাফুরর রহিম' তথা বিশেষ দানের কথাটি।

২১৯. *ইয়াসআলুনাকা* (তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে) *আনিল্* (সম্পর্কে, বিষয়ে) *খাম্বিরি* (মদ) *ওয়া* (এবং) *মাইসিলি* (জুয়া)।

□□ তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে।

+ *কল্* (আপনি বলুন) *ফিহিমা* (দুইটির মধ্যে) *ইসমুন* (গুনাহ, পাপ) *কাবিরুন* (বড়) *ওয়া* (এবং) *মানাফিউ* (উপকার) *লিন্নাসি* (মানুষের জন্য)।

□□ আপনি বলুন, দুইটির মধ্যে বড় গুনাহ এবং মানুষের জন্য উপকার (আছে)।

+ *ওয়া* (এবং) *ইসমুহমা* (দুইটি গুনাহ) *আক্বারু* (বড়) *মিন্* (হইতে) *নাফইহিমা* (দুইটির উপকার)।

□□ এবং দুইটি গুনাহ বড়, দুইটি উপকার হইতে।

+ *ওয়া* (এবং) *ইয়াসআলুনাকা* (তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে) *মাজ্জা* (কী) *ইউনফিকনা* (তাহারা খরচ করিবে)।

□□ এবং তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে কী তাহারা খরচ করিবে?

+ *কলিল্* (আপনি বলুন) *আফুওয়া* (উদ্ধৃত, অতিরিক্ত, বাড়তি)।

□□ আপনি বলুন, উদ্ধৃত (অতিরিক্ত)।

+ *কাজালিকা* (ওইভাবে) *ইউবাইইনু* (বর্ণনা করেন, বিবরণ দেন, ব্যাখ্যা করেন, ব্যক্ত করেন) *আলাহ* (আল্লাহ) *লাকমুলু* (তোমাদের জন্য) *আয়াতি* (আয়াত, নিদর্শন, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রমাণ, উল্লেখ, চিহ্ন) *লাআল্লাকুম* (যেন তোমরা, সম্ভবত) *তাআফাকাকনা* (তোমরা ফারাক কর, তোমরা চিন্তা কর, তোমরা গবেষণা কর, গভীরভাবে চিন্তা কর)।

□□ ওইভাবেই আল্লাহ বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য যেন তোমরা চিন্তা (গভীরভাবে) কর।

□ এই আয়াতে 'খাম্বির' শব্দের অর্থটি হলো আগুর অথবা কোনো মিষ্ট দ্রব্য পুচানো রস, যাহাকে মদ বলা হয়। ইহাকে আমরা মদ বলে থাকি, কারণ ইহা নেশা তৈরি করে। মদ্রা হতে মদিনায় হিজরতের কিছু দিন পর মদ পান এবং জুয়া খেলার উপরে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তারপর বলা হলো, মদ ও জুয়ার দোষ-গুণ তুলনা করে বলা হলো, ইহাতে লাভ-অপেক্ষা ক্রতির পরিমাণ অধিক। এজন্যই পানীয় হিসাবে মদ নিষিদ্ধ করা হলো। এখন প্রশ্ন আসে যে, মদের মধ্যেও যে কিছুটা উপকার আছে ইহা এই আয়াতে বলা হয়েছে। মদের উপরে ভর করা কিছু-কিছু অ্যালোপ্যাথি ঔষধ এবং সম্পূর্ণ মদের উপরে ভর করা হোমিও ঔষধগুলো তা উপকারের জন্যই ব্যবহার করা হয়। নিশ্চয়ই এই ঔষধমিশ্রিত মদ নেশার জন্য নেশাখোরও ব্যবহার করে না। কারণ নেশাখোর জানে যে, ইহাতে সমূহ ক্রতি হতে পারে। তবে ঔষধ মিলন ছাড়া মদ কেহ গ্রহণ করলে অবশ্যই নেশা হবে। কিন্তু কয়েক ফোঁটা মদমিশ্রিত ঔষধ জিহ্বার উপর দিলেই যে নেশা হবে ইহা আস্ত পাগলেও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং মদ যে কিছুটা উপকারেও আসে এই জুলন্ত প্রমাণটুকু আল্লাহ এই আয়াতে বর্ণনা করলেন। তারপরেও যারা ঔষধ-মিশ্রিত মদও পান করতে চায় বা পান করে তারা নিজের জীবনের উপর সমূহ বিপদ ডেকে আনে। তাই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য যাতে অনাচার-অবিচার বেড়ে না যায় সেই

জন্য মদকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। (সুরা বাকারার এই আয়াতে মদকে সর্বপ্রথম হারাম করা হয়েছে। তারপর সুরা নেসার আয়াতটি নাজেল করা হয় এবং পরিশেষে সুরা মায়েদায় সরাব হারাম হওয়ার আয়াতটি নাজেল করা হয়)। তারপরের আয়াতে বলা হলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ জমা করা ভালো নয়। এই অতিরিক্ত ধনসম্পদ জমা করাটাকে একটি সামাজিক অপরাধ বলা হয়েছে। তাই এই অতিরিক্ত সম্পদ মহৎ কাজে সুন্দরভাবে সামাজিক কল্যাণের জন্য ব্যয় করাটি বাঞ্ছনীয়। এবং সময় ও কালের ব্যবধানে ব্যয় করার প্রশুটিও আপেক্ষিকতায় ভাসমান। সুতরাং *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান বলার চেয়ে কি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন বললে আরও বেশি ভালো মানায় না? এবং আরও বেশি সুন্দররূপে প্রতিভাত হয় না?*

‘আলু আফওয়া’ শব্দটির বিষয়ে দেড় হাজার বছর আগে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, পরিবারবর্গের ভরণপোষণের পর যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে উহাকে ‘আলু আফওয়া’ বলা হয়। বিষয়টি নিয়েও মহানবীর সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে তথা একমত হতে পারেন নি। তারই জলন্ত প্রমাণটি অতি লজ্জায় বলতে হচ্ছে যে ‘আসহাবে সুফা’-র জলিল কদেরের সাহাবা হজরত আবু জুর গিফারি (রা.) এবং জিনুররাইন হজরত ওসমান গণি (রা.)-র মধ্যে বেশ কিছুটা মতভেদ দেখতে পাই। অবশ্য এই মতভেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভিসৃতি পাই। মহানবি বলেছেন যে, ‘প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু কর, তারপর বিবিকে দাও, তারপর পরিবারবর্গকে দাও, তারপর আশ্রয়িত্বজনদেরকে দাও এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হও। অন্য আরেকটি হাদিসে মহানবি বলেছেন যে, ‘হে আদম সন্তান, যদি তুমি তোমার বাড়তি সম্পদ খরচ কর উহা উত্তম আর যদি জমিয়ে রাখ উহা ক্ষতিকর।’ এরপরেও অনেক-অনেক কথা বলা যেত, কিন্তু এখানে আর নয়।

২২০ ফি (মধ্যে) *দুনিয়া* (দুনিয়া, ইহকাল, পৃথিবী, জগৎ, বহু নিকট, খুব নিকট) *ওয়াল* (এবং) *আখিরাত* (আখেরাত, পরকাল)।

□□ *দুনিয়া* এবং *আখেরাত*ের মধ্যে।

+ *ওয়া* (এবং) *ইয়াসআলুনাকা* (তাহারা আপনাকে প্রশ্ন [জিজ্ঞাসা] করে) *আনিন্* (সম্পর্কে, বিষয়ে) *ইয়াতামা* (এতিমদের)।

□□ এবং তাহারা আপনাকে প্রশ্ন (জিজ্ঞাসা) করে এতিমদের সম্পর্কে।

+ *কল্* (আপনি বলুন) *ইসলাহুল্* (সংশোধন করা, ঠিক করা, সন্ধি করা) *লাহুল্* (তাহাদের জন্য) *খাইকল্* (উত্তম)।

□□ আপনি বলুন তাহাদের জন্য সংশোধন করা উত্তম।

+ *ওয়া* (এবং) *ইন্* (যদি) *তুখানিতহুল্* (তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাক) *ফাইখওয়ানুকুল্* (সুতরাং তাহারী তোমাদের ভাই)।

□□ এবং যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাক সুতরাং তাহারা তোমাদের ভাই।

+ *ওয়াল্* (এবং)-*লাহুল্* (আল্লাহ) *ইয়ালামুল্* (জানেন) *মুফসিদা* (ফ্যাসাদকারী) *মিনাল্* (হইতে) *মুসলিহি* (সংশোধনকারী, ভালো, যে ঠিক করিয়া দেয়)।

□□ এবং আল্লাহ জানেন ফ্যাসাদকারীকে সংশোধনকারী হইতে।

+ *ওয়া* (এবং) *লাও* (যদি) *শাআ* (চাহিতেন)-*লাহুল্* (আল্লাহ) *লা-আনতাকুল্* (তোমাদেরকে কষ্টে ফেলিতেন)।

□□ এবং যদি চাহিতেন আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টে ফেলিতেন।

+ *ইন্না* (নিশ্চয়ই)-*লাহি* (আল্লাহ) *আজিজুল্* (শক্তিশালী) *হাকিম* (হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞানময় বিচারক)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী হেকমতওয়ালা।

□ আল্লাহর কালামের এই আয়াতের মর্ম অধম লিখকের তথা অধম অনুবাদকের বোধগম্য নহে, কারণ এই আয়াতটি গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ এবং এই রহস্য উদ্ঘাটন করা অধম অনুবাদকের পক্ষে সম্ভবপর হলে না বলে পাঠক বাবা-মায়াদের কাছে ক্লম্বা চেয়ে নিলাম এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলে রাখলাম যে যদি কারও এই গভীর রহস্যটির বিষয়ে কিছু জানবার ইচ্ছা ও আগ্রহটি থেকে থাকে তাহলে শাহ সুফি সদ্দর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত তিনখণ্ডে কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন। আরও উল্লেখ্য যে হজরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির রচিত ফতুহাতে মক্কিয়া নামক অমর গ্রন্থটি দৃষ্টব্য।

২২১. ওয়া (এবং) না (না) তানকিহল (তোমরা নিকাহ [বিবাহ] কর) মুশরিকাতি (মুশরিক নারীদেরকে) হাত্তা (যতক্ষণ পর্যন্ত) ইউমিননা (ইমান আনে)।

□□ এবং তোমরা নিকাহ (বিবাহ) করিও না মুশরিক নারীদেরকে যতক্ষণ (না) ইমান আনে।

+ ওয়া (এবং) লামাতন্ন (অবশ্যই দাসী) মুমিনাতন্ন (মোমিন) খাইরুম্ম (উত্তম) মিন (হইতে) মুশরিকাতিন (মুশরিক নারী) ওয়া (এবং) লাও (যদিও) আজাবাকুম (তোমাদের কাছে ভালো লাগে, তোমাদেরকে চমৎকৃত করে, তোমাদেরকে মুগ্ধ করে)।

□□ এবং অবশ্যই মোমিন দাসী উত্তম মুশরিক নারী হইতে এবং যদিও তোমাদের ভালো লাগিয়াছে।

+ ওয়া (এবং) না (না) তনকিহল (তোমরা নিকাহ করিও) মুশরিকিনা (মুশরিক পুরুষদের) হাত্তা (যতক্ষণ পর্যন্ত) ইউমিন (ইমান আনে)।

□□ এবং তোমরা নিকাহ করিও না মুশরিক পুরুষকে যতক্ষণ পর্যন্ত (না) ইমান আনে।

+ ওয়া (এবং) লাআবদন্ন (অবশ্যই একজন দাস) মুমিনুন (মোমিন) খাইরুম্ম (উত্তম) মিন (হইতে) মুশরিকিন (মুশরিক) ওয়া (এবং) লাও (যদিও) আজাবাকুম (তোমাদের কাছে ভালো লাগে)।

□□ এবং অবশ্যই মোমিন দাস উত্তম মুশরিক হইতে এবং যদিও তোমাদের ভালো লাগে।

+ উলাইকা (উহারাই তাহারা) ইয়াদউনা (তোমাদেরকে ডাকে) ইলা (দিকে) নারি (আপ্তন)।

□□ উহারাই তাহারা তোমাদেরকে ডাকে আপ্তনের দিকে।

+ ওয়াল (এবং) - লাহ (আল্লাহ) ইয়াদউ (ডাকেন) ইলান (দিকে) জান্নাতি (জান্নাতে) ওয়াল (এবং) মাগফেরাতি (মাগফেরাত, ক্লম্বা) বিইজ্জনিহি (তাহার হকুমের)।

□□ এবং আল্লাহ ডাকেন জান্নাত এবং মাগফেরাতের (ক্লম্বা) দিকে তাহার হকুমে।

+ ওয়া (এবং) ইউবাইইয়েন (স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন, স্পষ্ট বর্ণনা করেন) আয়াতিহি (তাহার আয়াতসমূহ, তাহার নিদর্শনসমূহ) লিন্নাসি (মানুষের জন্য) লাআলাহম্ম (আশা করা যায় তাহারা) ইয়াতাজাক্করুনা (জিকির [সংযোগ, যোগাযোগ] করিতে পারে)।

□□ এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহার আয়াতসমূহ মানুষদের জন্য আশা করা যায় তাহারা জিকিরকারী হইবে।

□ রূপলাবণ্যে আকর্ষণীয় অপূর্ব সুন্দরী নারী অথবা একজন সুন্দর সুপুরুষ যাকে দেখলে অভিভূত এবং অদৃশ্য আকর্ষণে ডুবে যেতে চায় তাকে নিকাহ করতে তথা বিবাহ করতে আল্লাহ মানা করে দিচ্ছেন যদি সেই মানুষটি ইমানদার না হয়। পরক্ৰমে, দাস অথবা দাসী হলেও যদি সে মোমিন হয় তবে

উহা মূশরিক হতে উত্তম। ইহার কারণটি হলো, মূশরিকেরা তাদের কর্মকাণ্ড এবং আচার-আচরণের মাধ্যমে জাহান্নামের দিকে আত্মান করে। অথচ আল্লাহ মানুষকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করে মুক্তির জগতের দিকে নিয়ে যেতে চান। কারণ জাহান্নাম এবং জাহান্নাম দুটোই সৃষ্টি। এই সৃষ্টির সব রকম বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ মুক্তিদানের ব্যবস্থাটি করেন আল্লাহ। যারা ইমান এনেছে তাদেরকে বিবাহ বিষয়ে এই সাবধানতার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। কারণ আম্মানগণ মোমিনগণের মতো নিরাপত্তার পূর্ণতার পৌছতে পারে নাই। তাই আম্মানদের পতিত হবার সম্ভব বিপদ থেকে যায়। সে জন্যই তাদেরকে বলা হচ্ছে যেন তারা মূশরিকদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়। পরক্লে, মোমিনেরাই জগতপ্তক। তারা যদি নিম্ন পর্যায়ের মানুষদের সাথে মেলামেশাও করে তবে তাদের কোনো রকম পতনের সম্ভাবনাটি থাকে না, বরং সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ নিম্নপর্যায়ে যারা অবস্থান করছে তাদের জন্য মোমিনেরাই হলো পথপ্রদর্শক।

অতি সাধারণ অর্থে এও বলা হয় যে, যারা কেবল মূর্তিপূজা করে তাদেরকেই মূশরিক বলা হয়েছে এবং যারা আহলে কেতাব তথা কেতাবধারী তাদের সঙ্গে এ-রকম মূর্তিপূজারক তথা মূশরিকদের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। সুতরাং ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। হজরত হুজায়ফা (রা.) এক ইহুদি মহিলাকে বিবাহ করলে হজরত ওমর (রা.) এই বললেন যে, 'আমি এই বিবাহকে হারাম মনে করি না, তবে আমি কেন মুসলিম নারীকে বিবাহ করলে না? আবার এ-কথাও বলা হয়ে থাকে যে, একজন মুসলমান পুরুষ খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মুসলমান মহিলার সঙ্গে খ্রিস্টান পুরুষের বিবাহ হবে না। আবার এমন হাদিসও পাওয়া যায় যে, সেই হাদিসে বলা হয়েছে, মুসলমানরা আহলে কিতাবদের মহিলাদেরকে বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু মুসলমান মহিলাদেরকে আহলে কিতাবিরা বিবাহ করতে পারবে না। এই অযাতির বিষয়ে আবু আবদুল্লাহ আহমেদ ইবনে হাম্বল বলেন যে, সেই সকল মূশরিক মহিলাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা মূর্তিপূজা করত বা করে। আরেকটি হাদিসে আম্মরা দেখতে পাই যে, দুনিয়াকে একটি সম্পদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে আর সেই সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পবিত্র রম্না।

২২২. ওয়া (এবং) ইয়াসআলুনাকা (আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে) আনিল (সম্পর্কে) মাহিদি (হায়েজ, খাত, রজঃস্রাব, মাসিকের সময়, মাসিকের স্থান, ওই দূষিত রক্ত যাহা বিশেষ সময়ে যুবতী মহিলাদের জরায়ু হইতে বাহির হয়)।

□□ এবং আপনাকে তাহারা প্রশ্ন করে (মহিলাদের) মাসিক সম্পর্কে।

+ কল (আপনি বলুন) হয়া (উহা) আজান (এমন ক্রতি বা কফু যাহা কোনো প্রাণীর প্রাণ বা দেহ পর্যন্ত পৌছাইয়া যায় - তাহা পার্থিব বা পরকালীনও হইতে পারে, অশুচি, দুঃখ, ক্রত, অপরাধ)।

□□ আপনি বলুন, উহা অশুচি।

+ ফাতাজিল (সুতরাং তোমরা দূরে থাক) নিসাজা (স্বীগণ, মহিলাগণ) ফিল (মধ্যে) মাহিদি (মাসিকের সময়ে, রজঃস্রাবকালে, হায়েজের সময়ে, খাতুর মধ্যে)।

□□ সুতরাং দূরে থাকো তোমরা স্বীদের খাতুর মধ্যে।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাকরাব (নিকটে যাইও, কাছে আসিও, নিকটবর্তী হইও, নিকটে) কুননা (তাহাদের) হাততা (যে পর্যন্ত, যতকণ পর্যন্ত) ইয়াতহলনা (মহিলার পবিত্রতাপ্রাপ্ত হয়, তাহারা পবিত্র হয়)।

□□ এবং তাহাদের নিকটে যাইও না যে পর্যন্ত (না) তাহারা পবিত্র হয়।

+ ফাইজা (সুতরাং যখন) তাহা হালনা (তাহারা পবিত্র হয়) ফাত (সুতরাং কাছে যাও) হুনা (তাহাদের) মিন (হইতে) হাইস (যেখানে, সে স্থানে) আমারা (হকুম দিয়াছেন, নির্দেশ দিয়াছেন) কুমুল (তোমাদের) লাহ (আলাহ)।

□□ সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় সুতরাং কাছে যাও তাহাদের যে-স্থান হইতে হকুম দিয়াছেন তোমাদেরকে আলাহ।

+ ইননা (নিশ্চয়ই)-লাহা (আলাহ) ইউহিব্বত (ভালোবাসেন) তাওয়াবিনা (তওবাকারীদেরকে) ওয়া (এবং) ইউহিব্বত (ভালোবাসেন) মুতাহতোয়াহেরিনা (পবিত্রতা অর্জনকারীদের, পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের)।

□□ নিশ্চয়ই আলাহ ভালোবাসেন তওবাকারীদেরকে এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।

□ এই আয়াতে স্ত্রীলোকের মাসিকের উপর জিজ্ঞাসা করা হলো এবং বলা হলো যে উহা 'আজান' তথা দঃখ, ক্লত, অপরাধ। সাধারণ অর্থে ব্যবহারিক জীবনের স্ত্রী-সহবাসের উপর ধরা হয়ে থাকে। উত্তরটি হলো, আপন উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তির উপরে থাকবার নির্দেশসহকারে ব্যবহারিক যৌন আচরণ গ্রহণ করব। 'নিসা' অর্থ হলো নারী। নারী যত রকম ভোগবিলাসের উপকরণ আছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক। যত রকম বৈষয়িক মোহ আছে তার মধ্যে চরম মোহটি হলো যৌন লালসা। এই যৌন মোহটি ত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষ মানসিকভাবে পবিত্র হয় না। যখন মোহমুক্ত থাকে তখন সেই যৌন বিষয়টি হয়ে যায় পবিত্র এবং যারা সাধক তাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য। নারীও যখন 'আজান'-মুক্ত হয় তখনই কেবল তার কাছে যাওয়া যায়, নতবা দঃখ-যাতনার মুখোমুখি হওয়াটা অনিবার্য। এই জন্য আলাহর হকুম অনুসারে স্ত্রী-সহবাস করিতে বলা হয়েছে। আলাহর দেওয়া অনুশালনের মাঝে তথা দায়েমি সালাতের মাঝে অবস্থান করে স্ত্রী-সহবাসে কোনো প্রকার অপরাধ থাকে না। মাসিক অবস্থায় মহিলারা যেমন সাময়িক অপবিত্র এবং পরিত্যাজ্য তেমনি মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিষয়গুলো তেমনি অপবিত্র এবং পরিত্যাজ্য।

নারীর সাথে মাসিকের বিষয়টি জড়িত থাকলে নারী যেমন সাময়িক অপবিত্র তেমনি বৈষয়িক মোহের মধ্যে ডুবে থাকলে মনটি হয় সাময়িকভাবে অপবিত্র। মানুষের ইন্দ্রিয়পথে যে-বৈষয়িক মোহগুলো এসে পড়ে এবং ভীড় জুমায় সেখান থেকে তওবা করে তথা মুখ ফিরিয়ে ফেলে যারা তওহীদের দিকে তথা খান্নাসরুপী শয়তান হতে মুক্তির দিকে তথা আলাহর দিকে অটল-অবিচল এবং দৃঢ়পতিষ্ঠ থাকেন আলাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন।

পরিশেষে সামান্য শরিয়তি ব্যাখ্যাটি দিতে চাই এই বলে যে, মহানবি বলেছেন, সহবাস ছাড়া অন্য সব কিছুই জায়েজ্। তাই বেশিরভাগ আলেম উলামারা বলেছেন যে, স্ত্রী-সহবাস করা যদিও বৈধ নয়, কিন্তু স্ত্রীর সহিত শ্বেশের আলাপ করাটি বৈধ। মহানবির কোনো এক স্ত্রী বলেন, মহানবি যখন স্ত্রীদের সঙ্গে মাসিক অবস্থায় আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন স্ত্রীরা লজ্জাস্থানে অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতেন। হজরত আবু দাউদ (রা.)-এর বর্ণনায়, মহানবি বাড়িতে এসেই নামাজের স্থানটিতে এসে নামাজ পড়তে থাকেন। নামাজে অনেকখানি সময় অতিবাহিত হবার পর মা আয়েশা (রা.) ঘুমিয়ে পড়েন। তখন শীতকাল ছিল, তাই শীত অনুভব করলে মহানবি মা আয়েশাকে কাছে আসতে বললেন। মা আয়েশা বললেন, আমি খাতবতী। এর পরেও মহানবি আমাকে আমার উরুর উপর হতে কাপড় সরিয়ে ফেলতে বললেন। উরুর উপর হতে কাপড় সরিয়ে ফেললে মহানবি মা আয়েশা (রা.)-র উপর কাধ মোবারক ও গাল মোবারক রেখে শুয়ে পড়েন। মা আয়েশা বলেন

যে, তখন আমিও মহানুবির উপর ঝুঁকে পড়ি। এভাবেই কিছুটা গরম অনুভব করার পর মহানুবি ঘুমিয়ে পড়লেন।

অবশেষে বলতে চাই যে এইসব কথা এবং ঘটনাগুলো যাদের জ্ঞানার ইচ্ছা আছে তারা বাজারে প্রচলিত যে-কোনো কোরান-এর তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন।

২২৩. *নিসাউকুম* (তোমাদের স্বীগণ, তোমাদের নারীগণ) *হারসুন* (ক্লেতখাম্মার, ফসল, কৃষি, বীজ বপন করা, চাষ করা, কৃষিভূমি) *লাকুম* (তোমাদের জন্য)।

□□ তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য কৃষিভূমি (উৎপাদন কেন্দ্র)।

+ *ফাত* (সুতরাং তোমরা যাও) *হারসাকুম* (তোমাদের কৃষিভূমিতে) *আননা* (যখন, যেখানে, কীভাবে) *শিতুম* (তোমরা চাহিয়াছিলে)।

□□ সুতরাং তোমরা যাও তোমাদের কৃষিভূমিতে যখন তোমরা চাও (ইচ্ছা কর)।

+ *ওয়া* (এবং) *কাদ্দিমু* (তোমরা আগে পাঠাও) *লিআনফুসিকুম* (তোমাদের নফসের জন্য)।

□□ এবং তোমরা আগে পাঠাও তোমাদের নফসের জন্য।

+ *ওয়াততাকুল* (এবং তোমরা ভয় কর) *লাহা* (আল্লাহকে) *ওয়া* (এবং) *আলাম* (তোমরা জানিয়া রাখ) *আননাকুম* (নিশ্চয়ই তোমরা) *মুলাকুহ* (তাহার সহিত মৌলাকাতে যাইতেছ, তাহার সহিত মুখাম্মখি হইতেছ)।

□□ এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং তোমরা জানিয়া রাখ নিশ্চয়ই তোমরা তাহার মৌলাকাতে (মুখাম্মখি হইতে) যাইতেছ।

+ *ওয়া* (এবং) *বাসরিল* (সুসংবাদ) *মুমিনিনা* (একমাত্র মোমিনদের জন্য)।

□□ এবং সুসংবাদ একমাত্র মোমিনদের জন্য।

□□ এই আয়াতের দু-রকম ব্যাখ্যা হয় : একটি জাগতিক এবং অপরটি মানসিক। আমরা প্রথমে মানসিক অর্থটি তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। নারীগণ অথবা নারীদের বলতে আমাদের কিছু সংখ্যক ইন্দ্রিয়পথে আসা মায়ার বন্ধনের জটলাগুলোকে বোঝায়। এই মায়ার বন্ধনের জটলাগুলোকেই আমাদেরকে উৎপাদন করার কেন্দ্র বলে বোঝানো হয়েছে। তাই ইহার উপরে ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের উপর ধৈর্যসহকারে দণ্ডায়মান হতে পারলে আপনার অভ্যন্তরে তৈরি হয় তওহিদ এবং যে ইহা করতে এগিয়ে না আসবে সে উৎপাদন করবে মোহমায়ার জটলা তথা শেরেকের গাটতি। প্রতিটি মানুষকে ভালো এবং মন্দ যে-কোনো একটি গ্রহণ অথবা বর্জনের জন্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এবং নির্বাচন করার অধিকারটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একটি মানুষ এই দুইটির যেকোনো ইচ্ছা অগ্রসর হতে পারে। সুতরাং আমাদের নফসের মঙ্গলের জন্য যেকোনোটি যেন মোহমায়ার জটলা তথা শেরেক দিয়ে না ভরে সে জন্য পূর্বেই দায়েমি সালাতের অনুশীলন করা উচিত। তাই আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহর দেওয়া কর্তব্যটি কর। কারণ, তোমরা তাহার মৌলাকাতে যাইতেছ। মৌলাকাত তথা মুখোম্মখি

হওয়াটা একমাত্র মোমিনদের জন্যই মহাসুসংবাদ। সুতরাং ইমান আনিার পর ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে খান্নাসমুজ্জ নফস তথা পরিপুঙ্ক হতে পারলেই মোমিন হওয়া যায় এবং এই মোমিনদের জন্যই একমাত্র মৌলাকাতের সুসংবাদটি দান করা হয়েছে।

এখন জাগতিক ব্যাখ্যাটি বহু হাদিসের দলিলপ্রমাণগুলোসহ তুলে ধরতে গেলে বিরাট আকার ধারণ করে। সুতরাং যারা জাগতিক অর্থাৎ জ্ঞানতে চায় তারা বাজারের প্রচলিত কোরান-এর তফসির দেখে নিতে পারেন।

২২৪. *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তাজ্জালু* (তোমরা বানাও, তোমরা বানাইতে থাক, তোমরা কর, তোমরা করিতে থাক)-*লাহা* (আল্লাহর) *উরদাতান*

(নিশানা, আড়, আডাল, প্রতিবন্ধক, কোনো পন্যকে বিক্রয় করার জন্য বাজারে উপস্থিত করা, যাহা আড় হইয়া যায় তাহাই বাধা হইয়া যায়) *লিআইমানিকুম* (তোমাদের কসমের জন্য, তোমাদের শপথের জন্য) *আন* (যে) *তাবারক* (তোমরা ভালো কাজ কর, তোমরা পরোপকার কর - তাবারক মূল শব্দটি হইল 'বারকন' এবং 'বারকন' শব্দটির অর্থ হইল : উপকারী, সদ্যুহারকারী, পরোপকারী) *ওয়া* (এবং) *তাত্তাকু* ('ইত্তেকাউ' হইতে শব্দটির আগমন। *ইত্তেকাউ* অর্থ : পরহেজ করা, বাচিয়া থাকা, তোমরা বাচিয়া থাক, তোমরা ভয় কর, তোমরা পরহেজগার থাক, আত্মসংযাত হইতে বিরত থাক। *তাত্তাকু*-র মূল শব্দটি এই জন্যই দেওয়া হইল যে অনেকে ইহাকে 'তাকওয়া' মনে করে। যদিও শব্দটির অর্থ 'তাকওয়া'-র অনেকটাই কাছাকাছি তবে 'তাকওয়া' শব্দটির ব্যবহার করা কতটুকু সঠিক উহা আমরা জানা নাই) *ওয়া* (এবং) *তুসলিহ* (তোমরা আপোষ করাও, তোমরা সংস্কার কর, তোমরা সাজাও। 'ইসলাহন' নামক মূল শব্দটি হতে ইহার আগমন। মূল 'ইসলা' শব্দটির অর্থ সংশোধন) *বাইনা* (মাঝে, মধ্যে) *নাসি* (মানুষদের, লোকদের, জনতার)।

এবং তোমরা ব্যবহার করিও না আল্লাহর (নামটি) প্রতিবন্ধক (হিসাবে) তোমাদের শপথের (ওয়াদার) জন্য (এইজন্য) যে তোমরা পরোপকার কর (ভালো কাজ কর) এবং তোমরা আত্মসংযাত হইতে বিরত থাক (আত্মসংযম কর) এবং তোমরা আপোষ করাও (তোমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা কর) মানুষদের মাঝে (জনতার মধ্যে)।

+ *ওয়া* (এবং)-*লাহ* (আল্লাহ) *সামিউন* (শোনেন) *আলিমুন* (জানেন)।

এবং আল্লাহ শোনেন, জানেন।

২২৫. *লা* (না) *ইউআখিজুকুম* (তোমাদেরকে ধৃত করিবে, তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে, তোমাদেরকে ধরিবে)-*লাহ* (আল্লাহ) *বিল্লাগবি* (অহেতুক [শপথের] জন্য; বেহদা কথা, কাজ, বস্তু, গুণ; ওই কসম [শপথ]-কে বলা হয় যাহা নিয়ত ব্যতীত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথায়-কথায় মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে, বেহদা শপথ) *ফি* (মধ্যে) *আইমানিকুম* (তোমাদের শপথের) *ওয়া* (এবং) *লাকিন্* (কিন্তু) *ইউআখিজু* (তিনি ধরিবে), *কুম্* (তোমাদের) *বিম্মা* (যাহা) *কাসাবাত* (সে ভালো কাজ করিয়াছে, সে উপার্জন করিল) *কুলুবুকুম্* (তোমাদের অন্তরগুলি)।

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করিবে না অহেতুক (শপথের) জন্য, তোমাদের শপথগুলির মধ্যে এবং কিন্তু তিনি ধরিবে তোমাদেরকে যাহা উপার্জন করিয়াছে তোমাদের কলব (অন্তর) গুলি।

+ *ওয়া* (এবং)-*লাহ* (আল্লাহ) *গাফুরকন* (পরম ক্ষমাশীল) *হালিমুন* (ধৈর্যশীল)।

এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

এই আয়াতে আমাদেরকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যেন বারবার কারণে-অকারণে শপথের বদ-অভ্যাসটি ত্যাগ করা হয়। শপথ করার পর সেই শপথের হেফাজত না করতে পারলে শপথের মর্যাদাটুকু দুর্বল (ক্ষীণ) হতে থাকে এবং এই জন্য কাফ্যারা দেওয়া উচিত। কারণ ইহাতে কথার মাঝে সংযম এবং সত্যবাদিতার মহত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানুষের মন যাতে শৃঙ্খলার বন্ধনটি অটুট রাখতে পারে সে জন্যই শপথ করার বিষয়টিতে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্য যে-কোনো মহৎ কাজ করতে গিয়ে বারবার আল্লাহর কসম খাওয়াটি সমীচীন নয়। কারণ আল্লাহর আবরণটি মানুষের আবরণের মানদণ্ডের অনেক উর্ধ্বে। কারণ আল্লাহ তো মনের খবরগুলো জানেন। সুতরাং কথায়-কথায় আল্লাহর নামে

কসম করলে মানুষের মনের মধ্যে আল্লাহর মহত্ত্বটির গুরুত্ব অনেকখানি কমে যায়। মনের সব রকম খবরই তো আল্লা জানেন, সুতরাং কসম খাওয়ার বাড়াবাড়ি অথবা অসাড়তা আল্লাহ জানবার পরেও পাকড়াও করেন না, বরং মানুষকে পাকড়াও করেন তার অন্তরের কর্মগুলো ভালো হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে সেই মানদণ্ডে। মনের মধ্যে যে যে-রকম চিন্তাভাবনা করে এবং যে যাহা চাহিতে থাকে উহার দ্বারাই মানুষ খান্নাসরূপী শয়তানের বন্ধনে তথা মোহমায়ার বাধনে তথা ষড়রিপুর ঘেরাটোপে ধরা পড়ে যায়। যে-মন ধৈর্যধারণ করতে পারে না, সেই মনই বস্তুজগতের মায়ার বন্ধনে আকৃষ্ট হয়ে জড়িয়ে পড়ে, যার ফলে আল্লাহর ক্রমা পাবার কথাটি অনেক দূরের বিষয়ে পরিণত হয়। ধৈর্যধারণ করে আপন মনের মাঝে খান্নাসরূপী মোহমায়ার আকর্ষণ হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে অবিরাম চেষ্টা করলে আল্লাহর ক্রমাশীলতার পরিচয়টি তখনই পরিষ্কার বুঝতে পারে।

২২৬. *লিল্লাজিনা* (যাহাদের জন্য) *ইউলুনা* (সম্পর্ক রাখিবে না বলিয়া শপথ করে) *মিন্* (হইতে) *নিসাইহিন্* (তাহাদের স্বীদের, তাহাদের নারীদের) *তারাব্বুস্* (অপেক্ষা করা, কোনো জিনিসের শস্তা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা) *আরবাঈন্* (চার) *আশহরিন্* (মাস)।

যাহাদের জন্য সম্পর্ক রাখিবে না বলিয়া শপথ করে তাহাদের স্বীদের হইতে, অপেক্ষা করিবে চার মাস।

+ *ফাইন্* (সুতরাং যদি) *ফাউ* (সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসে) *ফাইন্না* (সুতরাং নিশ্চয়ই) - *লাহা* (আল্লাহ) *গীফুর্* (ক্রমাশীল) *রাহিমুন্* (রহিম, পরম দয়ালু, মেহেরবান)।

সুতরাং যদি সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসে সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ রহিমরূপী ক্রমাশীল।

২২৭. *ওয়া* (এবং) *ইন্* (যদি) *আজাম্* (তাহারা দৃঢ় ইচ্ছা করিল) *তালাকা* (তালাকের, বিচ্ছেদের, আলাদা হওয়া) *ফাইন্না* (সুতরাং নিশ্চয়ই) - *লাহা* (আল্লাহ) *সামিউন্* (শোনে) *আলিমুন্* (জানেন)।

এবং যদি তাহারা দৃঢ় ইচ্ছা করে তালাকের সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনে, জানেন।

এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, আরবরা রাগান্বিত হয়ে নিজের স্বীর নিকটে যাবে না বলে শপথ করত। এইরূপ শপথ করার পর তারা স্বীর দেখাশোনা করত না, আবার তালাকও দিয়ে দিত না। এর ফলে স্বীরা যার-পর-নাই দুঃখকষ্টে জর্জরিত হতো। সুতরাং এই আয়াতে তারই একটি সমাধান করার কথাটি বলা হলো। যদি শপথ করবার পরেও চার মাসের মধ্যে স্বামী-স্বী আবার মিলিত হয় তাহলে ওই শপথ ভাঙবার জন্য কাফকারা দিয়ে আগের অবস্থায় যাবার অনুমতি দেওয়া হলো। এই চার মাসের মাঝে যদি স্বামী-স্বী মিলিত না হয় তাহলে আপনা-আপনি তালাক তথা সম্পর্কের বিষয়টি ছিন্ন হয়ে যাবে বলে বলা হয়েছে। স্বামী এবং স্বীর এই মিলন এবং বিচ্ছিন্নতাকে উপলব্ধি করে তালাকের সৌকর্য্যটি বলা হয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। বৈষয়িক ব্যাখ্যাটি দিতে গেলে অনেক রকম দলিলপত্র দেওয়া যায়, কিন্তু তা আর দিলাম না।

২২৮. *ওয়াল* (এবং) *মুতাল্লাকাত্* (তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণ, ওই সমস্ত মহিলা যাহাদেরকে তালাক দেওয়া হইয়াছে, যে-সব স্বীলোকদেরকে তালাক দেওয়া হইয়াছে) *ইয়াতারাব্বাস্না* (বিবাহ হইতে বিরত থাকিবে, অপেক্ষা করিবে, বিরত রাখিবে, প্রতীক্ষায় থাকিবে) *বিআনফসিহিন্না* (তাহারা নিজেদের নফসকে) *সালাসাটা* (তিন) *কুরুইন্* (মাসিক খতুস্রাব)।

□□এবং তালুকপ্রাপ্ত মহিলাগণ বিরত রাখিবে তাহাদের নিজেদের নফসকে তিন মাসিক খাতস্রাব (পর্যন্ত)।

+ ওয়া (এবং) লা (না) ইয়াহিন্ন (হালাল, বৈধ) লাহননা (তাহাদের জন্য) আই (যে) ইয়াখতম্না (তাহারা গোপন রাখিবে) মা (যাহা) খালাকা (সৃষ্টি করিয়াছেন)-লাহ (আল্লাহ) ফি (মধ্যে) আবহামিহিন্না (তাহাদের গর্ভে, তাহাদের বাচ্চাদানিতে) ইন্ (যদি) হননা (যদি হয়) ইউমিন্না (ইমান আনা) বিলাহি (আল্লাহর প্রতি) ওয়াল (এবং) ইয়াওমিন (দিনে) আখিরি (আখেরাতের)।

□□এবং হালাল হইবে না তাহাদের জন্য যে তাহারা গোপন রাখিবে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ তাহাদের বাচ্চাদানির মধ্যে যদি, যদি হয় আল্লাহর প্রতি ইমানদার এবং আখেরাতের দিনে।

+ ওয়া (এবং) বুতলাতহননা (তাহাদের স্বামীগণ) আহাক্ক (অধিকার রহিয়াছে, হক রহিয়াছে, বেশি বড় হকদার) বিরাদ্দি (ফিরাইয়া আনা, পুনরায় গ্রহণের, পুনঃগ্রহণে) হিন্না (তাহাদেরকে) ফি (মধ্যে) জালিকা (ওইটাই) ইন্ (যদি) আরাদ (তাহার এরাদা করে, তাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা চায়) ইস্লাহান (সংশোধন, আপোষনিশ্চিতি, একমত করানো, বিরোধ দূর করা, সমন্বয়সাধন করা, খাপ খাওয়ানো, মিলনসাধন করানো, পুনরায় বন্ধুত্বস্থাপন করা)।

□□এবং তাহাদের স্বামীগণের হক রহিয়াছে তাহাদেরকে ফিরাইয়া নেওয়ার মধ্যে, ওইটাই বিরোধ দূর করা যদি তাহারা চায়।

+ ওয়া (এবং) লাহননা (তাহাদের আছে) মিসলন্ (যেমন) লাজ্জি (যাহারা যে-সমস্ত) আলাইহিন্না (তাহাদের উপর) বিলমাক্কাফি (ন্যায়সঙ্গত অধিকার)।

□□এবং তাহাদের (নারীদের) আছে (অধিকার) যেমন যে-সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার (আছে) তাহাদের উপর।

+ ওয়া (এবং) লিবরিজ্জারি (পুরুষদের জন্য) আলাইহিন্না (তাহাদের উপর) দারাজাতন্ (মর্যাদা, ধাপ, সিঁড়ি)।

□□এবং পুরুষদের জন্য তাহাদের উপর (নারীদের) মর্যাদা রহিয়াছে।

+ ওয়া (এবং)-লাহ (আল্লাহ) আজিজুন্ (সর্বোচ্চ শক্তিশালী) হাকিম (হেকমতওয়ালা)।

□□এবং আল্লাহ সর্বোচ্চ শক্তিশালী হেকমতওয়ালা।

□ এই দুনিয়ার জীবনে যদি মিয়া-বিবির নাতি, আদর্শ এবং চরিত্র নিয়ে উভয়ের মাঝে বিরোধ বেধে যায় এবং অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে তাহলে সংসার জীবনটি হয়ে ওঠে অশান্তিময়। এই-রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওই অশান্তিটি দূর করতে চাইলে তালকের যে-নিয়মটি দেওয়া হয়েছে উহা একান্ত দরকার। কোরান এই তালকের নিয়মটি সহজ এবং সুন্দর করে দিয়েছেন, যাহাতে সামান্য কারণে-অকারণে তালাক না দিয়ে নিয়মটি মেনে নেওয়া হয়। তাহলে দুনিয়ার জীবনে সুখশান্তির বিষয়টি বিশৃঙ্খলার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তথা পবিত্রতার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। মাসিক থাকা অবস্থায় অথবা সহসা স্ববির্জন নিষিদ্ধ। প্রতিটি মাসিকের অবস্থাটি পার হয়ে যাবার পর দৈহিক পবিত্র অবস্থায় একবার মাত্র তালকের কথাটি প্রকাশ করে অপেক্ষা করার কথাটি বলা হয়েছে। স্বীর উপর স্বামীর যেমন তালাক দেবার অধিকারটি আছে তেমনি স্বরিণও স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার আছে। যদিও পুনরায় গ্রহণের বিষয়ে স্বী হতে স্বামীর অধিকারটি একটু বেশি। তচ্ছ কারণে অথবা কোনো প্রকার রাগের বশে স্বী-তালাক দেবার প্রথাটি প্রতিরোধ করার জন্যই তিন খাতকাল অপেক্ষা করবার আইনটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কারণ এই অপেক্ষা করার মাঝে উভয়ের মন ও মানসিকতা স্বাভাবিক হয়ে উঠলে মিলিত

হবার সুযোগটি লাভ করতে পারবে। তিনটি খাতকাল অপেক্ষা করা একটি সাধারণ আইন। এরই মাঝে যদি বোঝা যায় যে স্বী গভবতী হয়ে গেছে তাহলে প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ-রকম অপেক্ষাকালের মাঝে যদি স্বামী-স্ত্রীর মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তালাকের কথাটি আর প্রযোজ্য হবে না।

২২৯. *আততালাক* (তালাকটি) *মাররাতানি* (দুইবার)।

□□তালাকটি দুইবার।

+ *ফাইন্সাকুম* (সুতরাং থামাইয়া রাখা) *বিমাকফিন* (ভালো কাজের সহিত, বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মতভাবে) *আত্ত* (অথবা) *তাস্রিহম* (বাহির করিয়া দেওয়া, বিদায় করিয়া দেওয়া, ছাড়িয়া দেওয়া, রওনা করা - 'সারহন' মূল শব্দটির অর্থ হলো চতুষ্পদ গৃহপালিত পশুসমূহকে ফলবান বৃক্ষের মধ্যে চড়ানো। ব্যাপক অর্থে চড়াইতে পাঠানোকে 'সারহম' বলা হয়। তারুপর রূপকভাবে ছাড়িয়া দেওয়া এবং পাঠানো অর্থে ব্যবহার হইতে থাকে) *বিইহসানিন* (এহসানের সহিত, নেক কাজ করা, অন্যের জন্য ভালো করা, ভালো কাজ জানা এবং অন্যের ভালো কাজের আজ্ঞাম দেওয়া, সদয়ভাবে, পরোপকারের সহিত, অনুগ্রহের সহিত)।

□□সুতরাং থামাইয়া রাখা ন্যায়সম্মতভাবে অথবা মুক্ত করিয়া দাও এহসানের সহিত।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইয়াহিনলু* (হালান, বৈধ) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *আন* (যে) তাখুজ্জ (গ্রহণ করা, ধরিয়া রাখা) *মিম্মী* (যাহা) *আতাইতম* (তোমরা আতা করিয়াছ, তোমরা দিয়াছ) *ইননা* (তাহাদেরকে) *শাইয়িন* (কিছু, বস্তু; 'শাআ' ইহার মূল শব্দ) *ইল্লা* (কিছু, একমাত্র, ব্যতীত) *আই* (যদি, এই যে, হইতে) *ইয়াখাফা* (দুইজনে ভয় করে) *আল্লা* (এটা নয় কি, কেন নয়, কেননা) *ইউকিমা* (তাহারী দুইজন রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, মানিয়া চলিতে পারিবে না - 'ইকামাতুন' ইহার মূল শব্দ) *ইদুদা* (সীমারেখাগুলি, সীমানা, চৌহদ্দী - 'ইদা' ইহার মূল শব্দ)-*লাহি* (আল্লাহর)।

□□এবং হালান হইবে না তোমাদের জন্য যে তোমরা গ্রহণ করিবে যাহা তোমরা আতা করিয়াছ তাহাদেরকে কিছুই কিছু যদি দুইজনে ভয় করে কেন না তাহারা দুইজনে মানিয়া চলিতে পারিবে না আল্লাহর সীমারেখাগুলি।

+ *ফাইন* (সুতরাং যদি) *খিফতম* (তোমরা ভয় কর) *আল্লা* (যে) *ইউকিমা* (দুইজনে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না, মানিয়া চলিতে পারিবে না) *ইদুদা* (সীমারেখাগুলি)-*লাহি* (আল্লাহর)।

□□সুতরাং যদি তোমরা ভয় কর যে দুইজনে রক্ষা করিতে পারিবে না আল্লাহর সীমারেখাগুলি।

+ *ফালা* (সুতরাং নাই) *জুনাহা* (গুনাহ, পাপ) *আলাইহিমা* (তাহাদের দুইজনের উপর) *ফিমা* (তাহাদের দুইজনের মধ্যে) *আফতাদাত* (বিনিময় দিয়া) *বিহি* (ইহা দিয়া)।

□□সুতরাং নাই গুনাহ তাহাদের দুইজনের উপর তাহাদের দুইজনের মধ্যে ইহার দ্বারা বিনিময় দাও।

+ *তিলকা* (ওইটাই) *ইদুদল* (সীমারেখা)-*লাহি* (আল্লাহর) *ফালা* (সুতরাং না) *তাহতাদহা* (তাহা তোমরা লঙ্ঘন কর)।

□□ওইটাই আল্লাহর সীমারেখা সুতরাং তাহা তোমরা লঙ্ঘন করিও না।

+ *ওয়া* (এবং) *মাই* (যে) *ইয়াতাদদা* (লঙ্ঘন করে, অতিক্রম করে) *ইদুদল* (সীমারেখাগুলি)-*লাহি* (আল্লাহর) *ফাউলাইকা* (সুতরাং উহারাই) *ইমুজ্জ* (তাহারাই) *জোয়ালিমুনা* (জালেম)।

□□এবং যে লঙ্ঘন করিবে আল্লাহর সীমারেখাগুলি সুতরাং উহারাই তাহারা জ্বালেম।

□ এই আয়াতে প্রথমেই বলা হলো : তালাক দুইবার। তালাকের কথাটি দুবার মুখে উচ্চারণ করাটিকে বোঝানো হয় নি, বরং বোঝায় দুইবার তালাক দেওয়া। একবার তালাক দেবার পরেও ইহার প্রবাহটি থেকে যায়। সেই প্রবাহটির উপর আঘাত হেনে পরে তালাক বিষয়টি সম্পন্ন করতে হয়। সুতরাং এভাবেই তালাক দুইবার বোঝানো হয়েছে। তারপরে আবার বলা হলো যে, দুইবার তালাক দেবার পরেও জ্ঞানের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে অথবা এহসানের সহিত হালকা করা যায়। জ্ঞানের সহিত অথবা এহসানের সহিত পরিত্যাগ্য বিষয়টি গ্রহণ করা না-করা একজনের একান্ত নিজস্ব বিষয়। এখানে জ্ঞান এবং এহসান এই দুটোকেই মূল বিষয় বলে ধরা হয়েছে। যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে সেই নারীর কোনো কিছুই চাওয়া-পাওয়ার আওতায় আনা মোটেই হালানু নয়। যদি লক্ষ করা যায় যে, আল্লাহর বিধানসমূহের সীমা রক্ষা করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন করতে পারে তাহলে মুক্তিপণ হিসাবে তালাক-দেওয়া নারী হতে কিছু গ্রহণ করে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এই রকম বিষয়ে তাদের দুজনের উপর কোনো অন্যায় হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। তালাক-বিষয়ে এইগুলিই হলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এই সীমারেখা যারা ইচ্ছা করে ডিঙিয়ে যাবে অথবা লঙ্ঘন করতে চাইবে তাদেরকেই অত্যাচারী বলা হয়েছে।

২৩০. ফাইন (সুতরাং যদি) কাল্লাকাহা (সে তালাক দেয় তাহাকে) ফালা (সুতরাং না) তাহিল্লু (হলাল, বৈধ) লাহ (তাহার জন্য) মিম্বাদ (ইহার পরে) হাততা (যতক্ষণ না, যে পর্যন্ত না) তানকিহা (নিকাহ করে) জাহিজান (স্বামী) গাইরা (অন্য, ব্যতীত) হ (সে)।

□□সুতরাং যদি সে তালাক দেয় তাহাকে সুতরাং হালাল হইবে না তাহার জন্য ইহার পরে যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী নিকাহ করে।

+ ফাইন (সুতরাং যদি) কাল্লাকাহা (সে তালাক দেয় তাহাকে) ফালা (সুতরাং না) জুনাহা (গুনাহ, পাপ) আলাইহিমা (তাহাদের দুইজনের উপর) আই (যে, এই যে, হইতে) ইয়াতারাআ (পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া) ইন (যদি) জান্না (দুইজনেই মনে করে) আই (যে, এই যে, হইতে) ইউকিমা (তাহারা দুইজনে রক্ষা করিতে পারিবে) হুদুদাল (সীমারেখা) লাহি (আল্লাহর)।

□□সুতরাং যদি সে তালাক দেয় তাহাকে সুতরাং গুনাহ নাই তাহাদের দুইজনের উপর যে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, যদি দুইজনেই মনে করে যে তাহারা দুইজনে রক্ষা করিতে পারিবে আল্লাহর সীমারেখা।

+ ওয়া (এবং) তিলকা (ওইটাই) হুদুদল (সীমারেখা) লাহি (আল্লাহর) ইউবাইহিনুহা (তাহা সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন) লিকাউমি (সম্প্রদায়ের জন্য) ইয়ালামুনী (জানী)।

□□এবং ওইটাই আল্লাহর সীমারেখা তিনি তাহা সুস্পষ্ট বর্ণনা করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

□ এই আয়াতেও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর তা হলো জ্ঞান প্রয়োগের কথাটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তালাক এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয় যে ইহা জ্ঞানী লোকের নিয়ন্ত্রণে না থাকলে গণ্ডগোল হবার সম্ভব বিপদ থেকে যায়। তালাক বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীর মিলন-বিচ্ছেদের সঙ্গে যেমন সম্পর্কযুক্ত তেমনই আবার বিষয়সমূহের মোহের বন্ধন হতে মুক্তিলাভের সূক্ষ্ম নিয়ম-পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

এই আয়াতে এটুকুও জ্ঞানিতে পারলাম যে, প্রথম অথবা দ্বিতীয় তালাকের মধ্যে তাদেরকে গ্রহণ করে নিতে পারবে, কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে

নেবার অধিকারটুকু রহিত করা হলো। তালুকটি দুইবার হলেও ওজর-আপত্তি থেকে যথি কিছু যদি তিন তালুক দিয়ে ফেলে তাহলে পুনরায় আর গ্রহণ করা চলবে না।

২৩১. ওয়া (এবং) ইজা (যখন) তালুকতম্বন (তোমরা তালুক দাও) নিস্যাআ (নারীদেরকে, স্বীদেরকে) ফারালাগনা (সুতরাং তাহারা [নারীরা] পৌছিল) আজালাহনা (তাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ, তাহাদের নির্দিষ্ট মুদৎ, তাহাদের মৃত্যু) ফাআমসিকহনা (সুতরাং তাহাদেরকে [নারীদের] বাধা দিয়া থামাইয়া রাখা, তাহাদেরকে রাখা) বিমারুফিন (বিধি-মোতাবেক, বিধিসম্মতভাবে, ভালো কাজের সহিত) আও (অথবা) সারবিহ (মুক্ত করিয়া দেওয়া) হনা (তাহাদের [নারীদের]) বিলমারুফিন (বিধি-মোতাবেক, বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মতভাবে, ভালো কাজের মাধ্যমে)।

এবং যখন তোমরা তালুক দাও নারীদেরকে সুতরাং তাহারা পৌছে তাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদে সুতরাং তাহাদেরকে বাধা দিয়া থামাইয়া রাখা বিধি-মোতাবেক (ন্যায়সম্মত উপায়ে) অথবা মুক্ত করিয়া দাও তাহাদের (নারীদের) বিধি-মোতাবেক (ন্যায়সম্মত উপায়ে)।

+ ওয়া (এবং) না (না) তামসিক (তোমরা আটকাইয়া রাখিও) হনা (তাহাদেরকে [নারীদের]) দিলারান (কষ্ট দেওয়া, ক্রটিগ্রস্ত করা, উদ্ধানি দেওয়া) লিতাতাদ (বাড়াবাড়ি করার জন্য, তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না)।

এবং বাড়াবাড়ি করার জন্য ক্রটিগ্রস্ত করা (হইতে) তাহাদেরকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না।

+ ওয়া (এবং) মান (যে) ইয়াহআল (করে) জালিকা (ওইরূপ) ফাকাদ (সুতরাং নিশ্চয়ই) জালামা (জুলুম করে) নাক্সাহ (তাহার নফসের, তাহার নিজের)।

এবং যে ওইরূপ করে সুতরাং নিশ্চয়ই জুলুম করে তাহার নফসের।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাততাহিজ (তোমরা ধরো, তোমরা বানাও) আয়াতিন (আয়াতকে, নিদর্শনকে)-লাহি (আল্লাহর) হজুয়ান (ঠাট্টার পাত্র, ঠাট্টা করা)।

এবং তোমরা ধরিও না আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টার পাত্র (রূপে)।

+ ওয়াজ (এবং) কর (তোমরা জিকির কর) নিমাতান (নেয়ামতকে, অনুগ্রহকে)-লাহি (আল্লাহর) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ওয়া (এবং) মা (যাহা) আনিজালা (নাফেল করা হইয়াছে) আলাইকুম (তোমাদের উপর) মিনাল (হইতে) কিতাবি (কেতাব) ওয়াল (এবং) হিকমতি (হেকমত) ইয়াইজুকুম (তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন) বিহি (ইহার দ্বারা, তাহার সঙ্গে, উহা দিয়া)।

এবং তোমরা জিকির কর তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে এবং যাহা নাফেল করিয়াছেন তোমাদের উপর কেতাব এবং হেকমত হইতে, ইহার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন।

+ ওয়াত (এবং) তাকুল (ভয় কর)-লাহা (আল্লাহকে) ওয়া (এবং) ইলাম (তোমরা জানিয়া রাখি) আন্বাল (নিশ্চয়ই)-লাহা (আল্লাহ) বিকুল্লি (প্রত্যেকের সহিত) শাইইন (বস্তু, বিষয়) আলিম্বন (জানেন)।

এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে জানেন।

এই আয়াতে নারীত্বকে তালুক দেওয়ার কথাটাই প্রধানত বলা হয়েছে। এখানে স্বী-তালুক দেওয়াটা একটি উপলব্ধি মাত্র। সৃষ্টির মধ্যে আমরা সবাই নারী তথা প্রকৃতি। আমাদের এ-রকম নারীত্ব বর্জন করে পুরুষ হতে চাইলে মোহ-মায়ার বন্ধন হতে ধ্যানসাধনার তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের সাহায্যে মুক্তিলাভ করতে হবে। মোহ-মায়ী তথা খান্নাসরুপী

শয়তানকে ত্যাগ করার সাধনায় কামিয়াব হয়ে কোনো বিষয় ধরে রাখতে চাইলে উহা আর দোষণীয় হয় না। কারণ মায়ী তথা খান্নাস সব বুদ্ধ কৰ্মকেই কলুষিত করে ফেলে। এই বিষয়টির উপর যদি সম্ম্যক ধারণাটি না থাকে তাহলে উহাই পরিণত হয় নফসের উপর জুলুম। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় লুকিয়ে আছে। ধ্যানসাধনার দ্বায়েমি সালাত ছাড়া বিষয়গুলো খেল-তামাশায় পরিণত হয়। একই ধাতুর পদার্থ দিয়ে অপারেশন করার ছুরি এবং কসাইর ছুরি তৈরি হয়। সাজেনের নিয়তি থাকে বাচাবার, অপরপক্ষে কসাইর নিয়তি থাকে গোস্ত বিক্রি করার। মনের মাঝে মোহমায়ার খান্নাসরূপটি তাড়িয়ে দিলে বিষয়বস্তুকে ধারণ করার রূপটি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

২৩২. ওয়া (এবং) ইজ্জা (যখন) তালাকতমুল (তোমরা তালাক দাও) নিসাতা (নারীদেরকে, স্বীদেরকে) ফাবালাগুনী (সুতরাং তাহারা পোছাইয়া যায়) আজ্জালাহননা (তাহাদের [নারীদের] নির্দিষ্ট মেয়াদে) ফালা (সুতরাং না) তাদলু (বাধা দেওয়া) হননা (তাহাদেরকে [নারীদের]) অনি (যদি) ইয়ানিকিনা (তাহারা নিকাহ করিতে চায়) আজ্জওয়াজ্জোহননা (তাহাদের স্বামীগণ) ইজ্জা (যখন) তারাদাও (রাজি হওয়া) বাইনাহম (তাহাদের মধ্যে) বিলম্বাকফি (বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মত উপায়ে, ভালো কাজের মাধ্যমে)।

এবং যখন তোমরা তালাক দাও নারীদেরকে সুতরাং তাহারা পোছাইয়া যায় তাহাদের (নারীদের) নির্দিষ্ট মেয়াদে সুতরাং বাধা দিও না তাহাদেরকে (নারীদের) যদি তাহারা নিকাহ করিতে চায় তাহাদের স্বামীদেরকে যখন তাহারা রাজি হয় তাহাদের মধ্যে ন্যায়সম্মত উপায়ে (বিধিসম্মতভাবে)।

+ জালিকা (ওইটাই) ইউজ্জা (উপদেশ দেওয়া হইতেছে) বিহি (ইহার দ্বারা, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) মানু (যে) কানা (ছিল) মিনকুম (তোমাদের মধ্য হইতে) ইউমিনু (ইমান আনে) বিল্লাহি (আল্লাহর সহিত) ওয়াল (এবং) ইয়াওমিনু (দিনে) আখিরি (আখেরাতের)।

ওইটাই ইহার দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে ছিল তোমাদের মধ্য হইতে ইমান আনে আল্লাহর সহিত এবং আখেরাতের দিনে।

+ জালিকুম (ওইটাই তোমাদের) আজ্জা (বেশি পবিত্র, চরম শুদ্ধি) লাকুম (তোমাদের জন্য) ওয়া (এবং) আত্হাক (পবিত্রতম, পবিত্রতা)।

ওইটাই তোমাদের বেশি পবিত্র এবং তোমাদের জন্য পবিত্রতম।

+ ওয়াল (এবং) -লাহ (আল্লাহ) ইয়ালামু (জানেন) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) লা (না) তালামুনা (জানো)।

এবং আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে-স্বীদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছিল তাদের মেয়াদ শেষ হলে যদি স্বামী এবং স্বী উভয়ে রাজি থাকে তাহলে পুনরায় মিলতে পারবে এবং ইহাতে তাদেরকে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া মোটেই সম্মত নয়। এখানে পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই আয়াতের আতি চমৎকার রহস্যের উপর ভিত্তি করে যিনি ব্যাখ্যাটি লিখেছেন সেই বিখ্যাত শাহ সুফি সুদূর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

২৩৩. ওয়াল (এবং) ওয়ালিদাত (জননীরা, মায়েরা) ইউউদ্দিনা (স্বন্যদুগ্ধ পান করাইবে) আওলাদা (সন্তানদের) হননা (তাহাদের [নারীদের]) হাউলাইনি (দুই বছর - 'হাউলু' একবচন হইতে দ্বিবচনে 'হাউলাইনি' হইয়াছে) কামিলাইনি (পূর্ণ, পরিপূর্ণ) লিমান (তাহার জন্য যে) আরাদা (ইচ্ছা করিয়াছিল, চাহিয়াছিল) আই (যে) ইউউতিম্মার (পূর্ণ করিতে) রাদাআতা (স্ব ন্যপান করানো)।

□□এবং জননীরা (মায়েরা) স্তন্যপান করাইবে তাহাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর তাহার জন্য যে ইচ্ছা করিয়াছিল পূর্ণ করিতে স্তন্যপান করানোর (জন্য)।

+ ওয়া (এবং) আলাল (উপর) মাউলুদীলাহ (যাহার সন্তান) রিজুকুহননা (তাহাদের [মায়েদের] খোরাক) ওয়া (এবং) কিসুওয়াতুহননা (তাহাদের পোশাক, তাহাদের কাপড়-চোপড়) বিলম্বাকুফি (বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মত উপায়ে)।

□□এবং যাহার সন্তান (তাহার) উপর তাহাদের (মায়েদের) খোরাক এবং তাহাদের কাপড়-চোপড় বিধিসম্মত উপায়ে (দিতে হইবে)।

+ লা (না) তাকুল্লাহ (কষ্ট দেওয়া হইবে) নাকসুন (নফসকে) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) উস্বাহা (তাহার সাধ্য, তাহার ক্ষমতা)।

□□নফসকে কষ্ট দেওয়া হইবে না তাহার সাধ্য ব্যতীত।

+ লা (না) তদাবরা (তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহাকে উত্যক্ত করা হয়) ওয়ালিদাতন (মা) বিওয়ালাদিতা (তাহার সন্তানের কারণে, তাহার বাচ্চার কারণে) ওয়া (এবং) লা (না) মাউলুদন (জন্ম হওয়া, জন্মপ্রাপ্ত, নবজাত) লাহ (তাহার, যাহার) বিওয়ালাদিতি (তাহার [জনক])।

□□মাকে কষ্ট দেওয়া যাইবে না তাহার বাচ্চার কারণে এবং জনককে তাহার সন্তানের জন্য (কষ্ট দেওয়া যাইবে) না।

+ ওয়া (এবং) আলাল (উপর) ওয়ারিসি (উত্তরাধিকারীদের) নিসলু (অনুরূপ) জালিকা (ওইরূপ)।

□□এবং উত্তরাধিকারীদের উপরও ওইভাবেই অনুরূপ (কর্তব্য)।

+ ফাইন (সুতরাং যদি) আরাদা (ইচ্ছা করে) ফিসালান (দুধ ছাড়াইতে) আন (হইতে) তারাদিন (পরস্পর মতৈক্য, সম্মতিতে, আপসে খুশি থাকা, একের প্রতি অন্যের সম্মতি) মিনহুমা (উভয় পক্ষের) ওয়া (এবং) তাশাতরিন (আপসে পরামর্শ করা, পরামর্শের ভিত্তিতে) ফালা (সুতরাং নাই) জুনাহ (গুনাহ, পাপ) আলাইহিমা (তাহাদের উভয়ের উপর)।

□□সুতরাং যদি ইচ্ছা করে দুধ ছাড়াইতে উভয় পক্ষের সম্মতি হইতে এবং পরামর্শের ভিত্তিতে সুতরাং নাই গুনাহ তাহাদের উভয়ের উপর।

+ ওয়া (এবং) ইন (যদি) আরাততম (তোমরা ইচ্ছা কর, তোমরা চাও) আন (যে) তাজতারদিউ (তোমরা দুধ পান করাইবে) আওলাদাকুম (তোমাদের

সন্তানদের) ফালা (সুতরাং নাই) জুনাহ (গুনাহ, পাপ) আলাইকুম (তাহাদের উপর) ইজ্জা (যখন) সাললামতম (তোমরা অর্পণ কর) মা (যাহা) আতাইতুম (তোমরা দিতে চাহিয়াছিলে) বিলম্বাকুফি (বিধিসম্মতভাবে)।

□□এবং যদি তোমরা চাও যে তোমরা দুধ পান করাইবে (কোনো ধাত্রী দিয়া) তোমাদের সন্তানদের সুতরাং নাই গুনাহ তোমাদের উপর যখন তোমরা অর্পণ কর যাহা তোমরা দিতে চাহিয়াছিলে বিধিসম্মতভাবে।

+ ওয়াত (এবং) তাকুল (তোমরা ভয় কর) -লাহা (আল্লাহকে) ওয়া (এবং) ইলাম (তোমরা জানিয়া রাখ) আন্বাল (যে) -লাহা (আল্লাহর) বিমা (যাহা) তাআলামনা (তোমরা কাজ করিতেছ) বাসিরুন (দেখেন)।

□□এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ যাহা তোমরা করিতেছ (উহা) দেখেন।

□ এই আয়াতের এই জন্যই ব্যাখ্যাটি লিখবার সামান্যতম প্রয়োজন বোধ করি নাই যে প্রচলিত অর্থগুলো সবাই বুঝতে পারে এবং সবার জন্য পরিষ্কার একটি ধারণা দিতে পারে।

২৩৪. ওয়াল (এবং) লাজিনা (যাহারা) ইউতাওয়াফফাওনা (মূল শব্দ 'তাওয়াফফা' অর্থ হইল মরা, সুতরাং 'ইউতাওয়াফফাওনা' অর্থ হইল মারা

যায়; মৃত্যুবরণ করা) *মিন্‌কুম্* (তোমাদের মধ্যে) *ওয়া* (এবং) *ইয়াজ্জারুনা* (তাহারা রাখিয়া যায়) *অজ্জিওয়াজ্জান্* (স্বীদেরকে) *ইয়াতারািব্বাস্না* (তাহারা অপেক্ষা করিবে) *বিআনফুসিহিন্‌না* (তাহাদের নফসকে) *আব্বাআতা* (চার) *আশহরিন* (মাস) *ওয়া* (এবং) *আশরান* (দশ)।

এবং তাহারা মৃত্যুবরণ করে তোমাদের মধ্যে এবং তাহারা রাখিয়া যায় স্বীদেরকে তাহারা অপেক্ষা করিবে তাহাদের নফসকে চার মাস এবং দশ।

+ *ফাইজা* (সূতরাং যখন) *বালাগ্না* (তাহারা পৌছায়) *আজ্জালাহুন্‌না* (তাহাদের মেয়াদে) *ফালা* (সূতরাং নাই) *জুনাহা* (গুনাহ, পাপ) *আলাইকুম্* (তোমাদের উপর) *ফিমা* (যাহার মধ্যে) *ফাআলুনা* (তাহারা করে) *ফি* (মধ্যে) *আনফুসিহিন্‌না* (তাহাদের নফসের) *বিন্‌মারুফি* (বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মত উপায়ে)।

সূতরাং যখন তাহারা পৌছায় তাহাদের মেয়াদে সূতরাং নাই গুনাহ তোমাদের উপর সূতরাং যাহা তাহারা করে তাহাদের নফসের মধ্যে বিধিসম্মতভাবে।

+ *ওয়াল্* (এবং)-*লাহ* (আল্লাহ) *বিমা* (যাহা) *তাম্মালুনা* (তোমরা কর) *খাবিরুন্* (বিজ্ঞ, সচকিত, ইশিয়ার, অবহিত, অবগত)।

এবং আল্লাহ যাহা তোমরা কর (সেই বিষয়ে) বিজ্ঞ।

এই আয়াতের অর্থটি বুঝবার জন্য ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন মনে করলাম না। তারপরেও যাদের প্রচলিত অর্থটি জানবার আগ্রহ আছে তারা যেন বাজারের প্রচলিত *কোরান*-এর তফসির দেখে নেন।

২৩৫. *ওয়া* (এবং) *লা* (নাই) *জুনাহা* (গুনাহ, পাপ) *আলাইকুম্* (তোমাদের উপর) *ফিমা* (যাহার মধ্যে) *আরাদতুম্* (তোমরা পর্দার আড়ালে কথা বলিয়াছ, তোমরা ইঙ্গিতে কথা বলিয়াছ, তোমরা অস্পষ্ট কথা বলিয়াছ) *বিহি* (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) *মিন্* (হইতে) *খিততাতি* (বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহের আলোচনা) *নিসাই* (নারীগণ) *আও* (অথবা) *আখনানতুম্* (তোমরা গোপন রাখ, তোমরা গোপন কর) *ফি* (তোমাদের মনের মধ্যে) *আনফুসিকুম্* (তোমাদের নফসের)।

এবং নাই গুনাহ তোমাদের উপর যাহার মধ্যে তোমরা পর্দার আড়ালে কথা বলিয়াছ উহার দ্বারা নারীদের বিবাহের প্রস্তাবের মধ্যে অথবা তোমরা গোপন কর তোমাদের মনের মধ্যে।

+ *আলিমাল্* (জানেন)-*লাহ* (আল্লাহ) *আন্বাকুম্* (নিশ্চয়ই তোমরা) *সাতাজ্জুরুনাহুন্‌না* (তোমরা আলোচনা কর তাহাদের [নারীদের] [বিষয়ে]) *ওয়ালাকিল্* (এবং কিন্তু) *লা* (না) *তোয়াইদু* (তোমরা ওয়াদা কর) *হুনুনা* (তাহাদের [নারীদের]) *সিরবান্* (গোপনে) *ইল্লা* (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) *আন্* (যে) *তাকুলু* (তোমরা বল) *কাওলান্* (কথা) *মারুফান্* (বিধিসম্মত, ন্যায়সম্মত, ভালো কাজ, দস্তুরমারফিক ভালো কথা, নম্রভাবে ভালো কথা)।

নিশ্চয়ই তোমরা যে আলোচনা কর তাহাদের (নারীদের) (বিষয়ে) (সেই বিষয়ে) আল্লাহ জানেন। এবং কিন্তু তোমরা ওয়াদা করিবে না গোপনে তাহাদের (নারীদের) (সঙ্গে) একমাত্র তোমরা বল যে বিধিসম্মত কথা।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তাজ্জিম্* (তোমরা কঠিন সঙ্কল্প কর, তোমরা দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ কর) *উকদাতান্* (বন্ধন, আকদ, গিরা, বাধা, তোতলামি) *নিকাহি* (নিকাহ, বিবাহ) *হাতত্য়া* (যতরূণ না) *ইয়াবলুগাল্* (পৌছে) *কিতাবু* (কিতাব) *আজ্জালাহ* (তাহার নির্দিষ্ট সময়)।

এবং তোমরা সঙ্কল্প করিও না নিকাহের বন্ধনের যতরূণ না তাহার নির্দিষ্ট সময়ে কেতাবে পৌছে।

+ ওয়া (এবং) ইলাম (তোমরা জানিয়া রাখ) আননান (নিশ্চয়ই)-নাহা (আল্লাহ) ইয়ালান (জানেন) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) আনফুসিকুম (তোমাদের নফসের) ফাহ্জারুহ (সুতরাং ভয় কর তাহাকে)।

এবং তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যাহা তোমাদের নফসের মধ্যে (আছে)। সুতরাং ভয় কর তাহাকে।

+ ওয়া (এবং) ইলাম (তোমরা জানিয়া রাখ) আননান (নিশ্চয়ই)-নাহা (আল্লাহ) গাফরুন (ক্ষমাশীল) হালিমুন (ধৈর্যশীল)।

এবং তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল।

এই আয়াতে মেয়াদ পালনকারী মালোকেদের সোজাসজি বিবাহের প্রস্তাব করাটি একদম নিষেধ। তবে আকার-ইঙ্গিতে উহা প্রকাশ করলে দোষনীয় হবে না। মানুষ যে নারীদের নিয়ে কথাবার্তা বলবেই এটা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তাই এই বলে সতর্ক করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, প্রতীক্ষাকাল অতীত হবার আগে গোপন প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং বিবাহ করাটি নিষিদ্ধ। এই সময়টির মধ্যে জ্ঞানের কথাবার্তা ছাড়া অন্য কথা বলা ঠিক নয়। নিকাহের আকদকে প্রাধান্য দিতে বারণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না আল কেতাবে উপনীত হবার সময়টি নির্ধারিত আছে। এই বাক্যটি ধ্যানসাধনায় যারা দায়েমি সালাতে লিপ্ত আছে তাদের জন্যই একটি মূল্যবান উপদেশ।

নিকাহ হলো বিবাহ করা, সম্মিলিত হওয়া। যতক্ষণ আল কেতাব তথা ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতের মাধ্যমে শক্তিটি অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জন্মের সামনে বন্ধনের প্রাধান্য দেওয়াটি ঠিক নয়, কারণ এ-রকম শক্তি অর্জন করতে সময়ের প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতটি পালন করবার পরেই খান্নাস-ত্যাগের শক্তিটি সাধকের আয়ত্তে এসে যায়। তখন যে-কোনো বিষয়ে মনটি মিলিত হলে উহা আর মায়ার বন্ধনটি তৈরি করতে পারে না। এখানেই সকল শেরেকের হয় অবসান। এবং তওহিদ সাগরে সাধক তখন ডুবেও না ওঠেও না, বরং ভাসমান অবস্থায় অবস্থান করেন। ইহাই 'সুবহানি আল্লাহ' তথা ভাসমান আল্লাহ মুখে বলার গভীর রহস্য। কেহ এই রহস্যটি বুঝতে পারবে, আবার কেহ ইহার কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই বলে যারা কিছুই বুঝতে পারে না, তাদেরকে গালি দেওয়া যায় না। কারণ চরম পর্যায়ে সার্থক যখন অবস্থান করেন তখন দেখতে পান - কোনো গালি নাই, বরং ঘৃণায়মান তকদিরের লীলাখেলাটি চলছে।

২৩৬. না (নাই) জুনাহা (গুনাহ, পাপ) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ইন্ন (যদি) তালাকতমুন (তোমরা তালাক দাও) নিস্যাআ (নারীদেরকে, ম্বাদেরকে) মা (যাহা) লাম্বি (না, নাই) তাম্বাসস (স্পর্শ কর) হন্বা (তাহাদেরকে [নারীদের]) আও (অথবা) তাফরিদ (তোমরা নির্ধারণ কর, তোমরা নির্দিষ্ট কর) লাহুননা (তাহাদের [নারীদের] জন্য) ফারিদাতান (মোহর)।

নাই গুনাহ তোমাদের উপর যদি তোমরা তালাক দাও নারীদেরকে যাহাতে তাহাদেরকে (নারীদের) স্পর্শ কর নাই অথবা তোমরা মোহর ধার্য কর (নাই) তাহাদের জন্য।

+ ওয়া (এবং) মাততিউ ('মতআ' দাও) হন্বা (তাহাদেরকে)।

এবং মতআ দাও (বাঁশ দাও) তাহাদেরকে।

+ আললি (উপর) মুসিই (বিভবান, প্রাচর্য আছে যার, অর্থশালী, ক্ষমতাওয়ালগণ) কাদারুহ (তাহার আর্থিক সামর্থ্য, সুযোগ, সম্ভাবনা) ওয়া (এবং) আললি (উপর) মুকতিরি (ফকির, ভিক্ষক, যাহার ভাগ্যে লাকড়ির তরকারি নাই, যে একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তি, বিভীন) কাদারুহ (তাহার সাধ্যমতো)।

বিভবানদের উপর তাহার সামর্থ্য (অনুযায়ী) এবং বিভীনদের উপর তাহার সাধ্যমতো।

+ **মাতা** (উপহার, দান, ফায়দা) **বিলম্বাক্ষি** (বিধিসম্মতভাবে, ন্যায়সম্মত উপায়ে, ভালো কাজের সহিত)।

□□ **ভালো কাজের সহিত উপহার (ফায়দা) (দাও)।**

+ **হাক্কান** (সত্য) **আলান** (উপর) **মুহসিনিনা** (সৎকর্মশীলদের, নেক লোকদের, এহসানকারী)।

□□ **এহসানকারীদের উপর সত্য।**

□□ এই আয়াতের প্রচলিত অর্থটি বুঝবার জন্য মনে হয় ব্যাখ্যা দেবার কোনো দরকার নাই। তবে ইহার গভীরে যদি কেহ প্রবেশ করার ইচ্ছা রাখেন তাহলে শাহ সুফি সুদূর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত **কোরান-দর্শন** নামক **কোরান**-এর তফসিরটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। তবে ইহা মোটেই সবার জন্য নয়। যারা বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী এবং **কোরান**-গবেষণায় ভুবে থাকেন তাদেরকেই পড়তে অনুরোধ করছি।

২৩৭. **ওয়া** (এবং) **ইন** (যদি) **তাল্লাকতুম** (তোমরা তাল্লাক দিয়া দাও) **হননা** (তাহাদেরকে [নারীদের, স্বীদের] **মিন** (হইতে) **কাবলি** (পূর্বে) **আন** (যে) **তামাসু** (স্পর্শ করা) **হননা** (তাহাদেরকে [স্বীদের, নারীদের] **ওয়া** (এবং) **কাদ** (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যথেষ্ট) **ফারাদতুম** (তোমরা নির্দিষ্ট কর) **লাহননা** (তাহাদের [নারীদের, স্বীদের] জন্য) **ফারিদাতান** (মোহর) **ফানিসফ** (সূতরাং অধিক) **মা** (যাহা) **ফারাদতুম** (নির্দিষ্ট করিয়াছ) **ইল্লা** (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) **আই** (যদি) **ইয়াকুন** (মাফ করিয়া দেওয়া) **আও** (অথবা) **ইয়াকুওয়াল** (ক্ৰমা করিয়া দেওয়া, অনুগ্রহ প্রকাশ করা) **লাজি** (যাহারা) **বিইয়াদিহি** (যাহার হাতে রহিয়াছে) **উখদাতুন** (বন্ধন) **নিকাহি** (নিকাহ, বিবাহ)।

□□ এবং যদি তোমরা তাল্লাক দাও তাহাদেরকে পূর্ব হইতে যে তাহাদের স্পর্শ করিবে এবং নিশ্চয়ই তোমরা ফরজ কর (নির্দিষ্ট কর) তাহাদের (নারীদের) জন্য মোহর সূতরাং অধিক যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছ কিছু যদি মাফ কর (ক্ৰমা কর) অথবা ক্ৰমা করিয়া দাও যাহার হাতে রহিয়াছে নিকাহের (বিবাহের) বন্ধন।

+ **ওয়া** (এবং) **আন** (যে, এই যে, হইতে) **তাক** (তোমরা ক্ৰমা কর) **আকবাব** (নিকটবর্তী, নিকটতর, কাছে) **লিততাকওয়া** (তাকওয়ার জন্য)।

□□ এবং এই যে তোমরা ক্ৰমা কর (তাহা) তাকওয়ার জন্য নিকটবর্তী।

+ **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **তানসাতল** (তোমরা ভুলিয়া যাও) **ফাদলা** (ফজলকে, সদাশয়কে) **বাইনাকুম** (তোমাদের মধ্যে)।

□□ এবং তোমরা ভুলিয়া যাইও না ফজলকে (সদাশয়তাকে) তোমাদের মধ্যে।

+ **ইননাল** (নিশ্চয়ই)-**লাহা** (আল্লাহ) **বিমা** (যাহা) **কামালুনা** (তোমরা কর) **বাসিকুন** (দেখেন)।

□□ নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহা তোমরা কর (উহা) দেখেন।

□□ এই আয়াতের প্রচলিত অর্থটি বুঝে নেবার জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কেহ এই আয়াতের মারেফতি বহুসম্ময় ব্যাখ্যাটি জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে শাহ সুফি সুদূর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত **কোরান দর্শন** নামক **কোরান**-এর তফসিরটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

২৩৮. **হাফিজ** (তোমরা হেফাজত কর, তোমরা রক্ষা কর) **আলা** (উপর) **সালাওয়াতি** (সালাতের) **ওয়া** (এবং) **সালাতিল** (সালাত) **উস্তা** (মধ্যবর্তী, মাঝামাঝি, মধ্যকালীন)।

□□ সালাতের উপর হেফাজত কর এবং মধ্যবর্তী সালাতের।

+ **ওয়া** (এবং) **কুম** (তোমরা দাড়াও) **লিল্লাহি** (আল্লাহর জন্য) **কানিতিন** (বিনীত হইয়া, অনুগত)।

□□এবং তোমরা দাঁড়াও আল্লাহর জন্য বিনীত হইয়া।

২৩৯. *ফাইনু* (সূতরাং যদি) *থিকতম* (তোমরা ভয় কর) *ফারিজালান* (সূতরাং পদচারী, যে পায়ে হাঁটে) *আও* (অথবা) *রুক্বানান* (আরোহী অবস্থায়)।

□□সূতরাং যদি তোমরা ভয় কর সূতরাং পদচারী (যে পায়ে হাঁটে) অথবা আরোহী অবস্থায়।

+ *ফাইজা* (সূতরাং যখন) *আমিনত* (তোমরা নিরাপদ [বিপদমুক্ত, নির্বিঘ্ন, আপৎশূন্য] হও) *ফাজ্জুরুল* (সূতরাং জিকির কর) - *লাহা* (আল্লাহর) *কাম্মা* (যেমন, যেভাবে) *অলিলামাকুম* (তোমাদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন) *মা* (যাহা) *লাম* (না) *তাকুন* (তোমরা হও, তোমরা হইতেছ, তোমরা হইবে) *তায়ালামুনা* (তোমরা জানিতে)।

□□সূতরাং যখন তোমরা নিরাপদ হও সূতরাং জিকির কর আল্লাহর যেভাবে তোমাদেরকে তিনি শিখাইয়াছেন যাহা তোমরা অবগত ছিলে না (জানিতে না)।

□ এই আয়াতে বস্তুকে তালুক দিতে বলা হয় নি, বরং বস্তুর উপর যে খান্নাসরূপী মোহটি অবস্থান করে উহাকে তালুক দিতে হলে ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতটি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত না থাকলে মোহমায়ারূপী বস্তুমোহের খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, অথবা বশীভূত করা যায় না, অথবা মুসলমান বানানো যায় না। ধারণা থেকে যেমন ধ্যান এবং ধ্যানের উচ্চস্তরে আগমন করলেই সম্মাধির দিকে এগিয়ে যায়, সে-রকম ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতটি ক্রমান্বয়ে গভীরতা থেকে গভীরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং এই এগিয়ে যাওয়াটাই সম্মাধির দিকে এগিয়ে যাওয়া যেটাকে *কোরান* আরবি ভাষায় এই আয়াতে 'সালাতুল উসতা' বলেছে। অতি সাধারণ দৃষ্টিতে সালাতুল উসতাকে মধ্যবর্তী নামাজ মনে করে গণনার অঙ্কে ফেলে দিয়ে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় না। যেহেতু সালাতুল উসতার কথাটি *কোরান*-এ বলা হয়েছে সেই হেতু ৭৩ কেরকার ৭৩ রকম অর্থ করাটা একান্ত স্বাভাবিক। এবং নিরপেক্ষ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লেখাটি তখনই সম্ভবপর হয় যখন সাধক ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে সম্মাধির অবস্থান তথা সালাতুল উসতার অবস্থায় পৌঁছে যায় সেই রকম সাধকের নিকট 'সালাতুল উসতা'র ব্যাখ্যাটি পাওয়া সম্ভব, নতবা কতগুলো কথা আর কতগুলো ব্যাকরণের মারপ্যাচের গোলক-ধাধার মধ্যে পাঠকদেরকে ঘুরাইতে থাকে। তবে ইহাও সত্য যে, 'সালাতুল উসতা'র মৌখিক কোনো ব্যাখ্যা দেওয়াটি কষ্টকর কারণ ইহা প্রয়োগ-পদ্ধতির মাধ্যমে মেনে নিতে হয়। এই 'সালাতুল উসতা'র মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে সালাতি তথা যোগী তথা সংযোগকারী সব রকম বস্তুর উপর মোহ-মায়ার নামক খান্নাস হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। এই 'সালাতুল উসতা' সাধকদেরকে জাবরুত মোকাম্মির শেষ প্রান্ত থেকেও সরিয়ে দেয়, যেমন ইমামুল আউলিয়া বাবা বায়েজিদ বোস্তামি সালাতুল উসতায় পৌঁছবার একটু আগে বলে ফেললেন যে, 'আল্লাহ আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট'। তখন আল্লাহ বাবা বায়েজিদ বোস্তামিকে বললেন যে, 'যদি তুমি সত্য-সত্যই আমার উপর (আল্লাহর উপর) সন্তুষ্ট হতে পারতে তাহলে তুমি অন্য রকম কথা বলতে।' বাবা বায়েজিদ এই কথা শোনার পর গভীর ধ্যানসাধনায় মগ্ন হয়ে 'সালাতুল-উসতা' তথা সম্মাধিতে আগমন করে বলে ফেললেন, *আনা সুবহানি মা আজ্জামুশশানি* - তথা, আমি সুবহানি (ভাসমান) এবং সুব শান আমারই। এখানেই তওহিদ, এখানেই সালাতুল উসতার আসল পরিচয় - অন্যথায় কথা এবং ব্যাকরণের তরং-বরং এবং নর্তন-কুর্দন - আর কিছুই নয়।

২৪০. *ওয়াল* (এবং) *লাজিনা* (যাহারা) *ইউতাওয়াফফাওনা* (মারা যায়) *মিনকুম* (তোমাদের মধ্য হইতে) *ওয়া* (এবং) *ইয়াজাকুনা* (রাখিয়া যায়, সারিয়া দেয়, উপেক্ষা করে) *আজওয়াজান* (স্বীদেরকে)।

এবং যাহারা মারা যায় তোমাদের মধ্য হইতে এবং তাহারা রাখিয়া যায় স্বীদেরকে।

+ *ওয়াসিয়াতান* (ওসিয়ত করা) *লিআজওয়াজিহিম* (তাহাদের স্বীদের জন্য) *মাতাআন* (যে সমস্ত জিনিস কাজে লাগে, স্বামীর অবস্থা অনুসারে জাম্মা-চাদর-দোপাট্টা দেওয়া, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস, কাজে লাগে এমন জিনিস, উপকারের জন্য, প্রতিপালন, ভরণপোষণ) *ইলাল* (দিকে) *হাউলি* (এক বছর) *গাইরা* (ছাড়া, ব্যতীত) *ইখরাজিন* (বহিস্কার, বর্জন, দূরীকরণ)।

ওসিয়ত কর তাহাদের স্বীদের জন্য যে সমস্ত জিনিস কাজে লাগে এক বছরের দিকে বর্জন (বহিস্কার) ছাড়া।

+ *ফাইন* (সুতরাং যদি) *খারাজনা* (তাহারা বাহির হইয়া যায়) *ফালা* (সুতরাং নাই) *জুনাহা* (গুনাহ, পাপ) *আলাইকুম* (তোমাদের উপর) *ফি* (মধ্যে) *মা* (যাহা) *ফাআলুনা* (তাহারা করিয়াছে) *ফি* (মধ্যে) *আনফুসিহিননা* (তাহাদের নফসের) *মিন্ন* (হইতে) *মারুফিন* (ন্যায়সঙ্গত উপায়ে, বিধিসম্মতভাবে)।

সুতরাং, যদি তাহারা বাহির হয় সুতরাং নাই গুনাহ তোমাদের উপর যাহার মধ্যে তাহারা করিয়াছে তাহাদের নফসের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত উপায় হইতে।

+ *ওয়াল* (এবং) *লাহ* (আল্লাহ) *আজিজুন* (শক্তিশালী) *হাকিমুন* (হেকমতওয়ালা, বিজ্ঞানময় বিচারক)।

এবং আল্লাহ শক্তিশালী হেকমতওয়ালা।

এই আয়াতটিকে একান্ত বৈষয়িক মোটা অর্থে যদি গ্রহণ করে নিতেই হয় তাহলে এ-আয়াতটিকে মনসুখের বৃত্তে ফেলা হয়ে থাকে। তবে এ-আয়াতের যে-আধ্যাত্মিক অর্থটি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে তারই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আইমদ চিশতি সাহেব তাঁর রচিত *কোরান দর্শন* নামক *কোরান-তফসিরে*। অদম্য আগ্রহী পাঠকদের (সাধারণ পাঠকদের নহে) সেই তফসির পড়তে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২৪১. *ওয়া* (এবং) *লিল্মতাল্লাকাতি* (তালাক দেওয়া হইয়াছে যাহাদের তাদের জন্য, তালাকপ্রাপ্তদের জন্য) *মাতাউন* (নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ফায়দা, ভাগ করা, লাভ, ওই সমস্ত সামগ্রী যাহা কাজে আসে, যাহা হইতে ফায়দা পাওয়া যায়) *বিল্মারুফি* (ন্যায়সঙ্গতভাবে, বিধিসম্মতভাবে, উপযুক্তভাবে)।

এবং যাহাদেরকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর।

+ *হাককান* (ইহা একটি সত্য) *আলাল* (উপর) *মুত্তাকিনা* (মুত্তাকিদের)।

মুত্তাকিদের উপর ইহা একটি সত্য।

২৪২. *কাজালিকা* (ওইভাবে) *ইউবাইইনুল* (বর্ণনা করেন) *লাহ* (আল্লাহ) *লাকুম* (তোমাদের জন্য) *আয়াতিহি* (তাহার আয়াতসমূহ, তাঁহার নিদর্শনসমূহ) *লাআল্লাকুম* (সম্ভবত তোমরা, যেন তোমরা) *তাকিনুনা* (বুঝিতে পার, অনুধাবন করিতে পার)।

ওইভাবেই বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহকে যেন তোমরা বুঝিতে পার।

এই দুটি আয়াতের প্রচলিত অর্থটি বুঝবার জন্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করলাম না। তবে উচ্চস্তরের ব্যাখ্যাটি বুঝতে চাইলে শাহ সুফি সদর

উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

২৪৩. আলামতারা (আপনি কি দেখেন নাই?) ইলাল (দিকে) লাজিনা (যাহারা) খারাজ (বাহির হইয়াছিল) মিনু (হইতে) দিয়ারি (ঘরগুলি) হিম (তাহাদের) ওয়া (এবং) হম (তাহারা) উলফন (হাজার হাজার, সুবিদিত, ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত) হাজারান (ভয় করা, ভয় পাওয়া) মাউতি (মৃত্যু)।

আপনি কি দেখেন নাই তাহাদের দিকে যাহারা বাহির হইয়াছিল তাহাদের ঘরগুলি হইতে এবং তাহারা হাজার হাজার মৃত্যুর ভয়ে (বাহির হইয়াছিল)।

+ ফাকালু (সুতরাং বলিলেন) লাহমুন (তাহাদেরকে) লাহ (আল্লাহ) মৃত (তোমরা মরিয়া যাও) সুম্মা (তারপর) আহইয়া (জীবিত করিলেন) ইম (তাহাদের)।

সুতরাং বলিলেন তাহাদেরকে আল্লাহ, তোমরা মরিয়া যাও, তারপর তাহাদেরকে জীবিত করিলেন।

+ ইন্বাল (নিশ্চয়ই) লাহা (আল্লাহ) লাজ (অবশ্যই) ফাদলিন (ফজল দানের অধিকারী, মেহেরবান, অনুগ্রহশীল) আলান (উপর) নাস (মানুষদের) ওয়ালাকিননা (এবং কিন্তু) আকসরান (অধিকাংশ, বেশিরভাগ) নাসি (মানুষ) লা (না) ইয়াস্কুরনা (শোকর আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কৃতজ্ঞ হয়)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই মানুষের উপর ফজল দানের অধিকারী এবং কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর আদায় করে না।

২৪৪. ওয়া (এবং) কাঠিন (কতল কর, নিজেদেরকে হত্যা কর) ফি (মধ্যে) সাবিলিল (পথে, রাস্তায়) লাহি (আল্লাহ) ওয়া (এবং) ইলাম (জানিয়া রাখ) আন্বাল (যে) লাহা (আল্লাহ) সামিউন (শোনে) আলিমুন (দেখেন)।

এবং নিজেদেরকে (সাধনায়) হত্যা কর আল্লাহর পথের মধ্যে এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ শোনে, দেখেন।

এই আয়াতে আপনার মাঝে যে-খান্নাসরূপী মায়াগুলো অবস্থান করছে উহাই দেহঘর হতে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে বাহির করে দেবার শক্তিটি যারা অর্জন করতে পেরেছেন তাদের কুখাই বলা হয়েছে। যদিও 'উলফন' শব্দটির অর্থ করা হয় 'হাজার-হাজার', কিন্তু পরের অর্থটি না বোঝার কারণে এড়িয়ে যায়। এখানে 'উলফন' শব্দটির অর্থ হবে ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত। সাধকেরা বিরাট ধৈর্যধারণ করে ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের অনুশীলনের কারণে মৃত্যুর সাবধানতা ও উহার উপস্থিতি

নিবিড়ভাবে পরিজ্ঞাত হতে পেরেছেন। সে জন্যই আল্লাহ তাদেরকে বলেছেন, এখন তোমরা পূর্ণভাবে মৃত্যবরণ কর। মৃত কাবলী আনতামুত তথা মরার আগে মরে যাবার সাধনায় তারা পরিপক্বতার নিকটবর্তী হতে পেরেছেন, তাই তাদেরকে সাধনার চরম পর্যায়ে যেতে বলেছেন। সাধনার চরম স্তর গ্রহণ করবার পর আল্লাহ তাদেরকে জীবন দান করেন তথা অমরত্ব দান করেন তথা মৃত্যুঞ্জয়ী করেন। তখন এই ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতে রত সাধকদের আর মরণের অধীন থাকতে হয় না। নিকটের মৃত্যুই তাদের শেষ মৃত্যু এবং এই সাধকদের জন্য তখন এই বিষয়টি সহজ ও সাধনার হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুভয়, দুঃখ-যন্ত্রণা সব কিছু তিলে-তিলে ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতে বিরাট ধৈর্যধারণ করে জয়লীভ করতে পরে। এটাই মানুষের প্রতি আল্লাহর ফজল দানের চরম পরিণতি। যতক্ষণ না আল্লাহর গুণে গুণাবিত হওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত যত প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক না কেন সেই পূকাশগুলো নিছক মোখিক, ঠুনকো এবং অনেক সময় মেলিতে মিশ্রিত। অধিকাংশ মানুষ এই

জাতীয় কৃতজ্ঞ হতে রাজি হয় না, কারণ ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতটি পালন করার ধৈর্যধারণ সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। মরার আগে মৃত্যুবরণ করবার ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের দিকে মানুষদের খেয়াল রাখাটি যে একান্ত কঠব্য এই কথাগুলো এই আয়াতের শুরুতেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এই পথে এগিয়ে যেতে চাইলে আল্লাহর পথে অবশ্যই নিজেকে কতল করতে হবে। মায়ার খান্নাসরূপী যে-রূপটি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বিরাজ করছে উহাকেই ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ শক্তি অর্জন করে কতল করতে হবে। এই কতলটি ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাত পালন করাই নামাস্তর। এখানে নিজেকে কতল করার অর্থটি হলো নিজের ডেতরে মায়ার খান্নাসটিকে কতল করা, ইহাই এই আয়াতের এবং সমগ্র কোরান-এর বিশেষ আশ্বাস, যা সবার মন ও মগজে মোটেই ধরা পড়ার কথা নয়।

পাঠকদেরকে বিশেষভাবে এই কথাটি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, বাজারে প্রচলিত অনেক কোরান-তফসিরে কত রকম দলিলের দোহাই দিতে-দিতে এমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে যে উহা হতে কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় না। অনেকে তো আজগুবি পেগু রোগের বাহানাটি পাঠকের সম্মুখে হাজির করে জ্ঞানচর্চার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকেন, অনেকটা কুস্তিগীরের দুই হাতে দুই গদা ঘোরানোর মতো। মনে হয়, কত কী জানে! মনে হয়, মাখায় জ্ঞান গিজগিজ করতে থাকে। অথচ এরাই যে মাকাল ফলের মতো, সুন্দর সেই কথাটি বলতে গেলে উল্টা আম্মাকেই মাকাল ফল বলে ফেলবে। সুতরাং কাকে গালি দেব? কারণ চরম পর্যায়ে কোনো গালি নাই। ইহাই আল্লাহর জুলজালালের বিচিত্র রূপে অবগাহন করা – যেখানে এক সেকেন্ডে কয়েক হাজার কোটি রূপ দেখানোর পুর আর সেই রূপটি কোনো দিন কোনো কালেও দেখানো হয় না। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলা হয় জুলজালাল।

২৪৫. মান (কে) জাআল (সে) লাজি (যে) ইউকরিদল (কর্জ দেয়) লাহা (আল্লাহকে) কারদান (কর্জ, ঋণ, ধার, দেনা) হাসানীন (সুন্দর, রূপবান, শোভাময়, চমৎকার, মনোহর) ফাইউদাইফাহ (সুতরাং তাহা বহুগুণ করা হইবে) লাহ (তাহার জন্য) আদওয়াফান (কয়েক গুণ, দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ) কাসিরাতান (অনেক বহ)।

□□ কে সেই (ব্যক্তি) যে আল্লাহকে কর্জ দেয় সুন্দর কর্জ সুতরাং তাহা বহুগুণ করা হইবে তাহার জন্য দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ, অনেক।

+ ওয়াল (এবং) লাহ (আল্লাহ) ইয়াকবিদু (সংকুচিত করা, হ্রাসকৃত করা, গুটাইয়া লওয়া, সঙ্কীর্ণ করা, অপসারিত করা, মুদ্রিত করা, নিম্নলিখিত করা, কুণ্ঠিত করা, জড়সড় করা, ঘাটতি, অভাবগ্রস্ত করা, চাহিদা তৈরি করা, বিহীনতা, কমতি, ন্যূনতা, অনটন, দারিদ্র্য) ওয়া (এবং) ইয়াবসুত (সম্প্রসারিত, প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত, বিস্তৃত)।

□□ এবং আল্লাহ সংকুচিত করেন এবং সম্প্রসারিত করেন।

+ ওয়া (এবং) ইলহিহি (তাহার দিকে) তরজাউনা (তোমাদেরকে ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, তোমরা ফিরিয়া যাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন)।

□□ এবং তাহার দিকে তোমাদের ফিরাইয়া নেওয়া হইবে।

□ এই আয়াতে আল্লাহ তার বান্দার কাছে কর্জ চাইছেন তথা ধার চাইছেন, কর্জ কথাটির অর্থই হলো পরিশেষে ইহা শোধ করে দেওয়া। এই কর্জের সঙ্গে সুন্দর শব্দটি যোগ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই সুন্দর কর্জটি বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন আর একটি মানুষের পক্ষে আল্লাহকে কর্জ দেবার কঠি-বা আছে অথবা কী থাকতে পারে। সেই কর্জটি সুন্দর হোক আর অসুন্দরই হোক,

কিছু কৰ্জ দেবার কথাটি আসলে বিশেষ করে আল্লাহকে কৰ্জ দেবার কথাটি আসলে চিন্তা কুরাটি একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। একটি মানুষের তো কিছুই নেই, সবই তো আল্লাহর; তাহলে আল্লাহ বান্ধার কাছে কেন কৰ্জ চাইছেন এবং সেই কৰ্জটি আবার সুন্দর কৰ্জ বলা হয়েছে। একটি মানুষ পবিত্র, একটি নফস পবিত্র, ইহাতে বিকৃতমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং এই পবিত্র নফসটিকে আল্লাহ যে সন্মিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেছেন সেই দানের জিনিসটিই তো কৰ্জ দেওয়া যায়। সন্মিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটির আগমন তখনই ঘটে যখন শয়তান বিশেষ কয়টি রূপ ধারণ করে একটি আমির সঙ্গে মিশে থাকে। এই মিশ্রিত আমিরটি তথা নফসটিকেই বলা হয় আমিত তথা অহম তথা খুদি তথা ইম্মি। এই আমিতটি আল্লাহকে কৰ্জ দিতে হয় তথা আল্লাহ এই আমিতটিই চেয়েছেন। কারণ এই আমিতই সব রকম আকাম-কুতামের গুরুত্বকর। ইহাকেই কৰ্জ দিতে পারলে মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞরূপী কহাটি জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে যখন কহাটি সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন আপন নফসটি রহের বলয়ে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে যায়, তখন নফস যে-দিকেই তাকায় না কেন রহরূপী আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তখনই একটি নফস বঝতে পারে যে, তার আগমনটি আল্লাহ হতেই হয়েছে এবং প্রত্যাবর্তনটিও আল্লাহর মধ্যে হবে গেছে। জীবিত অবস্থায় তথা দুনিয়ার জিন্দেগিতে যখন একটি নফস রহরূপী আল্লাহর মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় তখনই নফসটি চিৎকার দিয়ে বলে ফেলে, *আনাল হক তথা আমিই সত্য*। তখনই একটি নফস অন্য ভাষায় বলে ফেলে, *আনা সুবহানি মা আজামুশশানি* - অর্থাৎ 'আমিই সুবহানি সুশান আম্মাই'। তখনই নফসটি আরেকটি ভাষায় বলে ফেলে, *লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা* - অর্থাৎ, 'এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই'। তখনই খাজা গরিব নেওয়াজ মঈনুদ্দিন হাসান সানজারির পীর ও মুরশিদ খাজা ওসমান হারুনি বলে ফেললেন, *খাহে কে আনাল্লাহে বখ্ব খাহে কে হ্যাল্লাহ*। ইহাই বান্ধার আল্লাহকে দেওয়া সুন্দর কৰ্জ তথা কৰ্জে হাসানা। নতুবা বান্ধার কাছে আল্লাহর কৰ্জ চাইবার প্রশ্নটির অবান্তর।

২৪৬. *আলাম (নাই কি?) তারা (আপনি দেখুন) ইলাল (দিকে) মালায়ি (নেতাদের এবং বড়লোকদের জামাত, প্রধানদের, বিশিষ্ট প্রধানদিগকে) মিম্ব (হইতে) বানি (বনি) ইসরাইলা (ইসরাইলদের) মিম্ব (হইতে) বাদি (পরে) মুসা (মুসা)।*

আপনি কি দেখেন নাই, মুসার পরবর্তীকালে বনি ইসরাইল হইতে প্রধানদেরকে?

+ *ইজ (যখন) কাল (তাহারা বলিয়াছিল) লিনাবিইল (নবির জন্য) লাহম্ব (তাহাদের জন্য) বাসি (আপনি পাঠান, নিযুক্ত করুন, উদিত করিয়া দিন) লানা (আমাদের জন্য) মালিকান (বাদশা, উচ্চতম হাকিম, রাজা, শাসক) নুকাতিল (আমরা কতল করিব, আমরা সংগ্রাম করিব, আমরা সাধনা করিব) ফি (মধ্যে) সাবিলিল (পথে, রাস্তায়) লাহি (আল্লাহর)।*

যখন নবির জন্য তাহারা বলিয়াছিল, তাহাদের জন্য আপনি পাঠান আমাদের জন্য একজন বাদশাহ আমরা কতল করিব আল্লাহর পথের মধ্যে।

+ *কাল (তিনি বলিলেন) হাল (নয় তো) আসাইতম (তোমরা আশা করিলে, আশা করা যায়) ইন (যদি) কতিবা (ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হয়, ফরজ করিয়া দেওয়া হয়, ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়, লেখা হয়, জন্মের আগেই ভাগ্য লেখা হইয়াছিল, নির্ধারিত করা হয়) আলাইকুমুল (তোমাদের উপর) কিতাল (কতল, সংগ্রাম, জেহাদ, যুদ্ধ) আললা (এইটা নয় কি? কেন নয়?) তুকাতিল (তোমরা কতল করিবে)।*

তিনি বলিলেন, নয় তো তোমরা আশা করিলে যদি ফরজ করিয়া দেওয়া হয় তোমাদের উপর কতল তোমরা যে কতল করিলে না?

+ কাল (তাহারা বলিয়াছিল) ওয়া (এবং) মালানা (আমাদের কী হইয়াছে) আল্লা (এইটা নয় কি?, কেন নয়?) নুকাতিলা (আমরা কতল করিব) ফি (মধ্যে) সাবিলিল (পথে, রাস্তায়) লাহি (আল্লাহর) ওয়া (এবং) কাদ (নিশ্চয়ই) উখরিজ্জনা (আমাদেরকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়) মিন (হইতে) দিয়ারি (ঘরবাড়ি) না (আমাদের) ওয়া (এবং) আবনাইনা (আমাদের সম্মানগণ)।

□□ তাহারা বলিয়াছিল এবং আমাদের কী হইয়াছে যে, আমরা আল্লাহর পথে কতল করিব না এবং নিশ্চয়ই ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমাদের সম্মানগণকে।

+ ফালানুমা (সুতরাং যখন) কুতিবা (ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফরজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, জন্মের আগেই ভাগ্য লেখা হইয়াছিল) আলাইহিমুল (তাহাদের উপর) কিতালু (কতলের) তাওয়াল্লাহু (তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহারা পিঠ ফিরাইল) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) কালিলাম (অল্পসংখ্যক, অল্প কিছু) মিন্হুম (তাহাদের মধ্য হইতে)।

□□ সুতরাং যখন ফরজ করিয়া দেওয়া হইল তাহাদের উপর কতলের, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক ব্যতীত।

+ ওয়াল (এবং) লাহ (আল্লাহ) আলিমুম (জানেন) বিজ্জোয়ালিমিনা (জালেমদের বিষয়ে)।

□□ এবং আল্লাহ জালেমদের বিষয়ে জানেন।

□ এই আয়াতে যে-ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে উহা হজরত দাউদ (আ.)-এর একটি আগের ঘটনা। ইহাদ্বারা তাদের রাজ্য হতে বহিস্কৃত হয়ে ইলুছাডা অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করছিল। তাদের দেশ জেরুজালেমে রাজত করছিল রাজা জালুত। ইতিহাসে তার নামটি গোলিয়াত নামে সুপরিচিত। তারা তাদের নবি স্যামুয়েল (আ.)-কে বলেছিল, আল্লাহ যেন তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রাজা নিযুক্ত করে দেন, যার নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ধর্মরাক্ষী প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর পথে জেহাদ করবার সুযোগ পাইতে পারে। তাদের এই আবেদনের জবাবে স্যামুয়েল নবি (আ.) তাদেরকে বললেন, জেহাদের আদেশ হলে তখন তারা তো মুখ ফিরিয়ে নেবে না? নবির এই প্রশ্নের জবাবে তারা বললো, কেন আমরা এই জেহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নেব? কারণ আমরা যে আপন-আপন ঘর হতে বহিস্কৃত এবং এক-কথায় বলতে গেলে আমরা সত্যিই সর্বহারা। সুতরাং জেহাদ করা ছাড়া তো আমাদের আর উপায় থাকে না। কিন্তু তারপর যখন জেহাদের আদেশটি আসলো তখন তারা প্রায় সবাই জেহাদ হতে পালিয়ে গেল, কেবলমাত্র নামে কয়েকজন ছাড়া। তাই যারা কতলের কর্তব্যটি পালনে ধৈর্যধারণ করতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ কফরির বিরুদ্ধে জেহাদ করাটাই হলো কতল। তারপর ইহাও অপ্রিয় সত্য কথা যে, সশস্ত্র কতলের চাইতে নফসের কতলই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের দেশেই নিজেরা থাকতে না পারি অথবা অনেক বৃকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই, তখন সশস্ত্র কতল করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কারণ এই সশস্ত্র কতলের মাধ্যমেই নিজেদের ব্যবস্থাটি নিজেদেরই করতে হয়। এখানে পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে কতলকে আমি কতল অথবা জেহাদ নামে আখ্যায়িত করেছি। কারণ যুদ্ধ নামক শব্দটি ইসলামের মানদণ্ডে কতটুকু সমীচীন উহা শ্রদ্ধেয় এবং বিজ্ঞ আলিম সমাজের হাতেই তুলে দিলাম।

২৪৭. ওয়া (এবং) কাল্লা (বলিলেন) লাহম (তাহাদেরকে) নাবিইউহম (তাহাদের নবি), ইন্নালু (নিশ্চয়ই) লাহা (আল্লাহ) কাদ (নিশ্চয়ই) বাসা (উখিত, আবিভূত অভ্যাদিত) লাকম (তোমাদের জন্য) তালুতা (তালুতকে) মালিকান (বাদশাহ, রাজা, উচ্চতম, হাকিম, শাসক)।

□□এবং তাহাদের নবি তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ উখিত (আবির্ভূত) করিয়াছেন তোমাদের জন্য তালুতকে একজন রাজ্যরূপে।

+ কালু (তাহারা বলিয়াছিল) আননা (কীভাবে, কীরূপে, যেখানে, যখন, কোথায়) ইয়াকুনা (হইবে, হয়, হইয়া যাইবে) লাহল (তাহার জন্য) মুলক (রাজ্য, রাজত্ব, বাদশাহি) আলাইনা (আমাদের উপর) ওয়া (এবং) নাইনু (আমরা) আতাকক (অধিক হকদার) বিনমুলকি (বাদশাহিতে, কর্তৃত্ব সহকারে, শাসনকর্তৃত্ব) মিনহ (তাহা হইতে, তাহার চাইতে) ওয়া (এবং) লান্ন (নাই) ইউতা (দেওয়া হয়) সাআতান (প্রাচুর্য, স্বচ্ছলতা, শক্তি) মিনাল (হইতে) মালি (ধনসম্পদ, মাল)।

□□তাহারা বলিল, কীরূপে হইবে তাহার জন্য বাদশাহি এবং আমরা কর্তৃত্ব সহকারে তাহার চাইতে অধিক হকদার এবং তাহাকে ধনসম্পদ হইতে প্রাচুর্য দেওয়া হয় নাই।

+ কালু (বলিলেন [নবি]) ইন্নাল (নিশ্চয়ই) লাহাস (আল্লাহ) তাফাহ (তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন) আলাইকুম (তোমাদের উপর) ওয়া (এবং) জাদাহ (তাহাকে অধিক দিয়াছেন, তাকে বেশি দিয়াছেন) বাস্তাতান (প্রশস্ততা, প্রচুর পরিমাণে) ফিল (মধ্যে) ইলমি (জ্ঞান) ওয়াল (এবং) জিসমি (প্রতিষ্ঠিত দেহে, শারীরিক শক্তিতে)।

□□নবি বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তোমাদের উপর এবং তাহাকে অধিক দিয়াছেন জ্ঞানের এবং প্রতিষ্ঠিত দেহের মধ্যে প্রশস্ততা।

+ ওয়াল (এবং) লাহ (আল্লাহ) ইউতি (দান করেন) মুলকাহ (তাহার কর্তৃত্ব) মাই (যাহাকে) ইয়াশাহু (তিনি চান, তিনি ইচ্ছা করেন)।

□□এবং আল্লাহ দান করেন তাহার কর্তৃত্ব যাহাকে ইচ্ছা।

+ ওয়াল (এবং) লাহ (আল্লাহ) ওয়াসিউন (বিস্তৃত) আলিমুন (জ্ঞানী)।

□□এবং আল্লাহ বিস্তৃত, জ্ঞানী।

□□যখন স্যামুয়েল নবি বললেন, তোমাদের জন্য তালুতকে আল্লাহ রাজা মনোনীত করেছেন, তখন ধনসম্পদের অধিকারী বড়-বড় ধনী লোকেরা এবং সমাজের প্রবল প্রভাবশালী লোকেরা বললো যে, আমরা তালুতের চাইতেও অনেক বেশি সম্পদশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী, সুতরাং আমাদের উপর তালুত কীভাবে কর্তৃত্ব করবে? তখন নবি বললেন, তালুতকে আল্লাহ অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ দিচ্ছেন জ্ঞানের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠিত দেহের মধ্যে। আসলে সত্য বলতে কি, আল্লাহর জ্ঞানে যারা জ্ঞানী সেই সকল মানুষদেরকেই মহামানব বলা হয় এবং আল্লাহ সকল প্রকার কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহর এই দান জোর করে অথবা বলপূর্বক আল্লাহ হতে কখনই আদায় করা যায় না। ইহা নিছক দানের বিষয়। যার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত বর্ষণ করা হয়, সে-ই আল্লাহর কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব লাভ করেন। এবং ইহাই আল্লাহর বিশেষ রহমতের দান।

কোরান যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হবার কথাটি বারবার বলেছেন সেখানে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী মহাপুরুষদের মাঝে উল্লেখ পাগলামি-মার্ক শেরেকের গন্ধ পায় এবং যা-তা ফতোয়া মারতে থাকে। আল্লাহ যে জাতরূপে তিনটি স্থানে অবস্থান করেন : লা-মোকাম, জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর - এই তিনটি স্থান ছাড়া আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগত সেফাতিরূপ তথা গুণবাচক রূপ। এমনকি সৃষ্টির শেষ সীমা তথা সিদ্দরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সেফাতিরূপ। এই সেফাতি রূপগুলো জাতরূপী-আল্লাহ হতেই আগত এবং অবিরামভাবে আগমনের ধারা বজায় রেখে ছুটে চলেছে। আল্লাহর এই দানটি হিসাবের অংক কষে পাওয়া যায় না, বরং আল্লাহ যাকে খুশি তাকেই এই দানটি করার কথাটি বারবার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং স্যামুয়েল নবি বললেন যে, তালুতকে আল্লাহ জ্ঞানের মধ্যে

এবং দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এইরূপ মহাপুরুষের দেহ এবং মনমগজ হতে যা কিছু আগমন করে উহাই আল্লাহর দেওয়া প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারণ এই মহাপুরুষের আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে সকল প্রকার অস্পষ্টতা এবং অজ্ঞানতা দূরীভূত করতে পেরেছেন। আল্লাহর জ্ঞানে যারা একান্ত বিশেষভাবে জ্ঞানী তাদেরকেই আল্লাহ আবদুহ খেতাবে ভূষিত করেছেন। এমএ-র উপর যেমন পিএইচডি এবং পিএইচডি'র উপরে ডিপিট এবং ডিপিটের উপর আর কোনো ডিগ্রি থাকে না এবং রবিতাকুর, কাজী নজরুল, লালন সাহুজি, হাসন রাজা – এরা ডিপিট দান করেন, তিকু সেই রকম আল্লাহর বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী আবদুহদের কর্মবিবরণী কিছুটা কোরান-এর সূরা কাহাফ পাঠ করলেই আবদুহ খিজির এবং জাদবেল নবি মুসা কলিমউল্লাহর জ্ঞানের প্রশস্ততার পার্থক্যটুকু হতে সবাই কমবেশি বুঝতে পারে।

২৪৮. ওয়া (এবং) কালা (বুলিলেন) লাহম (তাহাদেরকে) নাবিইউহম (তাহাদের নবি) ইননা (নিশ্চয়ই) আয়াতা (আয়াত, নিদর্শন) মুলকিহি (তাহার বাদশাহি) আই (যে) ইয়াতিয়াকুম (তোমাদের কাছে আসিবে) যাইবে, তোমাদের উপর আসিবে) তাবুত (সিন্দুক, বাত্র, পেটি, নোকা, জাহাজ) ফিহি (ইহার মধ্যে) সাকিনাতম (প্রশান্তি, প্রশান্ত অবস্থা বা ভাব, চুক্তি, চুক্তিপত্র, চুক্তিনামা, ঈশ্বর ও কোনো ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে চুক্তি) মির (হইতে) রাববিকুম (তোমাদের রব) ওয়া (এবং) বাকিয়াতম (অবশিষ্ট থাকা, বাচিয়া থাকা বস্তু, কতগুলি বাকি থাকা বস্তু যাহা মুসা (আ.) এবং হারুন-এর পরিত্যক্ত বস্তু) মিম্মা (যাহা) তারাকা (রাখিয়া যাওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং বাধ্যতামূলকভাবে ত্যাগ করা) আল (বংশধরগণের) মুসা (মুসার) ওয়া (এবং) আল (উত্তরাধিকারীদের, বংশধরগণের) হারুনা (হারুনের) তাহমিলুল (তাহা বহন করে) মালাইকাত (ফেরেশতারা)।

এবং বুলিলেন তাহাদেরকে তাহাদের নবি নিশ্চয়ই তাহার রাজত্বের লক্ষণ হইবে যে তোমাদের কাছে আসিবে সিন্দুক, ইহার মধ্যে প্রশান্তি তোমাদের রব হইতে এবং অবশিষ্ট যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে মুসার বংশধরগণ এবং হারুনের বংশধরগণ ফেরেশতারা তাহা বহন করে।

+ ইননা (নিশ্চয়ই) ফি (মধ্যে) জালিকা (ওইটার) লা আইয়াতাল (একটি নিদর্শন, একটি আয়াত) লাকুম (তোমাদের জন্য) ইন (যদি) কুনতুম (তোমরা হও) মুমিনিনা (মোমিন)।

নিশ্চয়ই ওইটার মধ্যে একটি নিদর্শন তোমাদের জন্য যদি তোমরা হও মোমিন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়ে যাই। কারণ কেহ বলেন, ওই সিন্দকের মধ্যে সম্মান ও পদমর্যাদা রয়েছে, কেহ বলেন রহমত দিয়ে ভরা আছে, কেহ বলেন উহার মধ্যে সম্মান আছে। এখন প্রশ্ন হলো, সম্মান, পদমর্যাদা এবং রহমত – এগুলো কি বস্তু, না বায়বীয় পদার্থ, নাকি অন্য কিছু? আবার কেহ বলেন, ‘সাকিনা’ হলো সোনার তৈরি একটি ‘খাফা’, কেহ বলেন সাকিনা হলো মানুষের চেহারার মতো চেহারা – উহার মধ্যে হৃদয়টিও সঞ্চারিত হতো, আবার কেহ বলেন, সাকিনা হলো তীর বেগময় এক ব্যাপশা বাতাসতুল্য, কেহ বলেন সেই বাতাসের দুইটি মাথা ছিলো। যে-বাতাস চোখে দেখা যায় না উহার আবার কেমন করে দুইটি মাথা হয় উহা অধম লিখকের মাথায় ধরে না। সবচেয়ে মজার কথাটি হলো যে সবাইকে চমকিয়ে দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, সাকিনা হলো একটি মরা বিভালের মাথা। সুতরাং অধম লিখকের পক্ষে পাঠকের নিকট ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। অনেক তফসির ঘেটেও আমি কোনো সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না।

২৪৯. ফালাম্মা (সূতরাং, যখন) ফাসোয়ানা (বাহির হওয়া, বণ্ডনা হওয়া, আলাদা হওয়া, শিশুর দুধ ছাড়ানো) তালুত (তালুত) বিনজুনুদি (সৈন্যবাহিনীর সহিত, ফোজের সহিত, লঙ্করের সহিত) কালা (বলিল) ইন্নাল্লাহা (নিশ্চয়ই আল্লাহ) মুবতারিকুম (তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হইবে) বিনাইরিন (একটি নহর দ্বারা)।

☐☐সূতরাং যখন বণ্ডনা হইল তালুত সৈন্যসহ, বলিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করিবেন একটি নহর দ্বারা।

+ ফাম্মান (সূতরাং, যে) শারিবা (পান করিবে) মিনহ (উহা হইতে) ফালাইসা (সূতরাং না) মিননি (আম্মা হইতে)।

☐☐সূতরাং যে পান করিবে উহা হইতে সূতরাং সে আম্মা হইতে নয়।

+ ওয়া (এবং) মালু (যে) লাম্ম (না) ইয়াদআম্মহ (উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে) ফাইননাহ (সূতরাং নিশ্চয়ই সে) মিননি (আম্মার) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) মানিগ (যে) তারাকা (কোষ ভরিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া) ওলফাতান (এক অঞ্জলি, এক কোষ, এক চুল) বিইয়াদিহি (নিজ হাতে, আপন হস্তে)।

☐☐এবং যে উহার স্বাদ লইবে না সূতরাং নিশ্চয়ই সে আম্মার ব্যতিক্রম যে অঞ্জলি ভরিয়া লইবে এক অঞ্জলি নিজ হাত দিয়া।

+ ফাশারিবু (সূতরাং তাহারা পান করিল) মিনহ (উহা হইতে) ইল্লা (ব্যতীত, কিন্তু, একমাত্র) কালিলাম্ম (সামান্য, নগণ্য, স্বল্প) মিনহম্ম (তাহাদের মধ্য হইতে)।

☐☐সূতরাং তাহারা পান করিল উহা হইতে তাহাদের মধ্য হইতে নগণ্য (সংখ্যক) ব্যতীত।

+ ফালাম্মা (সূতরাং যখন) জাওয়াজাহ (উহা অতিক্রম করিল) হয়া (সে) ওয়াল (এবং) লাজিনা (যাহারা) আম্মানু (ইম্মান আনিয়াছে) মাআহ (তাহার সাথে) কালু (বলিল) লা (নাই) তাকাটা (শক্তি) লানাল (আম্মাদের) ইয়াওম্মা (আজ) বিজালুতা (জালুতের সঙ্গে) ওয়া (এবং) জুনুদিহি (তাহার সৈন্যদের)।

☐☐সূতরাং যখন উহা অতিক্রম করিল সে এবং যাহারা ইম্মান আনিয়াছেন তাহার সহিত, বলিল, নাই শক্তি আম্মাদের আজ জালুতের এবং তাহার সৈন্যদের সঙ্গে।

+ কালাল (বলিল) লাজিনা (যাহারা) ইয়াদনুননা (মনে করিত) আননাহম্ম (নিশ্চয়ই তাহারা) মুলাকুল (মোলাকাতকারী, সাক্ষাৎকারী, যাহারা সম্মুখীন হয়) লাহি (আলাহ) কাম্ম (কী পরিমাণ, কত) মিন (হইতে) ফিয়াতিন (দল) কালিলাতিন (কুঁদু, ছোট) গালাবাত (জয়ী হইয়াছে, বিজয়ী হইয়াছে, পরাভূত করিয়াছে, বিজয়লাভ করিয়াছে) ফিয়াতান (দল) কাসিরাতান (বড়, বৃহৎ) বিইজনিলাহি (আলাহর হক্কে, আলাহর অনুমতিক্রমে)।

☐☐বলিল, যাহারা মনে করিত নিশ্চয়ই তাহারা আলাহর সঙ্গে মোলাকাতকারী কত ছোট দল হইতে জয়ী হইয়াছে বড় দলের (উপর), আলাহর হক্কে।

+ ওয়ালি (এবং) লাহ (আলাহ) মাআস (সাথে) সোয়াবিরিনা (সবরকারীদের, ধৈর্যধারণকারীদের)।

☐☐এবং আলাহ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে (আছেন বা থাকেন)।

☐ এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি আমি লিখতে পারলাম না। কারণ, ইহার উপরে আম্মার কোনো পরিষ্কার ধারণা জন্মায় নাই। তবে এই আয়াতের বিষয়টির উপর অনেক কোরান-তফসিরের ব্যাখ্যাগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু কোনো সঠিক এবং নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নাই। তবে পাঠকদের মধ্যে যারা বেশি আগ্রহী কেবল তাদেরকেই বলছি যে তারা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসির পড়ে দেখতে পারেন। হজরত মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির

ফতহাতে মক্কিয়া-র অনুবাদটি যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশন করতেন অথবা তফসিরে রুহুল বায়ান-এর অনুবাদ করতেন অথবা তফসিরে নাইমি-র অনুবাদ করতেন তাহলে বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে বিষয়গুলোর উপর অনেকটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাতো। কিন্তু আফসোস, যেহেতু বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশনটি এগুলোর তফসির ভুলেও করতে চাইবেন না, কারণ সেটি ওহাবি বলয়ের কুয়াশায় অনেক আগেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

২৫০. ওয়া (এবং) লাম্বা (যখন) বারাজু (তাহারা সবাই বাহির হইয়া পড়িল, তাহারা সম্মুখীন হইল) লিজালতা (জালুতের জন্য) ওয়া (এবং) জুনদিহি (তাহার সৈন্যরা) কালু (বলিল) রাববানা (হে আমাদের রব) আফরিগ (তুমি ঢালিয়া দাও, মুখ খুলিয়া দাও, বর্ষণ করো) আলাইনা (আমাদের উপর) সাবরান (সবর, ধৈর্য) ওয়া (এবং) সাববিত (মজবুত, কঠিন, সুদৃঢ়) আখদামানা (আমাদের পদযুগল, আমাদের চরণ, আমাদের পাশুলি, আমাদের পদসমূহ) ওয়া (এবং) উনসুবনা (আমাদেরকে সাহায্য কর) আলাল (উপর) কাওমিল (জাতি) কাফিরিনা (কাফের)।

এবং যখন তাহারা বাহির হইয়া পড়িল জালুতের এবং তাহার সৈন্যদের জন্য, বলিল, হে আমাদের রব, ঢালিয়া দাও আমাদের উপর ধৈর্য এবং মজবুত আমাদের পদযুগল এবং আমাদেরকে সাহায্য কর কাফের কওমের উপর।

২৫১. ফাহাজামু (সুতরাং তাহারা পরাভূত করিল, সুতরাং তাহারা পরাজিত করিল, তাহারা পলায়নপূর করিল, সুতরাং তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত করিল, সুতরাং তাহারা হতভম্ব করিল) হুম (তাহাদের) বিইজনিল (হকুমে) লাহি (আল্লাহর)।

সুতরাং তাহারা হতভম্ব করিল (পরাজিত করিল) তাহাদেরকে আল্লাহর হকুমে।

+ ওয়া (এবং) কাতানা (হত্যা করিলেন) দাউদ (দাউদ) জালুতা (জালুত) ওয়া (এবং) আতাহল (তাহাকে দান করিলেন) লাহল (আল্লাহ) মলকা (রাজত) ওয়াল (এবং) হিকমাতা (হেকমত) ওয়া (এবং) আললামাহ (তাহাকে শিক্ষা দিলেন) মিম্বা (যাহা) ইয়াশাউ (তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন)।

এবং হত্যা করিলেন দাউদ জালুতকে এবং তাহাকে দান করিলেন আল্লাহ রাজত এবং হেকমত এবং তাহাকে শিক্ষা দিলেন যাহা তিনি চাইয়াছিলেন।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) লা (না) দাফউল (দূর করা, হঠাইয়া দেওয়া, দফা করা, হাওলা করিয়া দেওয়া, প্রতিহত করা) লাহি (আল্লাহ) নাসা (মানুষদের) বাদাহুম (তাহাদের কেহ-কেহকে) বিবাহিন (কিছু অংশ দ্বারা) লাকাসাদাতিল (অবশ্যই ফ্যাসাদে ভরিয়া যাইত, বিপর্যস্ত হইয়া যাইত, ঝামেলায় ভরিয়া যাইত, ঝগাটে পূর্ণ হইত, অমঙ্গলে ভরিয়া যাইত, আঘাতে ভরিয়া যাইত, ক্ষতে ভরিয়া যাইত, ক্ষতি হইত) আরদ (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ) ওয়া (এবং) লাকিন্নাল (কিছু) লাহা (আল্লাহ) জু (ওয়ালা) ফাদলিন (ফজল, মেহেরবানি) আলাল (উপরে) আলামিন (জগতসমূহের, আলমসমূহের)।

এবং যদি আল্লাহ প্রতিহত না (করিতেন) মানুষদের কিছু অংশ দ্বারা তাহাদের কেহ-কেহকে, অবশ্যই ফ্যাসাদে ভরিয়া যাইত পৃথিবী এবং কিছু আল্লাহ জগতসমূহের উপর ফজলওয়াল।

২৫২. তিলকা (ওইটা) আয়াতল (আয়াত, নিদর্শন, চিহ্ন) লাহি (আল্লাহ) নাওলুহা (আমরা তেলাওয়াত [পাঠ] করিতেছি) আলাইকা (তোমার উপর) বিলহাক্কি (সত্যসহ, সত্যের দ্বারা)।

ওইটা আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) আমরা আপনার উপর সত্যসহ তেলাওয়াত (পাঠ) করিতেছি।

+ ওয়া (এবং) ইন্নাকা (নিশ্চয়ই আপনি) লামিনাল (অন্যতম অন্তর্ভুক্ত) মুরসালিন (রসুলগণের, রসুলদের)।

এবং নিশ্চয়ই আপনি রসুলগণের অন্যতম।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হলেন তারা এবং জালুতের বাহিনী প্লাবন নিয়ে পালিয়ে গেল এবং মোমিনগণ তালুতের নেতৃত্বে জয়লাভ করলেন। ইহার পর আল্লাহ তালুতের মাধ্যমে হজরত দীউদ (আ.)-কে রাজত্ব এবং হেকমত দান করলেন। মোমিনদের দিয়ে আল্লাহ যদি এই ফজল মানব-সমাজে দান না করতেন তবে এই পৃথিবী ভরে যেত ফ্যাসাদের জটিলতায়। তাই পরিশেষে আল্লাহ বলছেন যে, নিশ্চয়ই আপনি একজন রসুল সকল রসুলদের মধ্যে। অধম লিখক আল্লাহর ক্বালামের এই আয়াতের মর্মটি বুঝতে পারি নি বলেই এটুকু লিখেই শেষ করে দিলাম।

২৫৩. তিলকা (ওই) রসুল (রসুলেরা, রসুলগণ) ফাদদালনা (আমরা ফজিলত দিয়াছি, আমরা মর্যাদা দিয়াছি, আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি) বাদাহম (তাহাদের কেহ-কেহ) আলা (উপর) বাদিন (অংশ, টুকরা, সম্পূর্ণ বস্তু কিছু অংশ, কিছু, কাহারও)।

ওই রসুলগণ আমরা ফজিলত দিয়াছি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর।

+ মিনহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কাহারও, কেহ) কাললামা (কথা বলিয়াছেন) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়া (এবং) রাফাতা (উর্ধ্বে স্থাপন করিলেন, উপরে উঠাইলেন, উঠাইলেন) বাদাহম (তাহাদের কেহ-কেহ) দারাজাতিন (মর্যাদা, ধাপ, সিঁড়ি)।

তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ কথা বলিয়াছে কাহারও (সাথে) এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে স্থান করিলেন তাহাদের কেহ-কেহকে।

+ ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দান করিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনা (পুত্র) মারিয়ামা (মারিয়মের) বাইইনাতি (খোলা চিকুসমূহ, উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি, শক্তি দিয়াছি) বিকুহি (কুহের দ্বারা) কুদসি (খুব পবিত্র, পবিত্র সত্তা)।

এবং আমরা দিয়াছি মারিয়মের ছেলে ইসাকে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং আমরা তাহাকে (ইসাকে) সাহায্য করিয়াছি খুব পবিত্র কুহের দ্বারা।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাতা (চাইতেন, ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালা (সে যুদ্ধ করিল, পরস্পর যুদ্ধ করা) আল্লাজিনা (যাহারা) মিন (হইতে) বাদি (পরে) হিম (তাহাদের) মিম্বাদি (হইতে পরে) মা (যাহা) জাতাহম (তাহাদের কাছে আসিয়াছিল) বাইইনাতি (উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়ালাকিনি (এবং কিছু) ইখতালাকু (তাহারা মতভেদ করিল, তাহারা মতবিরোধ করিল) ফামিনহম (সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে) মান (যে, কেহ, কাহারও) আমানা (ইমান আনিয়াছে, ইমান আনিল) ওয়া (এবং) মিনহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কেহ) কাফারা (কুফরি করিল, অস্বীকার করিল)।

এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না তাহাদের পর হইতে যাহারা, যাহা তাহাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণগুলি আসিয়াছিল ইহার পরেও এবং কিছু তাহারা মতবিরোধ করিল সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ইমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কুফরি করিল।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাতা (ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালু (তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত)।

এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা একে অপরকে হত্যা করিত না।

+ ওয়া (এবং) লাকিনুনা (কিন্তু) আল্লাহ (আল্লাহ) ইয়াফআলু (করেন)
মা (যাহা) ইউরিদু (তিনি চাহেন)।

এবং কিন্তু আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

এই আয়াতে আল্লাহ নিজেরই ঘোষণা করছেন এই বলে যে, রসুলগণের মধ্যে তিনি ফজিলতের প্রশ্নে কিছুটা কমবেশি করেছেন। অথচ এই সূরা বাকারাতেই আল্লাহ আদমদেরকে তথা মানুষদেরকে রসুলগণের মধ্যে ছোট-বড় করার ভাগ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা এই কথাটুকুর মাঝে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আল্লাহ মর্যাদার প্রশ্নে তথা ফজিলতের বিষয়ে রসুলগণের মধ্যে একজন হতে আরেকজনকে মর্যাদাবান বেশি করেছেন। যেহেতু এই মর্যাদার বিভাজনটি রসুলগণের মধ্যে তিনিই করেছেন সেই হেতু কোনো কিছু বলার এবং অভিযোগ করার প্রশ্নটি অবান্তর। অথচ আমাদেরকে রসুলগণের মধ্যে ছোট-বড় করতে মানা করে দিয়েছেন। কারণ যদিও রসুলগণ আমাদেরই মতো অথচ রসুলগণ মোটেও আমাদের মতো নহেন। যেহেতু রসুলেরা আমাদের মতো নহেন সেই হেতু আল্লাহ আমাদেরকে ছোট-বড় করতে তথা পার্থক্য করতে মানা করে দিয়েছেন।

আবার আল্লাহ বলেছেন, রসুলগণের মধ্যে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। এই কথাটির গভীর রহস্য অধম লিখকের পরিষ্কার জানা থাকলেও অপরিস্কারের ভান করে বলতে হচ্ছে যে তিনি (আল্লাহ) রসুলদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন। আবার তিনি বলছেন যে উচ্চমর্যাদার প্রশ্নে রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও উচ্চমর্যাদাটি দান করেছেন। তারপর আল্লাহ বলছেন, মরিয়মপুত্র হজরত ইসা রুহুল্লাহ (আ.)-কে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই উজ্জ্বল প্রমাণ (বাইবুনাত) বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? অধম লিখকের মনে হয় যে এই উজ্জ্বল প্রমাণটি হলো হজরত ইসা রুহুল্লাহ (আ.) দোলনাতে গুয়ে-গুয়েই কথা বলতেন। তিন দিনের শিশু অবস্থায় আর কোনো রসুল কথা বলেছেন কি না উহা অধম লেখকের জানা নাই। কিন্তু হজরত ইসা রুহুল্লাহ (আ.) যে জন্মগ্রহণ করেই কথা বলতে শুরু করেছেন ইহার জুলন্ত দলিলটি আমরা কোরান-এই পাই। কথিত আছে যে, দোলনায় গুয়ে-গুয়ে শিশু ইসা রুহুল্লাহ (আ.) যখন মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন সেই মানুষেরা অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত এবং ভক্ত তথা মরিদ হয়ে যেত। তারপরে আবার মরিয়মপুত্র ইসাকে রুহুল কুদ্দুস তথা অতি পবিত্র রুহ দ্বারা শক্তিশালী করার কথাটিও বলা হয়েছে। অধিকাংশ তুফসিরকারকেরা রুহুল কুদ্দুসের অর্থটি বুঝতে না পেরে অনুমানের গুলম্বারা বিদ্যাটি জাহির করে ফেলেছেন। আর সেই গুলম্বারা বিদ্যাটি হলো, রুহুল কুদ্দুস বলতে তারা ফেরেশতা জিবরাইলের কথাটি উল্লেখ করেছেন। হায় রে খোদা! এরা কি এটুকু বেমানান ভুলে গেছেন যে, জিবরাইল ফেরেশতার নফসও নাই এবং রুহও নাই। তথা নির্বাচন করার অধিকার হতে ফেরেশতার সস্পর্শভাবে বঞ্চিত। আসলে ফেরেশতা জিবরাইলের নাম যদি রুহুল কুদ্দুস দেওয়া হয় তাহলে ইহা অনেকটা কানা ছেলের নাম পদ্যলোচনের মতো শোনায়, তথা চোখই নাই অথচ কী সুন্দর অপূর্ব চোখ দুইটি। বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাকি না দিয়ে একবার ভাবুন তো যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে কোনো নফস এবং কোনো রুহ দান করেন নি। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজীবকে আল্লাহ নফস দান করেছেন, কিন্তু রুহ দান করেন নাই - একমাত্র মানুষ এবং জিন ছাড়া। তাই আমরা দেখতে পাই, মানুষের মধ্যে যে-রকম আল্লাহর ওলি হয়, তেমনি জিনের মধ্যেও আল্লাহর ওলি হয়। যেহেতু জিনজাতির সঙ্গে আমাদের তথা মানুষদের সঙ্গে পরিচয় নাই বললেই চলে তাই ইচ্ছা করেই জিনজাতির কথাটি বাদ দিয়ে যাই। আমরা জানি, ফেরেশতার অতি পবিত্র,

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নহে। সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। তাই মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাতি তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফেরেশতারা অতি পবিত্র হয়েও এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটির ধারেকাছেও নাই – কারণ নির্বাচন করার ক্ষমতাটি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি। নির্বাচন করার কথাটি তখনই আসে যখন ভালো এবং মন্দে মিশ্রণ করা হয়। ভালো-মন্দের অধিকারটি দান করলেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিও দান করা হয়ে যায়। কারণ কান টানলে মাথা আপনিই আসবে। আল্লাহর এত বড়-বড় জুলন্ত প্রমাণসমূহ দেখার পরেও মানুষ উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হত্যায়জ্ঞ এমনকি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে বারবার। ইহা মানবজাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কের তিলক হয়ে আছে এবং থাকবে। তাই এই সীমিত ইচ্ছাশক্তিটি দান করার দরুন কেহ ইম্মান আনবে কেহ সরাসরি কুফরি করবে। ভালো এবং মন্দের এই লীলাখেলাটি যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে অনেক রূপ ও রঙে এবং অনেক রকম লেবাসে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেছেন তথা নির্বাচন করার অধিকারটি দিচ্ছেন সেই হেতু আল্লাহ ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যদি হস্তক্ষেপ আল্লাহ করতেন তাহলে এই হত্যায়জ্ঞের লীলাখেলাটির চিরতরে অবসান হতো। এখানে অনেকেই আল্লাহকে গোপনে দোষ দিতে চায়। কিন্তু অধম লিখক নিরপেক্ষ মনে বলছি যে, স্বাধীনতা দেবার পর যদি উহা হরণ করা হয় তাহলে এই স্বাধীনতার মর্যাদাটি থাকে কোথায়? সুতরাং সর্বপ্রকার দোষ হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালাহুশানাহ সম্পূর্ণ মুক্ত।

২৫৪. *ইয়া আইউহা* (ওহে) *লাজিনা* (যাহারা) *আম্মান* (ইম্মান আনিয়াছ) *আনফিক* (তোমরা খরচ ব্যয় কর) *মিম্মা* (যাহা) *রজাকনাকুম* (আমরা আল্লাহী রেজেক তোমাদেরকে দিয়াছি) *মিন* (হইতে) *কাবালি* (পূর্বে) *আন* (যে) *ইয়াতিয়া* (আসিবে, লইয়া আসিবে) *ইয়াওমুন* (দিন) *লা* (না) *বাইউন* (ক্রয়-বিক্রয়, বেচাকেনা, লেনদেন, বিক্রয় করা, ক্রয় করা) *ফিহি* (ইহার মধ্যে) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *খুল্লাতুন* (দোষ্টি, বন্ধুত্ব, আনুকূল্য, সখ্য, মিত্রতা, স্বজনতা) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *শাফাতুন* (মধ্যস্থতা, ঠিকালতি, সুপারিশ, কাহারও পক্ষে কথা বলা)।

□□ওহে যাহারা ইম্মান আনিয়াছ, তোমরা খরচ কর যাহা পূর্ব হইতে আমরা রেজেক তোমাদেরকে দিয়াছি, যেদিন ইহার মধ্যে ক্রয়বিক্রয় আসিবে না, এবং না বন্ধুত্ব এবং না সুপারিশ।

+ *ওয়া* (এবং) *কাফেরুনা* (কাফেরেরা) *হম্ম* (তাহারা) *জালেমুনা* (জালেম, অত্যাচারী)।

□□এবং কাফেরেরা, তাহারা জালেম।

□ এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখার আগে পাঠকদেরকে একটি কথা বারবার বলে রাখতে চাই আর সেই কথাটি হলো, পৃথিবীতে যে-কয়টি সম্মানিত চলমান ভাষা আছে তার মধ্যে আরবি ভাষাও একটি। অথচ এই আরবি ভাষাটি হলো সবচাইতে গরিব ভাষা। গরিব ভাষা এজন্যই বললাম যে, একটি শব্দ দিয়ে অনেক রকম অর্থ হয়। দুনিয়ার ধনসম্পদকে যেমন রেজেক বলা হয়েছে তেমনি আবার আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যতত্ত্বলোকেও রেজেক বলা হয়েছে তাই ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে অনেক সময় চিন্তায় পড়ে যেতে হয়। এই আয়াতে যে-রেজেক দেওয়া হয়েছে, এবং উহা ব্যয় করার কথাটি বলা হয়েছে উহা দুনিয়ার ধনসম্পদও হতে পারে আবার আধ্যাত্মিক জগতের রহস্যতত্ত্বও হতে পারে। তারপর বলা হয়েছে, যে-দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ আর কোনো কাজে আসবে না সেই দিনটি মৃত্যু-ঘটনা ঘটে যাবার পূর্বরূপ হতে। আবার এই মৃত্যুটাকেই কোথাও কেয়মিত বলা হয়েছে আবার কোথাও

আখেরাতও বলা হয়েছে। একেক তফসিরকারক একেক রকম দুর্ভিত্তি গ্রহণ করে ব্যাখ্যাগুলো লিখে গেছেন। সুতরাং ব্যাখ্যার যত দুর্বলতাই থাক না কেন ব্যাখ্যাকারীকে হাকিকতে তথা চরম সত্যে কোনো প্রকার গালমন্দ করা যায় না। আবার 'জালেম' শব্দটি নিয়ে একটি আলোচনা করা যাক। আমরা দেখতে পাই, কোথাও পান হতে চুন কমে গেলেই জালেম বলা হয়েছে, কোথাও সামান্য নুফসের ভুলক্রটির জন্য জালেম বলা হয়েছে, আবার কোথাও ভয়ঙ্কর অত্যাচারীকে জালেম বলা হয়েছে। তবে সব জালেমের সঙ্গে কাফের শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। যে-জালেমের সঙ্গে কাফের শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেই জালেমেরা জঘন্য অত্যাচারী জালেম, যাদেরকে সমাজ ঘৃণা করে, অথচ ভয়ে উচ্চবাচ্য করে না। এই রকম জালেমদের কথাটি যখন বলা হয় তখন কাফের নামক শব্দটি উল্লেখ করা হয়। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা জালেম, যারা অত্যাচারী এবং ইত্যাদি জঘন্য গুণে গুণায়িত তারা হয় কাফের আবার কোথাও কাটা কাফের। এই যে একটি শব্দের অনেক রকম অর্থ হয় এবং ইহারই দরুন ইসলামে এত ফেরকাবাজির চেহারাগুলো বাধ্য হয়ে দেখতে হয়। সুতরাং যারা একেক ফেরকায় একেক রকম ব্যাখ্যা তুলে ধরে, চরম পর্যায়ে তথা হাকিকতে তাদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না। দোষটি তখনই দেওয়া যায়, যদি ইচ্ছা করে আপনি প্রবৃতির সঙ্গে খান্নাসটিকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যাগুলো তুলে ধরেন। তাহলে অবশ্যই তা দোষণীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এক শব্দের বহু অর্থের একটিকে তুলে ধরেন তাহলে কি করে দোষ দিতে পারি? তবে আল্লাহ পাকই ভালো জানেন যে ইহা কি আন্তরিক নাকি কুন্নিম (মেকি)?

২৫৫. আল্লাহ (আল্লাহ) না (নাই) ইলাহা (কোন ইলাহ [উপাস্য]) ইল্লা (ব্যতীত, একমাত্র, কিছু) ইয়া (তিনি)।

□□ আল্লাহ – নাই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া।

+ আল্লাহইউন (চিরজীবন্ত) কাইউমু (নিত্য বিরাজমান)।

□□ চিরজীবন্ত, নিত্য বিরাজমান।

+ না (না) তাখজু (ধরে – মূল শব্দ 'আখাজুন' হইতে তাখাজু। এই জন্যই মূল শব্দ দিলাম যে অনেকের 'ধরা' না লিখে 'স্পর্শ করা' শব্দটি ব্যবহার করে। অথচ 'স্পর্শ' শব্দের আরবি হইল 'মাসসাহ'। যেহেতু এইখানে 'মাসসাহ' শব্দটির বদলে 'তাখাজু' বলা হইয়াছে তাই বহু 'ধরা' শব্দটি ব্যবহার করিলাম) হ (তাহাকে) সিনাতুন (তন্দ্রা, নিদ্রার আবেশ, অবসাদ, পাতলা ঘুম) ওয়া (এবং) না (না) নাওমুন (নিদ্রা, ঘুম)।

□□ তন্দ্রা তাহাকে ধরে না এবং না ঘুম।

+ লাই (তাহার জন্য) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহের) ওয়া (এবং) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) আরদি (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ)।

□□ আকাশসমূহের মধ্যে যাহা তাহার জন্য এবং যাহা পৃথিবীর মধ্যে।

+ মান (কে) জা (তাহা, যাহা, যে, অধিকারী) আল্লাজি (যে) ইয়াশফাউ (সুপারিশ করা) ইন্দা (নিকট) হ (তাহার) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) বিইজনিহি (তাহার অনুমতি)।

□□ কে তাহার যে সুপারিশ করে তাহার নিকট তাহার অনুমতি ব্যতীত।

+ ইয়ালামু (তিনি জানেন) মা (যাহা) বাইনা (মধ্যে) আইদিহিম (তাহাদের হাতে) ওয়া (এবং) মা (যাহা) খালফাহম (তাহাদের পিছনে)।

□□ তিনি জানেন, যাহা তাহাদের হাতের মধ্যে এবং যাহা তাহাদের পিছনে।

+ ওয়া (এবং) না (না) ইউহিতনা (তাহারা আয়ত্ত [আবৃত] করে) বিশাইয়িন (কিছুর দ্বারা, কিছুর সহিত, বস্তুর দ্বারা, বস্তুর সহিত) মিন

(হইতে) *ইলম্বিহি* (তাহার জ্ঞান) *ইল্লা* (একমাত্র, ব্যতীত, কিছু) *বিম্বা* (যাহা) *শাআ* (তিনি চাহেন)।

এবং তাহারা আয়ত্ত করে না কিছু তাহার জ্ঞান হইতে একমাত্র যাহা তিনি চাহেন।

+ *ওয়াসিয়া* (পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, প্রসারিত, বিস্তৃত) *কুবসিইউহ* (তাহার সিংহাসন) *সাম্মাওয়াতি* (আসমানসমূহ) *ওয়া* (এবং) *আরদা* (পৃথিবী)।

তাহার সিংহাসন পৃথিবী এবং আকাশসমূহে বিস্তৃত।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইয়াউদহ* (তাহাকে কান্ড করে, তাহাকে অবসাদগ্রস্ত করে, তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত করে) *হিফজুহমা* (দুইটির হেফাজত, দুইটির সংরক্ষণ)।

এবং তাহাকে কান্ড করে না দুইটির হেফাজতে (সংরক্ষণে)।

+ *ওয়া* (এবং) *ইয়া* (তিনি) *আলিউল* (উর্ধ্ব, উচ্চ) *আজিমু* (আজমত, মহান)।

এবং তিনি উচ্চ, মহান।

এই আয়াতে 'ইলাহ' শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি কিছুটা। 'ইলাহ' অর্থ নেতা, অধিকারী, উপাস্য। এখন প্রশ্ন হলো : এই নেতা, এই ইলাহ, এই উপাস্য আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগতের কোথাও অবস্থান করার প্রশ্নই ওঠে না, একমাত্র মানুষের খান্নাসম্মিশ্রিত মনের মাঝেই ইলাহ আপনিত্ব তৈরি হয়ে যায়। যেমন ব্যাকটেরিয়াকে কেই ডেকে আনে না, ইহা আপনিই জন্মায় তেমনি খান্নাসম্মিশ্রিত মনটি এমনই একটি জিনিস তথা মাল যার মধ্যে বহু ইলাহের সমাগম ঘটে এবং এই ইলাহগুলো মনের মধ্যে গুণাগুণ গুরু করে দেয়। ইহাই শেরেকে ডবে থাকে। ইহাই শেরেকের পুরে গোসল করা। কারণ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও অণুপরিমাণ শেরেকের অবস্থানটি নাই একমাত্র মানুষ এবং জিনের অন্তর ছাড়া, যদিও সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর সেকাত তথা গুণাবলি। আল্লাহর যে-কোনো গুণাবলির বর্ণনা দিতে গেলেই র' অক্ষরটি ব্যবহার করতে হয় তথা আল্লাহর সূর্য, আল্লাহর চন্দ্র, আল্লাহর পৃথিবী এবং আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগত। আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মাঝে ঘূম থাকতে পারে, অলিস্য থাকতে পারে এবং আরও অনেক কিছু থাকতে পারে যা আমাদের জানা নাই, কিন্তু জ্ঞাতরূপী আল্লাহ তিনটি স্থানে অবস্থান করেন : প্রথমটি লা-মোকাম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি হলো জিন এবং মানুষের অন্তর। নফস এবং রুহের বিরূপ পার্থক্যটি যারা পরিষ্কার বুঝতে পারে নি, তারা এই বিষয়ে লেজে-গোবরে করে ছাড়ে। নফস আল্লাহর সেকাত, কিন্তু রুহ আল্লাহর জ্ঞাত তথা আল্লাহ স্বয়ং। এই রুহটি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছেন। যেমন একটি কাঠাল গাছে একশত কাঠালের পাঁচ হাজার কোষে কাঠালের বীজটি অবস্থান করছে। এই এতগুলো বীজের একটি ছোট বীজ রোপন করলে কুড়ি বছর পর দেখা যায় যে বিরূপ একটি কাঠাল গাছ এবং সেই গাছে কাঠালও ধরে আছে। এই ছোট একটি বীজের মধ্যে এতবড় কাঠাল গাছটির বিশাল শক্তিটি কেমন করে লুকিয়ে থাকে তা কৃষিবিজ্ঞানীরাই বলতে পারেন। প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদে অবশ্যই গ্রহণ করবে এবং তুন্দা ও বিশ্রামের প্রশ্নটি অবশ্যই আসবে। এমনকি গাছপালা, শাকসবজি ইত্যাদিও যে তুন্দায় আচ্ছন্ন হয় ইহা কৃষিবিজ্ঞানীরাই বলে থাকেন। কিন্তু রুহ? রুহ তো নফস নয়, বরং রুহ হলো আল্লাহর আদেশ তথা হুকুম। সতরাং এই রুহরূপী আল্লাহ চিরজীব তথা সব সময় জীবিত থাকেন। তাই আল্লাহকে তুন্দা এবং নির্দা কোনো কিছুই ধরতে পারে না অথবা স্পর্শ করারও ক্ষমতা নাই। আকাশগুলি এবং পৃথিবীর আরও যা কিছুই আছে সবই তো তাঁরই সেকাত। তিনি এবং তাঁর সেকাতসমূহ ছাড়া আর কিইবা থাকতে পারে? কারণ আল্লাহ এবং আল্লাহর গুণাবলি ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্বটি কল্পনাও করা যায় না।

অস্তিত্বের অবসান না থাকলে উহাকে শূন্য বলে। শূন্য যোগ শূন্য সমান সমান শূন্য। সুতরাং শূন্য শব্দটি কেবলই মৌখিক, বাস্তবে এর অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই 'আয়াতুল কুরসি' নামক আয়াতটিতে আল্লাহর যত শার্ন-মানই প্রকাশ করা হোক না কেন উহাতে অবাক হবার কিছুই নাই। তারাই অবাক হবেন যাদের মধ্যে শেরেকের অবস্থানগুলো বহাল ভবিষ্যতে বিরাজ করছে। সুতরাং সাধক কেন ধ্যানসাধনা করে? কেন বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার মোরাকুবা-মোশাহেদায় মশগুল থাকে? একমাত্র নিজের মধ্যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছায়। কারণ খান্নাসই শেরেকের জন্মদাতা। খান্নাস নাই, শেরেকও নাই। খান্নাস আছে, শেরেকের অবস্থানটিও আছে। পরিশেষে এই শেরেকের অবস্থানটিকে মিটিয়ে দিয়ে তওহিদে অবস্থান করার আত্মনাটি পরোক্ষভাবে করা হয়েছে। কেউ ইহার রহস্য বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির।

আমরা শুনেছি, মানুষের ভিতরে একটি গোসতের টকরা অবস্থান করছে, সেই গোসতের টকরাটি যদি পবিত্র হয় তাহলে সব কিছুই পবিত্র আর যদি তা অপবিত্র হয়, সব কিছুই অপবিত্র এবং উহারই নামটি হলো কলব।

২৫৬. না (নাই) *ইকুরাহা* (দমন, দমননীতি দ্বারা শাসন [কোয়ারশন], বলপ্রয়োগে বাধ্য করা, নিপাটন, শাসন, বাধ্যবাধকতা [কম্পালশন], দুর্বার শক্তি বা চাপ, বাধ্য করা, অবরোধ, মনোভাব-দমন, সংযম, বিবৃতভাব, বাধা [কমট্রেন], ক্ষমতা, জোর, কর্মশক্তি, কার্যকরতা, বলবত্তা, প্রেরণা, প্রভাব, বলপ্রয়োগ, জোরাজুরি, প্রবল চেষ্ঠা [ফোর্স, ফোর্সিং] মানুষকে জোরজবরদস্তি করিয়া কোনো কাজ করিতে বাধ্য করা [জোরজবরদস্তি করিয়া মুসলমান বানাইবার প্রয়োজন নাই - *লোগাতুল কোরান*, রশিদ নোমানি] বিরক্তি, অবাকিত বিষয় [জে. বি. হাবা] ভীতি, ঘণা [হেসওয়েরি] অপছন্দ [কাউম্যান]) *ফি* (মধ্যে) *দ্বীন* (দ্বীন, ধর্ম, ধার্মিক, ধার্মিকতাপূর্ণ, অর্থাৎ আচারানিষ্ঠ, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন, বিবেকী, অতিযত্নবান [রিলিজিয়াস], শুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, আত্মরিক - এবং আরও অনেক রকম অর্থ হয়। যাহা কিছু জীবের জীবনকে সৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া রাখে তাহাই ধর্ম)।

□□ নাই জোরজবরদস্তি ধর্মের মধ্যে।

+ *কাহ* (নিশ্চয়ই, অবশ্যই) *তাবাইয়ানা* (বয়ান করা, প্রকাশ করা, পরিষ্কার করিয়া বলা) *রুশদ* (সুপথ, নির্ভুল পথ, শুদ্ধ পথ, হেদায়েত, যোগ্যতা, পথপ্রাপ্ত, মঙ্গল, সাবধানতা, সুন্দর তদবির, বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, অবোধ, সহজ, সাবলিল, নিখুঁত, নির্দোষ, স্পষ্ট, সঠিক নির্দেশনা, সচেতনতা) *মিনাল* (হইতে) *গাইরি* (দ্রাস্তি, ভুল, ভুল ধারণা, ভুল চিন্তাধারা, ভ্রম, গোমরাহি, কুপথগামিতা)।

□□ অবশ্যই সুপথের বয়ান (প্রকাশ) (হইয়াছে) ভুল ধারণা হইতে।

+ *ফামান* (সুতরাং যে) *ইয়াকফুর* (কুফরি করে) *বিততাগতি* (তাগুতের সহিত, বস্তুমোহের সহিত, মোহের সহিত, কলুষিত বস্তুবাদের সহিত, মোহসৃষ্টিকারী বিষয়বস্তুর সহিত। বিষয়মোহকে এক-কথায় তাগুত বলে। বিষয়সমূহ তাগুত নহে, কারণ এইগুলি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সুতরাং, যে-কোনো বিষয়ের উপর মোহটিকে তাগুত বলা হয়) *ওয়া* (এবং) *ইউমিন* (ইমান আনিবে, ইমানের কাজ করিবে) *বিল্লাহি* (আল্লাহর সহিত) *ফাকাহি* (সুতরাং অবশ্য) *ইস্তামসাকা* (ধরিয়া ফেলিল, দৃঢ়ভাবে ধারণ করিল, ধারণ করিল) *বিলুতুফ্যাতি* (হাতল দ্বারা, পানপাত্রের হাতল, কিনারা, লোটা-বদনা ধারণ করিবার স্থান, কবজি, কাটাযুক্ত বৃক্ষ, শহরতলি এলাকা, মানুষের দল, পদক, নকশা) *উসকা* (মজবুত, খুবই মজবুত, নির্ভরযোগ্য)।

□□ সুতরাং যে কুফরি করে তাগুতের সহিত এবং ইমান আনে আল্লাহর সহিত সুতরাং নিশ্চয়ই ধারণ করে হাতল দ্বারা খুব মজবুত করিয়া।

+ লা (না) *ইনফিসাম্মা* (ভাঙিয়া যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া) *নাহা* (যাহা)।

□□ যাহা (কখনই) ভাঙিয়া যায় না।

+ *ওয়া* (এবং) *আলাহ* (আল্লাহ) *সামিউন* (শোনেন) *আলিমুন* (জানেন)।

□□ এবং আল্লাহ শোনেন, জানেন।

২৫৭. *আলাহ* (আল্লাহ) *ওয়ালিউ* (অভিভাবক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, অশ্রয়দাতা) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমান* (ইমান আনিয়াছে) *ইউখরিজুহুম* (তাহাদেরকে বাহির করিয়া আনে) *মিনাজ্জ* (হইতে) *জুলুম্মাতি* (অন্ধকার) *ইলা* (দিকে) *নুরি* (আলো, নূর)।

□□ আল্লাহ অভিভাবক (বন্ধু) যাহারা ইমান আনিয়াছে, তাহাদেরকে বাহির করিয়া আনে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে।

+ *ওয়া* (এবং) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *কাফারু* (কুফরি করে) *আউলিয়াহুম* (তাহাদের অভিভাবক বন্ধু) *তাগুত* (তাগুত) *ইউখরিজুহুম* (তাহারা তাহাদেরকে বাহির করিয়া লইয়া যায়) *মিনান* (হইতে) *নুরি* (নূর, আলো) *ইলা* (দিকে) *জুলুম্মাতি* (অন্ধকার)।

□□ এবং যাহারা কুফরি করে তাহাদের অভিভাবক (বন্ধু) তাগুত, তাহারা তাহাদেরকে বাহির করিয়া লইয়া যায় আলো হইতে অন্ধকারের দিকে।

+ *উলাইকা* (উহারাই তাহারা) *আসহারু* (অধিবাসী) *নারি* (আগুনের)।

□□ উহারাই তাহারা, আগুনের অধিবাসী।

+ *হুম* (তাহারা) *ফিহা* (উহার মধ্যে) *খালেদিনা* (বাস করিবে)।

□□ তাহারা উহার মধ্যে বাস করিবে।

এই দুটো আয়াতের সামান্য কিছু ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে দেখা যায়, প্রথমেই বলা হয়েছে যে ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকার জোরজবরদস্তি তথা বুলপ্রয়োগ কোনো অবস্থাতেই নাই। কারণ ধর্মবিষয়টি প্রকৃতপক্ষে একান্ত মনের বিষয়। জোর করে ধর্মের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করাতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। কারণ অনুষ্ঠানসমূহ সুন্দর পালন করছে, কিন্তু মনটি মোটেও অনুষ্ঠানের গভীরতায় অবস্থান করে না। জোর করে কাজ করানো যায়, কিন্তু জোর করে মন বসানো যায় না। মনোজগতের বিষয়টি প্রতিটি মানুষের একেকটি একান্ত নিজস্ব বিষয়। তাই এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, কোনো প্রকার জোরজবরদস্তি ধর্মের মধ্যে নাই। এখানে একটি কথা হলো যে, যিনি ধর্মপালন করছেন, তিনি আল্লাহর বান্দা, আবার যে ধর্মকে অস্বীকার করছে সেও মনেরই অজান্তে আল্লাহর বান্দা। এছাড়া সবাই যদি বিনা বাকে, বিনা প্রশ্নে ধর্মের সব রকম অনুশাসন মেনে চলতো তাহলে আল্লাহর পরীক্ষা করার প্রশ্নটির স্থান কোথায় থাকতো? আল্লাহ অন্যত্র *কোরান*-এ বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিম্নেষের মধ্যে পৃথিবীতে বাস করা সব মানুষগুলোকেই এক উন্মত্তে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা এজন্যই করেন না যে, পরীক্ষা করার কথাটি একদম অকেজো হয়ে যায়। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা করার জন্যই মহান আল্লাহর এই লীলাখেলাটি চলে আসছে। যদিও সুমুগ্ন সৃষ্টিরাজ্য তওহিদে বাস করে এবং যারা তওহিদে বাস করে তাহাদেরকে নিয়ে আল্লাহর লীলাখেলার প্রশ্নটি আসে না। যেহেতু মানুষ এবং জিন জাতিকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করা হয়েছে তাই মানুষ এবং জিনের অন্তরে বাস করা খান্নাসরূপী শয়তান কত রকম মোহমায়ার জাল তৈরি করে আর সেই মোহমায়ার জালে অধিকাংশ মানুষ ফেলে যায় এবং তাগুতের পূজা করে। সৃষ্টির বিষয়বস্তু কখনই তাগুতরূপে দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং মানবমনের মাঝে খান্নাসের তৈরি মোহমায়াজালো সৃষ্টির বিষয়বস্তুর উপর প্রভাব ফেলে এবং যখনই মোহমায়ার প্রভাবটি বস্তুজগতের উপর পড়ে তখনই উহা হয় কলুষিত, কলঙ্কিত এবং কদর্যে ভরা। এই তাগুতকে মুখে-মুখে

অস্বীকার করলে তাপ্তত কখনই ভেঙে যায় না। মুখে-মুখে যতবারই আউজবিলাহি বিনাশ শায়তোয়ানুর রাজিম তথা পখিরের আঘাত খাওয়া শয়তানি হতে আশ্রয় চাই না কেন, শয়তান কিছতেই দূর হয় না। এই শয়তানকে দূর করতে হলেই পীরে কামেলের আশ্রয় অথবা পীরে কামেলের সনদপ্রাপ্ত খলিফার আশ্রয়ে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতে লিপ্ত থাকলেই তাপ্ততটি ধীরে-ধীরে ছুটে যায় এবং তখনই মনে হবে সমগ্র সৃষ্টিজগত একই তওহিদের মাঝে ডুবে আছে। এই তাপ্ততকে তাড়াতে হলে মনের দৃঢ়তা নিয়ে এবং একান্ত মনে ধ্যানসাধনা করে যেতে হয় এবং এই ধ্যানসাধনার মধ্যেই গড়ে ওঠে অগ্নসর হবার মজবুত আল্লাহর প্রতি ইমান। তারপরই বলা হয়েছে, যারা ইমানদার তাদের অভিভাবক তো যুয়ং আল্লাহ। তখন আল্লাহ এই প্রকার ইমানদারদেরকে অঙ্ককার হতে আলোর দিকে বাহির করে আনেন। পরবর্ত্তে যারা এই মোহমায়ার তাপ্ততের মধ্যে জুড়িয়ে থাকে তারা ঠিক এর উল্টোটি করে। তারা আলো হতে অঙ্ককারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে আপন পবিত্র মনের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসের তৈরি মোহ-মায়ার তাপ্ততের দরুন। এরাই প্রতিনিয়ত অদৃশ্য আশ্তনের দহনে জ্বলছে অথচ বোঝা যায় না। এরা তখন আশ্তনের সাথী হয়ে যায় এবং সেখানেই বাস করে। সুতরাং ঘুরেফিরে সব কথার মূলে ওই একই কথা। সঙ্গীতের যত রাগ-রাগিনী থাক না কেন সবই তো মাত্র সাত পাকে বাধা আর সেই সাত পাকের নাম হলো : সা রে গা মা পা ধা নি। যত উপদেশ, যত ভূয় প্রদর্শন, যত সাবধানতা ইত্যাদি বারবার দেওয়া হচ্ছে সবই তো ওই একই সুরে গাথা আর সেই সুরটির নাম হলো আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলা। পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই আর সেটা হলো, আপন অন্তর হতে তাপ্ততকে মুক্ত করতে পেরেছে কিনা ইহা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। উপর হতে আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার দিয়ে এই রহস্যটি বুঝবার কোনো দাড়াপাল্লা তৈরি হয় নি। যদি রহস্যলোকের রহস্যগুলি দেখিয়ে দেওয়া যেত তাহলে অস্বীকারকারী কি থাকতো? তাই তো দেখতে পাই, যুগে-যুগে কালে-কালে লক্ষ-লক্ষ নবি-রসুল-ওলি-গাউস-কুতব-আবদাল-আরিফ-মুনি-খামি-সাধু-সন্ত আগমন করে কত প্রকার আদেশ-উপদেশ করার পরেও মোহমায়ার নদী সাতরিয়ে সবাই কূলে উঠতে পারে না।

২৫৮. **আলাম** (না কি) **তারা** (আপনি দেখেন) **ইলান** (দিকে) **লাজি** (যে) **হাজ্জা** (সে আগড়া করিয়াছে, সে প্রতিবাদ করিয়াছে) **ইবরাহিম** (ইবরাহিমের সঙ্গে) **ফি** (মধ্যে) **রাববি** (তাহার রব) **আন** (যে) **আতাহ** (তাহাকে দিয়াছেন) **আল্লাহ** (আল্লাহ) **মুলকা** (রাজত)।

□□ আপনি দেখেন না কি যে-দিকে ইবরাহিমের সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়াছিল তাহার রবের মধ্যে যে আল্লাহ তাহাকে দিয়াছেন রাজত?

+ **ইজ** (যখন) **কাল** (বলিলেন) **ইবরাহিম** (ইবরাহিম) **রাববিয়া** (আম্মার রব) **আল্লাজি** (যিনি) **উইহি** (জীবন দেন) **ওয়া** (এবং) **উইমিত** (মৃত্যু দেন)।

□□ যখন ইবরাহিম বলিয়াছিলেন, যিনি আম্মার রব - জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন।

+ **কাল** (বলিল [নুমরুদ]) **আনা** (আমি) **উইহি** (জীবন দেই) **ওয়া** (এবং) **উমিত** (আমি মৃত্যু দেই)।

□□ বলিল (নুমরুদ) আমি জীবন দেই এবং আমি মৃত্যু দেই।

+ **কাল** (বলিলেন) **ইবরাহিম** (ইবরাহিম) **ফাইননা** (সুতরাং নিশ্চয়ই) **আল্লাহ** (আল্লাহ) **ইয়াতি** (আসিবে, আসে, আনিবে, আনেন) **বিশশামসি** (সূর্যের সহিত) **মিনাল** (হইতে) **মাশরিকি** (পূর্ব দিক) **ফাতি** (সুতরাং আনো) **বিহা** (ইহার সহিত) **মিনাল** (হইতে) **মাশরিকি** (পশ্চিম দিক) **ফাবুহিতা**

(সূতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল, সূতরাং হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সূতরাং হতভম্ব হইল, সূতরাং তালগোল পাকাইয়া ফেলিল, সূতরাং বিভ্রান্ত হইল, সূতরাং বিস্মিত হইল, সূতরাং পরাভূত হইল) আললাজি (যে) কাফারা (কুফরি করিল, অস্বীকার করিল, বাতিল করিল, প্রত্যাখ্যান করিল, বর্জন করিল, মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল)।

বলিলেন ইবরাহিম, সূতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ সূর্যের সহিত আনেন পূর্ব দিক হইতে, সূতরাং তুমি আনো ইহার সহিত পশ্চিম দিক হইতে, সূতরাং হতভম্ব হইয়া গেল যে কুফরি করিল (অস্বীকার করিল)।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) না (না) ইয়াদি (হেদায়েত করেন, সঠিক পথ দেখান) কাওমা (জাতি, কওম, গোত্র, সম্প্রদায়) জোয়ালিমিনা (জালেম, অত্যাচারী, অন্যায়কারী)।

এবং আল্লাহ হেদায়েত করেন না জালেম কওমকে।

এই আয়াতে সেই সকল মহাসাধকদের মধ্যে যখন আপন রবের উদয় হয়ে থাকে তখনই বিশ্ববরূপী আল্লাহ তাহার রাজত্ব দান করেন। মহাপুরুষদের তথা ঔলি-আল্লাহদের এ-রকম রববিষ্ময়ের শক্তির মধ্যেই যুগে-যুগে, কালে-কালে কাফেরদের তথা অস্বীকারকারীদের সব রকম বিরোধ আর বিতর্ক চলে এসেছে, আসছে এবং আসবে। কারণ কাফেরেরা তথা অস্বীকারকারীরা প্রকাশ্য এবং দৈহিক শক্তি ছাড়া যে বিশাল আত্মিক শক্তিটি অবস্থান করছে উহা গ্রহণ করে নিতে অথবা মেনে নিতে কখনই রাজি ছিল না এবং কখনও রাজি থাকে না। ইহাই অস্বীকারকারীদের চারিদিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই অস্বীকারকারীদের মাঝেও একটি খোড়া যুক্তি অবস্থান করে আর সেই খোড়া যুক্তিটি হলো, এই ইহজীবনের পর আর কোনো জীবন নাই। প্রতিটি মানুষ যে জন্ম-মৃত্যুর ঘণায়মান চক্রের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে আছে এই কথাটি মেনে নিতে রাজি নয়, সূতরাং ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের সাহায্যে এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ঐশ্বরিক রহস্যময় জ্ঞানস্বর্যটি যে উদয় হতে পারে, ইহার গুরুত্ব অথবা প্রয়োজনীয়তা আছে বলে অস্বীকারকারীর দলেরা মনে করে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তরূপে নমরুদ, ফেরাউন আরও অনেকের নাম বলা চলে। এ জন্যই যারা রহস্যের জগতটিকে অস্বীকার করে যায় এবং লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের উপাসনা করে যায় তাদের পক্ষে মুক্তি লাভের হেদায়েত হতে বঞ্চিত থাকতে হয়। ইহা একটি নিম্নম সত্য।

এখন একটি প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে যে, এত কিছু দেখার পরেও, এত কিছু জানবার পরেও এরা কেমন করে অস্বীকার করে? মানব দৃষ্টিভঙ্গি দু-রকম হয়ে থাকে : একটি ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তাধারাটি যে প্রবহমান ইহাই বা কে দিয়েছে? অথবা ইহারই মাঝে কী-বা রহস্য লুকিয়ে আছে? অধম লিখককে প্রশ্ন করলে উত্তরটি হবে, 'আমি জানি না।' তবে এই সব আজব-আজব প্রশ্নের আজব-আজব উত্তরগুলো যদি

একাত্তরই জানবার ইচ্ছাটি থাকে তাহলে দিওয়ান-ই শামস-ই তাবরিজ নামক ফারসি ভাষায় রচিত বিরাট গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। দেখতে পাবেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিক দর্শনের কী চমৎকার লীলাখেলার রহস্য। তবে ইহা মানুষকে জংলি বানাবার বস্তুর দৃষ্টিক দর্শন নয়।

২৫৯, আও (অথবা) ক্বা (মতো) আললাজিনা (যে, যাহারা) মাওরা (চলিয়া গিয়াছে, রাশি পাকাইল, কটখাদু হওয়া, অতিক্রম করিল, পার হইল, ডিঙাইল, লঙ্ঘন করিল, স্থানান্তরে গেল, নিজের পথ কুরিয়া লইল, অবস্থান্তরিত হইল, মালিকানা বদল হইল, জ্ঞাপিত বা চালিত হইল, চাল হইল, চলাচল করিল, পরিচিত হইল, অতিবাহিত হইল, অতিক্রান্ত হইল, অদৃশ্য হইল, শেষ

হইল, মিলাইয়া গেল, মারা গেল) *আলা* (উপর) *কারইয়াতিনু* (বস্ত্রবাসী, রুদ্র গ্রাম, জনপদ) *ওয়া* (এবং) *হিয়া* (সে, তাহা) *খাউইয়াতিনু* (পতিত, পতনপ্রাপ্ত, খোলা, ধ্বংসাবশেষ, ধ্বংস, অধঃপতন, সর্বনাশ, ক্ষতি, হানি, সোভাগহানি, নৈতিক অধঃপতন) *আলা* (উপর) *উরুশিহা* (তাহার ছাদ, তাহার সিংহাসন, তাহার চাল)

অথবা যাহার মতো অতিক্রম করিয়াছিল ছোট গ্রামের উপর এবং তাহা ধ্বংস (পতিত) তাহার ছাদগুলির উপর।

+ *কাল* (বলিল) *আননা* (কীভাবে, যেখানে, যখন) *ইউই* (জীবিত করা) *হাজিহি* (ইহা, ইঙ্গিতদানকারী) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *বাদা* (পর, পরে) *মাউতিহা* (তাহার মৃত্যু)।

বলিল, কীভাবে জীবিত করিবে ইহাকে আল্লাহ তাহার মৃত্যুর পর?

+ *ফাআমাতাহ* (সুতরাং তাহাকে মৃত্যু দিলেন) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *মিয়াতা* (একশত) *আমিন* (বহুর) *সুম্মা* (তারপর) *বাআসাই* (তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন)।

সুতরাং তাহাকে মৃত্যু দিলেন আল্লাহ একশত বছর, তারপর তাহাকে পুনরায় জীবিত করিলেন।

+ *কাল* (বলিলেন) *কাম* (কত) *লাবিসতা* (তুমি অবস্থান করিয়াছিলে?)

বলিলেন, তুমি কত (কাল) অবস্থান করিয়াছিলে?

+ *কাল* (বলিল) *লাবিসতা* (আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, আমি ছিলাম) *ইয়াওমান* (একদিন) *আও* (অথবা) *বাদা* (কিছু অংশ) *ইয়াওমিন* (দিনের)।

বলিল, আমি অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা কিছু অংশ দিনের।

+ *কাল* (বলিলেন) *বাল* (বরং) *লাবিসতা* (তুমি অবস্থান করিয়াছিলে) *মিয়াতা* (একশত) *আমিন* (বহুর) *ফানজুর* (সুতরাং তাকাও, সুতরাং দেখ) *ইলা* (দিকে) *তোয়ামিকা* (তোমার খাদ্য) *ওয়া* (এবং) *শারাবিকা* (তোমার পানীয়) *লাম* (নাই) *ইয়াতাসান্না* (নষ্ট হয়, বিকৃত হয়)।

বলিলেন, বরং তুমি অবস্থান করিয়াছিলে একশত বছর সুতরাং দেখ তোমার খাদ্যের দিকে এবং তোমার পানীয়ের, (উহা) নষ্ট হয় নাই।

+ *ওয়া* (এবং) *উনজুর* (তাকাও, নজর দাও) *ইলা* (দিকে) *হিমারিকা* (তোমার গাধা) *ওয়া* (এবং) *লিনাজ্জালাকা* (আমরা তোমাকে জানাইবার জন্য) *আয়াতান* (আয়াত, নিদর্শন) *লিন্নাসি* (ইনসানদের জন্য, মানুষদের জন্য) *ওয়া* (এবং) *উনজুর* (তাকাও, নজর দাও, দেখ) *ইলা* (দিকে) *ইজ্জুয়ামি* (হাড়গুলি) *কাইফা* (কীভাবে) *নুনশিজ্জাহা* (আমরা জীবিত করি, আমরা তাহাকে সংযোজিত করি) *হা* (তাহা) *সুম্মা* (তারপর) *নাক্সুহা* (আমরা ঢাকিয়া দেই) *হা* (তাহা) *লাহ্মান* (গোস্ত)।

এবং তুমি নজর কর তোমার গাধার দিকে এবং আমরা (আল্লাহ) তোমাকে জানাইবার জন্য (একটি) আয়াত (নিদর্শন) মানুষের জন্য এবং তুমি নজর কর হাড়গুলির দিকে কীভাবে আমরা (আল্লাহ) জীবিত করি তাহা তারপর আমরা আল্লাহ ঢাকিয়া দেই তাহা গোস্ত (দিয়া)।

+ *ফালাম্মা* (সুতরাং যখন) *তাবাইইয়ানা* (স্পর্শ হইল, প্রকাশ পাইল) *লাহ* (তাহার জন্য) *কাল* (বলিল) *আলাম* (আমি জানি) *আননা* (নিশ্চয়ই) *আল্লাহ* (আল্লাহ) *আলা* (উপর) *কুলিলি* (সব) *শাইয়িন* (কিছুর, বস্তুর) *কাইকুন* (ক্ষমতাবান)।

সুতরাং যখন স্পর্শ হইল তাহার জন্য বলিল আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

এই আয়াতে বলা হয়েছে একটি গ্রামের ধ্বংসের পরিণতির কথাটি। একজন মানুষকে এখানে চিন্তা করতে দেখছি এবং সে অবাক বিষ্ময়ে এই কথাটি চিন্তা করছিল যে মারা যাবার পর আবার কেমন করে জীবিত হতে পারে। লোকটি এই চিন্তার মধ্যে যখন ডুবে গেল তখন আল্লাহ তাকে একশত

বহুর মৃত অবস্থায় রেখে দিলেন। তারপর তাকে আবার জীবিত করলেন। লোকটি পুনরায় জীবিত হবার পর আল্লাহ প্রশ্ন করাতে লোকটি বলেই ফেললো যে সে একদিন অথবা একদিনের সামান্য অংশ ঘুমিয়েছিল। তখন আল্লাহ বললেন যে, না তুমি একদিনও নয় এবং একদিনের কিছু অংশ নয়, বরং একশত বছর ঘুমিয়েছিলে। তারপর আরও চমক দেবার জন্য বলা হলো যে তোমার খাদ্য-পানীয়ের দিকে তুমি তাকিয়ে দেখ তো, উহা ঠিক সে-রকমই আছে কি না? এবং তুমি যে গাধা নামক বাহনটি ব্যবহার করতে উহার দিকে তাকিয়ে দেখ তো।

লোকটি অবশেষে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন এবং তখনই আল্লাহ বললেন যে, আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য এই সকল ঘটনাগুলো নিদর্শনরূপে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরি। অবশেষে সেই লোকটি অকপটে বলেই ফেললো, যে এই রহস্যের জ্ঞান আমার জ্ঞান ছিল না এবং এখন জ্ঞানতে পারলাম এর গভীর রহস্য এবং আল্লাহকে বললো তুমি প্রতিটি বস্তুর উপর শুধু ক্ষমতাবানই নও, বরং তুমিই যে সেই সর্বশক্তিমান ইহাতে আর বিদ্বান সন্ধেহের অবকাশ রইল না। কারণ বই-পড়া বিদ্যা-বুদ্ধিতে সন্ধেহ আর প্রশ্নগুলো ধাপে-ধাপে সাজানো থাকে, কিন্তু ধ্যানযোগে যখন এই রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলো চোখের সামনে দেখতে পেলাম তথা আইনুল একিনে পরিণত হলো তখন সব রকম সন্ধেহ আর প্রশ্নের অবসান হয়ে যায়। পরিশেষে এই আয়াতের বিস্ময়কর ব্যাখ্যাটি যদি কোনো পাঠকের বিস্তারিত জানবার আগ্রহ থাকে তাহলে শাহ সুফি সদুর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত *কোরান দর্শন* নামক *কোরান*-এর তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন। অথবা হজরত মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফতহাতে মক্কিয়া* পড়ে দেখতে পারেন। তবে আফসোস। সুফিবাদের বিশ্ববিখ্যাত এই ওলি হজরত মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফতহাতে মক্কিয়া* নামক অল্পর গ্রন্থটি আজও কোনো ব্যক্তি, কোনো পীর-ফকির অথবা সরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনুবাদ করেন নি। *কোরান*-এর আয়াতটি মোটেই বিজ্ঞান-বহির্ভূত নয় এবং ইহা বিজ্ঞানের বহু উর্ধ্বের মহাবিজ্ঞান। ইট ইজ দ্য সায়েন্স বিয়ন্ড অল সায়েন্স।

২৬০. *ওয়া* (এবং) *ইজ্জ* (যখন) *কাল* (বলিলেন) *ইবরাহিম* (ইবরাহিম) *বাববি* (আম্মার রব) *আরিনি* (আম্মাকে দেখান) *কাইফা* (কীভাবে) *তুইল* (আপনি জীবিত করেন) *মাওতা* (মৃতকে)।

এবং যখন বলিলেন ইবরাহিম, আম্মার রব, আম্মাকে দেখান কীভাবে আপনি জীবিত করেন মৃতকে।

+ *কাল* (বলিলেন) *আওয়ালাম* (তবে কি নাই) *তুমিন* (আপনি বিশ্বাস করেন)।

বলিলেন, তবে কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

+ *কাল* (বলিলেন) *বাল্লা* (হ্যা) *ওয়ালাকিন* (এবং কিন্তু) *লিইয়াত মাইননা* (প্রশান্ত করার জন্য) *কালবি* (আম্মার কলবকে)।

বলিলেন, হ্যা এবং কিন্তু প্রশান্ত করার জন্য আম্মার কলবকে।

+ *কাল* (বলিলেন) *ফাকুজ্জ* (সূতরাং ধরুন) *আব্বাআতান* (চার) *মিনাল* (হইতে) *তাইরি* (পাখি) *ফাসুরহননা* (সূতরাং আপনি পোষ মানান তাহাদেরকে) *ইলাইকা* (আপনার দিকে) *সুম্মা* (তারপর) *ইজ্জআল* (আপনি রাখুন, আপনি করিয়া দিন, আপনি বানাইয়া দিন, রাখিয়া দিন) *আলা* (উপর) *কুললি* (প্রত্যেকে) *জাবালিন* (পাহাড়) *মিনহননা* (তাহাদের হইতে) *জুজআন* (অংশ, টকরা) *সুম্মা* (তারপর) *উদউহননা* (তাহাদেরকে ডাকুন) *ইয়াতিনাকা* (আপনার কাছে আসিবে) *সাইয়ান* (দোড়াইয়া, ছুটিয়া, দ্রুত)।

বলিলেন, সূতরাং আপনি ধরুন চারটি পাখি হইতে সূতরাং তাহাদেরকে পোষ মানান আপনার প্রতি তারপর রাখিয়া দিন প্রত্যেক পাহাড়ের উপর

তাহাদের হইতে অংশ (টুকরা) তারপর তাহাদেরকে ডাকুন আপনার কাছে আসিবে দোঁড়াইয়া।

+ ওয়া (এবং) ইলুম (আপনি জানিয়া রাখুন) আননা (যে) আল্লাহ (আল্লাহ) আজিজুন (শক্তিশালী) হাকিমুন (হেকমতওয়ালা)।

এবং আপনি জানিয়া রাখুন যে আল্লাহ শক্তিশালী, হেকমতওয়ালা।

এই আয়াতে আল্লাহর অনেক একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো যে কেবল মৃতকেই তিনি জীবন দান করেন না, বরং টুকরো-টুকরো করে গোসতগুলো মিশিয়ে পাহাড়ের উপর রেখে দিয়ে ডাক দিলে সঙ্গে-সঙ্গে সব কিছু একত্রিত হয়ে পাখি হয়ে চলে আসবে। এখানে একটি বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করুন, আর সেই বিষয়টি হলো আল্লাহ নিজে না ডাক দিয়ে তার বন্ধুকে ডাকতে বলেছেন। যে-কাজটি আল্লাহর করার কথা উহা কেন তার বন্ধুকে দিয়ে ডাকবার আদেশটি দিচ্ছেন? ইহা কি অনেকটা সেই রকম যে-রকম অন্যত্র কোরান-এ বলা হয়েছে, *অম্মা রামাইতা ইজু রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা* - তথা আপনি যে ককুর ছুড়ে মেরেছেন উহা আপনি মারেন নি, বরং উহা আমিই (আল্লাহ) মেরেছি এবং উহা আপনার হাত নয়, বরং উহা আমারই হাত। এই কথাটির দ্বারা আল্লাহর মহাবিজ্ঞানময় পদ্ধতিতে তার প্রিয় বান্দাদের মাঝে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হন। যদিও প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ রহস্যময় ধারণা করে বিরাজ করছেন, কিন্তু তারাই আল্লাহর বন্ধু যারা এই রহস্যকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করতে পেরেছেন। এই রহস্য যখন সাধকের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে যায় তখন সাধকের নফসটিকে সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের মতো গ্রাস করে ফেলে এবং সাধক তখন নিজের মধ্যে রহস্যের অবস্থানটি দেখতে পান এবং তখনই সাধক আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠেন। এই রহস্য আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগতে - অবশ্য অধম লিখকের জানা মতে - আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তাই মানুষই হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। যদিও কিছু লোককে না-বুঝে না-শুনে ফেরেশতাদের নিয়ে হিয়া-হিয়া বলতে দেখা যায় এবং লাফালাফি শুরু করে দেয়, তাদের এই কথাটুকু জেনে রাখা উচিত যে, কোনো ফেরেশতাকেই আল্লাহ নফস এবং রহস্য দুটোর একটিও দান করেন নি। ফেরেশতারা যত পবিত্র হোক না কেন, তারা হলেন ভালো-মন্দের উল্লেখ আল্লাহর একান্ত আজ্ঞাবহ রোবট। *বুখারি* এবং *মুসলিম শরিফ*-এর একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, বান্দা নফুল এবাদত করতে-করতে আল্লাহর এত কাছে এসে পড়ে যে বান্দার জিস্মাটি আল্লাহর জিস্মায় পরিণত হয়, বান্দার চোখ আল্লাহ চোখে পরিণত হয়, বান্দার কান আল্লাহর কানে পরিণত হয় এবং বান্দার হাত-পা, চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুই আল্লাহময় হয়ে যায়। সুতরাং টুকরো-টুকরো করা পাখিগুলোর গোসতগুলোকে পাহাড়ের উপর রাখা অবস্থায় আল্লাহ কিছু ডাক দিলেন না, বরং আল্লাহর বন্ধুকে দিয়ে আল্লাহ ডাক দেওয়ালেন। এখানেই ভাববার বিষয়, এখানেই গোপনীয়তার অভ্যস্তরে গভীর গোপনীয়তা লুকিয়ে থাকে, যাহা বলে ও লিখে শত ব্যাখ্যা দিলেও বোঝা যায় না। ইহা তখনই বোঝা যায় যখন সাধক এই গভীর রহস্যের মধ্যে ডুব দিতে পারেন। *বুখারি শরিফ*-এ বর্ণিত আছে যে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) দুই রকম জ্ঞান মহানবি হতে অর্জন করেছেন : একটি জাহেরি এবং অপরটি বাতেনি। উনি বলেই দিয়েছেন যে জাহেরি জ্ঞানটির একটিও রেখে না দিয়ে প্রকাশ করার কর্তব্য ও দায়িত্বটি পালন করে গেলাম, কিন্তু পরকালে বাতেনি জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটিও প্রকাশ করলাম না, কারণ যদি উহা প্রকাশ করতাম তাহলে জ্ঞানরাজ্যে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবার সম্ভাবনাটি থাকবে এবং আরবি ভাষার বাগধারীতে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, 'ইহাতে কাটা যাইবে আমার এই গলা' তথা ইহা বলার বিষয় নয়, বরং ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে

আইনুল একিন তথা চোখে দেখে নেবার বিষয়। তারপরেও এই রহস্যময় জ্ঞানের বিষয়টি যারা আরও বেশি জানতে চান তাদেরকে একান্ত অনুরোধ করছি - মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির পর ও মুরশিদ কেবলমাত্র কারা নিরক্ষর বাবা শামসে তাবরিক বলে যেতেন আর তারই শিষ্য মাওলানা রুমি উহা লিখে রাখতেন - সেই লিখে রাখা বিশাল গ্রন্থ *দিওয়ানে শামসে তাবরিক*, যাহা ফারসি ভাষায় রচিত, উহা পড়লেই রহস্যলোকের অনেক বিষয় জানা যায়। *দিওয়ানে ব আলি শাহ কলন্দর*, *দিওয়ানে আমির খসরু* এবং হজরত মতিউদ্দিন ইবনুল আরাবির *ফতহাতে মক্কিয়া* এবং শাহ সুফি সদ্দর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত *কোরান দর্শন* নামক তিন-খণ্ডে রচিত *কোরান*-এর তফসিরটি পড়লেই পরিষ্কার একটি ধারণা জন্মাবে। তাই মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি একস্থানে বলেছেন যে, যদিও বাক্বা আল্লাহ নহে, কিন্তু আল্লাহ হতে বাক্বা আলাদাও নহে। হজরত বদর উদ্দিন আহমদ মজাফেদে আলফেসানি সিরহিফ সুন্দর একটি কথা বলে গেছেন আর সেই সুন্দর কথাটি হলো, নফস নফসই এবং রুহ রুহই। তবে *নফস এবং রুহ মিলনে একাকার হয়ে গেলে নফস আর রুহের পার্থক্যটি করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।*

২৬১. *মাসাল* (অনুরূপ, উপমা, দৃষ্টান্ত, মতো, মেসাল) *আললাজিনা* (যাহারা) *ইউনফিকুন* (ব্যয় করে, খরচ করে) *আমওয়ালাহম* (তাহাদের মালসমূহ, তাহাদের ধনসম্পদ) *ফি* (মধ্যে) *সাবিলি* (পথ, রাস্তা) *আলাহি* (আল্লাহর) *কামাসালি* (যেমন) *হাব্বাতিন* (দানা, একটি শস্যবীজ, শস্য, সবজি, গম, যব) *আমবাতাত* (উৎপাদন করে, উৎপন্ন করে) *সাবআ* (সাত) *সানাবিনা* (শিশু, খোসা) *ফি* (মধ্যে) *কুললি* (প্রত্যেকটি) *সুমবলাতিন* (শিশু, খোসা) *মিয়াত* (একশত) *হাব্বাতি* (শস্যবীজ, শস্যকণা, শস্যদানা)।

□□ উপমা (দৃষ্টান্ত) যাহারা ব্যয় করে তাহাদের মালসমূহ আল্লাহর পথের মধ্যে যেমন একটি শস্যবীজ উৎপাদন করে সাতটি শিশু, প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে (আছে) একশত শস্যবীজ (শস্যদানা)।

+ *ওয়া* (এবং) *আলাহ* (আল্লাহ) *ইউদাইফ* (বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন) *লিমাউ* (যাহার জন্য) *ইয়াশাউ* (তিনি ইচ্ছা করেন)।

□□ এবং আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করেন যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।

+ *ওয়া* (এবং) *আলাহ* (আল্লাহ) *ওয়াসিউন* (পরিব্যাপ্ত, সকল দিকে বিস্তৃত বা অবস্থিত) *আলিমুন* (জানী)।

□□ এবং আল্লাহ বিস্তৃত জানী।

২৬২. *আললাজিনা* (যাহারা) *ইউনফিকুন* (ব্যয় করে, খরচ করে) *আমওয়ালাহম* (তাহাদের মালসমূহ) *ফি* (মধ্যে) *সাবিলি* (পথ, রাস্তা) *আলাহি* (আল্লাহ) *সুম্মা* (তারপর) *লা* (না) *ইতবিউনা* (অনুসরণ করে) *মা* (যাহা) *আনফাকু* (তাহারা ব্যয় করে) *মান্নান* (উপকার করিয়া গর্ব বোধ করা, খোটা দেওয়া, মুক্তিপণ ব্যতীত বন্দি মুক্ত করিয়া দেওয়া) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *আজান* (এমন কীতি বা কষ্ট যাহা কোনো প্রাণীর প্রাণ বা দেহ পর্যন্ত পৌছাইয়া যায়, দুঃখকর)।

□□ যাহারা ব্যয় করে তাহাদের মালসমূহ আল্লাহর পথের মধ্যে তারপর অনুসরণ করে না যাহা তাহারা ব্যয় করে খোটা দিবার (জন্য) এবং না দুঃখকর।

+ *লাহম* (তাহাদের জন্য রহিয়াছে) *আজরু* (পুরস্কার, পারিশ্রমিক) *হম* (তাহাদের) *ইন্দা* (নিকট) *রাব্বিহিম* (তাহাদের রবের)।

□□ তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রবের নিকটে।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *খওফন* (ভয়) *আলাহিহিম* (তাহাদের উপর) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *হম* (তাহারা) *ইয়াহজানুন* (আক্রমণ, চিহ্নিত, তাহারা দুঃখাক্রান্ত হইবে না)।

□□এবং নাই ভয় তাহাদের উপর এবং তাহারা চিন্তিত না।

২৬৩. *কাওলুন* (কথা) *মারুফুন* (ভালো কাজ, নরম কথা) *ওয়া* (এবং) *মাগফিরাতুন* (ক্ষমা, অপরাধ, মার্জনা) *খাইকুন* (উত্তম, অতিশয়, ভালো, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠ) *মিন* (হইতে) *সাদাকাতিন* (যে-সদকা, যে-দানের) *ইয়াতবাউহা* (তাহার পিছনে থাকে) *আজান* (দুঃখকর, কষ্ট)।

□□ভালো কথা এবং ক্ষমা উত্তম (যে) সদকার পিছন হইতে (আছে) কষ্ট (দুঃখকর)।

+ *ওয়া* (এবং) *আলাহ* (আল্লাহ) *গানিউন* (ধনী) *হালিমুন* (ধৈর্যশীল)।

□□এবং আল্লাহ ধনী, ধৈর্যশীল।

এই তিনটি আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় যারা ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের উপর সুন্দর একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণটি হলো, একটি শস্যদানী উৎপাদন করে সাতটি শিশু এবং প্রতিটি শিশুর মধ্যে থাকে একশত শস্যদানা। এই ধনসম্পদটি কি বৈষয়িক নাকি আধ্যাত্মিক? বৈষয়িক দানের মধ্যে কেমন করে ধনসম্পদ শত-শত গুণে বৃদ্ধি পায় ইহা আমরা জানা নাই। তবে যেহেতু এই আয়াতে শত-শত গুণে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় বলা হয়েছে ইহা অকাট্য সত্য, ইহা *কোরান*-এর সত্য। যারা তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং যারা এই ব্যয় করার হিসাবটি রাখে না এবং এই ব্যয়ের মাধ্যমে সুখ-দুঃখের প্রশ্নটিতে একদম নিরপেক্ষ থাকে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিনিময় রয়েছে এবং এই বিনিময়ের পর তাদের কোনো প্রকার ভয় ও চিন্তা করতে হবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সদকা করার পর সেই সদকার মধ্যে যদি অহঙ্কার অথবা দুঃখ দেবার অভিপ্রায়টি থেকে যায় তাহলে সেই সদকার বিনিময়ে কিছু আশা না করাটাই ভালো। এই তিনটি আয়াতের বৈষয়িক ব্যাখ্যায় ফুলঝুরির মতো অনেক কিছুই বলতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি বারবার মনে হচ্ছে যে, ইহার বৈষয়িক প্রশ্ন হতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি উত্তম। এই তিনটি আয়াতের আধ্যাত্মিকতা এত সুন্দর এবং এত চমৎকার করে যিনি ফটিয়ে তুলেছেন, যা পাঠ করলে জ্ঞানী লোকেরা অভিভূত হয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস রাখি, যিনি এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন উনার নাম শাহ সুফি সুন্দর উদ্দিন আহমদ চিশতি তার রচিত *কোরান দর্শন* নামক *কোরান*-এর তিন খণ্ডে রচিত তফসিরে।

২৬৪. *ইয়াআইউহা* (ওহে) *আল্লাজিনা* (যাহারা) *আমানু* (ইমান আনিয়াছ) *লা* (না) *তুবতিলু* (তোমরা বাতিল করিয়া দাও, তোমরা নষ্ট করিয়া দাও, তোমরা রদ করিয়া দাও, তোমরা কাটিয়া ফেল - ইবতাল হইতে 'তুবতিলু' শব্দটি আসিয়াছে) *সাদাকাতিকুম* (তোমাদের খয়রাতসমূহ, তোমাদের সদকা, তোমাদের দানগুলি) *বিলম্বান্নি* (মান্নার দ্বারা) *ওয়া* (এবং) *আজা* (কষ্ট) [*মাননা ওয়াল আজা* : সুখকর এবং দুঃখকর, প্রিয় এবং অপ্রিয়, ভালো এবং মন্দ, সুখদায়ক বিষয় এবং দুঃখদায়ক বিষয়]।

□□ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছ, তোমরা নষ্ট (বাতিল) করিও না তোমাদের খয়রাতসমূহ মান্না এবং আজার দ্বারা।

+ *কাল* (মতো) *লাজি* (যে, যাহারা) *ইউনফিকু* (ব্যয় করে) *মালাহ* (তাহার মাল) *রিয়াআ* (লোক দেখানো, আত্মপ্রদর্শন, দেখাইবার জন্য কোনো কাজ করা) *নাসি* (মানুষদের, লোকদের) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *ইউমিনু* (ইমান আনে) *বিল্লাহি* (আল্লাহর সহিত) *ওয়া* (এবং) *ইয়াওমিল* (দিন) *আখিরি* (আখেরাতের)।

□□যাহার (তাহার) মতো ব্যয় করে তাহার মাল মানুষদের দেখাইবার জন্য এবং ইমান আনে না আল্লাহ এবং আখেরাতের দিনের সহিত।

+ কাম্বাসালহ (সূতরাং তাহার উদাহরণ) কাম্বাসালি (উদাহরণের মতো, দৃষ্টান্তের মতো) সীফওয়ানিন (পরিষ্কার পাথর) আলাইহি (তাহার উপর) উরারুন (মাটি) ফাআসাবাহ (সূতরাং তাহার কাছে পৌছাইয়াছে, সূতরাং তাহাকে পাইয়াছে) ওয়াবিরুন (অধিক বৃষ্টিপাত, মুষলধারার বৃষ্টিপাত, বড়-বড় ফোটার বৃষ্টি, খাবারে অকুচি, কঠিন কাজ) ফাতারাকাহ (সূতরাং তাহাকে ছাড়িয়া দেয়) সালদান (শক্ত পাথর যাহার উপর কিছুই জন্মায় না, পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, মসৃণ করিয়া রাখা)।

□□ সূতরাং তাহার উদাহরণ পরিষ্কার পাথরের মতো (একটি) দৃষ্টান্ত তাহার উপর (আছে) মাটি, সূতরাং তাহার কাছে পৌছাইয়াছে অধিক বৃষ্টিপাত সূতরাং তাহাকে ছাড়িয়া দেয় শক্ত পাথর যাহার উপর কিছুই জন্মায় না।

+ লা (না) ইয়াকদিরুনা (তাহারা তকদির সৃষ্টি করে) আলা (উপর) শাইয়িন (কোনো কিছুর) মিম্মা (যাহা) কাসাবু (তাহারা কাম্বাই করিয়াছে, তাহারা অর্জন করিয়াছে)।

□□ তাহারা তকদির সৃষ্টি করে না কোনো কিছুর উপর যাহা তাহারা কাম্বাই করিয়াছে (অর্জন করিয়াছে)।

+ ওয়া (এবং) আলাহ (আলাহ) লা (না) ইয়াহদি (হেদায়াত করেন) কাওমা (কওম, জাতি, গোত্র) কাফেরিনা (কাফেরদের)।

□□ এবং আলাহ হেদায়েত করেন না কাফের সম্প্রদায়কে (কওমকে)।

□ এই আয়াতে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে দান-খয়রাত করার পর সেই দান-খয়রাতের সঙ্গে প্রচার করতে মানা করা হয়েছে। দান-খয়রাত করার পর, বিশেষ করে যাদেরকে দান করা হয়েছে তাদের মনে কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিতে অথবা খোটা দিতে বারণ করা হয়েছে। সমাজে আমরা অহরহ দেখতে পাই যে, যার দানের টাকায় উপকার হয়েছে তাকেই একদিন না একদিন জঘন্য ভাষায় খোটা দিয়ে থাকে। এই রকম খোটাওয়ালা দান-খয়রাতের মূল্য লোকের কাছে থাকতে পারে, কিন্তু আলাহ ইহাকে নিষ্ফল সদকা বলে অভিহিত করেছেন। পুনরায় আলাহ বলেছেন যে, যারা মানুষকে দেখাবার জন্য দান-খয়রাত করে তাদের এই লোক-দেখানো দান-খয়রাতটিতে আলাহ এবং আখেরাতের উপরে বিশ্বাসের ভাগটি খুবই কম থাকে। অধম লিখকের অভিজ্ঞতায় দেখতে পেয়েছি যে, বেশির ভাগ দান-খয়রাতকারীরাই দান-খয়রাত করার পর অহকারের একটি ভাবমূর্তি প্রকাশ করে ফেলেন। তবে ইহার ব্যতিক্রমও তো দেখতে পেয়েছি। যেমন, কেরানিগঞ্জ থানার জিনজিরা ইউনিয়নের ব্রিটিশ আমলের কোটিপতি হাফেজ সাহেবের বিশাল দানের নীরব দৃষ্টান্তটি।

আলাহ এই লোক-দেখানো দান-খয়রাতের উদাহরণ কী সুন্দর করে দিয়েছেন : শক্ত পাথর, তার উপরে একটি মাটি, তার উপরে প্রবল বৃষ্টি, তারপর যেমনকার পাথর তেমনই – ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলো আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক করে তোলে। পরিশেষে আলাহ একদম খোলাখুলি বলেই ফেললেন যে, কাফের সম্প্রদায়কে তিনি হেদায়েত করেন না। এখন এই কাফের বলতে এই আয়াতের পরিশেষে আলাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন ইহা অধম লিখকের বুঝে এসেও অনেক সময় ব্যাপসা মনে হয়।

২৬৫. ওয়া (এবং) মাসাল (উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, উপমা, মেসাল) আললাজিনা (যাহারা) ইউনফিকুনা (ব্যয় করে, খরচ করে) আমওয়ালাহম (তাহাদের মাল, তাহাদের ধনসম্পদ) ইবতেগাআ (চাওয়া, তালাশ করা) মারদাতি (খুশি হওয়া, পছন্দ করা, আনন্দ, সন্তুষ্টি, খুশি করার জন্য কিছু দেওয়া, পরস্পর রাজি হওয়া) আলাহি (আলাহ) ওয়া (এবং) তাস্বিতনি (বহাল করা বহাল রাখা) মিন (ইহতে) আনফসিহিম (তাহাদের নফস) কাম্বাসালি (দৃষ্টান্তের মতো, উদাহরণের মতো) জান্নাতিম (জান্নাত)

বিরাবওয়াতিন (উঁচু ভূমিতে, উঁচু জায়গায়, টিলাতে) আসওয়াবাহা (তাহাকে পাইয়াছে, তাহার কাছে পৌছাইয়াছে) ওয়াবিলুন (অধিক বৃষ্টিপাত, মুষলধারায় বৃষ্টিপাত, বড়-বড় ফোটার বৃষ্টি, খাবারে অরুচি, কঠিন কাজ) ফাতাতাত (সূতরাং সে আনিল, সূতরাং সে আসিল, সূতরাং আনে) উকুলাহা (তাহার ফল) দিফাইনি (দ্বিগুণ, দুই গুণ, ডবল - 'দিফুন' এর দ্বিবচন)।

□□ এবং (এই) উদাহরণ যাহারা ব্যয় করে তাহাদের মাল সঞ্চয়িতালাশ করে আলাহর [আলাহর সঞ্চয়িতালাশ করে] এবং বহাল রাখে তাহাদের নফস হইতে দৃষ্টিভ্রমের মতো জান্নাত; অধিক বৃষ্টিপাত উঁচু ভূমিতে বর্ষিত হইয়াছে, সূতরাং আনে তাহার ফল দ্বিগুণ।

+ ফাইন (সূতরাং যদি) লাম (না) ইউসিবহা (তাহাতে বর্ষিত হয়) ওয়াবিলুন (অধিক বৃষ্টিপাত) ফাতাহাল (সূতরাং আদ্রতা, সামান্য শিশির, সামান্য বৃষ্টি)।

□□ সূতরাং যদি অধিক বৃষ্টিপাত তাহাতে বর্ষিত না হয় সূতরাং আদ্রতা (সামান্য বৃষ্টি) (যথেষ্ট)।

+ ওয়া (এবং) আলাহ (আলাহ) বিমা (যাহা) তামানুনা (তোমরা কাজ করিতেছ) বাসিরুন (দর্শনকারী)।

□□ এবং আলাহ যাহা তোমরা করিতেছ, (উহা) দর্শনকারী।

□□ এই আয়াতে বিষয়টিকে সাজিয়ে ব্যাখ্যাটি দিতে পারলাম না। তবে ইহাতে যে মূর্তের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত ভাবদর্শনটিকে প্রকাশ করা হয়েছে ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ বিমূর্ত ব্যাখ্যাটি শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত কোরান-তফসিরে সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে। বিমূর্তকে যখনই মূর্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় তখনই ব্যাখ্যা ও বিশেষণগুলো বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সূতরাং অন্যান্য অনেক তফসির হতে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি তলে ধরতে পারিতাম, কিন্তু ইহা না করে সোজাসুজি 'পারলাম না' বলে পাঠকদেরকে জানিয়ে দিলাম।

২৬৬. আ-ইয়াওয়াদদু (কেহ কি চাহিবে?, কেহ কি চায়?, কেহ কি আশা করে/ করিবে?, কেহ কি ভালোবাসে/ ভালোবাসিবে?, কেহ কি কামনা করে?, কেহ কি পছন্দ করে?) আহাদু (কেহ, এক, একলা, প্রথম) কুম (তোমাদের, তোমাদের ওপর, তোমাদের জন্য, তোমাদের সঙ্গে) আন (যে) তাকুন (হয়, হবে) লাহ (তাহার জন্য) জান্নাতুন (জান্নাত) মিন (হইতে) নাখিলিন (খেজুর, খজুর) ওয়া (এবং) আনাবিন (আগুর, দ্রাক্ষা) তাজুরি (প্রবাহিত হয়, বহমান) মিন (হইতে) তাহতিহাল (তাহার নিচে, তাহার পাদদেশে, তাহার তলদেশে) আনহারু (ঝরনাগুলি, ঝরনাসমূহ, জলস্রোতসমূহ, জলপ্রবাহসমূহ)।

□□ চায় কি কেহ তোমাদের যে তাহার জন্য হয় জান্নাত খেজুর এবং আগুর হইতে প্রবাহিত হয় তাহার নিচ (পাদদেশ) হইতে ঝরনাসমূহ (জলস্রোতসমূহ)?

+ লাহ (তাহার জন্য) ফিহা (উহার মধ্যে) মিন (হইতে) কুললি (সব রকমের, সব ধরনের) সামারাতি (ফলসমূহ)।

□□ তাহার জন্য উহার মধ্যে সব রকমের ফলমূল হইতে।

+ ওয়া (এবং) আসোয়াবাহ (সে উপনীত হয়, সে আগত হয়, সে উপস্থিত হয়) কিবারু (বার্ষিক্য, বৃদ্ধাবস্থা, জরা) ওয়া (এবং) লাহ (তাহার জন্য) জুররিয়াতুন (আওলাদ, সন্তান, বংশধর - আসলে ছোট-ছোট বাচ্চাদেরকে জুররিয়াতুন বলা হয়, আবার কখনো-কখনো ছোট-বড় সমস্ত সন্তানদেরকেই জুররিয়াতুন বলা হয়। এই জুররিয়াতুন শব্দটি একবচন এবং বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়) দুয়াকীউ (দুর্বলগণ, কমজোরগণ - একবচন

‘দায়িকুন’ হইতে বহুবচন ‘দুয়াকাউ’। হীনবলগণ, শক্তিহীনগণ, ক্লিণগণ, রুগ্ণগণ)।

□□এবং সে বার্ষিক্যে উপনীত হয় এবং তাহার জন্য সন্তানগণ (আপ্তলাদগণ) হীনবল (দুর্বল)।

+ ফাঈসায়াহা (সুতরাং তাহার কাছে উপস্থিত হয়, তাহাকে পাইয়াছে) ইসোয়ারুন (ঘূর্ণিঝড়, ঘূর্ণিবায়, ঘূর্ণিবাত) ফিহি (ইহার মধ্যে) নারুন (আপ্তন) ফাহতারাফাতি (সুতরাং জুলিয়া যায়, পুড়িয়া যায়)।

□□সুতরাং তাহার কাছে উপস্থিত হয় ঘূর্ণিঝড় ইহার মধ্যে আপ্তন, সুতরাং জুলিয়া যায় (পুড়িয়া যায়)।

+ কাজালিকা (ওইভাবে) ইউবাইইন (বর্ণনা করেন) আল্লাহ (আল্লাহ) লাকুম (তোমাদের জন্য) আয়াতি (আয়াত, নিদর্শন) লাআলিলাকুম (যেন তোমরা, সম্ভবত তোমরা) তাতাফাক্কারনা (তোমরা গবেষণা কর, তোমরা গভীরভাবে চিন্তা কর)।

□□ওইভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলি) যেন তোমরা গভীরভাবে চিন্তা কর (গবেষণা কর)।

□ এই আয়াতের হুবহু শাব্দিক অর্থগুলো সাজাতে গিয়ে বারবার হতাশ হতে হয়েছে। কারণ প্রায় অনুবাদকই কোনো চিন্তার ধার না ধরে অনুবাদ করে গেছেন। যেহেতু হুবহু অনুবাদ করার ইচ্ছায় কলম ধরেছি সেই হেতু কত রকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় তা পাঠক অনুবাদগুলো পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। অনেক কষ্ট করে, অনেক ডিকশনারি ও কোরান-এর তফসির ঘেটে-ঘেটে অবশেষে কোথাও হুবহু অনুবাদটি না পেয়ে হতাশ হলাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখাটি অধম লিখকের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা লিখা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব হলো না। তাই পাঠকের কাছে ক্লমা চেয়ে নিলাম।

অনেক তফসিরকারকের অনেক রকম ব্যাখ্যার কিছু-কিছু অংশ তুলে ধরতে পারতাম, কিন্তু সবখানেই যেন একটা মনগড়া ভাবদর্শনের গন্ধ পাই বলে তুলে ধরতে পারলাম না। তবে পরিশেষে এটুকু বলতে চাই যে মোটামুটি এই আয়াতের ভালো ব্যাখ্যাটি যিনি লিখেছেন তাঁর নাম শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি।

কোরান-এ যে কত কঠিন এবং কত শক্ত বিষয় মাঝে-মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা অস্বস্তি বুঝতে পারি এবং এও বুঝতে পারি যে এতকাল এত কোরান-এর তফসির পড়বার পরেও কোরান-এর কিছুই বুঝতে পারি নি। প্রথমে মনে করতাম সব কিছু বুঝে গেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে কোরান-এর কিছুই বুঝতে পারি নি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্য আল্লাহর এই কোরান যে শিক্ষাপ্ররূপে দাঁড়িয়ে আছে তা এই বৃদ্ধ বয়সে বুঝতে পারলাম। কোরান যে একটি মহাগ্রন্থ এই আয়াতটি তার জুলন্ত দলিল বলে যথেষ্ট মনে করি। কারণ এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখাটা মোটেই সাধারণ ব্যাপার নহে।

২৬৭. ইয়াআইউহা (ওহে, হে) আল্লাজিনা (যাহারা) আমান (ইমান আনিয়াছে) আনফিক (তোমরা ব্যয় কর, তোমরা খরচ কর) মিন (হইতে) তাইয়িবাতি (পবিত্র) মা (যাহা) কাসারতুম (তোমরা উপার্জন কর, তোমরা রোজগার কর, তোমরা আয় কর) ওয়া (এবং) মিম্মা (যাহা) আখরাজনা (আমরা [আল্লাহ] বাহির করি) লাকুম (তোমাদের জন্য) মিনাল (হইতে) আবদি (জমিন, পৃথিবী, মাটি, দেহ)।

□□ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছে, তোমরা ব্যয় কর পবিত্র হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর এবং যাহা আমরা (আল্লাহ) বাহির করিয়াছি তোমাদের জন্য মাটি হইতে।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাইয়ামমামুন (তোমরা ইচ্ছা কর) খাবিসা (নোংরাবস্তু, নিকৃষ্ট বস্তু, নাপাক, অপবিত্র - প্রতিটি নিকৃষ্ট বস্তুকে আরবি ভাষায় 'খাবিস' বলা হয়) মিনহ (তাহা হইতে) তনফিকনা (তোমরা ব্যয় কর, তোমরা খরচ কর) ওয়া (এবং) লাজতম (তোমরা নও) বিআখিজিহি (ওইটার গ্রহণকারীর সাথে) ইল্লা (একমাত্র, ব্যতীত, কিন্তু) আন (যে) তগ্মিদু (তোমরা দেখিয়াও দেখ না, তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখ, তোমরা জড়তার আশ্রয় লও) ফিহি (ইহার মধ্যে)।

এবং তোমরা ইচ্ছা করিও না নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করিতে এবং তোমরা নও ওইটা গ্রহণকারীর সাথে একমাত্র যে তোমরা দেখিয়াও দেখ না ইহার মধ্যে।

+ ওয়া (এবং) ইলামু (জানিয়া রাখ) আননা (অবশ্যই, নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে) আল্লাহ (আল্লাহ) গানিউন (ধনী) হাম্বিদুন (প্রশংসিত)।

এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধনী, প্রশংসিত।

২৬৮. আশশাইতান (শয়তান) ইয়াইদু (সে ভয় দেখায়, সে ভয় প্রদর্শন করে, সে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে ওয়াদা দিতেছে) কুমল (তোমাদের) ফাকরা (দারিদ্র, গরিবি, দরিদ্র হওয়া - এইখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না-থাকা মানুষটিকে 'ফাকরি' বলা হইয়াছে) ওয়া (এবং) ইয়ামুরু (সে আদেশ করে, সে আদেশ দান করে) কুম (তোমরা) বিলফাইশায়ি (অশীলতা, সীমাবদ্ধিত পাপ, এমন বেহায়াপনা যাহার ছাপ অন্যের উপর পড়ে, যে-সমস্ত কাজ আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন, খারাপ কথা, মন্দ কাজ, উলঙ্গ হইয়া কাবা তোয়াফ করা, ফাহেশার সহিত)।

শয়তান প্রতিশ্রুতি দেয় তোমাদিগকে দারিদ্রের এবং আদেশ দেয় তোমাদেরকে ফাহেশার সহিত।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) ইয়াইদু (ওয়াদা করেন) কুম (তোমরা) মাগফিরাতান (ক্ষমা, ক্ষমা করিয়া দেওয়া) মিনহ (তাহা হইতে) ওয়া (এবং) ফাদলান (তিনি ফজিলত দিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, মর্যাদা, মাগফিরাত, ফজিলত, মেহেরবানি, রহমত)।

এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমার ওয়াদা করিয়াছেন তাহা হইতে এবং ফজলের।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়াসিউন (বিস্তৃতি, প্রসারিত, প্রাচুর্যময়) আলিমুন (জ্ঞানী)।

এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী।

২৬৯. ইউউতিল (দান করেন) হিকমাতা (হেকমত, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, পাকা কথা, তদবির, জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সত্য উপলব্ধি করা, রহস্যলোকের জ্ঞান লাভ করা, মারফতের জ্ঞান, সুস্বাভিচার জ্ঞান) মাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (তিনি ইচ্ছা করেন)।

তিনি হেকমত দান করেন যাহাকে তিনি ইচ্ছা করেন।

+ ওয়া (এবং) মাই (যাহাকে) ইউউতা (দান করা হইয়াছে) হিকমাতা (হেকমত) ফাকাদ (সূতরাং নিশ্চয়ই) উতিয়া (তাহাকে দেওয়া হইয়াছে) খাইরান (কল্যাণ, উত্তম) কাসিরান (অনেক, প্রচুর, প্রভূত, বহু, উপচাইয়া পড়া, ঢালিয়া ফেলা, কোনো কিছুর উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়া, উপচাইয়া ওঠা, প্রাচুর্যপূর্ণ, উচ্ছৃঙ্খিত)।

এবং যাহাকে দান করা হয় হেকমত সূতরাং নিশ্চয়ই তাহাকে দেওয়া হয় অনেক কল্যাণ।

+ ওয়া (এবং) মা (না) ইয়াজ্জাকাকু (জিকির, যোগ লাগানো, সংযোগের প্রচেষ্টা, যোগাযোগের ইচ্ছা) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) উলুল

আলবাব (সুকৃজ্ঞানের অধিকারী, মস্তবুদ্ধির অধিকারী, অবিমিশ্র বুদ্ধির অধিকারী, পবিত্রবুদ্ধির অধিকারী, মস্তবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা)।

এবং সংযোগ করে না উলুল আলবাব ছাড়া।

২৭০, ওয়া (এবং) মা (যাহা) আনফাকতম (তোমরা ব্যয় কর, তোমরা খরচ কর) মিন (হইতে) নাকফাতিন (ব্যয় করা, খরচ করা) আও (অথবা) নাজার (মানত করা) তম (তোমরা) মিন (হইতে) নাজরিন (মানত) ফাইন্না (সুতরাং নিশ্চয়ই) আল্লাহ (আল্লাহ) ইয়ালামহ (উহা জানেন)।

এবং যাহা তোমরা ব্যয় কর ব্যয়ের বিষয় হইতে অথবা নজর হইতে যেন নজর দিয়া থাকে সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ উহা জানেন।

+ ওয়া (এবং) মা (নাই) লিজ্জোয়ালিমিনা (জালেমদের জন্য) মিন (হইতে) আনসারিন (সাহায্যকারী)।

এবং নাই জালেমদের জন্য সাহায্যকারী হইতে।

২৬৭, ২৬৮, ২৬৯ ও ২৭০ - এই চারটি আয়াতে সাধকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তাহারা যেন তাদের পবিত্র উপার্জনগুলি ইমানের অনুশীলনের জন্য ব্যয় করে। দেহের মধ্যে অবস্থান করা চোখ-কান-নাক-জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিতে আজীবনে যে চিন্তাভাবনা মাথার মধ্যে লোভ-মোহরূপে তথা খল্লাসরূপে জন্ম হতে থাকে উহাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ওলিদের আশ্রয়ে থেকে যারা ধ্যানসাধনায় রত আছেন তাদের জন্য জ্ঞানীতের সংবাদটি অতি নিকটে অবস্থান করছে। এগুলো ব্যয় করতে না পারলে মৃত্যুর পর তথা ছোট কৈয়ামতের পর সাধকদেরকে মৃত্যুর পথে বাধার সৃষ্টি করে। অবশ্য যারা সত্যিকার ইমান এনেছে তারা এই মোহ-মায়ার মন্দের কবলে পড়ে বশীভূত ও বাধ্য না হয়ে মন্দের কোনো বিষয়ই নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করে নেয় না। এজন্য এই জাতীয় আমানদের উপর আল্লাহর রহমত পর্যায়ক্রমে বর্ষিত হতে থাকে এবং ইহারই ফলে ধাপে-ধাপে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন এবং পরিশেষে আল্লাহর গুণে গুণাবৃত ও মহাপ্রশংসার অধিকারী হয়ে সব রকম মোহ-মায়ার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেন। যারা আসলেই ইমানের অনুশীলনের সাধনায় রত থাকেন তারা ভালো করেই জানেন যে, আল্লাহ দূরে থাকেন না, বরং সাধকদের জীবন-রংগের নিকটেই জাতরূপে অবস্থান করছেন। কারণ আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য যতই ঠমক আর চমকে পরিপূর্ণ থাক না কেন, উহা নিশ্চয়ই সেফাত তথা গুণবাচক রূপ। কারণ আল্লাহ কেবলমাত্র তিনটি স্থানে জাতরূপে অবস্থান করেন আর সেই তিনটি স্থানের নাম হলো : লা-মোকাম, জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর তথা জীবন-রংগের নিকটে। এই অঙ্কের প্রাথমিক সূত্রগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে কোরান-এর ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণগুলি অনেক সময় আত্মবিরোধের বুড়িতে পরিণত হয়ে যায় এবং ইহাকেও চরম সত্যে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ ওয়াহেদ এবং আহাদের লীলাখেলায় প্রতি সেকেন্ডে কোটি-কোটি রূপের খেলা দেখিয়ে চলছেন এবং এই এক সেকেন্ডের কোটি-কোটি লীলাখেলাগুলো কোনো দিন কোনো কালেও আর দেখানো হবে না। তাই ধ্যানসাধনায় মগ্ন থেকে ইমানের অনুশীলনে ডুব দিতে গিয়ে যখন গভীরে প্রবেশ করে তখন সব কিছুই পরমের লীলাখেলা বলে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভ করেন। সেই অবস্থায় সার্থকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কেবলই বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। মনে হবে, এরা কিছুই জানে না, অথচ গভীরের জ্ঞান যে সাধকদেরকে বোবা বানিয়ে ফেলে উহা কেবলমাত্র সাধকেরাই বুঝতে পারে। সিংহ বুঝতে পারে একটি বাঘের শরীরে শক্তি কতটুকু, কিন্তু একটি খরগোশের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। অজ্ঞতা এবং জ্ঞানের যে শ্রেণীবিন্যাসগুলো আমরা দেখতে পাই উহাও তো পরমেরই লীলাখেলা। সুতরাং চরম পর্যায়ে উপনীত হলে গালমন্দটি আর থাকে না।

রহস্যের জ্ঞানকে হেকমত বলা হয়। আবার অনেকে হেকমতকে সুক্ষ্ম বিচারজ্ঞান বলে মনে করেন। সাধক তখনই সত্যিকার হেকমতের অধিকারী হয় যখন আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসরূপী শয়তানের মোহমায়ার বাধনগুলো ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারে। তারপর 'ফাহেসা' শব্দটির কত রকম অর্থ করা হয়, এবং এই অর্থগুলো দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা হতে উদ্ভূত হয়। আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে অবস্থান করা খান্নাসটি ফাহেসার জন্মদাতা তথা বিষয়মোহের অশীলতা দিয়ে খান্নাস পবিত্র নফসটিকে ঢেকে দেয়, যেমন রাতের আধার ঢেকে দেয় দিনের দৃশ্যমান গাছপালা। পরিশেষে আরও কিছু কথা, আরও কিছু ব্যাখ্যা, আরও কিছু দলিলপত্র হাজির করা যেত, কিন্তু সব কথার শেষ কথাটিই তো ব্যাখ্যাবিশেষণ করে পাঠকের কাছে তুলে ধরলাম। হয়তো কারো কাছে ভালো লাগবে, কারো কাছে লাগবে না। এই ভালো লাগা না লাগার দ্বন্দ্ব কেউ বিব্রত বোধ করবে, কেউ বলবে 'চমৎকার'।

২৭১. **ইন** (যদি) **তবদু** (প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, উন্মুক্ত করা, খোলা, অনাবৃত করা, দৃষ্টিগোচর করানো) **সাদাকাতি** (সদকাগুলি, খয়রাতসমূহ জাকাতসমূহ, দানশীলতা, পরোপকার, ভিক্ষা, দান, পুরহিত, দয়া, সদয়তা— 'সাদকাতুন' এর বহুবচন হইল সাদাকাত। মানুষ নিজের ধনসম্পদ হইতে এবাদতের জন্য যে-জাকাত ইত্যাদি বাহির করে তাহাকেই **কোরান**-এর ভাষায় সাদকা বলে) **ফানিইম্মা** (সুতরাং অতি উত্তম) **হিয়া** (সে, ইহা, তাহা)।

□□ যদি প্রকাশ কর সদকাগুলি সুতরাং ইহা উত্তম।

+ **ওয়া** (এবং) **ইন** (যদি) **তথফু** (গোপন কর) **হা** (উহা) **ওয়া** (এবং) **তহতহা** (তোমরা তাহা দাও, ইহা উহা) **ফকরাআ** (ফকিরদের, দরিদ্রগণের অভাবগ্রস্তদের, যাদের প্রয়োজন আছে, সর্কটাবস্থাপন্ন, আপদগ্রস্তদের) **ফাহেয়া** (সুতরাং উহা) **খাইরুন** (উত্তম, ভালো, সর্বোত্তম, সবচেয়ে ভালো, সবচাইতে শুভ) **লাকুম** (তোমাদের জন্য)।

□□ এবং যদি গোপন কর উহা এবং তোমরা তাহা দাও উহা ফকিরদেরকে সুতরাং উহা সবচাইতে ভালো তোমাদের জন্য।

+ **ওয়া** (এবং) **ইউকাফিরু** (দূর করিয়া দিবে, ক্ষমা করিবে, অপসারণ করিবে, সরাইয়া দিবে) **আনকুম** (তোমাদের হইতে) **মিন** (হইতে) **সাইয়াতিকুম** (তোমাদের পাপসমূহ, তোমাদের দোষসমূহ, তোমাদের অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলি, তোমাদের খারাপ দিকগুলি, তোমাদের ক্ষতিকর প্রবণতাগুলি, তোমাদের দুর্বত্তিগুলি)।

□□ এবং দূর করিয়া দিবেন তোমাদের হইতে তোমাদের পাপসমূহ হইতে।

+ **ওয়া** (এবং) **আলাহ** (আল্লাহ) **বিমা** (যাহা) **তামালুন** (তোমরা আমল কর) **খাইরুন** (পরিষ্কৃত, সম্যক অবগত, বিজ্ঞ, সচকিত, ইশিয়ার)।

□□ এবং আল্লাহ তোমরা যাহা কর, সম্যক অবগত।

২৭২. **লাইসা** (নয়, নহে) **আলাইকা** (আপনার উপর) **হুদাহুম** (তাহাদের হেদায়েত) **ওয়ালাকিননা** (এবং কিন্তু) **আলাহা** (আল্লাহ) **ইয়াহদি** (হেদায়েত করেন) **মাই** (যাহাকে) **ইয়াশাউ** (তিনি চাহেন, তিনি চান)।

□□ আপনার উপর তাহাদের হেদায়েত নাই এবং কিন্তু আল্লাহ হেদায়েত করেন যাহাকে তিনি চাহেন।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (যাহা) **তনফিকু** (তোমরা ব্যয় কর, তোমরা খরচ কর) **মিন** (হইতে) **খাইরিন** (উত্তম, ভালো) **ফালি** **আনফুসিকুম** (সুতরাং তাহা তোমাদের নফসের জন্য)।

□□ এবং যাহা তোমরা ব্যয় কর ভালো হইতে সুতরাং তাহা তোমাদের নফসের জন্য।

+ **ওয়া** (এবং) **মা** (না) **তনফিকুনা** (তোমরা ব্যয় কর) **ইল্লা** (ব্যতীত) **ইবতিগাআ** (চাওয়া, তালাশ করা) **ওয়াজ্জিল্লাহি** (আল্লাহর চেহারা, আল্লাহর

মুখমণ্ডল - কিছু-কিছু জ্ঞানপাপী ডিকশনারির রচয়িতা 'আল্লাহর চেহারা'র বদলে আল্লাহর পুরস্কার অথবা সমৃদ্ধি লিখিয়া থাকেন, কারণ এই জ্ঞানপাপীরা কোনো অবস্থাতেই অধ্যাত্মবাদকে মানিয়া লয় না, যদিও এই জ্ঞানপাপীরা নিজেদেরকে আহলে সূনাতুল জামাতের অনুসারী বলিয়া দাবি করেন)।

□□ এবং তোমরা ব্যয় করিও না আল্লাহর চেহারা চাওয়া ব্যতীত।

+ ওয়া (এবং) মা (যাহা) তবফিকু (তোমরা ব্যয় কর) মিন (হইতে) খাইরিন (উত্তম, ভালো) উত্তওয়ফিকা (পূর্ণমাত্রায়, পুরাপুরি দেওয়া) ইলাইকুম (তোমাদের দিকে) ওয়া (এবং) আনতুম (তোমরা) লা (না) তুজলামুনা (জুলুম করা হইবে)।

□□ এবং যাহা তোমরা ব্যয় কর ভালো হইতে তোমাদের দিকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে এবং তোমাদের (প্রতি) জুলুম (অত্যাচার) করা হইবে না।

□ এই আয়াত দুটির প্রথমটিতে যে-সদকা তথা দান করার কথাটি বলা হয়েছে সেই দানটি যদি সবার সামনে করা হয় তবে ইহাকেও আল্লাহ উত্তম দান বলে ঘোষণা করেছেন। সবার সামনে দান করার প্রশ্নটি যখন আসে তখন ইহাকে অনেকেই লোক-দেখানো দান বলে এটা-সেটা বলতে চাইবে। কিন্তু দাতার এই প্রকাশ্য দানটির মাঝে যদি লোক-দেখানোর নিয়তটি না থাকে তাহলে উহা উত্তম। ব্যতিরেকের মানুষেরা লোক-দেখানো বলেই মনে করবে, কিন্তু দাতার মনের নিয়তটির উপর নির্ভর করছে যে ইহা যদিও লোকদের সামনেই দান করা হচ্ছে তবে ইহা লোক-দেখানো নয়; সুতরাং নিয়তটি একান্তরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এখানে দাতার নিয়তটি কেবলমাত্র দাতাই জানে, আর জানেন আল্লাহ; তবে আল্লাহ ইহাও বলেছেন যে, গোপনে দান করাটি উত্তমেরও উত্তম তথা ভালোরও ভালো। তারপর ফকিরদেরকে দান করার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এখানে ফকির বলতে দু-রকম অর্থ করা যায় : যারা আসলেই গরিব ইহারা ফকির আবার যারা আল্লাহর চেহারা লাভের আশায় ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের মধ্যে ডুবে আছেন সব কিছু ইচ্ছা করে ফেলে দিয়ে, তারাও ফকির। এই জাতীয় ফকিরেরা হাত পাতে জানেন না অথবা চাইতেও জানেন না। এই দানে মানুষের ছোট-ছোট পাপগুলোকে ঢেকে দেবার কথাটিও বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই দানের ভেতরেও বিরাট একটি রহস্যের শক্তি লুকিয়ে আছে যাহা মানুষের পাপসমূহকেও ঢেকে দেয়। পরিশেষে বলা হচ্ছে যে তোমাদের এই দান আন্তরিক না লোক-দেখানো সেই বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত রয়েছেন তথা ভালোভাবেই জানেন।

হেদায়েতের বিরাট বোঝাটি আপনার উপর চাপানো হয় নাই, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। ভালো পথে ব্যয় করলে উহা নিজেদের নফসের মঙ্গলের জন্যই করা হয়। আবার অনেকে তো ব্যয় করে যায় কেবলমাত্র একটি আশায় আশাবিত্ত হয়ে, বিরাট ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর চেহারা লাভের জন্য তথা আল্লাহকে নিজের মধ্যে উদ্ভাসিত করার (অদম্য) আকাঙ্ক্ষায়। পরিশেষে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তোমাদের এই উত্তম পন্থায় যে-দান করছো উহার পুরস্কারটি পুরোপুরিই দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি সামান্যতম জুলুমও করা হবে না। সুতরাং ফকির সাধকেরা অনেক কিছু ইচ্ছা করে ত্যাগ করে যখন আল্লাহকে পবিত্র ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতে মশগুল থাকে এবং বিরাট ধৈর্যধারণ করে তাদের বিরাম হবার প্রশ্নই ওঠে না, বরং পুরোপুরি মনের বাসনাটি পূর্ণ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

২৭৩. লিলফকারাই (ফকিরদের জন্য) আল্লাজিনা (যাহারা) উহসির (তাহাদেরকে বুঝি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদেরকে খামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদেরকে সান্নাবন্ধ করা হইয়াছে, তাহাদেরকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাদেরকে আটকানো হইয়াছে) ফি (মধ্যে) সাবিলি (রাস্তা, পথ) আল্লাহি

(আল্লাহর) না (না) *ইয়াসতাতিউনা* (তাহাদের ক্ষমতা) *দুব্বান* (আঘাত করা, মারা, ঘোরাফেরা করা) *ফি* (মধ্যে) *আবুদি* (মাটি, পৃথিবী, দেহ)।

☐☐ ফকিরদের জন্য - যাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছে আল্লাহর পথের মধ্যে তাহারা ক্ষমতা রাখে না পৃথিবীর মধ্যে আঘাত হানিতে।

+ *ইয়াহসাবুহম* (তাহাদেরকে মনে করে) *জাহিলুনা* (অজ্ঞ, জ্ঞানশূন্য, জ্ঞান না থাকা, অজ্ঞান, মুখ, অশিক্ষিত, অজ্ঞানতাপূর্ণ, অজ্ঞানতাসজাত) *আগ্নিয়াআ* (ধনী, সম্পদশালী ধনবান) *মিনাত* (হইতে) *তাআফফাকি* (লোভ না করা, না চাওয়া, সওয়াব না করা - দুধ দোহনের পর যে-দুধ উটনির ওলানে থাকিয়া যায় তাহাকে আরবগণ 'উফতিন' ও 'উফাকাতুন' বলিয়া থাকে। সেইজন্য এই দুইটি শব্দ 'বাচিয়া' যাওয়া সামান্য জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'তাআফফাকি' শব্দটি এই সমস্ত শব্দ হইতে গঠন করা হইয়াছে। তাই ছোটখাট বাচিয়া যাওয়া জিনিস হইতে বাচিয়া থাকাকে 'তাআফফাকি' বলা হয়)।

☐☐ তাহাদেরকে মনে করে জাহেলেরা (অজ্ঞ, মুর্থ) ধনী (সম্পদশালী) না চাওয়া হইতে।

+ *তারিফুহম* (তুমি তাহাদেরকে চিন অথবা চিনিবে) *বিসিমাহম* (তাহাদের চেহারার দ্বারা, তাহাদের চেহারার নিশান - সিমা অর্থ হইল নিশান, চিহ্ন)।

☐☐ তুমি তাহাদেরকে চিনিবে তাহাদের চেহারার দ্বারা।

+ *লা* (না) *ইয়াসআলুনা* (তাহারা চায়) *নাসা* (মানুষ) *ইলহাকান* (কাকুতিমিনতিসহ, নাছোড়বান্দারূপে অনুরোধ, জিদ করা)।

☐☐ তাহারা চায় না মানুষের (নিকটে) কাকুতিমিনতিসহ।

+ *ওয়া* (এবং) *মা* (যাহা) *তনফিকু* (তোমরা ব্যয় কর) *মিন* (হইতে) *খাইবিন* (উত্তম, ভালো) *ফাইননা* (সুতরাং নিশ্চয়ই) *আল্লাহা* (আল্লাহ) *বিহি* (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) *আলিমুন* (জানেন)।

☐☐ এবং যাহা তোমরা ব্যয় কর ভালো হইতে সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহার সঙ্গে জানেন।

☐ এই আয়াতটির সাথে জাগৃতিক অভাবী ফকিরদের বিষয়টি যত না মিলে অথবা খাটে তার চাইতে বেশি মিলে যায় সেই সকল ফকিরেরা যাহারা ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের মধ্যে ডুবে আছে এবং এই ফকিরদের মন-মানসিকতা আল্লাহর পথে নিয়োগ করি রাখে যার জন্য দুনিয়াতে বাস করা তথাকথিত ধনসম্পদের অধিকারী ধনীদের কাছে চাইতে পারে না অথবা অনুনয় বিনয়ও করতে পারে না। যেহেতু এই ফকিরেরা বৈষয়িক কাজকরবার হতে দূরে সরে ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতে মগ্ন থাকে তাই আপন নফসটিকে কোনো রকমে বাচিয়ে রাখার জন্য সামান্য কুটি-কুজির কাজটিও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এইরূপ ফকিরদের অবস্থা দেখে ধর্মবিষয়ে সামান্য জ্ঞান লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে। যারা জ্ঞানী তারা তাদের চেহারা দেখেই তাদের অবস্থা বুঝতে পারেন, কারণ এই ফকিরেরা মানুষের কাছে কিছু চায় না। সুতরাং এই শ্রেণীর ফকিরদের যারা সাহায্য করেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। এবং ছোট-ছোট পাপসমূহ আল্লাহর রহমত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই আয়াতে দুনিয়ার ফকিরদের যেমন সাহায্য করার কথাটি বলা হয়েছে, তেমনিই ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতে মগ্ন থাকা ফকিরদেরও সাহায্যের কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং অধম লিখকের একান্ত মতামতটি হলো ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাত যীরা পালন করছে এবং জাহেরি মসজিদের ইমামেরা যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় জামাতবান্দি হয়ে করছে এবং কুরাছে তাদেরকেও ধনসম্পদ হতে কিছু দান করা উচিত বলে করি এবং সেই সঙ্গে মেজাজি মসজিদের ইমামদের মাসিক বেতন দেওয়াটিকে একদম হালাল মনে

করি। যদিও কিছু উগ্রপন্থীরা মসজিদে ইমামতি করে উপার্জন করাটিকে সঠিক মনে করেন না।

দুই জন গ্রিক দার্শনিক সুন্দর একটি কথা বলেছেন আর সেই কথাটি হলো : যদি জেলেরা না থাকে তাহলে মাছ পাবে কোথায়? যদি কসাইরা না থাকে তাহলে গোস্ত পাবে কোথায়? যদি কৃষকরা না থাকে তাহলে তরিতরকারি পাবে কোথায়? এভাবেই আল্লাহ মানুষদেরকে একেকটি কর্মে একেক রকম করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ধ্যানসাধনার দায়িত্বি সালাতে মশগুল থাকা ফকিরদেরকে কাজ করে খাবার উপদেশটি খয়রাত করেন তাদেরকে মুখই বলবো নাকি জ্ঞানপাণী বলবো ইহার সিদ্ধান্তটি অধম লিখকের জানা নাই।

২৭৪. আল্লাজিনা (যাহারা) *ইউনফিকুন* (ব্যয় করে, খরচ করে) *আমওয়ালাহম* (তাহাদের মালসমূহ) *বিল্লাইলি* (রাতে) *ওয়া* (এবং) *নাহারি* (দিনে) *সিররান* (গোপনে) *ওয়া* (এবং) *আলানিয়াতান* (প্রকাশ্যে) *ফালাহম* (সুতরাং তাহাদের জন্য) *আজুরুহম* (তাহাদের পুরস্কার) *ইন্দা* (নিকটে, কাছে) *রাব্বিহিম* (তাহাদের রবের)।

যাহারা ব্যয় করে তাহাদের মালসমূহ রাতে এবং দিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে সুতরাং তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার তাহাদের রবের নিকটে।

+ *ওয়া* (এবং) *লা* (নাই) *খাওফুন* (ভয়) *আলাইহিম* (তাহাদের উপর) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *হুম* (তাহারা) *ইয়াহজানুন* (দুঃখাক্রান্ত হইবে, দুঃখ পাইবে, শোকগ্রস্ত হইবে, চিন্তিত হইবে, আক্ষেপ করিবে)।

এবং ভয় নাই তাহাদের জন্য এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

এই আয়াতটিতে মসজিদে ধনসম্পদ নাকি আধ্যাত্মিক ধনসম্পদ ব্যয় করার কথাটি বলা হয়েছে তা অনুমান করাটি চিন্তায় ফেলে দেয়, কারণ মসজিদে ধনসম্পদ রাতে, দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করতে থাকলে অবশেষে দাতাকেই না ভিক্ষকে পরিণত করে ফেলে তার সমূহ চিন্তা করার বিষয়টি উঠে আসে। কারণ ধনসম্পদ দু'হাতে যদি দান করতেই থাকে তাহলে দাতার নিকট কিছু থাকার কথা নয় বলে মনে হয়। *কোরান*-এর অন্যত্র এ-ও বলা হয়েছে যে, লাগাম ছাড়া দান করতে যেয়ো না এবং হাতকে কুপণতায় মুগ্ধবদ্ধও করো না। এখানে দানের প্রশ্নে এবং কুপণতার প্রশ্নে একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই আয়াতে যেভাবে দুনিয়ার ধনসম্পদ একজন ব্যক্তি হুলাল পথে অর্জন করে সব সময় বিলাতেই থাকে তাহলে তার অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? নিরপেক্ষ বিবেক কী বলতে চায়? আবার বলা হয়েছে, এই দানের বিনিময়টি রবের নিকট রয়েছে। প্রশ্ন হলো, রবের এই বিনিময়টি কি নগদ, না বাকি? জীবিত থাকতে, না মরে যাবার পর বিনিময়? তারপর আরেক ধাপ এগিয়ে দাতাকে সাহস দিয়ে বলা হচ্ছে, সেই দাতার কোনো প্রকার ভয়ও নাই এবং চিন্তাও নাই। এই ভয় এবং চিন্তাটি নগদ, নাকি বাকি? জীবিত থাকতে, নাকি মরে গেলে? মানুষ যে অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত প্রাণী এটা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

হাকিকতে প্রতিটি মানুষই প্রচুর মালদার তাই এই প্রচুর মাল যাহা মানব-ইন্দ্রিয়পথে আগমন করে জমা হতে থাকে, সেই মালগুলো ধ্যানসাধনার দায়িত্বি সালাতের মাধ্যমে ব্যয় করে মুক্তি পেতে হবে। মাল পরিপূর্ণরূপে জাকাত-এর রূপ ধারণ না করলে লোভমোহের শক্ত বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করা যায় না। তাই ব্যয় করা কথাটি মূলত একটি গোপন বিষয়। প্রকাশ্য ব্যয়ের পরিমাণ নিত্যন্তই নগণ্য। যখন সাধকেরা গোপনে এবং প্রকাশ্যে সব কিছু ব্যয় করার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন খাল্লাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি

শূন্যতার দিকে এগিয়ে যায় এবং তখনই সব রকম ভয়ভীতি এবং দুঃখযাতনা হতে নফসটির দিকে এগিয়ে যায়।

২৭৫. আললাজিনা (যাহারা) ইয়াকুননা (খায়) রিবা (সুদ) লা (না) ইয়াকুননা (তাহারা দাড়াইবে) ইল্লা (কিছু, একমাত্র, ব্যতীত) কামা (যেমন) ইয়াকিন (দাঁড়ায়) আললাজি (যে) ইয়াতাখাব্বাতহ (তাহাকে পাগল বানাইয়া দিয়াছে) শাইতোন (শয়তান) মিনাল (হইতে) মাসসি (স্পর্শ, ছোয়া)।

যাহারা খায় সুদ তাহারা দাড়ায় না একমাত্র যেমন দাড়ায় যে, তাহাকে পাগল বানাইয়া দিয়াছে শয়তানের স্পর্শ হইতে।

+ জালিকা (ওইটা) বিআননাহম (নিশ্চয়ই তাহারা) কাল (বলে) ইননামা (নিশ্চয়ই) বাইউ (বেচাকেনা, লেনদেন, বিক্রয় করা, ক্রয় করা) মিসলু (মতো) রিবা (সুদ)।

ওইটা নিশ্চয়ই তাহারা বলে, নিশ্চয়ই কেনাবেচার মতোই সুদ।

+ ওয়া (এবং) আহাললা (হালাল করা) আলাহ (আল্লাহ) বাইআ (কেনাবেচা) ওয়া (এবং) হাররামা (হারাম করা) রিবা (সুদ)।

এবং হালাল করিয়াছেন আল্লাহ কেনাবেচাকে এবং হারাম করিয়াছেন সুদকে।

+ ফামান (সূতরাং যে) জাআ (আসিয়াছে) হ (তাহার কাছে) মাওযিজাতন (নসিহত, উপদেশ, নির্দেশনা, হুকুম) মির (হইতে) রাব্বিহি (তাহার রবের) ফানতাহা (সূতরাং সে বিরত রহিয়াছে) ফালাহ (সূতরাং তাহার জন্য) মা (যাহা) সালফা (অতীতে হইয়াছে)।

সূতরাং যাহারা কাছে আসিয়াছে তাহার রব হইতে উপদেশ সূতরাং সে বিরত রহিয়াছে। সূতরাং তাহার জন্য যাহা অতীত হইয়াছে।

+ ওয়া (এবং) আমরুহ (তাহার হুকুম, তাহার আদেশ) ইলা (দিকে) আলাহি (আল্লাহ)।

এবং তাহার হুকুম আল্লাহর দিকে।

+ ওয়া (এবং) মীন (যে) আদা (ফিরিয়া গেল, ফিরিয়া আসিল, আবার আসিল, চলিয়া গেল) ফাউলাইকা (সূতরাং উহারা) আস্হাবু (অধিবাসী) নাবি (আগুনের)।

এবং যে ফিরিয়া আসিল, সূতরাং উহারা আগুনের অধিবাসী।

+ ইম্ম (তাহারা) ফিতা (উহার মধ্যে) খালিদুনা (প্রতিষ্ঠিত হইবে, অনেক দিন থাকিবে)।

তাহারা উহার মধ্যে অনেক দিন থাকিবে।

এই আয়াতে প্রথমেই সুদ খাওয়ার কথাটি বলা হয়েছে। সুদ খাওয়া এবং ব্যবসা করা এক বিষয় নয়। যদিও ব্যবসাতে লাভ আছে, কিন্তু সুদের সম্পদের প্রশ্নে বাড়া ছাড়া ক্ষতির কথাটি আসে না, কিন্তু সমাজে কিছু লোক এই ব্যবসার কেনাবেচাটিকে সুদের মতোই মনে করে থাকে। কেনাবেচাকে আল্লাহ এজন্যই হালাল করে দিয়াছেন যে, কেনাবেচার মধ্যে কখনো লাভ হতে পারে আবার কখনো লোকসানও হতে পারে। কিন্তু সুদের বেলায় লোকসানের প্রশ্নটি থাকে না বলে সুদকে হারাম করা হয়েছে। এই সাবধানবার্তা শোনার পরেও যাদের মনের মাঝে কোনো পরিবর্তন হয় না তাদেরকেই আল্লাহ আগুনের অধিবাসী বলে আখ্যায়িত করছেন এবং অনেক দিন অবস্থানের কথাটিও বলা হয়েছে। অনেক তফসিরকারক জোশের ধাক্কায় 'চিরস্থায়ী' লিখে ফেলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বলে কিছু নাই। আর যদি থেকেও থাকে তবে এখানে প্রযোজ্য হয় না। কারণ দুনিয়ার সব মানুষেরই একদিন না একদিন আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার কথাটি যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে সেই হেতু চিরস্থায়ী শব্দটি নিছক একটি আপেক্ষিক শব্দ। এর পরেও যারা চিরস্থায়ী লিখে থাকেন তাদেরকেও বলার কিছু নাই। মহানবির চাচাতো ভাই হবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে,

যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন (মরণের সময়) উদভ্রান্ত এবং পাগলের মতো হয়ে ওঠে।

২৭৬. **ইয়ামহাক** (কমাইয়া দেয়, ঘাটতি দান করে, ধ্বংস করিয়া দেয়, মুছিয়া দেওয়া, কোনো বস্তু বরকত অপসারণ করা, মিটাইয়া দেওয়া, বরকত দূর করিয়া দেওয়া, নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া, বঞ্চিত করা, বিরহিত করা) **আলাহ** (আলাহ) **রিবা** (সুদ) **ওয়া** (এবং) **ইউরবি** (বর্ধিত হইতেছে, দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হইতেছে, বাড়ানো হয়) **সাদাকাতি** (দান, সৎকা, খয়রাত)।

বরকত দূর করিয়া দেন আলাহ সুদের এবং বাড়াইয়া দেন দানের।

+ **ওয়া** (এবং) **আলাহ** (আলাহ) **লা** (না) **ইউহিবু** (ভালোবাসা) **কললা** (প্রত্যেক) **কাফকারিন** (অকৃতজ্ঞ) **আসিমিন** (পাপী, দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষতিসাধক, মন্দ, বিদেষপণ)।

এবং আলাহ ভালোবাসেন না প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ, পাপীকে।

২৭৭. **ইন্ন** (নিশ্চয়ই) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **আম্মান** (ইম্মান আনিয়াছে) **ওয়া** (এবং) **আম্মিনুসসোয়ালিহাতি** (আম্মলে সাহেলা) **ওয়া** (এবং) **আকামুস** (কায়েম করে) **সালাতা** (সালাত, নামাজ) **ওয়া** (এবং) **আতাউ** (দেয়) **জাকাতা** (জাকাত) **লাহুম** (তাহাদের জন্য) **আজলু** (পুরস্কার) **হম** (তাহাদের) **ইনদা** (কাছে, নিকটে) **রাববিহিম** (রবের)।

নিশ্চয়ই যাহারা ইম্মান আনে এবং আম্মলে সাহেলা করে এবং কায়েম করে সালাত এবং জাকাত দেয় তাহাদের জন্য তাহাদের রবের নিকট প্রতিদান (রাহিয়াছে)।

+ **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **খাওফুন** (ভয়) **আলাইহিম** (তাহাদের উপর) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **হম** (তাহারা) **ইয়াহজানুনা** (চিন্তাভাবনা করা, চিন্তিত হওয়া, দুঃখ খেদ করা, দুঃখিত হওয়া)।

এবং না ভয় তাহাদের উপর এবং না তাহারা চিন্তিত (হইবে)।

২৭৮. **ইয়া আইউহা** (ওহে) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **আম্মান** (ইম্মান আনিয়াছে) **ইততাক** (ভয় কর) **আলাহ** (আলাহ) **ওয়া** (এবং) **জাকু** (পরিচ্যাগ কর, ছাড়িয়া দাও) **মা** (যাহা) **বাকিয়া** (বকেয়া আছে, বাকি আছে, থাকিয়া যায়) **মিনার** (হইতে) **রিবা** (সুদ) **ইন** (যদি) **কুনতুম** (তোমরা হও) **মুম্মিনিনা** (মোমিন)।

ওহে যাহারা ইম্মান আনিয়াছে, ভয় কর আলাহকে এবং ছাড়িয়া দাও যাহা বকেয়া আছে সুদ হইতে যদি তোমরা হও মোমিন।

এই আয়াত তিনটির প্রথমটিতে আলাহ বলছেন যে সুদের ব্যবসায় দুনিয়ার দুর্ভিক্ষে অনেককেই খালি চোখে বিপ্লবালী তথা ধনবান বলে মনে হয়, কিন্তু একটু ভিত্তরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় যে, ধনসম্পদের মধ্যে যে-বরকত রহমতরূপে বর্ধিত হয় উহাতে তা আর মোটেই থাকে না। যেখানে সুদের কারবারে এখনও দেখতে পাই যে, অনেক ধনসম্পদের মালিক হয় এবং চোখ-ধাধানো আলিশান বাড়িঘরের মালিক হয়, উহাকে কলমের খোঁচায় ধ্বংস করিয়া দেন লেখাটি বাস্তবতাবর্জিত, বরং বরকত থাকে না বলাটাই শ্রেয়। অধম লিখক আড়ফুক, তাবিজতুহা, আসরম্মাসর জাতীয় ফকিরিতে মোটেই বিশ্বাসী নহে, বরং ইহা হতে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। কারণ এইসব আম্মল যারা করে সেইসব তথাকথিত পীর-ফকিরেরা সুফিবাদের মূল বিষয়টিকে কলঙ্কিত করে ছাড়ে। কোথায় মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির সুফিবাদ, আর কোথায় এই সব তথাকথিত পীরফকিরদের আম্মলনামার নাচনাচি! কোথায় মাহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, আহমদ কবির রেফায়ি, শামসে তাবরিজ, ইমাম গাজালি, খাজা গরিব নেওয়াজ, গাউসুল আজম গাউসে পাক, বাহাউদ্দিন নকশেবান্দ, মোজাদ্দেরে আলফেসানি আর মনসুর হাল্লাজ, আর কোথায় এইসব আড়ফুক-মাকী, তাবিজ-তুহা, আসর-মাসরের অনুসারী তথাকথিত

পীরফকিরের দল! আমাদেরও দোষ আছে। আমরা মোলা দিয়ে মহানবিকে বিচার করি। আমরা খাদেম দিয়ে খাজা বাবা আর গার্ডসুল আজম গার্ডসে পাককে বিচার করি। আমরা যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে বিচার করি। আমরা পাণ্ডা-পুরোহিত দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর মহাদেবকে বিচার করি। আমরা নিছক দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতেও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ফালত অনুসারীদেরকে দিয়ে বিচার করি। যতই এতসব কথা আর চিলাচিলি করি না কেন যা হবার তা হবেই। এবং এই আসল-নকলের বৈচিত্র্যময় রঙচঙের খেলাটি যদি না থাকতো তাহলে মহান আল্লাহ জালালাহ জুলজালালের রূপগুলো কেমন করে দেখতে পারতাম?

আমার পীর ও মুশিদ কেবলমাত্র কাবা বাবা সুরেশ্বরীর আওলাদ শাহ সুফি মাওলানা জালাল নুরী এইসব বাড়-ফক, তাবিজ-তুহা, আসর-মাসুরে মোটেই বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তারই পরিভাই তথা হজরত বাবা নুরী শাহ আল সুরেশ্বরীর প্রধান খলিফা মাওলানা জাফর শাহ ফকির আল সুরেশ্বরী, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পীর ছিলেন, তিনি আমাকে একটি আমলনামা পরীক্ষা করে গ্রহণ করে নিতে বললেন। বঙ্গবন্ধুর পীর মাওলানা জাফর শাহ ফকির আল সুরেশ্বরী আমাকে এ-ও বললেন যে, 'এই আমলটি প্রয়োগ করে দেখে যদি ফল না পাওয়া যায় তবে ফেলে দিয়ে।' এই কথাগুলো অনেক দিন আগের কথা। আমি অধম লিখক সেই আমলনামাটি গ্রহণ করি। আমারই নানুভাই কেরানীগঞ্জ উপজেলার কালীগঞ্জের আলীনগরে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার আমজাদ আলীর বাড়ির পেছনে একটি বড় কদবেল গাছ ছিলো এবং উঠানের পাশে বড়-বড় কয়টি ডালিম গাছে বেশ কিছু ডালিম ধরেছিল। কিন্তু সেই কদবেল গাছ এবং ডালিম গাছগুলো ছোট-ছোট পোকামাকড়ে ভরা ছিলো। আমি বঙ্গবন্ধুর পীর সাহেব মাওলানা জাফর শাহ ফকির আল সুরেশ্বরীর দেওয়া আমলনামাটি পরীক্ষা করার জন্য তাবিজ-আকারে সূরা বনি ইসরাইল-এর ৭৮ নম্বর আয়াতটি লিখে উহারই নিচে পিতার নামসহ তিনজন সুদখোরের নাম লিখে কদবেল গাছ এবং ডালিম গাছে বেধে দিবার ব্যবস্থাটি করলাম। কয়েক দিন পর নানুভাই আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে, একটি পোকাও কদবেল ও ডালিম গাছে নাই। এই কথাগুলো লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে বঙ্গবন্ধুর পীর মাওলানা জাফর শাহ ফকির আল সুরেশ্বরী বলেছিলেন যে, সুদখোরদের কাঁটপতঙ্গ ঘণা করে। সেই দৃশ্যটি দেখার পর সুদখোরদের চরম শোচনীয় শাস্তির কথাগুলো মনে পড়ে গেল যাহা *কোরান*-এ আল্লাহ বারবার সাবধান করে দিয়েছেন। সুদখোরদের পাপের বোঝা কত নিচে নামতে পারলে কাঁটপতঙ্গ ঘণায় দূরে সরে যায় উহাই বাস্তবে দেখলাম, তা না হলে এতগুলো আজীবাজে কথা তুলে ধরতাম না। তারপরেও একটি কথা থাকে যাহা আমাকে একদম নিরপেক্ষ হয়ে বলতে হচ্ছে আর সেই কথাটি হলো, এই সুদখোরদের নাম বুলিয়ে দিলেই যদি পোকামাকড় সব কিছু দূর হয়ে যায় তাহলে কাঁটনাশক ঔষধের আর প্রয়োজন থাকার কথা নয়। যে-সমস্ত ক্ষেতখান্নারে কাঁটপতঙ্গের আক্রমণ হয় সেখানে এই রকম সুদখোরদের নাম বুলিয়ে দিলে যদি কাঁটপতঙ্গ হতে রেহাই পাওয়া যেত তাহলে এত রকম কাঁটনাশক ঔষধের প্রয়োজন হতো না। তাহলে একদিকে কাঁটপতঙ্গকে দূরে সরে যেতে দেখলাম, আবার অন্য দিকে এই জাতীয় প্রশ্নগুলো আসাও একান্ত স্বাভাবিক। *সুতরাং এই রকম ছোট-ছোট ঘটনার চমক দিয়ে সকল বিষয়ের বিচার করার প্রশ্নটি সঠিক বলে মনে করি না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চমক আর সমাজকেন্দ্রিক ব্যবস্থাটিকে এক পাল্লায় বিচার করা ঠিক নয়।*

তারপরের আয়াতে যারা ইম্যান এনেছে এবং আমলে সালেহা তথা সংকর্ম করেছে এবং সালাত কায়েম করেছে এবং জাকাতও আদায় করেছে তাদের আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবার কথাটি বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কতক এই পুরস্কারটি কি নগদ, নাকি বাকি? তথা দুনিয়ার জীবনে পাওয়া

যাবে, না মরে যাবার পর পাওয়া যাবে? এই জাতীয় গুণে যারা গুণান্বিত তাদের কোনো প্রকার ভয়ও নাই এবং চিন্তা করার কোনো কারণও নাই বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। এই ভয় এবং এই চিন্তাটি কি বাকি, নাকি নগদ? কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে, যারা দুনিয়াতে অন্ধ থাকবে তারা মরার পরেও অন্ধ থাকবে। এই বাণীতে সরাসরি নগদ পাবার কথাটি বলা হচ্ছে বলে মনে করি। এই দুনিয়াতে যারা অন্ধ থাকবে তারা মরার পরেও অন্ধ থাকবে। এই অন্ধত্বটি বলতে কী বোঝায়? এবং ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বা কী হবে? এবং এই কথাগুলোর মধ্যে কি বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে?

তারুপরের আয়াতটিতে চমৎকার একটি কথা বলা হয়েছে যা অনেকের চোখেই ধরা পড়ার কথা নয়। সেই কথাটি হলো, এই আয়াতে কেবলমাত্র যারা ইমান এনেছে একমাত্র তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদটাকে পরিত্যাগ কর। তখনই তোমাদের আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ভাতি জন্মাবে এবং সুদ হতে মুক্ত হতে পারবে, যখন তোমরা মোমিন হতে পারবে। সুতরাং ইমান আনা এবং মোমিন হওয়ার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্যটি দেখতে পাচ্ছি ইহা অনেকের চোখেই ধরা পড়তে চায় না। এই ইমান আনা এবং মোমিন হওয়ার পার্থক্যটি যাদের চোখে ধরা পড়ে নি, তাদেরও কোনো দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ইহা সর্বশক্তিমানেরই অত্যন্ত গোপনীয় লীলাখেলা।

২৭৯. *ফাইন* (সুতরাং, যদি) *লাম* (না) *তাকওয়ালু* (তোমরা কর) *ফাজ্জালু* (সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ) *বিহারবিন* (যুদ্ধের) *মিনা* (হইতে) *আল্লাহি* (আল্লাহর) *ওয়া* (এবং) *রাসুলিহি* (তাহার রসুল)।

☐☐☐ সুতরাং যদি তোমরা না কর (রিবা-র শর্ত ছাড়িয়া না দাও) সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ আল্লাহ এবং তাহার রসুল হইতে একটি যুদ্ধের (ঘোষণা)।

+ *ওয়া* (এবং) *ইন* (যদি) *তবতম* (তোমরা তওবা কর) *ফালাকুম* (সুতরাং তোমাদের জন্য) *রস* (মূল, মাথা) *আমওয়ালিকুম* (তোমাদের মালের)।

☐☐☐ এবং যদি তোমরা তওবা কর সুতরাং তোমাদের জন্য তোমাদের মালের মূলধন।

+ *লা* (না) *তাজ্জলিমুনা* (তোমরা জুলুম কর) *ওয়া* (এবং) *লা* (না) *তুজ্জলামুনা* (জুলুম করা হইবে)

☐☐☐ তোমরা জুলুম করিও না এবং জুলুম করা হইবে না (তোমাদের উপর)

২৮০. *ওয়া* (এবং) *ইন* (যদি) *কানা* (হয়) *জু* (ওয়ালা) *উস্বাতিন* (অভাব, কপদকশূন্যতা, চরম দারিদ্র, বিপদের সময়, অভাবের সময়) *ফানাজ্জিরাউন* (সুতরাং অবকাশ দেওয়া, সুতরাং সুযোগ দেওয়া) *ইলা* (দিকে) *মাইসারাতিন* (সহজতা, স্বাচ্ছন্দ্য)।

☐☐☐ এবং যদি অভাবওয়ালা হয় সুতরাং অবকাশ দাও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে।

+ *ওয়া* (এবং) *আন* (যদি) *তাসাদ্দাকু* (তোমরা সদকা কর, তোমরা খয়রাত দাও) *খাইরুন* (উত্তম, ভালো) *লকুম* (তোমাদের জন্য) *ইন* (যদি) *কুনতম* (তোমরা) *তাআলামুনা* (জানো)।

☐☐☐ এবং যদি তোমরা সদকা কর তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানিতে।

২৮১. *ওয়া* (এবং) *ইততাক* (তোমরা ভয় কর) *ইয়াওমান* (দিন) *তরজাউনা* (তোমরা ফিরিয়া যাও) *ফিহি* (ইহার মধ্যে) *ইলা* (দিকে) *আল্লাহি* (আল্লাহর)।

☐☐☐ এবং তোমরা ভয় কর, তোমরা ফিরিয়া যাইবে ইহার মধ্যে (সেই) দিনে আল্লাহর দিকে।

+ **সুম্মা** (তারপর) **তয়াফফা** (পুরাপুরি দেওয়া হইবে, পুরা দেওয়া হইবে, পূর্ণ দেওয়া হইবে) **কল্লু** (প্রত্যেক) **নাফসিন** (নফসকে) **মা** (যাহা) **কাসাবাতি** (সে অর্জন করিয়াছে, সে কামাই করিয়াছে) **ওয়া** (এবং) **ইম্ম** (তাহারা) **লা** (না) **ইউজ্জলামুনা** (জুলুম করা)।

তারপর পুরাপুরি দেওয়া হইবে প্রত্যেক নফসকে যাহা সে উপার্জন করিয়াছে এবং তাহারি জুলুম করে না।

এই তিনটি আয়াতের প্রথমটি বলা হয়েছে, যে-সুদটুকু পাইতে উহা ছেড়ে দিতে এবং যদি তোমরা তাহা না কর তাহলে উহা হইবে আল্লাহ এবং রসুলের সহিত যুদ্ধ করার মতো। তবে যে-মূলধনটি দেওয়া হয়েছে উহা পাইবার এবং চাইবার অধিকারটি বহাল রাখা হলো। তারপর বলা হলো, তোমরা জুলুম তথা অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও যাতে অত্যাচারিত না হও সেই বিষয়ে খেয়াল রাখবে। তারপরের আয়াতে বলা হয়েছে, যে-গ্রহিতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সেই গ্রহিতার অভাব দূর হবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত বৈষয়িক স্বচ্ছলতা ফিরে না আসে সেই পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। উহা তোমাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণ হবে যদি তোমরা সুদের শর্তটি ছেড়ে দাও। সুদ খাওয়াটি যে একটি মহাপাপ উহা যদি তোমরা জানতে তাহলে ভুলেও সুদের কারবারটি করতে না। তারপরের আয়াতে বলা হয়েছে, সেই দিনটির কথা মনে কর অথবা যেদিন মারা যাবে সেই মৃত্যুর দিনটির কথা মনে কর, কারণ মৃত্যুর পর সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর বলা হয়েছে, প্রতিটি নফস যা অর্জন করেছে সেই অর্জিত বিষয়টি একটুও কম দেওয়া হবে না এবং কোনো প্রকার জুলুম অত্যাচারও করা হবে না।

২৮২, **ইয়া আইউহা** (ওহে) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **আমানু** (ইমান আনিয়াছ) **ইজ্জা** (যখন) **তাদাইয়ানতুম** (তোমরা একে অন্যকে কজ্জ দিয়াছ, খণ দিয়াছ, ধার দিয়াছ, লেনদেন করিয়াছ) **বিদাইনি** (খণের দ্বারা, মূল্যের সহিত, ধার দেওয়ার মাধ্যমে, ধার করার বিষয়ে) **ইলা** (দিকে) **আজালিন** (নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, মেয়াদ, মৃত্যু) **মোসামমান** (নির্দিষ্ট, আলামত, নিশানা) **ফাকতুবহ** (সুতরাং তোমরা লিখিয়া রাখ)।

ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছ, যখন তোমরা একে অপরকে কজ্জ (খণ) দাও নির্দিষ্ট মেয়াদের দিকে খণের সহিত সুতরাং উহা তোমরা লিখিয়া রাখ।

+ **ওয়াল** (এবং) **ইয়াকতুব** (লিখিবে) **বাইনাকুম** (তোমাদের মধ্যে) **কাতিবুন** (লেখক) **বিলআদলিন** (সুন্না ন্যায়বিচারের সহিত, ইনসাফের সহিত)।

এবং লিখিবে তোমাদের মধ্যে লেখক সুন্না ন্যায়বিচারের সহিত।

+ **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **ইয়াবা** (অস্বীকার করিবে, বিরত থাকিবে) **কাতিবুন** (লেখক) **আই** (যে) **ইয়াকতুব** (লিখিতে) **কামা** (যেমন, যেমনি) **আল্লামাহ** (তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন) **আল্লাহ** (আল্লাহ) **ফানইয়াকতুব** (সুতরাং সে লেখে)।

এবং অস্বীকার করিবে না লেখক যে লিখিতে যেমন আল্লাহ শিখাইয়াছেন তাহাকে সুতরাং সে লেখে।

+ **ওয়াল** (এবং) **ইউমলিলিন** (সে লিখিয়া লউক) **লাজ্জি** (যে) **আলাইহি** (যাহার উপর) **হাক্কু** (সত্য হইয়াছে, প্রমাণিত হইয়াছে, সঠিক হইয়াছে, ইক, অধিকার) **ওয়া** (এবং) **ইয়াততাকি** (সে যেন ভয় করে) **আল্লাহা** (আল্লাহ) **রাব্বাহ** (তাহার রব) **ওয়া** (এবং) **লা** (না) **ইয়াবখাস** (সে কমাইতেছে, সে হ্রাস করিতেছে, সে কমায়, সে হ্রাস করে) **মিনহ** (উহা হইতে) **শাইয়ান** (কিছু)।

এবং সে লিখিয়া লউক যে যাহার উপর (আছে) অধিকার এবং সে যেন ভয় করে তাহার রব আল্লাহকে এবং সে কমায় না উহা হইতে কিছু।

+ ফাইন (সূতরাং যদি) কানা (হয়) লাজি (যে) আলাইহি (যাহার উপর) হাকক (অধিকার) সাক্ষিহান (বেকুব, বেআকল, অজ্ঞান, মূর্খ, বুদ্ধিহীন) আও (অথবা) দায়িকান (দুর্বল, কন্মজোর, জুযিফ, হীনবল, শক্তিহীন, ক্ষণ, রুগ্ন) আও (অথবা) না (না) ইয়াসতাত্ত (কন্মতা রাখে, করিতে পারে) আন (যে) ইউমিলনা (সে লিখাইবে) ইয়া (সে) ফান ইউমিল (সূতরাং লেখার বিষয়) ওয়ালিউই (তাহার অভিভাবক) বিন আদলি (ন্যায়সঙ্গতভাবে)।

□□সূতরাং যদি যে হয় যাহার উপর অধিকার (আছে), বেকুব (নির্বোধ) অথবা দুর্বল [কন্মজোর] অথবা পারে না যে লিখাইবে সে, সূতরাং লেখার বিষয়ে তাহার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে।

+ ওয়া (এবং) ইসতাহিদ (সাক্ষী উপস্থিত কর, সাক্ষী থাক) শাহিদাইনি (দুই সাক্ষী) মিন (হইতে) রিজালিকুম (তোমাদের পুরুষ)

□□এবং সাক্ষী থাক, দুইজন সাক্ষী তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে।

+ ফাইন (সূতরাং যদি) লাআম (না) ইয়াকনা (হয়) রাজলাইনে (দুইজন পুরুষ) ফারাজলন (সূতরাং একজন পুরুষ) ওয়া (এবং) ইমরাতানি (দুইজন মহিলা) মিমমীনি (মধ্য হইতে) তাবদতিনা (তোমরা পছন্দ কর, তোমরা রাজি হও) মিনাশ (হইতে) শোহাদায়ি (সাক্ষ্য দানকারীগণ) আন (যদি) তাদিনলা (রাষ্ট্র হারাইয়া ফেলে, ভুলিয়া যায়) ইহদাহমা (দুইজনের একজন) ফাতজাক্কিরা (সূতরাং স্বরণ করাইবে, সূতরাং মনে করাইবে, সূতরাং জিকির করিবে) ইহদাহমা (দুইজনের একজন) উথরা (দ্বিতীয়, পূর্ববর্তী)।

□□সূতরাং যদি দুইজন পুরুষ না হয় সূতরাং একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার মধ্য হইতে তোমরা পছন্দ কর সাক্ষীদের মধ্য হইতে, যদি ভুলিয়া যায় দুইজনের একজন সূতরাং মনে করাইবে পূর্ববর্তী দুইজনের একজনকে।

+ ওয়া (এবং) না (না) ইয়াবা (অস্বীকার করিবে, বিরত থাকিবে) শুহাদাউ (সাক্ষীগণ) ইজা (যখন) মাদুউ (যাহাদেরকে ডাকা হয়, যাহাদেরকে আহ্বান করা হয়)।

□□এবং অস্বীকার করিবে না সাক্ষীগণ যখন যাহাদেরকে ডাকা হইবে।

+ ওয়া (এবং) না (না) তাসআম (তোমরা অলসতা করিতে থাকিলে, তোমরা পেরেশান হইলে) আন্তাক্তবহ (তোমরা তাহা লেখ) সাগিরান (ছোট) আও (অথবা) কাবিরান (বড়) ইলা (দিকে) আজালিহি (ইহার ক্ষেত্রে)।

□□এবং তোমরা অলসতা করিও না তাহা লিখিতে ছোট অথবা বড় তাহার ক্ষেত্রের দিকে।

+ জালিকুম (ওইটাই তোমাদের জন্য) আকসাত (পূর্ণ ইনসাফওয়ালা, বেশি ইনসাফওয়ালা, অধিক ন্যায়সঙ্গত) ইনদাল্লাহি (আল্লাহির নিকট) ওয়া (এবং) আকওয়াম (সবচাইতে বেশি সোজা) লি (জন্য) শাহাদাতি (সাক্ষ্য, নিশ্চিত খবর, প্রকীণ্য, খোলাখলি)।

□□ওইটাই তোমাদের জন্য অধিক ন্যায়সঙ্গত আল্লাহর নিকটে এবং সবচাইতে বেশি সোজা সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য।

+ ওয়া (এবং) আদনা (অধিক নিকটে) আল্লা (এটা নয় কি?, কেন নয়?) তারতাব (তোমরা সন্ধেহের মধ্যে আছ) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) আন (যে) তাকনা (হয়) তিজারাতান (ব্যবসা) হাজিরাতান (নগদ) তাদিকনাহা (তোমরা তাহাকে ঘুরাও, তোমরা তাহাকে বদলাইয়া দাও) বাইনাকুম (তোমাদের মধ্যে) ফালাইসা (সূতরাং নাই) আলাইকুম (তোমাদের উপর) জুনাহন (গুনাহ, পাপ) আল্লা (এটা নয় কি? কেন নয়?) তাকতুবু (তোমরা লিখিয়া রাখো) হা (তাহা)।

□□এবং অধিক নিকটে ইহা নয় কি তোমরা সন্ধেহের মধ্যে আছ একমাত্র যে হয় নগদ ব্যবসা তোমরা তাহাকে বদলাইয়া দাও তোমাদের মধ্যে সুতরাং নাই তোমাদের উপর গুনাহ যদিও তাহা তোমরা লিখিয়া রাখো না।
+ ওয়া (এবং) আশহিদু (সাক্ষী রাখিও) ইজ্জা (যখন) তাবাইয়াতুম (তোমরা কেনাবেচা কর)।

□□এবং সাক্ষী রাখিও যখন তোমরা কেনাবেচা কর।

+ ওয়া (এবং) লা (না) ইউদারবা (কতিপ্লু করা হইবে) কাতিবুন (লেখক) ওয়া (এবং) লা (না) শাহিদুন (সাক্ষী)।

□□এবং কতিপ্লু করা হইবে না লেখক এবং সাক্ষীকে।

+ ওয়া (এবং) ইন (যদি) তাফআল (তোমরা কর) ফাইন্নাহ (সুতরাং নিশ্চয়ই উহা) কুসকুম (ফাসেকি) বিকুম (তোমাদের জন্য)।

□□এবং যদি তোমরা কর সুতরাং নিশ্চয়ই উহা তোমাদের জন্য ফাসেকি।

+ ওয়া (এবং) ইউতাক (তোমরা ভয় কর) আল্লাহ (আল্লাহ)।

□□এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে।

+ ওয়া (এবং) ইউআলমিকুম (তোমাদেরকে শিক্ষা দেন) আল্লাহ (আল্লাহ)।

□□এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আল্লাহ।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) বিকুল্লি (প্রত্যেকের সহিত) শাইয়িন (বন্ধুর, কিছুর) আলিমুন (জানেন)।

□□এবং আল্লাহ প্রত্যেক বন্ধুর সহিত জানেন।

□ এই আয়াতটি সমগ্র কোরান শরিফ-এর মধ্যে সবচাইতে বড় আয়াত। যেহেতু দুনিয়ার ধনসম্পদের লেনদেনের বিষয়টি জড়িত এবং যেহেতু মানুষ দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি বেশি দুর্বল এবং লোভী তাই আল্লাহ আরশ হতে আগত কোরান-এর সবচাইতে বড় আয়াতটি লেনদেনের উপরেই বর্ণনা করেছেন। এই খণের আয়াতটি নাজেল হবার পর কোনো-কোনো তফসিরকারক প্রথম পূর্ণমানব হজুরত আদম (আ.)-কেই চুক্তিভঙ্গের দ্বায়ে দোষী করতে চেয়েছেন। অধম লিখক এই কথাটি মানতে নারাজ, যদিও প্রত্যেকের ব্যাখ্যা লেখার স্বাধীনতাটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি। এই বিশাল আয়াতের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে লেনদেন করতে যাবে তখন উহা লিখে নেওয়াই ভালো, কারণ ইহা সন্ধেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত তথা যথার্থ। এই বিশাল এবং সবচেয়ে বড় আয়াতে বৈষয়িক বিষয়ের উপর যত প্রকার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে এবং হাদিসের দলিল-প্রমাণ হাজির করা হয়েছে তাহা পাঠকেরা কমবেশি বুঝতে পারবেন।

বৈষয়িক বিষয়ের হিসাব-নিকাশের বেলায় ন্যায়বিচার, মজবুত সাক্ষী, লেনদেনের চুক্তি, আল্লাহকে ভয় কর বারবার বলে এজন্যই সার্বধান করা হয়েছে যে মানুষ দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি দুর্বল এবং লোভী হয়ে যাওয়াটির সমুহ বিপদ থেকে যায়। আমরা যদি দুনিয়ার জাগতিক বিষয়গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে এই জাগতিক দৃশ্যগুলোই সব সময় দেখতে হয়।

২৮৩. ওয়া (এবং) ইন (যদি) কুনতুম (তোমরা হও) আলা (উপর) সাফারিন (সফর, ভ্রমণ) ওয়া (এবং) লামি (না) তাজিদু (পাও) কাতিবান (লেখক) ফারিতানুম (সুতরাং রেহেন, সুতরাং জামিন, সুতরাং বন্ধক) মাগ্বদাতন (মুক্তির মধ্যে অবস্থিত, ধরিবার মতো, হস্তগত)।

□□এবং যদি তোমরা হও সফরের (ভ্রমণের) উপর এবং তোমরা পাও না লেখক সুতরাং মুক্তির মধ্যে অবস্থিত (রাখিও)।

+ ফাইন (সুতরাং যদি) আমিনা (বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে) বাদকুম (তোমাদের কেই) বাদান (কাহারও উপর) ফালইউআদদি (সুতরাং সে ফেরত দেয়, সুতরাং সে পরিশোধ করে) আল্লাজি (যাহার) উতুমিনা (বিশ্বাস করা

হয়) আম্মানা তাহ (তাহার আম্মানত) ওয়াল (এবং) ইয়াত্‌তাকি (ভয় করে) লাহা (আল্লাহকে) রাব্বাহ (তাহার রব)।

□□ সুতরাং যদি বিশ্বাস করে তোমাদের কেহ কাহারও উপর সুতরাং সে (যেন) পরিশোধ করে যাহার (উপর) বিশ্বাস করা হইয়াছিল তাহার আম্মানতের এবং ভয় করে তাহার রব আল্লাহকে।

+ ওয়া (এবং) লা (না) তাকুতুম্ (তোমরা গোপন কর) শাহাদাতা (সাক্ষ্য)।

□□ এবং তোমরা গোপন করিও না সাক্ষ্য।

+ ওয়া (এবং) মান (যে) ইয়াকুতুম্‌হা (উহা গোপন করে) ফাইন্নাহ (সুতরাং নিশ্চয়ই সে) আসিমুন (পাপী, অপরাধী, অধার্মিক) কাল্বুহ (তাহার কলব, তাহার অন্তর)।

□□ এবং যে উহা গোপন করে সুতরাং নিশ্চয়ই সে অপরাধী তাহার কলবে (অন্তরে)।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) বিমা (যাহা) তাম্মানুনা (তোমরা কর) আলিমুন (জানেন)।

□□ এবং আল্লাহ যাহা তোমরা কর, জানেন।

□ এই আয়াতটির দু-রকম অর্থ করা যায়। এই আয়াতে দায়েমি সালাতের বিষয়টির উপর অতিসূক্ষ্ম এবং সবার মাথায় না ধরার মতো জটিল একটি ব্যবহারিক বিশেষণ অঙ্কিত করা হয়েছে। ইহাতে যেমন বৈষয়িক আদান-প্রদানের চোখে পড়ার মতো সূক্ষ্ম বিধান দেওয়া হয়েছে তেমনি আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে উহা বর্জন করার বিষয়টি নিখুত এবং অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দান করা হয়েছে।

২৮৪. লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহ) ওয়া (এবং) মা (যাহা) ফিল (মধ্যে) আরদি (পৃথিবী, মাটি, জমিন, দেহ)।

□□ আল্লাহর জন্য যাহা আকাশসমূহের মধ্যে এবং যাহা পৃথিবীর মধ্যে।

+ ওয়া (এবং) ইন (যদি) তকুদু (তোমরা প্রকাশ কর) মা (যাহা) ফি (মধ্যে) আনফসিকুম (তোমাদের নফস) আত (অথবা) তখফু (লুকাইয়া রাখ, গোপন কর) হ (তাহা) ইউহাসিবকুম (তিনি তোমাদের হিসাব নিবেন, তোমাদের ভালোমন্দ কাজের হিসাব করিবেন) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) আল্লাহ (আল্লাহ)।

□□ এবং যদি তোমরা প্রকাশ কর যাহা তোমাদের নফসের মধ্যে অথবা তোমরা গোপন কর তাহা তোমাদের হিসাব নিবেন উহার দ্বারা আল্লাহ।

+ ফাইয়াগফিরু (সুতরাং ক্ষমা করিবেন) লিল্লাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (তিনি চাহেন) ওয়া (এবং) ইউআজ্জিবু (তিনি শাস্তি দেন, আজাব দেন) মাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (তিনি চাহেন)।

□□ সুতরাং ক্ষমা করিবেন তিনি যাহাকে চান এবং তিনি শাস্তি দিবেন যাহাকে তিনি চান।

+ ওয়া (এবং) আল্লাহ (আল্লাহ) আলা (উপর) কুল্লি (প্রত্যেক) শাইয়িন (কিছুর, বস্তুর) কাদির (তকদিরদাতা শক্তি, ক্ষমতাবান, শক্তিমান)।

□□ এবং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর তকদিরদাতা ক্ষমতাবান।

২৮৫. আম্মানা (ইম্মান আনিয়াছে) রাসুল (রসুল) বিমা (যাহা) উন্জিলু (অবতীর্ণ হয়, নাজেল হয়) ইলাইহি (তাহার দিকে) মিন (হইতে) রাব্বিহি (তাহার রবের) ওয়া (এবং) মুমিনুনা (মোমিনেরা, মোমিনগণ)।

□□ ইম্মান আনিয়াছে রসুল যাহা নাজেল হয় তাহার দিকে তাহার রব হইতে এবং মোমিনগণ।

+ কুল্লুন (প্রত্যেকে, সকলে, সবাই) আম্মানা (ইম্মান আনিয়াছে) বিলাহি (আল্লাহের সহিত, সঙ্গে) ওয়া (এবং) মালাইকাতিহি (তাহার ফেরেশতাদের)

ওয়া (এবং) কুতুবীহি (তাঁহার কেতাবসমূহ) ওয়া (এবং) রুসুলীহি (তাঁহার রসুলদের)।

□□ প্রত্যেকে ইম্মান আনিয়াছে আল্লাহর সঙ্গে এবং তাঁহার ফেরেশতাদের এবং তাঁহার কেতাবসমূহের এবং তাঁহার রসুলদের।

+ না (না) নুফ্যাবরিক (আমরা পার্থক্য করি, প্রভেদ করি, বিভিন্ণতা করি, ফারাক-তফাৎ করি, আলাদা করি, ভিন্ন করি) বাইনা (পরস্পরের মধ্যে, দুইয়ের মাঝে) আতাদিন (কাহাকেও) মিন (হইতে) রুসুলীহি (তাঁহার রসুলগণ)।

□□ আমরা পার্থক্য করি না কাহারও মধ্যে তাঁহার রসুলগণের হইতে।

+ ওয়া (এবং) কালু (বলে) সামিনা (আমরা শুনি) ওয়া (এবং) আতওয়ানা (আমরা আদেশ মানিলাম) ওফ্বানাকা (তোমার ক্রমা, তোমার আশুয়) বাব্বানা (আমাদের রব) ওয়া (এবং) ইলাইকা (তোমার দিকে) মাসিরু (প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন)।

□□ এবং বলে, আমরা শুনি এবং আমরা আদেশ মানিলাম তোমার ক্রমা (চাই) আমাদের রব এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন (ফিরিয়া আসা)।

□ এই দুটি আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে 'সাম্মাওয়াতু ওয়াল আরদ'। ইহার হাক্কিক অর্থটি হলো মন এবং দেহ এবং মেজাজি অর্থটি হলো আকাশ এবং পৃথিবী। দেহ এবং মনের মিলিত শক্তিটির নাম নফস (কুহ নহে)। সূতরাং ইহার দ্বারা জীবজগৎকে বোঝানো হয়েছে। যাহা কিছু এই জীবজগতে অবস্থান করছে উহা তো আল্লাহরই জন্য তথা আল্লাহর অপর প্রকাশ ও বিকাশের জন্য। তাই জীবজগৎ হলো আল্লাহর সেকাফ তথা গুণাবলি। এই জীবজগতের মাঝে আল্লাহর প্রকাশ এবং বিকাশের ক্রমবিবর্তন ঘটে চলছে এবং এই ক্রমবিবর্তনের পরিণামে মানুষকেই জীবশ্রেষ্ঠ তথা আশারাফুল মাখলুকাত বলে গণ্য করা হয়েছে, তাই মানুষই আল্লাহর চরম বিকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার উপর ভিত্তি করে যে ভাবগুলো আমরা উদয় করি অথবা গোপন করি তাহার প্রত্যেকটির হিসাব আল্লাহ রাখেন এবং সেই অনুসারে আমাদের নফসের উন্নতি অথবা অবনতি ঘটতে থাকে। প্রতিটি মানুষ কিছু মনের অজ্ঞাতে নিজের নিজের তকদির সৃষ্টি করে। প্রতিটি মানুষের জন্য দুইটি পথ খোলা আছে : একটি মুক্তির পথ এবং অপরটি বন্ধনের পথ। মানুষ ধ্যানসাধনার দ্বায়েন্নি সালাতের অবিরাম প্রচেষ্টায় আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাসরুপা শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টার পেছনে ক্রমা এবং পরিশেষে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমতে রহিম-রূপে (রহমান-রূপে নয়) ক্রমা পাবার পর মুক্তি লাভ করে। আর যারা নিজের আকাম-কুকামের দ্বারা শাস্তি পাবার ইচ্ছা রাখে তাদের জন্য তো শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোনো বস্তুই দোষণীয় নহে, বরং পবিত্র, কিন্তু সেই বস্তুর উপরে মনের মোহটি যখন জড়িয়ে যায় তখনই শাস্তির পথে পা বাড়ায়। সুন্দর বিষয়টি হলো এই যে, ইহা জানবার পরও আপাতমধুর মোহের মধ্যে ধীরে-ধীরে ডুবে যেতে থাকে এবং এই মোহটাই আমাদের নিকট খুবই প্রিয় বিষয়। ইহাকেই শেরেক বলা হয়। শেরেক বাহিরে থাকে না। শেরেক বস্তুজগতে থাকে না। শেরেক আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কোথাও অবস্থান করে না। একমাত্র মানুষের মন যখন খান্নাসরুপা শয়তানের প্রবোচনায় মোহের মধ্যে ডুবে যায় তখনই হয় শেরেক। সূতরাং প্রতিটি মোহযুক্ত মনই কমবেশি শেরেকে ডুবে থাকে। তাই প্রতিটি মানুষ মনের অজ্ঞাতে মোহের ফাঁদে পড়ে শাস্তি পাবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জেনে রাখতে হবে যে, ভালো এবং মন্দ এবং সব বিষয়ের উপর আল্লাহ তকদির দানকারী শক্তি। সূতরাং কেমন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে সেই মহান ইচ্ছাটি হৃদয়ের মাঝে ধারণ করা একান্তি কর্তব্য।

পরের আয়াতে রসুল এবং মোমিনগণ তাহাদের রবের পক্ষ হতে যে ইম্মান এনেছেন উহা হাককুল একিন তথা ইম্মানের পরিপূর্ণতায় ভরপুর। এখানে রসুল

এবং আমান বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে 'রসূল এবং মোমিন'। এই মোমিনগণ আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ এবং কেতাবসমূহ এবং রসূলগণের প্রতি পরিপূর্ণ ইমান এনেছেন। তাই এদেরকে মোমিন বলা হয়েছে। এই মোমিনেরা রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করেন না, কারণ মোমিনেরা ধ্যানসাধনার দায়েমি সলিহতের অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে রহিমরূপী আল্লাহর ক্রমা পাবার পর দেখতে পান - সব রসূলেরাই একই নুরের অধিকারী। নুরের প্রশ্নে কোথাও ক্রম, কোথাও বেশি, কোথাও আবার খুবই বেশি থাকতে পারে, কিন্তু পাত্র বিভিন্ন হলেও নুরের প্রশ্নে অভিন্ন। তাই মোমিনেরা রসূলগণের মধ্যে কাহাকেও পার্থক্য করেন না।

২৮৬. **লা (না) ইউকাল্লিকু** (কষ্ট দেন, আদেশ করেন) **আল্লাহ** (আল্লাহ) **নাফসান** (নফস, প্রাণ) **ইল্লা** (ব্যতীত, কিন্তু, একমাত্র) **উসআহা** (তাহার সাধ্য, তাহার ক্ষমতা - মূল শব্দ 'ওয়াসআ' হইতে 'উসআহা' হইয়াছে)।

□□ কষ্ট দেন না আল্লাহ নফসকে (প্রাণকে) তাহার সাধ্য ব্যতীত।

+ **লাহা** (তাহার জন্য) **মা** (যাহা) **কাসাবাত** (তাহার অর্জন, তাহার কামাই, তাহার উপার্জন) **ওয়া** (এবং) **আলাইহা** (তাহার উপর) **মা** (যাহা) **ইকতাসাবাত** (সে অর্জন করিয়াছে, সে কামাই করিয়াছে)।

□□ তাহার জন্য যাহা সে অর্জন করিয়াছে এবং তাহার উপর যাহা সে অর্জন (কামাই) করিয়াছে।

+ **রাব্বানা** (আমাদের রব) **লা (না) তয়াখিজ** (পাকড়াও কর, ধৃত কর, অপরাধী বলিয়া রায় দাও, দোষ দাও, নিন্দা কর, দণ্ডাদেশ দাও, ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া রায় দাও, বাতিল কর, অগ্রাহ্য কর) **না** (আমাদেরকে) **ইন** (যদি) **নাসিনা** (আমরা বিশ্বস্ত হই, আমরা ভুলিয়া যাই) **আও** (অথবা) **আখতানসা** (আমরা ক্রটি করিয়া ফেলি, ভুল করি, হতচকিত হই, স্থলন করি, দোষ করি, ক্ষতি করি, হানি করি)।

□□ (হে) আমাদের রব, আমাদেরকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা আমরা ক্রটি করিয়া ফেলি।

+ **রাব্বানা** (আমাদের রব) **ওয়া** (এবং) **লা (না) তাহমিল** (চাপাইয়া দেওয়া, বহন করা) **আলাইনা** (আমাদের উপর) **ইসরান** (বোঝা, দায়িত্ব, দায়, কঠিন কাজ, ভার, মোট, যাহা বহন করা হয়) **কামা** (যেমন) **হাম্মালতাহ** (তাহা তুমি চাপাইয়া দিয়াছিলে) **আলা** (উপর) **আল্লাজিনা** (যাহারা) **মিন** (হইতে) **কাবলিনা** (আমাদের পূর্বে)।

□□ (হে) আমাদের রব, এবং চাপাইয়া দিও না আমাদের উপর বোঝা যেমন তাহা তুমি চাপাইয়া দিয়াছিলে (তাহাদের) উপর যাহারা আমাদের পূর্বে হইতে (ছিল)।

+ **রাব্বানা** (আমাদের রব) **ওয়া** (এবং) **লা (না) তহাম্মিলনা** (আমাদের উপর চাপাইও) **মা** (যাহা) **লা (না) তাকাতা** (শক্তি) **লানা** (আমাদের) **বিহি** (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা)।

□□ (হে) আমাদের রব, এবং আমাদের উপর চাপাইও না যাহা আমাদের শক্তি নাই তাহার সঙ্গে।

+ **ওয়াকু** (এবং মুছিয়া ফেল, এবং মোচন করিয়া দাও, এবং দূর করিয়া দাও, এবং নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও) **আন্বা** (আমাদের হইতে)।

□□ এবং মুছিয়া ফেল আমাদের হইতে

+ **ওয়াক্ফিরলানা** (এবং আমাদেরকে ক্রমা কর) **ওয়ারহামনা** (এবং আমাদেরকে রহিম কর) **আন্তা** (তুমি) **মাওলানা** (আমাদের অভিভাবক) **ফানসুননা** (সুতরাং আমাদেরকে সাহায্য কর) **আলা** (উপর) **কাওমি** (কওমের) **কাফেরিনা** (কাফের)।

□□এবং আমাদের ক্ষমা কর, এবং আমাদেরকে রহম কর, তুমি আমাদের মওলা (অভিভাবক) সুতরাং আমাদেরকে সাহায্য কর, কাফের কওমের উপর।

□ এই আয়াতে প্রথমেই নফসের কথাটি বলা হয়েছে। বলে রাখা ভালো যে নফস অনেক প্রকার : তবে মোটামুটিভাবে এখানে কয়েক প্রকার নফসের উল্লেখ করা হলো - যেমন : নফসে হায়ওয়ানি, নফসে শাজ্জারা, নফসে আশ্জারা, নফসে লাউয়াম্মা, নফসে মোতমায়েন্না, নফসে মুলহেমা এবং নফসে ওয়াহেদ। এখানে নফসে হায়ওয়ানি এবং নফসে শাজ্জারা বলতে জীবের প্রাণ এবং গাছের প্রাণকে বোঝানো হয়েছে। এই দুটি প্রাণ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী অবস্থান করে। সুতরাং এই দুটি নফস তওহিদে বসি করে। সুতরাং এই দুটি নফস মুসলমান। সত্য কথা বলতে কি, এই সামান্য কথাগুলো বড়-বড় পণ্ডিতেরাও জানে না। এখন আসুন, মানুষ এবং জিনের নফসগুলির প্রকারভেদ। অনেকে তো জিনের নফসগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে কুপণতা প্রকাশ করেন। জিনেরাও মানুষের মতো সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি পেয়েছে এবং মানুষের মতো জিনেরাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। জিনজাতির মধ্যেও যে আল্লাহর বড়-বড় ওলি হয় উহার জুলুম প্রমাণটি যদি কান্নারও দেখতে মনে চায় তাহলে দিল্লিতে অবস্থিত মাইবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের পূর্বপাশের জিন ওলিদের কবরস্থানটি দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে।

প্রতিটি মানুষের নফস তার সাধ্য অনুসারে শুদ্ধিকর্ম করে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে ইহাই আল্লাহর রহস্যময় মনোনীত বিধান। এই বিধানকে গায়ের জোরে খণ্ডন করা যায় না, বরং ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের এত্তেবাসে মূহবতে ডুব দিয়ে বিধান ভঙ্গ না করে উর্ধ্বে ওঠা যায়। যে-নফস যে-রকম চিন্তাভাবনা করে তাহা তাহার উপরেই জমা থাকে এবং যারা খান্নাসের গোলামি করে মোহমায়ার আকর্ষণ হয়ে উঠাকে মাথার মধ্যে জমা করে রাখে তাহা সেই নফসেরই জন্য পুনর্জন্মের বীজ হয়ে তাকে সৃষ্টির মধ্যে আটকিয়ে রাখে। পুনর্জন্মবাদ তথা কৈয়ামতের আসল রহস্যটি যারা বুঝতে পারেন নি তাদেরই বা কী দোষ দিতে যাব? কুরণ সবই তো আল্লাহর লীলাখেলা। সাধকেরা তাদের আপন রবের নিকট ধৈর্যধারণ করে প্রার্থনা করেন তথা জিকির করেন তথা ওজিফা পাঠ করেন তথা ধ্যানমগ্ন হন যেন দায়েমি সালাত পালন করার মাধ্যমে ভুলক্রটিগুলি ধরা পড়ে যায় এবং খান্নাসের ওয়াসওয়াসা দেওয়া মোহমায়ার হতে মুক্তিলাভের প্রার্থনায় রত থাকেন, নতুবা খান্নাসের দ্বারা মাথায় জমা মোহমায়ার শেরেকগুলির দ্বারা ধরা পড়ে যায়। সাধকেরা প্রার্থনা করেন তাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে-রকম বোঝাটি যেন তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়। শুদ্ধির এমন লম্বা বোঝাটি যাহা পূর্বে দেওয়া হতো তাহা যেন ছোট করে দেওয়া হয় তথা সহজ করে দেওয়া হয়। তারা আরও প্রার্থনা করেন, খান্নাসের দেওয়া মোহমায়ার মাথা ভরা বোঝাটি যেন হাল্কা করে দেয়, কারণ তাহা বহন করার সামর্থ্য তাদের নাই। তাই সাধকেরা বারবার আল্লাহর কাছে কত রকমে, কত ভঙ্গিতে, কত শৈলীতে, ইনিয়-বিনিয়ে অবুঝ শিশুর মতো কেঁদে-কেঁদে মাওলারূপী আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা চায়। কারণ খান্নাসের দেওয়া এই মোহমায়ার বিশ্বের অনেক কাফের কওম ত্যাগ করতে রাজি নয়। খান্নাসের দেওয়া মোহমায়ার প্রলোভনে পৃথিবী কাফের কওম দিয়ে ভরে আছে এবং এই কাফের কওমদের থেকে মুক্তির চেষ্টা করে মোমিন হওয়াটা সত্যিই একটি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সামাজিক বিজয় না হলেও সমাজের ধারার উপর জীবনের বিজয়টি যে একান্ত কাম্য, একান্ত প্রার্থনা এবং একান্ত মিনতি।

১৯নং সূরা : মরিয়ম
 বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
 আল্লাহর নামের সাথে (বিসমিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান)
 একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ [ইহার অর্থ সিনার এলেক্সের অধিকারী ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়।]

২. জিকরু রাহ্মাতি রাব্বিকা আব্দাহ জাকারিয়ান।

□ রহমতের জিকির (স্মরণ) তোমার রব হইতে তাহার (আল্লাহ) বান্দা জাকারিয়ার প্রতি।

৩. ইজ্জ নাদা রাব্বাহ নিদাত্তান খাফিত্তান।

□ যখন সে তাহার রবকে ডাকিয়াছিল গোপনে (চুপিসারে)।

৪. কাল রাব্বি ইননি ওয়াহ্নাল আজম মিননি ওয়াশতালার রাআসু শাইবাও ওয়ালাম আকুম বিদোয়িকা রাব্বি শাকিয়ান।

□ বলিলেন (জাকারিয়া) হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি দুর্বল (ওয়াহানা) হাড়িড (আজম)-র অধিকারী এবং বার্ষিকের (শাইবান) কারণে আমার মাথা (রাআসু) সাদা হইয়া গিয়াছে এবং আমি কখনো হই নাই তোমার নিকট প্রার্থনা (দোয়া) করিয়া বিমুখ (শাকিয়ান) হে আমার রব (প্রতিপালক)।

□ এই আয়াতে হজরত জাকারিয়া (আ.) আল্লাহর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করছেন যে, তার শরীরের হাড়িডগুলো অত্যন্ত দুর্বল এবং মাথার সুবগুলো চুল ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। এখানে নির্দিষ্ট বয়সটি উল্লেখ করা হয় নি, তবে অভিজ্ঞতার আলোকে আশি বছরের উপরে যে বয়সটি হবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। নবী হজরত জাকারিয়া (আ.) আল্লাহর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করলেন যে, তোমা হইতে (আল্লাহ হইতে) একজন উত্তরাধিকারী (ওয়ালিয়ান তথা বন্ধু) আমাকে দান কর যেন সে ইয়াকব বংশের উত্তরাধিকারিত্ব করবে। পরে আল্লাহ সেই শিশুটিকে ৭ নম্বর আয়াতে তার গোলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে সামান্য একটু স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাখ্যাটি লিখতে চাই, যদিও ব্যাখ্যার প্রশ্নে একজন লেখকের বিদ্ধ-পরিমাণ স্বাধীনতা থাকার কথা নয়। তাই যদি সামান্য স্বাধীনতা পেতাম তাহলে বলতাম যে এই আশি-নব্বইটি বছর হজরত জাকারিয়া (আ.)-র উপর গভিয়ে গেল এবং অস্থিসমূহ নড়বড়ে হয়ে গেল এবং চুলগুলো স্বেতশুভ্র হয়ে যাবার পর ওনার উত্তরাধিকারিত্বের কথাটি মনে পড়ে গেল। এতকাল তথা যৌবনকাল হতে শুরু করে যৌবনের দরবার গতি থাকা অবস্থায় উনি উত্তরাধিকারিত্বের কথাটি কেমন করে বেমালুম ভুলে গেলেন এবং একবার মনের মাঝে এই প্রশ্নটি কেন দোলা দিল না ইহা একটি চিত্তার বিষয় বলে মনে করতে চাই। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওনার উত্তরাধিকারিত্বের কথাটি মনের মধ্যে চেগাইয়া উঠিল কেন ইহা বুঝতে পারলাম না। ধরে নিলাম, এই বদ্ধ বয়সেও তিনি পূর্ণ গুরুকীর্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ওনার স্বা যে প্রথম থেকেই বন্ধ্য এটা জানা সত্ত্বেও উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে কেন তিনি অন্য স্বা গ্রহণ করলেন না? সেই যুগে সেই সময়ে অন্য স্বা-গ্রহণ কোনো দোষণীয় বিষয় বলে গণ্য হতো না। হজরত জাকারিয়া (আ.)-র স্বা প্রথম থেকেই বন্ধ্য জ্ঞানবার পুরেও বড়ো বয়সের স্বার গড়ে কেমন করে রাখা হতে পারে ইহাও চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দর্শনে এই বদ্ধ বয়সে গর্ভধারণ করার প্রশ্নই উত্থে পারে না। কারণ আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত বিধানটি দিয়েছেন এবং এই বিধান দেবার পর

আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন এই বলে যে, *সুন্নাতুল্লাহে লা তাবদিল* – অর্থাৎ আল্লাহর আইন বদলায় না। অবশ্য আল্লাহ নিজেই যদি তার আইনটি বদলিয়ে ফেলেন তাহলে বলার কিছুই থাকে না। এই বন্ধার গড়ে কেমন করে একটি বাচ্চার অবস্থান হতে পারে এবং তার উপর এই বন্ধা সারাটি জীবন বক্ষ্যা ছিল এবং এই বক্ষ্যা ঘুর গড়ে যে-বাচ্চাটি অবস্থান করে প্রসব হলেন উনার নামই হজরত ইয়াহিয়া (আ.)। তাই বোধ হয় আল্লাহ এই বক্ষ্যা বন্ধার অবাধ করা সন্তান হজরত ইয়াহিয়া (আ.)-কে তিনবার আশীর্বাদ করেছেন। নবি জাকারিয়া (আ.)-র প্রার্থনাটি সামাজিক দুর্ভিক্ষে, বিশ্বয়কর হলেও আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করে তারই উত্তরাধিকারী রূপে হজরত ইয়াহিয়া (আ.)-কে দান করলেন। সত্যিই আল্লাহর এই দানটি সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী দান। এরপরেও কথা থেকে যায় যে, আল্লাহর নবি, রসুল এবং ওলিরা আল্লাহর কাছে কিছু অসম্ভব প্রকৃতির বিষয় বা জিনিস চাইলে আল্লাহ কখনই বঞ্চিত করেন না। এই আয়াতে আমাদেরকে এই শিক্ষাটি আল্লাহ দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করি।

৫. *ওয়া ইন্নি খেফতল মাওয়ালিয়া মিন ওয়ারাই ওয়া কানাৎ ইমরাআতি আকিবান ফাহাবলি মিল্লাদনকা ওয়ালিয়ান।*

□ এবং নিশ্চয়ই আমি আমার অভিভাবকদের (ম্বাওয়ালিয়া) সম্পর্কে ভয় (খিফত) করি আমার পেছন হইতে এবং আমার স্বা হয় বক্ষ্যা (সন্তানহীনা, আকিবান) সুতরাং আমার জন্য দান কর তোমার নিকট হইতে একজন উত্তরাধিকারী (ওয়ালিয়ান)।

৬. *ইয়ারিসুনি ওয়া ইয়ারিসু মিন আলে ইয়াকুবা, ওয়াজ্জাআলহ রাব্বি রাদিআন।*

□ যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব (ইয়ারিসুনি) করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে আলে (বংশ) ইয়াকুব হইতে। এবং হে আমার রব, তাকে নির্বাচিত (জাজ্জা) কর অনুগত (রাদিআন) ভাবে।

৭. *ইয়া জাকারিয়া ইন্না নবাশশিক্কা বি গোলামিন ইসমুহ ইয়াহিয়া লাম নাজ্ আল্লাহ মিন কাবল সামিয়ান।*

□ হে জাকারিয়া, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে একটি গোলামের সসংবাদ দিতেছি তাঁহার নাম হইবে ইয়াহিয়া। আমরা নির্বাচিত করি নাই তাঁহার জন্য পূর্ব হইতে এই নাম।

৮. *কালা রাব্বি আননা ইয়াকুন লি গোলামুন ওয়া কানাৎ ইমরাতি আকিবান ওয়াকাদ্ বালাগত মিনাল কিবাবি ইতিয়ানি।*

□ (জাকারিয়া) বলিল হে আমার রব কাঁড়াবে হইবে আমার জন্য গোলাম? এবং আমার স্বা হয় বক্ষ্যা! এবং অবশ্যই আমি বার্ষিকের শেষ সম্মায় পোছিয়া গিয়াছি।

৯. *কালা কাজালিকা, কালা রাব্বকা হয়া আলাইয়া হাইইনুন ওয়া কাদ্ খালাকতকা মিন কাবল ওয়ালাম তাক্ শাইয়ান।*

□ (আল্লাহ) বলিলেন, প্ররূপভাবেই। তোমার রব বলিলেন উহা আমার উপর সহজতর (হাইইনুন) এবং অবশ্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি পূর্ব হইতে এবং তুমি কোনো বস্তুই ছিলে না।

১০. *কালা রাব্বিজ্ আল্লি আয়াতান, কালা আয়াতুকা আল্লা তুকা লিলমান নাসা সালাসা লাইয়ালিন সাওইয়ান।*

□ (জাকারিয়া) বলিলেন, হে আমার রব, আমার জন্য নির্বাচন করুন একটি নিদর্শন (আয়াত)। (আল্লাহ) বলিলেন তোমার জন্য নিদর্শন (আয়াত) সাবধান! তুমি কোনো মানুষের সাথে কথা বলিবে না পূর্ণ তিন রাত্রি (সালাসা লাইয়ালিন) (যদিও) তুমি বোবা (সাবুইয়ান) নও।

১১. ফাখারাজ্জা আলা কাওমিহি মিনাল্ মিহরাবি ফা আওহা
ইলাইহিম্ আনুসাব্বিহ বোকুবাভাও ওয়া আসিয়ান।

□ সুতরাং (জাকারিয়া) তাঁহার কাওমের উপর বাহির হইলেন মেহেরাব (সাধনার ঘর) হইতে সুতরাং তাহাদের প্রতি আদেশ (আওহা) দিলেন যেন তাহারা সকাল এবং সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করে।

১২. ইয়া ইয়াহিয়া খুজিল কিতাবা বিকুয়াতিন, ওয়া আতাইনাহল হক্মা সিবিইয়ান।

□ (আল্লাহ বলিলেন) হে ইয়াহিয়া, ধর কিতাবকে কুওয়াতের (শক্তি) সাথে। এবং আমরা তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছি হেকমত।

১৩. ওয়া হানানাম্ মিল্লাদুননা ওয়া জাকাতান, ওয়া কানা তাকিয়ান।

□ এবং আমাদের হইতে (সেই ছিল) অনুগ্রহশীল (হানানাম্) এবং পবিত্র (জাকাত)। এবং সে ছিল মুঠাকিদের দলভুক্ত।

১৪. ওয়া বাররাম্ বিওয়ালিদাইহি ওয়ালাম ইয়াকুন জাব্বারান আসিয়ান।

□ এবং (সে ছিল) বাবা-মার সাথে সদাচারী (বাররাম্) এবং (সে) ছিল না উদ্ধত (জাব্বারান) অবাধ্য (আসিয়ান)।

১৫. ওয়া সালামুন আলাইহি ইয়াওমা উলিদা ওয়া ইয়াওমা ইয়ামুত ওয়া ইয়াওমা ইউবআসু হাইআন।

□ এবং সালামি (শান্তি) তাঁহার উপরে জন্মদিনে এবং মৃত্যুদিনে এবং পুনরুত্থান দিনে জীবিত অবস্থায় (হাইয়ান)।

১৬. ওয়াজ্জুর ফিল কিতাবি মারিয়ামা ইজিন্তাবাজাত মিন আহলিহা মাকানান শারকিয়ান।

□ এবং জিকির (স্মরণ) করুন কিতাবের মধ্যে মরিয়মকে যখন সে তাহার পরিবার-পরিজন হইতে পৃথক হইয়া পূর্বদিকের (শারকিয়ান) একস্থানে (আশ্রয় লইল)।

১৭. ফাত্তাখাজাত মিন দুনিহিম্ হিজাবান ফাআরসালনা ইলাইহা রুহানা ফাতামাস্‌সালা লাহা বাশারান্ সাউইইয়ান।

□ সুতরাং সে তাহাদের হইতে (পরিবার-পরিজন) পর্দা গ্রহণ করিল। সুতরাং আমরা তাহার দিকে আমাদের রুহকে পাঠাইলাম সুতরাং তাহার জন্য উহা বাশার (মানুষ)-রূপে প্রকাশিত হইল।

□ রুহ যে বাশার-রূপটি ধারণ করতে পারেন তা এই আয়াতেই একটি স্পষ্ট দলিল-রূপে পেলান। এখানে একটি খেয়াল করুন যে 'ইনসান' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। 'ইনসান' এবং 'বাশার' দুটো শব্দের মাঝে অতীব সূক্ষ্ম পার্থক্যটি চোখে পড়ার মতো নয়। এ-জন্যই ভুল করে বসে এবং ভুল দেখিয়ে দিলে নানা রকম তর্ক-বিতর্ক করতে থাকে। যদিও রুহ হলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং আল্লাহ যে 'বাশার' রূপটি ধারণ করেন, এই আয়াতটি তার দলিল দেবার জন্য যথেষ্ট। আবার এই 'রুহ' যে কেবল 'বাশার'-রূপই ধারণ করতে পারেন তা নয়, বরং রসুল-রূপও ধারণ করতে পারেন, তারও দলিলটি পেলান। 'ফা আরসালনা ইলাইহা নাক্সানা' অর্থাৎ 'সুতরাং আমরা তাহার দিকে ('ইলাইহা' কিন্তু 'ইন্দা নহে) নফস পাঠাইলাম' বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে, 'ফা আরসালনা ইলাইহা রুহানা' - তথা, 'সুতরাং আমরা তাহার দিকে রুহকে পাঠাইলাম। - এই 'নাক্সানা' এবং 'রুহানা' শব্দ দুটির বিরাট পার্থক্যটি বুঝতে না পারলে সমগ্র বিষয়টি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। মরিয়মের নিকট বাশারি-এর রূপ ধরে যিনি আসলেন তিনি মোটেও জিব্রাইল ফেরেশতা নহেন, কারণ জিব্রাইল নিছক একজন ফেরেশতা, তা তিনি আল্লাহ কর্তৃক

যত শক্তিশালী হন না কেন। কারণ আমাদেরকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, ফেরেশতাদেরকে 'নফস'ও দেওয়া হয় নি এবং 'রুহ'-ও দেওয়া হয় নি। আরও উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, *কোরান*-এর কোথাও জিবরাইলকে রুহ বলে উল্লেখ করা হয় নি, কারণ ফেরেশতা কখনও রুহ এবং নফস নহে। এই সুক্ষ্ম বিষয়টি অনেকেই বুঝতে না পেরে এটা-সেটা লিখে নিজেও বিভ্রান্ত হয় এবং যারা আসল বিষয়টি জানার আগ্রহে *কোরান*-এর ব্যাখ্যাটি পাঠ করতে যান তারাও বিভ্রান্ত হয়। পরিশেষে একটি মজার বিষয় হলো যে, আপনি যে-কোনো *কোরান*-এর তফসির খুলে দেখুন, দেখতে পাবেন এই রুহকে জিবরাইল নামক ফেরেশতা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তথা বোঝানো হয়েছে, অথচ আল্লাহ কেবলমাত্র আদম-এর ভেতর রুহ ফৎকার করেছেন। কোনো ফেরেশতার ভিতর আল্লাহ রুহও ফৎকার করেন নি এবং নফসও ফৎকার করেন নি। ইহা *কোরান*-এর একটি জাজুল্যমান স্পষ্ট দলিল। আল্লাহ যখন আদমের সম্মুখে সমস্ত ফেরেশতাদেরকে এই বলে প্রশ্ন করেছিলেন যে তোমাদের জ্ঞান কি আদমের সমান? প্রতিউত্তরে সমস্ত ফেরেশতারা একবাক্যে বলে ফেললেন, 'লা ইল্লা মালানা ইল্লা লাম্মা আল্লামতানা' তথা 'আদমকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সেই জ্ঞান আমাদের নাই'।

এখন বলতে চাই, প্রিয় পাঠক বাবা-মায়েরা, আপনারা সরল বিশ্বাসে যে-কোনো জাদুরেল আলেমের এই অনুবাদটি পড়ে জিবরাইল ফেরেশতার কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলবেন, কারণ এটা প্যাচঘোচ ও সুক্ষ্ম বিষয়ের বিষয়টি আপনাদের জ্ঞান না থাকারই কথা, তাই ইহা যে একটি মারাত্মক এবং ক্ষয়ন্য ভুল এটা সেই মহুর্তে বুঝে উঠতে পারবেন না। এভাবেই *কোরান*-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনেকখানেকই এমন উল্টাপাল্টা দেওয়া হয় যে, সরল পাঠক সত্য-মিথ্যার সুক্ষ্ম পার্থক্যটি আর বুঝে উঠতে পারেন না। সুফি কবি আলুগামা ইকবাল এই জাতীয় *কোরান*-এর অনুবাদ ও তফসিরগুলো পড়ে একটি খাসা মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, এই সকল আলেম-উলামাদের *কোরান*-এর অনুবাদ ও তফসিরের নমুনা দেখে আল্লাহ, মহানবি এবং ফেরেশতারা সবাই অবাক হয়ে গেছেন। সুফি কবি আলুগামা ইকবালের উপর ক্রাফের ফতোয়া দেবার প্রথম সূচনাটি এখান থেকেই শুরু হয়। তবে আলেম-উলামারা তখনও প্রকাশ্যে কিছু মন্তব্য করার সাহস পান নি।

১৮. *কালাত ইন্ননি আউজু বিরবাহমানি মিন্কা ইন্ কন্তা তাকিয়ান।*

☐ সে বলিল, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট হইতে রহমানের নিকট আশ্রয় চাইতেছি যদি তুমি তাহাকে (রহমান) ভয় কর।

১৯. *কালাত ইন্নাম্মা আনা রাসুলু রাব্বিকি লি আহাবা লাকি গোলামান জাকিয়ান।*

☐ সে বলিল, নিশ্চয়ই আমি তোমার রব (প্রতিপালক) হইতে একজন রসুল। তোমাকে দান করার জন্য পুতপবিত্র (জাকিয়ান) এক গোলাম (সন্তান)।

২০. *কালাত আনুনা ইয়াকুনু লি গোলামুন ওয়ালাম ইয়ামসাসনি বাশারুন ওয়ালাম আকু বাগিহয়ান।*

☐ সে (মরিয়ম) বলিল কেমন করিয়া হইবে আমার জন্য গোলাম (সন্তান)? এবং আমাকে স্পর্শ করে নাই কোন বাশার (মানুষ)! এবং আমি কখনো নই অবাধ্যচারিনী।

২১. *কালাত কাজালিকি কালাত রাব্বিকি হয়া আলাইয়া হাইয়িনুন ওয়া লিনাজআলাহ আয়াতাল্ লিন্নাসি ওয়া রাহামাতাম্ মিন্না। ওয়া কানাত আম্মরাম্ মাকদিয়ান।*

☐ (বাশার) বলিলেন, ঐরূপভাবেই। তোমার রব বলিলেন, উহা আমার উপর সহজতর (হাইয়িনুন)। এবং আমরা তাহার জন্য মনোনীত করিব একটি

আয়াত (নিদর্শন) মানুষদের জন্য এবং আমাদের হইতে (উহা) একটি রহমত। এবং উহা ছিল স্থিরকৃত (মাক্দিয়ান) হকুম (আম্মরান)।

২২. ফাজাআলাতহ ফান্‌তাবাজাত বিহি মাকানান কাসিয়ান।

☐ সুতরাং সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল সুতরাং সে তাহাকে সহ এক দূরতম (কাসিয়ান) স্থানে (চলিয়া গেল)।

২৩. ফাজাআহান মাখাদ ইলা জিজ্‌ইন নাখলাতি, কালাত ইয়া লাইতানি মিত্ত কাবলা হাজা ওয়া কুনত নাসিয়ান মানসিয়ান।

☐ সুতরাং তাহার প্রসববেদনা (মাখাদ) উপস্থিত হইলে, (সে) খেজুর বৃক্ষের (নাখলাতি), পাদদেশের (জিজ্‌ইন) দিকে (পৌছিল)। সে বলিল, হায় আফসোস (ইয়া লাইতানি), আমি যদি ইহার (ঘটনা) আগে মরিয়া যাইতাম! এবং আমি হইতাম (মানুষের) স্মৃতি (নাসিয়ান) হইতে বিলুপ্ত।

২৪. ফানাদাহা মিন তাহতিহা আল্লা তাহজানি কাদ জাআলা রাব্বুকি তাহতাকি সারিয়ান।

☐ সুতরাং তাহার নিচ হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, সাবধান (আল্লা) তুমি দুঃখিত হইও না অবশ্যই তোমার রব নির্বাচন করিবেন তোমার নিচ হইতে এক প্রবাহিত বর্ণাধারা (সারিয়ান)।

২৫. ওয়া হজ্‌জি ইলাইকি বেজ্‌জ্‌ইন নাখলাতি তুসাকিত আলাইকি রুতাবান জানিয়ান।

☐ এবং তুমি নাড়া দাও (হজ্‌জি) তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের ডালকে তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে তাজা (রুতাবান) ফল।

২৬. ফাকলি ওয়াশরাবি ওয়াকারুরি আইনান, ফাইম্মা তারাইননা মিনাল বাশারি আহাদান ফা কলি ইননি নাজারুত লিররাইম্মানি সাওম্মান ফালান উকাললিম্মাল ইয়াওম্মা ইনসিয়ান।

☐ সুতরাং খাও এবং পান কর এবং চক্কে শীতল কর। সুতরাং যদি তুমি বাশারদের (মানুষ) হইতে কাহাকেও দেখ সুতরাং বলো নিশ্চয়ই আমি বহুমানের জন্য সাওম্মের (রোজা) মানত (নাজারত) করিয়াছি সুতরাং ভুলেও (ইনসিয়ান) (কারো সাথে) আজকের দিন কথা বলিব না।

২৭. ফাআতাত বিহি কাওম্মাহা তাহমিনুহ, কালু ইয়া মারিয়ামু লাকাদ জিইতি শাইয়ান ফারিয়ান।

☐ সুতরাং সে আসিল তাহার কাওম্মের নিকট যাহা সে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সাথে নিয়া। তাহারা বলিল, হে মরিয়ম, অবশ্যই তুমি খুশি মনে (ফারিয়ান) ইচ্ছাকৃতভাবে (জিইতি) কিছু করিয়াছ।

২৮. ইয়া উখ্তা হারুনা মা কানা আবুকি ইম্মরাআ সাওইন ওয়াম্মা কানাত উম্মুকি বাগিয়ান।

☐ হে হারুনের বোন, তোমার পিতা তো পাপী (আসোইন) ছিলেন না! এবং তোমার মাতাও ছিলেন না অব্যাহত (বাগিয়ান)।

২৯. ফাআশারাত ইলাইহি, কালু কাইফা নুকাল্লিমু মান কানা ফিল মাহদি সাবিয়ান।

☐ সুতরাং সে ইশারা করিল তাহার দিকে (শিঙ)। তাহারা বলিল কিভাবে আম্মর কথা বলিব যে হয় শিঙ অবস্থায় (সাবিয়ান) দোলনার (মাহদি) মধ্যে।

☐ এই আয়াতটি চিত্রাশীল ব্যক্তিবর্গকে অনেকখানি ভাবিয়ে তোলে। কারণ মা মরিয়ম যখন দোলনায় রাখা তিন দিনের শিঙ হজরত ইসা (আ.)-কে দেখিয়ে বললেন যে, 'তোমরা দোলনায় রাখা তিন দিনের শিঙকেই প্রশ্ন করো।' - এতে লোকেরা অবাক বিস্ময়ে বলে ফেললেন যে, 'আম্মর কেমন

করে এই দোলনার তিন দিনের শিশুর সঙ্গে কথা বলব?’ প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবীতে যত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে এবং করবে, তিন দিন বয়সে কথা বলার কোনো নজির বা দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং সেই যুগের কথা তো বাদই দিলাম, বরং এই একবিংশ শতাব্দীতেও তিন দিনের কোনো শিশু কথা বলতে পারে বললে অবাক হবারই কথা। কারণ প্রকৃতির নিয়মে যার কোনো দৃষ্টান্ত থাকে না উহাই যখন দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, তাই লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছিল মা মরিয়মকে যে, কেমন করে এই তিন দিনের শিশু ইসা (আ.) কথা বলবেন?

এখন আমাদের প্রশ্নটি অন্য বিষয়ের উপর হলেও ভূমিকাটি এ জন্যই দেওয়া হলো যে, এই সেই ইসা (আ.) নবি, যিনি আল্লাহর হাবিব মহানবি মুহম্মদ মোস্তফা (আ.)-র উম্মত হতে চেয়েছিলেন। যে ইসা নবি (আ.)-র দৌলনা থেকে চতুর্থ আসমানে গমন করার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাই ছিল বিরাট একটি জুলন্ত মোজেজা তথা কারামতি, তিনি কেন মহানবির উম্মত হবার ফরিয়াদ করেছিলেন? হজরত ইসা (আ.) অবশ্যই জানতেন যে মহানবির উম্মতের মর্যাদা অনেক বেশি, সুতরাং মহানবির উম্মত গাউসুল আজম গাউসে পাক, খাজা গরিব নেওয়াজ, মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি - এ রকমভাবে লক্ষ-লক্ষ ওলি-গাউস-কুতব-আবদাল-আরিফদের মর্যাদাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় উহাও কি ভেবে দেখতে হবে?

সোদি আরবের ওহাবি ফেরকার মুসলমানদের গুরুত্বাকুর আবদুল ওহাব নজদি গাউসুল আজম গাউসে পাকে তার লিখিত বইতে উঠতে-বসতে যত রকম গালি দেওয়া যায় তার চেয়েও বেশি গালি দিয়েছে এবং শেরেকের ধূয়া তুলে এটা-সেটা বলতেও সামান্য লজ্জা বোধও করে নি। আজ বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মধ্যে যে-চ্যানেলগুলোতে সোদি আরবের ওহাবি-দর্শনটি প্রচার করা হচ্ছে উহাতে আল্লাহর ওলিদের কথাগুলো সযতনে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং মহানবির নামে মিলাদ পাঠ করা এবং আরও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রদর্শন করা তো দূরে থাক, বরং যা-তা ফতোয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। বাংলাদেশের আহলে সুন্নাতুল জামাতের মুসলমানেরা যে বিষমিশ্রিত মিষ্টি খেয়ে চলছে উহা এখনই কিছু-কিছু টের পাচ্ছি। সময় ও সুযোগে একদিন না একদিন এই সুমুস্ত গোমরগুলো ফাঁকি হয়ে যাবে এবং প্রকৃত সত্য আপন রূপেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

৩০. *কালো ইন্নি আবদুল্লা; আতানিয়াল কিতাবা ওয়া জাআলানি নাবিয়ান।*

□ সে (শিশু) বলিল নিশ্চয়ই আমি আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে মনোনীত করা হইয়াছে নবিরূপে।

□ এই আয়াতে হজরত ইসা (আ.) বললেন, ‘আমি আবদুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দা। তারপরেই বললেন, ‘তিন দিনের শিশু হলে কী হবে? - আমাকে কেতাব দেওয়া হয়েছে (আতানিয়াল কিতাবা)।’ এবং এই কেতাব দেওয়া হয়েছে বলেই তিন দিনের শিশু হজরত ইসা (আ.) আরও বলে ফেললেন যে, ‘আমাকে একজন নবি বানিয়েছেন (ওয়াজাআলানি নাবিয়ান)। একটু লক্ষ করুন, একটু গবেষণা করুন, একটু নিরপেক্ষ হতে চেষ্টা করুন, তারপর ভাবুন এখানে ‘রসুল’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। কেন করা হয় নি? - কারণ আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকেও রসুল বানিয়েছেন ইহার দলিলও কোরান-এর বেশ কয়েকটি স্থানে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু কোরান-এর একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না যে ফেরেশতাদেরকে নবি বানিয়েছেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকে একটি নবিও বানান নাই, বরং রসুল বানিয়েছেন। তারপরের আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সালাত এবং জাকাতের শিক্ষাদান করার

দায়িত্বটুকু দেওয়া হয়েছে (বিস্ সালাতি ওয়াজ্জাকাতি)। এখন প্রশ্ন হলো, এই সালাত তথা এই নামাজ কি করে ওয়াক্টিয়া নামাজ হয়? ওয়াক্টিয়া নামাজের মধ্যেই যদি সালাতটিকে সম্মানবদ্ধ করা হয় তাহলে হজরত ইসা (আ.) কোন সালাত শিক্ষা দেবার জন্য আগমন করেছেন? এরকমভাবে সালাতের পরেই জাকাতের কথাটিও বলা হয়েছে। এই জাকাত কি মালের জাকাত না কি অন্য কোনো জাকাত? যে-কেতাটি হজরত ইসা (আ.)-কে তিন দিনের বুয়সে দেওয়া হয়েছে উহা কি কাগজ আর কালিতে লিখিত কেতা, না কি আল্লাহর বিকাশমান সৃষ্টিজগতের কুতূহানের কেতা? এরকমভাবে অনেক-অনেক প্রশ্ন মনের মাঝে উকিঝুঁকি মারে এবং যারা সত্যিকার নিরপেক্ষ জ্ঞানের অধিকারী তারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন যে, তিন দিনের শিশুকে যে-কেতার দেওয়া হয়েছে সেই কেতাটি আল্লাহর নব্বের কেতা এবং সেই সঙ্গে এই শিশুটিকে নব্বয়তও দান করা হয়েছে। সুতরাং কেতা এবং নব্বয়ত দুটোই রহস্যপূর্ণ বিষয়। কেউ বুঝতে পারে, আবার কেউ বুঝতে পারে না।

৩১. ওয়া জাআলানি মবারাকান আইনা মা কুনুত ওয়া আওসানি বিস্ সালাতি ওয়াজ্জাকাতি মাদুমুত হাইয়ান।

এবং আম্মাকে মনোনীতি করা হইয়াছে বরকতময় (মোবারাকান) কুরিয়া আমি যেখানেই থাকি না কেন। এবং আম্মাকে ওসিয়ত (নিদেশ) করা হইয়াছে সালাত এবং জাকাতের সাথে অবশ্যই যতদিন (দুমুত) জীবিত থাকি (হাইয়ান)।

৩২. ওয়া বাররাম্ বিওয়ালিদাতি, ওয়া লাম ইয়াজ্জআলনি জাব্বারান শাকিয়ান।

এবং আম্মাকে বাধ্য করা হইয়াছে (বাররাম্) আমার মায়ের প্রতি। এবং আম্মাকে নির্বাচিত করা হয় নাই উদ্ধত (জাব্বারান) (ও) অভিশপ্ত (শাকিয়ান)।

৩৩. ওয়াস্ সালাম্ আলাইয়া ইয়াওমা উলিদ্তু ওয়া ইয়াওমা আমুতু ওয়া ইয়াওমা উবআস্ হাইয়ান।

এবং শান্তি আমার (ইয়া) উপর যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি (উলিদ্তু) এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করিব (আমুতু) এবং যেদিন আমি উখাত (উবআস্) হইব জীবিত অবস্থায় (হাইয়ান)।

৩৪. জালিকা ইসাবনু মারিয়ামা, কাওলাল্ হাক্কি আল্লাজ্জি ফিহি ইয়ামতাকুনা।

এ-ই (জালিকা) মরিয়মের ছেলে ইসা, সত্য কথা (কাওলাল্ হাক্কি) যাহারা এর মধ্যে বিতর্ক করে (ইয়ামতাকুনা)।

৩৫. মা কানা লিল্লাহি আইয়াততাখিজা মিনু ওয়ালাদিন সুবহানাহ, ইজ্জা কাদা আম্মরান ফাইননামা ইয়াকুন লাহ কুন ফাইয়াকুন।

আল্লাহর জন্য হয় না তিনি গ্রহণ করেন (আইয়াততাখিজা) সত্তান হইতে তিনি উহা হইতে পবিত্র। যখন (তিনি) কোন বিষয়ের (আম্মরান) সিদ্ধান্ত (কাদা) নেন সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি বলেন তাহার জন্য হও (কুন) সুতরাং উহা হইয়া যায় (ফাইয়াকুন)।

৩৬. ওয়া ইন্নাল্লাহা রাব্বি ওয়া রাব্বুকুম্ ফাবুদুহ, হাজ্জা সিরাতুন মোম্মাকিমুন।

এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব সুতরাং তাঁহারই এবাদত (আনুগত্য) কর। ইহাই সিরাতুল মোম্মাকিম (সঠিক পথ)।

৩৭. ফাখিতালাফাল্ আহ্জাবু মিন্ন বাইনিহিম্, ফাওয়াইনুল লিল্লাজ্জিনা কাফারু মিন মাশ্হাদি ইয়াওমিন্ আজ্জিমিন।

□ সূতরাং গোত্রগুলি (আহজাব) নিজেদের মধ্য হইতে এখতেলাফ (মতানৈক্য) করিল সূতরাং ধ্বংস (ওয়াইলুন) যাহারা কাফের সমাবেশ (মাশহাদ) হইতে শক্তিশালী (আজিম) দিন (ইয়াওমিন)।

৩৮. আসমিবিহিম ওয়া আবসির ইয়াওমা ইয়াতুনানা লাকেনিজ জোয়ালিমুনাল ইয়াওমা ফি দালামিন্ মুবিনিন।

□ তাহার সাথে তাহারা শুনিবে এবং তাহারা দেখিবে (আবসের) যেদিন আমাদের নিকট আসিবে, কিন্তু জালেমেরা এই দিনের মধ্যে স্পষ্ট গোমরাহিতে (দালালিন) রহিয়াছে।

৩৯. ওয়া আনজিরহম ইয়াওমান্ হাসরাতি ইজ্ কুদিয়াল্ আমরা ওয়াহম ফি গাফলাতিন ওয়াহম লা ইউমেনুন।

□ এবং তাহাদেরকে সতর্ক (আনজির) কর অনুতাপ (হাসরাতি) দিবস সম্পর্কে যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এবং তাহারা গাফেলের (অমনোযোগী) মধ্যে এবং তাহারা (উহা) বিশ্বাস করে না।

৪০. ইন্না নাহ্নু নারিসুল আরদা ওয়ামান আলাইহা ওয়া ইলাইনা ইউবজাউনা।

□ নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী এবং যাহা উহার উপর আছে এবং উহার সকলেই আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে (ইউবজাউনা)।

৪১. ওয়াজকুর ফিল্ কিতাবি ইব্রাহিমা। ইন্নাহ কানা সিদ্দিকান নাবিয়ান।

□ এবং জিকির (স্মরণ) কর কেতাবের মধ্যে ইবরাহিমকে। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী (সিদ্দিকান) নবি।

□ কেতাবের মধ্যে হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে কেমন করে মনে করা হবে তথা স্মরণ করা হবে তথা জিকির করা হবে? - কারণ তখন কেতাবের সন্ধান কোথায় পাবে! যদি কেতাব বলতে কাগজ বা অন্য কিছুতে লিখা থাকে, আর তা ছাড়া কেতাব পড়ার মতো অক্ষর পরিচয় তার জানা ছিল না, তাহলে এই কেতাব বলতে কি আল্লাহর প্রকাশিত ও বিকাশিত সৃষ্টিরাজ্যকে বোঝানো হয়েছে? যদি তাই হয়, তাহলে নরময় কেতাব হতেই ইবরাহিমকে (আ.) জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ হজরত ইবরাহিম (আ.) আনুমানিক ৫০০০ বছর আগে বলে গেছেন। আমরা দেখতে পাই, কোনো বিষয় জানবার জন্য আল্লাহ কেতাবের জিকির করার কথাটি বারবার বলেছেন। সূতরাং এই রহস্যলোকের নুরি কেতাবটি হতে কিছু জানতে হলে রহস্যলোকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, দেড় হাজার বছর আগে আড়াই হাজার ফুট উপরে জাবালুন নুর পর্বতে অক্ষকার নির্জন হেরাণ্ডহার মধ্যে ১৫ বছর ধ্যানসাধনা করতেন মহানবি আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে রহস্যলোকের জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিজনে কিছুদিন ধ্যানসাধনাটি করতে হবে, নতুবা কতগুলো কথা জানা যাবে। তাহলে অধ্যাবসাদকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? আর যদি - ধরেই নিলাম উহা কাগজের কেতাব, কিন্তু সেই সময়ে কাগজ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। আর ভাষাটিকে আক্ষরিক রূপ দান করে সাজাবার মতো ভাষাজ্ঞানী কি তখন ছিল?

আরও উল্লেখ্য যে, কোরান কেতাব বলতে কোথাও কোরান-কেই বুঝিয়েছে, আবার আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার গতিকেও কেতাব বলা হয়েছে। সূতরাং একপেশে করে বুঝতে গেলেই ভুল করা হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে চাই যে, সুফিবাদে বিশ্বাসী অনেকেই কোরান-কেও যে কোনো-কোনো স্থানে কেতাব বলা হয়েছে এটা মেনে নিতে নারাজ। আবার পরক্ষণে আল্লাহর প্রকাশ ও বিকাশের অবিরাম ছুটে চলার

গতিকেও যে কেতাব বলা হয়েছে এটাও অনেকে মেনে নিতে নারাজ। অনেকটা যারা শরিয়ত মেনেন তারা মারফত মেনেন না, আবার যারা মারফত মেনেন তারা শরিয়ত মেনেন না। কারণ আল্লাহর কালাম *কোরানুল হাকিম*-এর মাঝে উভয়ের সমন্বয়টি দেখতে পাই। যেমন আমরা জানি, ওহি নবি-রসুলের কাছেই নাফেল করা হয়, অথচ হজরত মুসা (আ.)-র মাথের কাছেও ওহি আসার কথাটি জানতে পারি এবং আরও অবাক হবার কথাটি হলো যে, মোম্বাহির কাছেও ওহি নাফেল করা হয়। ওহি শব্দটি একমাত্র হলেও তিনটি স্থানে তিনটি রূপ। তাই বলে একজন মানুষ মোম্বাহির নামের পরে (আ.) কখনই ব্যবহার করতে যাবেন না। কারণ যেহেতু মোম্বাহির কাছেও ওহি নাফেল হয়, তাই বলে কি 'মোম্বাহি (আ.)' বলা যায়? - না, যায় না।

৪২. *ইজ্জ কালানি লিআবিহি ইয়াআবাতি লিমা তাবুদু মা লা ইয়াস্মাউ ওয়া লা ইউবসিকু ওয়াল্লা ইউগনি আনকা শাইয়ান।*

□ যখন তিনি তাহার পিতার জন্য বলিলেন, হে আমার পিতা, কেন তুমি এবাদত কর যে কিছুই শোনে না এবং কিছুই দেখে না এবং তোম্মা হইতে কোন কিছুই উপকারে (ইউগনি) আসে না।

৪৩. *ইয়াআবাতি ইন্নি কাদ জাআনি মিনান্ ইলমি মা লাম ইয়াতিকা ফাততাবিনি আহদিকা সিরাতান সাবিয়ান।*

□ হে আমার পিতা, নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিয়াছে এলেম (জ্ঞান) হইতে যাহা তোম্মাকে দেওয়া হয় নাই, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোম্মাকে হেদায়েত করিব সঠিক (সাবিয়ান) পথে (সিরাতান)।

৪৪. *ইয়াআবাতি লা তাবুদিশ শায়তানা, ইন্নাশ শায়তানা কানা লিবরাইমানি আসিয়ান।*

□ হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করিও না। নিশ্চয়ই শয়তান হয় রহমানের জন্য অবাদ্য (আসিয়ান)।

৪৫. *ইয়া আবাতি ইন্নি আখাফু আই ইয়ামাস্সাকা আজাবুন মিনার রাহমানি ফাতাকুনা লিশ শায়তানি ওয়ালিয়ান।*

□ হে আমার পিতা, নিশ্চয়ই আমি ভয় করি (আখাফু) তোম্মাকে স্পর্শ করিবে (ইয়ামাস্সাকা) আজাব রহমান হইতে, সুতরাং তুমি হইয়া যাইবে শয়তানের জন্য বন্ধু।

৪৬. *কালানি আরাগিবুন আনতা আনু আলিহাতি ইয়া ইব্রাহিমু, লাইন লাম তানতাহি লাআবুজ্জমান্নাকা ওয়াহজুবনি মালিয়ান।*

□ (তাহার পিতা) বলিল, তুমি কি অপছন্দ (আরাগিবুন) কর! আমার ইলা-সম্মহ (উপাস্য) হইতে, হে ইব্রাহিম? যদি তুমি উহা হইতে বিরত (তানতাহি) না হও অবশ্যই আমি তোম্মাকে পাথর (আবুজ্জমান্না) নিক্ষেপ করিব এবং তুমি আমার নিকট হইতে অনেক সময়ের জন্য (মালিয়ান) দূর হইয়া যাও।

৪৭. *কালানি সালামুন আলাইকা, সাআস্তাগ্ফিরু লাকা রাব্বি, ইন্নাহ কানা বি হাকিয়ান।*

□ (ইব্রাহিম) বলিলেন, সালাম তোম্মার উপর। অচিরেই আমি তোম্মার জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয়ই তিনি হন আমার প্রতি দয়ালু (হাকিয়ান)।

৪৮. *ওয়া আতাজিলুকুম ওয়াম্মা তাদউনা মিন দুনিলাহি ওয়া আদউ রাব্বি। আসা আল্লা অকিনা বিদ্যায়ি রাব্বি শাকিয়ান।*

□ এবং আমি পৃথক হইতেছি তোম্মাদের হইতে এবং তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাহাদেরকে ডাক এবং আমি আমার রবকে ডাকিব। হইতে পারে

(আসা) আমি কখনো আমার রবের নিকট দোয়া করিয়া নিরাশ (শাকিয়ান) হই নাই।

৪৯. ফালাম্মা তাফালাহম ওয়াম্মা ইয়াবুদুনা মিন দুনিলাহি, ওয়া হাব্বনা লাহ ইসহাক ওয়া ইয়াকুব, ওয়া কুল্লান জাআলুনা নাবিয়ান।

□ সুতরাং (তিনি ইবরাহিম) যখন তাহাদের হইতে এবং তাহারা আলাহকে ছাড়া যাহাদের এবাদত করিত পৃথক হইলেন (তখন) আমরা তাহাকে দান করিলাম ইসহাক এবং ইয়াকুবকে। এবং তাহাদেরকে আমরা নির্বাচন করিলাম নবিরূপে।

৫০. ওয়া ওয়াহাব্বনা লাহম মির রাহ্মাতিনা ওয়া জাআলুনা লাহম লিসানা সিদ্দিকিন আলিয়ান।

□ এবং আমরা তাহাদের জন্য দান করিলাম আমাদের রহমত হইতে এবং তাহাদের জন্য নির্বাচন করিলাম সত্যবাদিতা, সর্বোচ্চ সম্মান (আলিয়ান)।

৫১. ওয়াজুর ফিল কিতাবি মুসা, ইন্নাহ কানা মুখলাসান ওয়া কানা রাসুলান নাবিয়ান।

□ এবং জিকির কর কেতাবের মধ্যে মুসাকে। নিশ্চয়ই তিনি হন পরিশুদ্ধ চিত্ত (মুখলাসান) এবং (তিনি) হন রসুল, নবি।

৫২. ওয়া নাদাইনাহ মিন জান্নাবিত তুরিন্ আইমানি ওয়া কাররাব্বনাহ নাজিইয়ান।

□ এবং তাহাকে (মুসা) আমরা ডাকিলাম তুরের ডান দিক হইতে এবং আমরা তাহাকে নিকটবর্তী করিলাম উচু জায়গায় (নাজিইয়ান)।

৫৩. ওয়া ওয়াহাব্বনা লাহ মির রাহ্মাতিনা আখাহ হারুনা নাবিয়ান।

□ এবং আমরা তাহার জন্য দান করিলাম আমাদের রহমত হইতে তাহার ভাই হারুনকে নবি করিয়া।

৫৪. ওয়াজুর ফিল কিতাবি ইসমাইলা ইন্নাহ কানা সাদিকান্ ওয়াদি ওয়া কানা রাসুলান নাবিয়ান।

□ এবং জিকির (স্মরণ) কর কেতাবের মধ্যে ইসমাইলকে নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিতে সত্যপ্রিয় এবং তিনি ছিলেন রসুল নবি।

৫৫. ওয়া কানা ইয়ামুরু আহ্লাহ বিস সালতি ওয়াজ্ জাকাতি, ওয়া কানা ইন্দা বাবুহি মারদিয়ান।

□ এবং (তিনি) ছিলেন তাহার পরিবারবর্গের প্রতি আদেশকারী সালাত এবং জাকাতের সাথে এবং তিনি ছিলেন তাহার রবের নিকট প্রিয়ভাজন।

৫৬. ওয়াজুর ফিল কিতাবি ইদ্রিসা, ইন্নাহ কানা সিদ্দিকান্ নাবিয়ান।

□ এবং জিকির (স্মরণ) কর কেতাবের মধ্যে ইদ্রিসকে, নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সিদ্দিক নবি।

৫৭. ওয়া রাফানাহ মাকানান্ আলিয়ান।

□ এবং আমরা তাহাকে উত্থাপিয়াছি সর্বোচ্চ (আলিয়ান) স্থানে (মাকানান)।
□ মর্যাদা শব্দটি অনেক তফসিরকারক ব্যবহার করেছেন, অথচ বাক্যে ইহা নাই।

৫৮. উলাইকাল্লাজিনা আনুআমাল্লাহ আলাইহিম মিনান্ নাবিইনা মিনজুরিয়াতি আদামা, ওয়া মিন্মান হামালনা মাআ নহিন ওয়া মিন জুরিয়াতি ইব্রাহিমা ওয়া ইসরাইলা, ওয়া মিন্মান হাদাইনা ওয়াজ্জাবাইনা, ইজা তুত্লা আলাইহিম আয়াতুর রাহমানি খারক সুজ্জাদান ওয়া বুকিয়ান।

□ এই সমস্ত লোক যাহারা আলাহ হইতে নেয়ামত পাইয়াছেন নবিগণের মধ্যে আদমের বংশধর (জুররিয়াত) হইতে। এবং যাহাদেরকে আমরা

উঠাইয়াছি (হাম্বালা) নুহের সহিত। এবং ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধর হইতে। এবং আমরা যাহাদেরকে হেদায়েত দিয়াছি এবং আমরা যাহাদেরকে নির্বাচিত করিয়াছি (ওয়াজ্জাত বাইনা)। যখন (ইজা) তাহাদের উপর তেলাওয়াত (আলোচনা) করা হয় রহমানের আয়াত (নিদর্শন) (তখন তাহারা) সেজদায় পড়িয়া যায় এবং কাঁদিতে থাকেন (বুকিয়ান)।

□ এই আয়াতে নুহের নৌকাটির কথা বলা হয়, অথচ বাক্যে নৌকার কোনো উল্লেখ নাই।

৫৯. ফাখালাফা মিম্ব বাআদ্বিহিম খালফুন আদাউস সালাতা ওয়াততাবাউশ শাহাওয়াতি ফাসাওফা ইয়ালকাওনা গাইয়ান।

□ সূতরাং তাহাদের পরে আসিল তাহাদের বংশধরগণ (খালফুন)। উপেক্ষা (আদাউস) করিল সালাত এবং আনুগত্য করিল প্রবৃত্তির (শাহাওয়াত)। সূতরাং অচিরেই (সাওফা) তাহারা পতিত (ইয়ালকাওনা) হইবে বিভ্রান্তিতে (গাইয়ান)।

৬০. ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আম্বিলা সালেহান ফাউলাইকা ইয়াদখলুনাল জান্নাতা ওয়ালা ইয়জলামনা শাইয়ান।

□ একমাত্র যাহারা তওবা (অনুতাপ) করিয়াছে এবং ইমান আনিয়াছে এবং আমলে সালেহা (সৎকর্ম) করিয়াছে সূতরাং তাহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন প্রকার (শাইয়ান) জুলুম করা হইবে না।

৬১. জান্নাতি আদ্বিন আল্লাতি ওয়া আদার রাহমানু ইবাদাহ বিল গাইবি ইন্নাই কানা ওয়াদহ মাতিয়ান।

□ চিরস্থায়ী (আদ্বিনান) জান্নাতসমূহ যাহাদেরকে (আল্লাতি) ওয়াদা দিয়াছেন রহমান তাহার বান্দাদের হইতে গায়েবের (অদৃশ্য) সাথে। নিশ্চয়ই তিনি, তাহার ওয়াদা অচিরেই আগমনকারী (মাতিয়ান)।

৬২. লা ইয়াসমাউনা ফিহা লাগওয়ান ইল্লা সালামান, ওয়া লাহম রিজকুহম ফিহা বুরাতান ওয়া আশিয়ান।

□ তাহারা শুনিবে না তাহার মধ্যে (জান্নাতে) বাজে কথা (লাগওয়ান) একমাত্র শান্তি (সালামান)। এবং তাহাদের জন্য তাহাদের রেজেক তাহার মধ্যে (জান্নাতে) (থাকিবে) সকাল (বুরাতান) এবং সন্ধ্যা (আশিয়ান)।

৬৩. তিলকাল জান্নাতল্লাতি নরিস মিন ইবাদিনা মান কানা তাকিয়ান।

□ ঐ জান্নাতসমূহ যাহার উত্তরাধিকারী (নরিস) আমরা করিব আমাদের বান্দাগণ (ইবাদিনা) হইতে যাহারা হইবে মুক্তাকি।

৬৪. ওয়া মা নাতানাঙ্জাল ইল্লা বিআমরি রাব্বিকা, লাহ মা বাইনা আইদিনা ওয়া মা খালফানো ওয়া মা বাইনা জালিকা, ওয়া মা কানা রাব্বুকা নাসিয়ান।

□ এবং আমরা অবতরণ করি না তোমার রবের হুকুম ব্যতীত। তাহার জন্য আমাদের হাতের মধ্যে যাহা আছে এবং আমাদের পিছনে যাহা আছে এবং ঐগুলির মধ্যে যাহা আছে। এবং অবশ্যই তোমার রব ভুল (নাসিয়ান) করিবার নহেন।

৬৫. রাব্বুস সাম্মাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মা বাইনাহমা ফাবুদহ ওয়াস্তাবির লিইবাদাতিহি, হাল তালাম লাহ সাম্মিয়ান।

□ তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী ও এই দুইয়ের মাঝে যাহা কিছু আছে সকলেরই রব। সূতরাং তাহার এবাদত করা এবং তাহার এবাদতের জন্য ধৈর্যধারণ (ওয়াস্তাবের) করা তুমি কি জান, তাহার জন্য অন্য আর একটি নাম (সাম্মিয়ান)?

৬৬. ওয়া ইয়াকুল ইনসানু আ ইজা মা মিতু লাসাওফা উখরাজু হাইয়ান।

□ এবং মানুষ বুলাবলি করে, আশ্চর্য! (আ.) যখন আমি মরিয়া যাঁইব তখন কি আমি শীঘ্রই (লাসাওফা) বাহির হইব (উখরাজু) জীবিত অবস্থায়! (হাইয়ান)।

৬৭. *আওয়া লা ইয়াজ্জুরুল ইনসানু আননা খালাক্নাহ মিন কাবলু ওয়া লাম ইয়াকু শাইয়ান।*

□ মানুষ কি জিকির (স্মরণ) করে না! নিশ্চয়ই আমরা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি পূর্ব হইতে (মিন কাবলু) অথচ সে কিছুই (শাইয়ান) ছিল না।

৬৮. *ফাওয়া রাব্বিকা লা নাহ্জুরান্নাহম ওয়াশ শায়াতিনা সুম্মা লানুহ্দিরান্নাহম হাওলা জাহান্নামা জিসিয়ান।*

□ সতরাং শপথ তোমার রবের নিশ্চয়ই আমরা একত্রিত করিব তাহাদেরকে ও শয়তানদেরকে। তারপর নিশ্চয়ই আমরা তাহাদিগকে হাজির করিব জাহান্নামের চারিদিকে (হাওলা) নতজানু (হাটুঙাংগা, জেসিয়ান) অবস্থায়।

৬৯. *সুম্মা লানান্জিয়ান্না মিন কুল্লি শিয়াতিন আইয়ুহম আশাদ্দু আলা রাহমানি ইতিয়ান।*

□ অতঃপর অবশ্যই আমরা টানিয়া বাহির করিব (লানান্জিয়ান্না) প্রত্যেক দল (শিয়াতিন) হইতে তাহাদেরকে যাহারা রহমানের উপর শক্ত (আশাদ্দু) ভাবে অবাধ্য (ইতিয়ান)।

৭০. *সুম্মা লানাহু আলাম বিল্লাজিনা হম আওলা বিহা সিলিয়ান।*

□ তারপর অবশ্যই আমরা তাহাদের বিষয়ে ভালো জানি (আলাম) যাহারা অধিকতর (আওলা) দক্ষ (সিলিয়ান) হইবার উপযুক্ত (বিহা)।

৭১. *ওয়া ইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা, কানা আলা রাব্বিকা হাত্মান মাকদিয়ান।*

□ এবং যদি তোমাদের সকলকে একমাত্র উহা পার হইতে হইবে (ওয়ারিদুহা) (যাহা) তোমার রবের উপর ছিল অবশ্যই (হাত্মান) সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত (মাকদিয়ান)।

৭২. *সুম্মা নুনাজ্জিল লাজিনা ইঠাকাও ওয়া নাজ্জাজ্জ জালিমিনা ফিহা জিসিইয়ান।*

□ অতঃপর আমরা যাহারা তাকওয়া (খোদাভীতি, আত্মসংযম, ভয়) করে তাহাদেরকে নাজাত (মুক্তি) দেই এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী (নাজারা) জালেমদেরকে তাহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ফেলিয়া দেই (জেসিয়ান)।

৭৩. *ওয়া ইজ্জা ততলা আলাইহিম আয়াতনা বাইয়িনাতিন কালান্ লাজিনা কাফারু লিল্লাজিনা আমানু আইউল ফারিকাইনি খায়রুম মাকামান ওয়া আহসানু নাদিয়ান।*

□ এবং যখন তাহাদের উপর আমাদের আয়াতসমূহ বাইয়েনাত (যুক্তি, দলিল, সাক্ষ্য, প্রমাণ) সহ তেলাওয়াত করা হয় (তখন) যাহারা কাফের তাহারা বলে যাহারা ইমানদার তাহাদের জন্য, দুইটি দলের মধ্যে মর্যাদায় (মাকামাস) কোনটি ভাল। এবং মজলিশ (মাহফিল) (নাদিয়ান) হিসাবে কোনটি উত্তম (আহসান)?

৭৪. *ওয়া কাম আহলাক্না কাব্লাহম মিন কার্নিন হম আহসানু আসাসান ওয়া রিয়ান।*

□ এবং (ওয়া) তাহাদের পূর্বে (কাবলাহম) আমরা ধ্বংস করিয়াছি (আহলাক্না) কত (কাম) সহচর (কার্নিন) (সুঙ্গী, সাখী, দোসর, স্বামী) হইতে। তাহারা সম্পদে (আসাসান - এই শব্দটি কোন অভিধানেই খুজে

পেলান্ন না, তাই বাজারের প্রচলিত অনুবাদ হতে সম্পদ অর্থটি নিতে বাধ্য হলাম) এবং দেখিতে শুনিতে (রিয়ান) ভালো ছিল।

৭৫. কুল মান কানা ফিদ দালালাতি ফালইয়ামদুদ লাহর বাহমানু মাদ্দা, হাভা ইউজা রাআও মা ইউআদনা ইম্মাল আজাবী ওয়া ইম্মাল সাআতা, ফাসাইয়ালানুনা মানু হয় শারকুম মাকানান ওয়া আদআফু জুনদান।

□ বল যাঁহারা বিদ্রাষ্ট্রির মধ্যে রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদের জন্য বর্ধিত (ইয়াসদুদ) করা হয় রহমান হইতে সময়কে (মাদ্দান)। এমনত অবস্থায় যখন তাহারা দেখিবে (রাআও) যাহা তাহাদের প্রতি ওয়াদা করা হইয়াছে। হউক (ইম্মা) তাহা আজাব অথবা হউক তাহা কিছু সময় (সায়াত)। সুতরাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে তাহাদের মধ্যে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট (শারকুন) এবং দলবলে (জুনদান) কে দুর্বল (আদআফুন)।

৭৬. ওয়া ইয়াজিদুল লাহল লাজিনা এহতাদাও হদান, ওয়াল বাকিইয়াতুস সোয়ালিহাত খায়রুম ইনদা রাব্বিকা সাওয়াবান ওয়া খায়রুম মারাদদান।

□ এবং বর্ধিত করেন (ইয়াজিদ) আল্লাহ তাহাদের জন্য সংপথে (এহতাদাও) একটি হেদায়েত (হদান), এবং স্বয়ী (বাকিয়াত) সংকর্মে (সোয়ালিহাত) তোমার রবের নিকট (ইনদা রাব্বিকা) রহিয়াছে উত্তম (খায়রুম) সাওয়াব এবং উত্তম (খায়র) প্রতিদান (মারাদদান)।

৭৭. আফারাআইতাল্লাজি কাফারা বিআইয়াতিনা ওয়া কাল লাইতাউয়ানুনা মালাও ওয়া ওয়ালাদান।

□ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ! যে আমাদের আয়াতের (নিদর্শন) সাথে কুফরি (অস্বীকার) করে এবং বলে অবশ্যই আমাদেরকে দেওয়া হইবে মাল (সম্পদ) এবং সন্তান-সন্ততি (ওয়ালাদান)।

৭৮. আততাল্লাআল গাইবা আমিততাখাজা ইনদার রাহমানি আহদান।

□ গায়েব (অদৃশ্য) কি তাহাদের নিকট প্রকাশ (আততাল্লাআ) পাইয়াছে! অথবা গ্রহণ করিয়াছে (ইত্তাখাজা) (তাহারা) রহমানের নিকট একটি ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি)?

৭৯. কাল্লা, সানাকতুবু মা ইয়াকুলু ওয়া নামুদু লাহ মিনাল আজাবি মাদ্দান।

□ কখনোই নহে! অচিরেই আমরা লিখিব (সানাকতুবু) অবশ্যই তাহারা যাহা বলে এবং আমরা বৃদ্ধি করিব তাহাদের জন্য একটি বর্ধিত (মাদ্দান) আজাব (শাস্তি) হইতে।

৮০. ওয়া নারিসুহ মা ইয়াকুলু ওয়া ইয়াতিনা ফারদান।

□ এবং তাহারা যাহা বলে তাহা আমাদের অধিকারে থাকিবে এবং তাহারা আমাদের নিকট আসিবে একাকী (ফারদান)।

৮১. ওয়াত্তাখাজু মিন দনিল্লাহি আলিহাতাল লিইয়াকুলু লাহম ইউজ্জান।

□ এবং তাহারা গ্রহণ করে আল্লাহ ব্যতীত অন্য ইলাহি (উপাস্য) সমূহকে। যেহেতু তাহারা যেন সম্মানের (ইজ্জান) অধিকারী হইতে পারে।

৮২. কাল্লা, সাইয়াকফুরুনা বিএবাদাতিহিম ওয়া ইয়াকুনুনা আলাইহিম দিদ্দান।

□ কখনোই নহে! অচিরেই তাহারা কুফরি করিবে (অস্বীকার) তাহাদের এবাদত (উপাসনা) সমূহের সাথে এবং তাহাদের উপর হইয়া যাইবে (ইয়াকুনুনা) (উহা) বিরোধী (দিদ্দান)।

৮৩. আলামতারা আননা আরসালনাশ শাইয়াতিনা আলাল কাফিরিনা তাউজ্জুহম আজ্জান।

□ তুমি কি দেখে নাই! নিশ্চয়ই আমরা পাঠাইয়াছি শয়তানদেরকে কাফেরদের উপর যাহাতে তাহারা (তাউজ্জুহম) বিপথগামী (আজ্জান) হয়।

৮৪. ফালা তাজ্জাল্ আলাইহিম, ইনুনা নাউদু লাহমু আদদান।

□ সুতরাং তাহাদের উপর তাড়াতাড়ি (তাজ্জাল্) করিও না। নিশ্চয়ই আমরা তাহাদের জন্য গণনা করিতেছি একটি গণনা (আদদান)।

৮৫. ইয়াওমা নাহশুরুল মুতাকিনা ইলার রাহমানি ওয়াফদান।

□ একদিন (ইয়াওমা) আমরা হাশর (একত্রিত) করিব (নাহশুরুল) মুতাকিনদেরকে (খোদাভীরুদেরকে) রহমানের (দয়াময়) দিকে সম্মানিত প্রতিনিধি দলরূপে (ওয়াফদান)।

৮৬. ওয়া নাসুকুল মুজুরিমিনা ইলা জাহান্নামা ওইরদান।

□ এবং আমরা অপরাধীদেরকে (মুজুরিমিনা) পান করাইবার জন্য (সুকুন) জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব (ওইরদান)।

৮৭. লা ইয়ামলিকুনাশ শাফায়াতা ইল্লা মানিঠাখাজা ইনদার রাহমানি আহদান।

□ তাহারা অধিকার পাইবে না (ইয়ামলিকুনা) শাফায়াত (সুপারিস) বিষয়ে, একমাত্র (ইল্লা) যিনি রহমানের নিকট প্রতিশ্রুতি (আহদান) গ্রহণ করিয়াছেন।

৮৮. ওয়া কালত তাখাজার রাহমান ওয়ালাদান।

□ এবং তাহারা বলে, রাহমান গ্রহণ করিয়াছেন একটি সন্তান।

৮৯. লাকাদ জিতম শাইয়ানু ইদদান।

□ অবশ্যই তোমরা গুরুতর (ইদদান) একটি বিষয় আনিয়াছ।

৯০. তাকাদুস সামাওয়াত ইয়াতাকাভারনা মিনহ ওয়া তানশাক্কুল আরদু ওয়া তাখিরকুল জিবানু হাদদান।

□ আকাশগুলি কাছাকাছি (তাকাদুস) হইবে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া (ইয়াতাকাভারনা) যে অবস্থায় আছে তাহা হইতে (মিনহ)। এবং জমিন (আরদু) খণ্ডবিখণ্ড (তানশাক্কুল) হইয়া যাইবে এবং পাহাড়গুলি (জিবানু) পতিত হইবে (তাখিরকুল) ধূলার (হাদদান) মতো।

৯১. আন দাআও লিররাহমানি ওয়ালাদান।

□ যদি তোমরা ডাক (বল) রহমানের জন্য একটি সন্তান।

৯২. ওয়ামা ইয়ামবাগি লির রাহমানি আই ইয়াহাখিজা ওয়ালাদান।

□ এবং রহমানের জন্য শোভনীয় নহে যে তিনি গ্রহণ করিবেন একটি সন্তান।

৯৩. ইন কুল্লু মান্ ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ইল্লা আতির রাহমানি আবদান।

□ আকাশগুলি এবং জমিনের মধ্যে এমন কেহ নাই একমাত্র আসিবে (তাহারা) রহমানের নিকট বান্দারূপে।

৯৪. লাকাদ আহসাহম ওয়া আদদাহম আদদান।

□ অবশ্যই আমি তাহাদেরকে পূরিবেশন করিয়া রাখিয়াছি। এবং তাহাদেরকে বিশেষভাবে গণিয়া রাখিয়াছি (আদদা) এবং একটি গণনা।

৯৫. ওয়া কুল্লুহম আতিহি ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি ফারদান।

□ এবং তাহারা সকলেই তাহার নিকট আসিবে কেয়ামতের দিন একাকী (ফারদান)।

৯৬. ইননাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিনুস্ সালিহাতি সাইয়াজ্ আলু লাহমুর রাহমানু উদদান।

□ নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আমলে সালেহা (সৎকর্ম) করিয়াছে অচিরেই তাহাদের জন্য নির্ধারণ করা হইবে রহম্মানের ভালোবাসা (উদ্দান)।

৯৭. ফাইননামা ইয়াসসারনাহ বিলিসানিকা লিতুবাশশিরা বিহিল মুঠাকিনা ওয়া তুন্জিরা বিহি কাউমান লুদ্দান।

□ নিশ্চয়ই আমরা উহাকে (কোরনি) সহজ করিয়াছি তোমার ভাষায়। যাহাতে তাহার দ্বারা তুমি সুসংবাদ দিতে পার মুঠাকিদেরকে (খোদাভীর) এবং ভয় দেখাইতে পার যাহার দ্বারা কলহপ্রিয় (লুদ্দান) সম্প্রদায়কে।

৯৮. ওয়া কাম্ম আহ্লাকনা কাব্লাহম্ম মিন কার নিন, হাল তুহিস্সু মিনহম্ম মিন আহাদিন আও তাসমাও লাহম্ম রিকজান।

□ এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে (কারনিন) ধ্বংস (আহ্লাক) করিয়াছি। তুমি কি অনুভব কর (তুহেস্সু) তাহাদের হইতে (মিনহম্ম) কোন একজনকে (মিনি আহাদিন) অথবা তুমি কি শুনিতে পাও (তাসমাও) তাহাদের জন্য (লাহম্ম) একটি ক্লিষ্টতম শব্দ (রিকজান)।

সূরা : আশিয়া

মক্কী র আয়াত : ১১২, রুকু : ৭

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

আল্লাহর নামের সাথে (বিস্মিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. কাছে আসিয়াছে (ইক্তারাবা) মানুষের জন্য (লিন্ নাসি) তাহাদের হিশাব (হিসাবুহম্ম) এবং তাহারা (ওয়াহম্ম) উদাসীনতার মধ্যে (ফি গাফ্লাতিন্) বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে (মুরিদুন)।

তাহাদের হিশাব মানুষের কাছে আসিয়াছে অথচ তাহারা উদাসীনতার মধ্যে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে।

২. না (মা) তাহাদের কাছে আসিয়াছে (ইয়াতিহিম্) হইতে (মিন্) জিকির (জিক্রিন্) হইতে (মির্) তাহাদের রব (রাব্বিহিম্) নূতন (মুহদাসিন্)

একমাত্র (ব্যতীত) (ইল্লাস) তাহা তাহারা শুনে (তামাউহ) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) খেলায় মাতিয়া থাকে (ইয়াল্আবুন)।

তাহাদের রব হইতে (এমন কোনো) নূতন জিকির হইতে তাহাদের কাছে আসে নাই যে তাহা তাহারা শুনে এবং তাহারা খেলায় মাতিয়া থাকে।

৩. মশগুল (বিভোর, তন্ময়) (লাহিয়াতান) তাহাদের কলব (অন্তর)-গুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) তাহারা লুকাইয়া রাখে (আসাররুন) গোপন আলোচনা (নাজ্ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) জুলুম করিয়াছে (জালামু) নয় কি (হাল)? এই (হাজা) একমাত্র (ইল্লা) মানুষ (বাশারুম) তোমাদের মতো (মিসলুকুম) তবে কি তোমরা আসিয়া পড়িবে (আফাতাতুনাস) জাদু (সিহরা) এবং (ওয়া) তোমরা (আনতুম) দেখিতেছ (তুবসিরুন)।

তাহাদের অন্তরগুলি (অন্য চিন্তায়) মশগুল এবং জালেমেরা লুকাইয়া গোপন আলোচনা করে (যে) নয় কি এই (ব্যক্তি) একমাত্র তোমাদের মতো মানুষ? তোমরা কি তবে জাদুর (কবলে) পড়িবে? এবং তোমরা দেখিতেছ।

৪. (নবি) বলিলেন (কাল) আমার রব (রাব্বি) জানেন (ইয়ালামুল) কথা (কাউলা) মধ্যে (ফিস) আকাশগুলির (সাম্মায়ি) এবং (ওয়া) জমিনের (আরদি) এবং (ওয়া) তিনিই (হয়াস) সব কিছু শোনে (সাম্মিউন) (এবং) সব কিছু জানেন (আলিমুন)।

(নবি) বলিলেন, ‘আকাশগুলি এবং জমিনের মধ্যে আমার রব জানেন (সব) কথা এবং তিনি সব কিছু শোনে এবং সব কিছু জানেন।

কোরান-এর এই আয়াতটি দিয়ে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা বলে থাকেন যে, যেখানে আল্লাহ আসমান-জমিনের সব কথা জানেন, শোনে সেইখানে পীর নামক উসিলা ধরার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বান্ধা ডাকবে, রব শুনবে ॥ এক কথায় ওহাবিরা পীর নামক উসিলা ধরাটিকে অস্বীকার করেন। যদি আমরা তথা আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীরা পাল্টা প্রশ্ন করি যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা হবার পরেও তাঁর কালামগুলো বান্ধাদের কাছে পাঠাতে গিয়ে দুইটি উসিলা কেন গ্রহণ করলেন? জিবরাইল এক উসিলা এবং তার পরের উসিলা মহানবির মাধ্যমে আল্লাহর কালামসমূহ কেন পাবো? সরাসরি আল্লাহর কালাম আল্লাহ কি পাঠাতে পারতেন না?

অবশ্যই পারতেন। তা হলে এই দুইটি উসিলা তথা জিবরাইল ও মহানবির মাধ্যমে কোরান পাঠাবার মধ্যে একটি গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। জগতের লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা কেন পীর নামক উসিলার মাধ্যমে আল্লাহকে নিজের মধ্যে বিকশিত ও প্রকাশিত করে গেছেন? যদি শ্রদ্ধেয় ওহাবি ভাইদের কথাটি মেনে নিই, তা হলে এই লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা কি আমাদেরকে ভুল শিক্ষা দিয়ে গেলেন? যদি বলি, না, ভুল শিক্ষার প্রশ্নই আসে না, তা হলে ওহাবি ভাইদের কথার কোনো মূল্যই থাকে না। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই উসিলা ধরাটিকে একটি বোঝা মনে করে। সুতরাং ওহাবি ভাইদের কথাগুলো শুনতে চমৎকার লাগে, কিন্তু বিরাট বিরাট ভুলের বিরাট বিরাট গর্ত লুকিয়ে থাকে।

৫. বরং (বাল) তাহারা বলে (কালু) অলীক (অমূলক, বৃথা, অসার) (আদগাসু) স্বপ্নগুলি (কল্পনা) (আহলামিন) বরং (বাল) তাহা সে উদ্ভাবন (আবিষ্কার, বিরচন) (ইফতারাহ) বরং (বাল) সে (হয়া) একজন কবি (শাইরুন) সুতরাং আনুক আমাদের কাছে (ফাল্ইয়াতিনা) কোনো আয়াত (নিদর্শন, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রমাণ, চিহ্ন) (বিআয়াতিন) যেমন (কাম্মা) প্রেরিত (আদেশপ্রাপ্ত, অনুপ্রাণিত, যাহাকে পাঠানো হইয়াছে, প্রেরণাপ্রাপ্ত) (উরসিলাল) আগেকার (পূর্ববর্তী, অতীতের) (আউয়ালুনা)।

বরং তাহারা বলে (এই সমস্ত) অলীক স্বপ্নসমূহ বরং তাহা সে উদ্ভাবন করিয়াছে বরং সে একজন কবি। সুতরাং কোনো নিদর্শন আনুক আমাদের কাছে, যেমন পূর্ববর্তীগণ (নিদর্শন নিয়া) প্রেরিত হইয়াছিল।

৬. ইমান আনে নাই (মা আম্মানাত) তাহাদের আগে (কাব্লাহম) কোনো (মিন) জনবসতি (কার্ইয়াতিন) যাহাকে আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস (বিনাশ, সংহার, বিলোপ) করিয়াছি (আহলাক্নাহা) সুতরাং ইহারা কি (আফাহম) ইমান আনিবে (ইউমিনুন)?

তাহাদের পূর্বে (যে-সকল) জনবসতি ইমান আনে নাই (তাহাদেরকে) আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি। সুতরাং ইহারাও কি ইমান আনিবে?

আধুনিক বেশ কিছু পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা অধম লিখককে প্রশ্ন করেন যে, আগেকার দিনে আল্লাহতে ইমান না আনার দরুন, অনেক জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু এই যুগে ইমান আনার প্রশ্ন তো বহু দূরের কথা, বরং বলে থাকেন যে, ‘আল্লাহই নাই।’ ইমান না আনা এক কথা আর ‘আল্লাহই নাই’ বলা আর এক কথা। সুতরাং এই ক্ষমার অযোগ্য ‘আল্লাহই নাই’ কথাটি যে সব জাতি তথা কমিউনিষ্টরা বলে বেড়ায় তাদের একটি কণ্ঠকেও ধ্বংস করা হয় নি। আদ আর সামুদ জাতিকে মূর্তিপূজার দরুন ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু অখণ্ড বিশাল ভারতে আজও বহাল তবিত্তে বহু মূর্তির পূজা চলে আসছে। তা হলে এদেরকে কেন ধ্বংস করা হলো না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অধম লিখক দিতে পারে নাই বলেই সরল-সহজ মনে তুলে ধরলাম এ জন্য যে কোনো জ্ঞানী পাঠক এর সুন্দর উত্তরটি দিতে পারেন এবং সেই আশায় অপেক্ষায় রইলাম।

৭. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা পাঠাইয়াছি (আরসালনা) আপনার আগে (কাবলাকা) একমাত্র (ইল্লা) মানুষ (রিজালান) আমরা ওহি করিতাম (নুহি) তাহাদের কাছে (ইলাইহিম) সুতরাং জিজ্ঞাসা করো (ফাসআলু) অধিবাসী (ধারণ করে আছে, মালিক, ওয়ালা) (আহলাজ) জিকিরকারী (জিকরি) যদি (ইন) তোমরা (কুনতুম) না (লা) জানো (তায়ালামুন)।

এবং (হে নবি) আমরা পাঠাইয়াছি আপনার আগে (কোনো রসুলকে) একমাত্র মানুষ (-কেই) আমরা ওহি করিতাম তাহাদের কাছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করো জিকিরকারীদের মধ্যে আছেন, যদিও তোমরা জান না (অবগত নও)।

‘আপনার আগে’ কথাটি এই আয়াতে আছে, কিন্তু ‘কোনো রসুলকে’ কথাটি নাই এবং থাকতে পারে না। তাই অধম লিখক ‘কোনো রসুলকে’ শব্দটিকে ব্রাকেটে রেখে দিয়েছি। এখানে ‘ইল্লা রেজালান’ অর্থাৎ একমাত্র পুরুষের কথাটি বলা হয়েছে। কোরান বার বার ঘোষণা করেছে যে আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ মানুষ এবং ফেরেশতাদের থেকে নির্বাচন করেছেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ সূরা হজের ৭৫ নম্বর আয়াতটি (আল্লাহ ইয়াস্তাফি মিনাল্ মালাইকাতি রসুলাও ওয়া মিনান্ নাস) এবং ইহার একদম লেংটা প্রমাণ হলো

সূরা ফাতির-এর ১-নম্বর আয়াতটি। এখানে মানুষকেও যে রসুলরূপে পাঠানো হয় সেই কথাটি বলা হয় নি, বরং সোজাসুজি বলা হয়েছে যে ফেরেশতাদেরকে রসুলরূপে পাঠানো হয়েছে (আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহে ফাতিরিস্ সাম্মাওয়াতি ওয়াল্ আরদি জাইলিল্ মালাইকাতি রসুলান্)। সুতরাং আল্লাহ্ কখনই ‘রেজাল’ তথা মানবরূপী পুরুষ হতে একমাত্র রসুল নির্বাচন করার কথাটি বলতে পারেন না। ইহা অজ্ঞানী অধম লিখক বলতে পারে, তাই ব্রাকেটে ‘কোনো রসুলকে’ শব্দটি উল্লেখ করেছি। কিন্তু মজার কথাটি হলো কোরান-এর একটি আয়াতেও ফেরেশতাদেরকে নবি বলে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং নবি বড়, রসুল ছোট। অথচ প্রচলিত বাজারে রসুলকে বড় বলা হয়। এই আহাম্মকের স্বর্গে অধম লিখকও অবস্থান করেছিল, পরে বহু গবেষণার পর নবি বড় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। আমাকে যদি কেহ কোরান-এর একটি আয়াতে ফেরেশতাকে নবি বলা হয়েছে, দেখিয়ে দিতে পারেন তা হলে অবশ্যই রসুলকে বড় বলব। আরও একটি মজার কথা হলো যে, ফেরেশতাদেরকে নফস এবং রুহ তথা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার একটিও দেওয়া হয় নি, তথা স্বাধীন নির্বাচন করার কোনো অধিকারই দেওয়া হয় নি। সুতরাং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ রোবট (?) ও বলা যেতে পারে।

৮. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ্) তাহাদের বানাই (জাআল্নাহুম্) দেহবিশিষ্ট (জাসাদাল্) না (লা) তাহারা খাইত (ইয়াকুলুনাত্) খানা (খাদ্য) (তায়্যাম্মা) এবং (ওয়া) না (মা) তাহারা ছিল (কানু) চিরস্থায়ী (খালিদিনা)।

ল্ট এবং আমরা (আল্লাহ্) (এমন কোনো) দেহবিশিষ্ট (করিয়া) তাহাদের বানাই নাই (যে) তাহারা খাইত না খাদ্য এবং না তাহারা ছিল চিরস্থায়ী।

৯. তারপর (সুম্মা) আমরা (আল্লাহ্) তাহাদের পূর্ণ (পুরা, কমতি বা ঘাটতি নাই) করিয়াছি (সাদাক্নাহুম্) ওয়াদা (ওয়াদা) সুতরাং আমরা (আল্লাহ্) তাহাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিত্রাণ, অব্যাহতি, নিষ্কার, তড়াবধান) করিয়াছি (ফাআন্‌জাইনাহুম্) এবং (ওয়া) যাহাদেরকে (মান্) আমরা চাহিয়াছি (নাসাউ) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ্) ধ্বংস করিয়াছি

(আহলাক্‌নাল) সীমালঙ্ঘনকারীদের (প্রাত্যাহিকক্রমকারী, ধার ডিঙাইয়াছে যে, সীমানা অতিক্রমকারী) (মুসরিফিন)।

তারপর আমরা (আল্লাহ) পূর্ণ করিয়াছি তাহাদের (প্রতি) ওয়াদা সুতরাং আমরা তাহাদেরকে রক্ষা করিয়াছি এবং যাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) চাহিয়াছি এবং আমরা ধ্বংস করিয়াছি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে।

১০. নিশ্চয়ই (লাকাদ) আমরা নাজেল করিয়াছি (আনজালনা) তোমাদের দিকে (ইলাইকুম) কিতাব (কিতাবান) ইহার মধ্যে (ফিহি) তোমাদের জন্য রহিয়াছে জিকির (জিকরুকুম) তবে কি না (আফালা) তোমরা বুঝিবে (তাকিলুন)।

নিশ্চয়ই আমরা নাজেল করিয়াছি তোমাদের দিকে কিতাব, ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে জিকির, তবে কি তোমরা বুঝিবে না?

১১. এবং (ওয়া) কত (কাম) আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস (বিধ্বস্ত, বিনাশিত, সম্পূর্ণ বিনষ্ট, চূর্ণ-বিচূর্ণ) করিয়াছি (কাসামনা) হইতে (মিন) জনবসতিকে (লোকালয়কে) (কারিয়াতিন) যাহা ছিল (কানাত) জালিম (জালিমাতান) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি (আনশানা) তাহার পরে (বাদাহা) জাতি (কাওমান) অপর (অন্য) (আখারিন)।

এবং আমরা ধ্বংস করিয়াছি কত জনবসতি (লোকালয়)-কে যাহারা ছিল জালিম (জুলুমকারী, ঊৎপীড়ক) এবং তাহার পরে আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি (নির্মাণ, উদ্ভব, রচনা) করিয়াছি অপর জাতি।

এই আয়াতটি পড়লে মনে হয় কত সহজ, কিন্তু ইহা মোটেই সহজ নয়। কারণ আল্লাহ পাক বহু জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার দরুন যে ধ্বংস করে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত কোরান হতে বেশ অনেকবার আমরা জানতে পারি। আমরা জানতে পারি, আদ ও সামুদ জাতির মতো মুসা নবির জামানার আগেও বহু জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার দরুন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। (সূরা তোয়াহা দ্রষ্টব্য)। প্রশ্ন আসতে পারে : কতদিন, কত কাল, কত যুগ আল্লাহ সেই সমস্ত জালিম জাতিদেরকে সহ্য করার পর ধ্বংস করে দিয়েছেন। কারণ বর্তমান যুগে পৃথিবীতে বহু জুলুমের ঘটনা অহরহ ঘটে চলছে এবং আল্লাহ ধৈর্যধারণ করে সেই জালিম জাতিগুলোকে ধ্বংস করার অপেক্ষায়

আছেন। কিন্তু আল্লাহ এই অপেক্ষাটি কতদিন, কত যুগ ধারণ করবেন উহা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। সুতরাং কোরান-এর এই আয়াতটির অর্থ সহজ মনে হলেও অধম লিখকের নিকট অনেক কঠিন। তাই এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি দিতে পারলাম না তথা এই আয়াতের অর্থটি অধম লিখকের জানা নাই। অনুমানের ঢিল ছোঁড়া আপন বিবেকের কাছে অপরাধ বলে মনে করি। তাই অকপটে স্বীকার করে নিলাম যে এই আয়াতের মর্মার্থটি জানা নাই।

১২. সুতরাং যখন (ফালাম্মা) তাহারা অনুভব করিল (আহাস্‌সু) আমাদের (আল্লাহ) শাস্তি (বাসানা) তখন (ইজা) তাহারা (হম্ম) তাহা হইতে (মিন্‌হা) পালাইতে লাগিল (ইয়ারকুদুন)।

সুতরাং যখন তাহারা অনুভব (জ্ঞান, উপলব্ধি, বোধ) করিল আমাদের (আল্লাহ) শাস্তি (সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ) তখন তাহারা তাহা হইতে পালাইতে (চম্পট, দৃষ্টির বাহিরে গমন) লাগিল।

১৩. না (লা) তোমরা পালাইবে (তারকুদু) এবং (ওয়া) তোমরা ফিরিয়া যাও (ইরজিউ) দিকে (ইলা) তাহার (মা) তোমাদের আরাম দেওয়া হইয়াছিল (উত্‌রিফতুম্) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং (ওয়া) তোমাদের ঘরবাড়িগুলিকে (মাসাকিনিকুম্) তোমাদের যাহাতে (লাআল্লাকুম্) জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে (তুসআলুন)।

তোমরা পালাইও না এবং তোমরা ফিরিয়া যাও তাহার দিকে ইহার মধ্যে তোমাদের আরাম (নিয়ামত, ভোগসম্ভার, বিলাসিতা, সম্ভোগ, তোহফা, অনুগ্রহ) দেওয়া হইয়াছিল এবং তোমাদের ঘরবাড়িগুলিকে যাহাতে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে।

১৪. তাহারা বলিয়াছিল (কালু), হায় আমাদের দুর্ভোগ (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) ছিলাম (কুন্না) জালিম (জোয়ালেমিন)।

তাহারা বলিয়াছিল, হায় আমাদের দুর্ভোগ, নিশ্চয়ই আমরা জালিম (অত্যাচারী) ছিলাম।

১৫. সুতরাং (ফাম্মা) চলিতে থাকে (জালাত্) ওই (তিল্কা) তাহাদের আর্তনাদ (দাওয়াহম্) যতক্ষণ না (হাত্তা) তাহাদেরকে আমরা পরিণত করি

(জাআল্‌নাহ্ম) কর্তিত শস্য (কাটা শস্য) (হাসিদান্) আশ্বন-নিভানো ছাই (খাম্বিন্)।

সূতরাং তাহাদের ওই আত্নাদ (কাতর বা আকুল চিৎকার) চলিতে থাকে যতক্ষণ না তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) পরিণত করি কাটা শস্য, আশ্বন-নিভানো ছাই।

১৬. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি (খালাক্‌নাস্) আকাশ (সামাআ) এবং (ওয়া) জম্বিনকে (আরদা) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মা) দুইটির মধ্যে (বাইনাহ্মা) খেলার ছলে (কৌতুক, আমোদ, ক্রীড়া, মজা, ঠাট্টা, তামাশা, পরিহাস, কৌতুহল) (লাইবিন্)।

এবং আমরা আকাশ এবং জম্বিনকে এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কিছু (আছে) (উহা) খেলার ছলে সৃষ্টি করি নাই।

১৭. যদি (লাও) আমরা (আল্লাহ) চাহিতাম (আরাদনা) যে (আন) আমরা গ্রহণ করিব (নাত্তাখিজা) খেলারূপে (লাহয়াল্) নিশ্চয়ই আমরা তাহা লইতাম (লাত্তাখাজ্‌নাহ) হইতে (মিন্) আমাদের নিকট (লাদুননা) যদি (ইন্) আমরা (কুননা) করার হইতাম (ফাইলিন্)।

যদি আমরা (আল্লাহ) চাহিতাম যে আমরা খেলারূপে আমরা গ্রহণ করিব তাহা আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে খেলা হিশাবে লইতাম। আমরা যদি (খেলা) করিবার হইতাম।

১৮. বরং (বাল্) আমরা নিক্ষেপ করি (নাক্‌জিফু) সত্য দিয়া (বিল্‌হাক্কি) উপরে (আলাল্) মিথ্যা (বাতিলি) সূতরাং চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় (ফাইয়াদ্‌মাশ্বহ) সূতরাং তখন (ফাইজা) তাহা (হয়া) নিশ্চিত হইয়া যায় (জাহিকুল্) এবং (ওয়া) তোমাদের জন্য আছে (লাকুমুল্) আক্লেপ (দুর্ভোগ) (ওয়াইলু) সেই কারণে যাহা (মিম্মা) তোমরা রচনা করিয়াছ (তাসিফুন্)।

বরং আমরা সত্য দিয়া নিক্ষেপ করি অথবা আঘাত করি মিথ্যার উপরে, সূতরাং (উহা) চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়, সূতরাং তখন তাহা নিশ্চিত হইয়া যায় এবং তোমাদের জন্য (আছে) আক্লেপ তথা দুর্ভোগ সেই কারণে (যাহা) তোমরা রচনা করিয়াছ।

১৯. এবং (ওয়া) তাঁহারই (লাহ) যাহা কিছু (মান) মধ্যে আছে (ফি) আকাশগুলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়াল) জমিনের (আর্দি) এবং (ওয়া) যাহা আছে (মান) তাঁহার কাছে (ইন্দাহ) না (লা) তাহারা অহংকার (-বশে) বিরত থাকে (ইয়াস্তাক্বিরুনা) হইতে (আন) তাঁহার এবাদত (ইবাদাতিহি) এবং (ওয়া) না (লা) তাহারা ক্লান্ত হয় (ইয়াস্তাহসিরুনা)।

এবং আকাশগুলি এবং জমিনের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাঁহারই। এবং যাহা (আছে) তাঁহার কাছে তাহারা অহংকার (-বশে) বিরত থাকে না তাঁহার (আল্লাহ) এবাদত হইতে এবং তাহারা ক্লান্ত (পরিশ্রান্ত) হয় না।

২০. তাহারা তসবিহ করে (ইউসাব্বিহনাল) রাত্রে (লাইল) এবং (ওয়া) দিনে (নাহার) না (লা) তাহারা ঢিলান্নি (শৈখিল্য) (ইয়াফতুরুন)।

দিনে এবং রাত্রে তাহারা তসবিহ করে (এবং) তাহারা ঢিলান্নি (শৈখিল্য, খেমে যাওয়া, কুঁড়েঘি) (করে) না।

২১. কি (আম্মিত) তাহারা বানাইয়া লইয়াছে (তাখাজু) ইলাহরূপে (আলিহাতাম্ম) মধ্য হইতে (মিনাল) মাটি (আর্দি) তাহারা (হম্ম) উঠাইতে পারে (ইউনশিরুন)।

তাহারা কি ইলাহরূপে (মাবুদরূপে) বানাইয়া লইয়াছে মাটির মধ্য হইতে। তাহারা উঠাইতে পারে (কি)?

২২. যদি (লাও) হইত (কানা) তাহাদের উভয়ের মধ্যে (ফিহিমা) ইলাহ (মাবুদ) (আলিহাতুন) ছাড়া (ব্যতীত) (ইল্লা) আল্লাহ (আল্লাহ) অবশ্যই উভয়েই ফ্যাসাদ (খ্বংস) করিত (লাফাসাদাতা)। সুতরাং ভাসমান (ফাসুবহানা) আল্লাহ (আল্লাহ) রব (রাব্বিল) আরশের (আরশি) তাহা হইতে যাহা (আম্মা) তাহারা বর্ণনা করে (ইয়াসিফুন)।

আল্লাহ ছাড়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে যদি (আরও অনেক) ইলাহ হইত অবশ্যই উভয়েই ফ্যাসাদ (খ্বংস) করিত। সুতরাং আরশের রব আল্লাহ ভাসমান। তাহা হইতে যাহা তাহারা বর্ণনা করে।

২৩. না (লা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে (ইউসআলু) ওই বিষয়ে যাহা (আম্মা) তিনি করেন (ইয়াফআলু) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্ম) জিজ্ঞাসিত হইবে (ইয়ুসআলুন)।

ওই বিষয়ে, তিনি যাহা করেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে না, বরং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।

২৪. কি (আমিত্) তাহারা গ্রহণ (প্রাপ্তি, ধারণ, অবলম্বন, বরণ, মানিয়া লওয়া) তাহারা গ্রহণ করিয়াছে (তাখাজু) হইতে (মিন্) তাহাকে ছাড়া (বদলান, পরিবর্তন করা, উপেক্ষা করা, বহির্ভূত, ব্যতীত) (দুনিহি) ইলাহরূপে (মাবুদরূপে) (আলিহাতান) বলুন (হে নবি) (কুল), পেশ করো (উপস্থিত, আনয়ন, প্রস্তাবন, অবতারণা, উত্থাপন করো) (হাতু) তোমাদের দলিল (প্রমাণ, স্বত্বসাব্যস্তকারী পত্র) (বুরহানাকুম) এইটা (হাজ্জা) জিকির (জিক্ৰু) যাহারা (মান্) আমাদের সাথে (মাইয়া) এবং (ওয়া) জিকির (জিক্ৰু) যাহারা (মান্) আমার আগে (কাবলি) বরং (বাল্) অধিকাংশই (আক্সারু) তাহাদের (হম্) না (লা) জানে (ইয়ালামুন) একমাত্র সত্যকে (আল্ হাক্কা) তাহার ফলে (ফাহম্) মুখ ফিরাইয়া লয় (মুরিদুন)।

তাহারা গ্রহণ করিয়াছে কি তাঁহাকে (আল্লাহকে) ছাড়া ইলাহরূপে তথা উপাস্যরূপে? বলুন (হে নবি), তোমাদের দলিল (প্রমাণ) পেশ করো এইটা জিকির যাহারা আমার সাথে (আছেন) এবং জিকির আমাদের আগে যাহারা (তাহাদেরও)। বরং তাহাদের অধিকাংশই একমাত্র সত্যকে জানে না। তাহার ফলে মুখ ফিরাইয়া লয়।

২৫. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) পাঠাইয়াছি (আরসালনা) হইতে (মিন্) আপনার আগে (কাবলিকা) রসূলকে (রাসূলিন্) একমাত্র (ইল্লা) আমরা (আল্লাহ) ওহি করিয়াছি (নুহি) তাহার দিকে (ইলাইহি) নিশ্চয়ই তিনি (আননাহ) নাই (লা) কোনো ইলাহ (ইলাহা) একমাত্র (ইল্লা) আমি (আনা) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো (ফাবুদুন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) পাঠাই নাই আপনার আগে কোনো রসূলকে আমরা একমাত্র তাহাদের কাছে ওহি করিয়াছি। নিশ্চয়ই তিনি, নাই কোনো ইলাহ একমাত্র আমি (আল্লাহ) (ছাড়া) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো।

২৬. এবং (ওয়া) তাহারা বলে (কালু) গ্রহণ করিয়াছেন (তাখাজ্জার) রহমান (রাহমানু) সন্তান (ওয়ালাদান) তিনিই ভাসমান (সুবহানাহ) বরং (বাল) বান্দা (ইবাদুন) সম্মানিত (মুক্‌রামুন)।

এবং তাহারা বলে রহমান (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই ভাসমান বরং সম্মানিত বান্দা।

নফস তথা জীবাত্মা সন্তান গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ তথা আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না বরং খান্নাসমুক্ত নফসের অধিকারী বান্দারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এই বিষয়টি না বোঝার দরুন অনেকেই ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। এমনকি জিনও যখন কিছু বলে তা মানুষের সুরতেই বলে। সুরতে মানুষ, কিন্তু কথা বলছে জিন, তাই ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। সুরতে মনসুর হাল্লাজ, কিন্তু কথা বলছেন আল্লাহ। সুরতে মানুষ বায়েজিদ বোস্তামি, কিন্তু বায়েজিদের কণ্ঠ হতেই বলা হচ্ছে, আনা সুবহানি মা আজ্জামুশ শানি তথা ‘আমিই সুবহানি এবং সব শান আমারই।’ বায়েজিদের কণ্ঠে আল্লাহ স্বয়ং এই কথাটি বলছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে এই কথাটি বায়েজিদই বলছেন। কিন্তু আসলে যাঁর কথা সে-ই বলছেন। ভুল আর বিভ্রান্তির অবকাশ তো থাকারই কথা; তাই ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীদেরকে ‘বুৎপরস্তু’ বলে গালি দেয়। অবশ্য চরম সত্যে ওহাবিদেরকেও দোষারোপ করা যায় না। কারণ তকদিরে তাদেরকে বুঝবার রহমতটি দান করা হয় নি। ওহাবিরা মনে করেন, কী! এ রকম কথা বায়েজিদ বলছেন! অথচ বায়েজিদের কণ্ঠে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা স্বয়ং বলছেন। আর ওহাবিদের দোষ দিয়েই বা কী লাভ? কারণ রুহকেও তারা ‘নুরানি মাখলুক’ আখ্যা দিয়ে ফেলেছেন। নুরানি অর্থ নুরের আর মাখলুক অর্থ হলো সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি কখনও স্রষ্টা হয় না, তদ্রূপ স্রষ্টাও কখনও সৃষ্টি হয় না। নফস মানুষেরই আছে, কিন্তু আল্লাহ নফস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আপন নফসের সঙ্গে আল্লাহ বান্দাকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য নফসের সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানকে দিয়েছেন। আবার সেই সঙ্গে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা (আল্লাহ) তোমাদের শাহারগের তথা জীবনরগের কাছেই আছি। ধ্যানসাধনার মাধ্যমে

বান্দা যখন আপন নফসকে খান্নাসমুজ্জ করতে পারেন, তখনই সেই বান্দার কণ্ঠে আল্লাহ্ কথা বলেন। সেই বান্দার চোখে আল্লাহ্ দেখেন। সেই বান্দার কানে আল্লাহ্ শোনে। সেই বান্দার হাতে আল্লাহ্ স্পর্শ করেন। যদিও বুখারি শরিফ-এর ইঁহা একটি মশহুর হাদিস ॥ কিন্তু ওই যে, ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি পাকানোর দরুন ভুল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং হাকিকতে কাকে দোষ দেব?

২৭. না (লা) তাহারা আগে বাড়িয়া তাঁহার (আল্লাহ্‌র) (ইয়াস্বিকুনাহ্) কথার দ্বারা (বিল্কাউলি) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) তাঁহার (আল্লাহ্‌র) হুকুম মতো (বিআম্মরিহি) কাজ করেন (ইয়াম্মালুন)।

এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) আগে বাড়িয়া কথা বলেন না এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) হুকুমমতো কাজ করেন।

২৮. তিনি জানেন (ইয়ালামু) যাহা (ম্মা) মধ্যে (বাইনা) তাহাদের সামনে (আইদিহিম্) এবং (ওয়া) যাহা (ম্মা) তাহাদের পিছনে (খাল্ফাহম্) এবং (ওয়া) না (লা) তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করেন (ইয়াশ্ফাউনা) একমাত্র (ইল্লা) তাহাদের জন্য (লিম্মানির্) রাজি হন (তাওওয়া) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) হইতে (মিন্) তাহারা ভয়ে (খাশ্‌ইয়াতিহি) ভীত সঙ্কল্প (মুশ্ফিকুন)।

তিনি (আল্লাহ্) জানেন যাহা তাহাদের সামনে এবং যাহা তাহাদের পিছনে (আছে) এবং তাহারা সুপারিশ করিবেন না একমাত্র তাহাদের জন্য (যাহাদের প্রতি আল্লাহ্) রাজি হন এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীতসঙ্কল্প।

২৯. এবং (ওয়া) কেহ (ম্মাই) বলে (ইয়াকুল্) তাহাদের মধ্য হইতে (মিন্‌হম্) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) একজন ইলাহ্ (ইলাহম্) ব্যতীত (মিন্) তিনি (দুনিহি) সুতরাং ওই কারণে (ফাজালিকা) আমরা তাকে শাস্তি দিব (নাজ্জিহি) জাহান্নামে (জাহান্নাম্) ওইরূপে (কাজালিকা) আমরা শাস্তি দেই (নাজ্জিজ্) জালিমদিগকে (জালেমিন)।

এবং কেউ (যদি) বলে তাহাদের মধ্য হইতে নিশ্চয়ই আমিও একজন ইলাহ্ (মাবুদ) তিনি (আল্লাহ্) ব্যতীত, ওই কারণে আমরা তাকে শাস্তি দিব জাহান্নামে ওইরূপে আমরা জালিমদেরকে শাস্তি দেই।

৩০. কি (আওয়া) না (লাম) ভাবিয়া দেখে (ইয়ারাল) যাহারা (লাজিনা) অস্বীকার করিয়াছে (কাফার) যে (আন্নাস) আকাশমণ্ডলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়াল) জমিন (আরদা) উভয়েই ছিল (কানাতা) মিলিত অবস্থায় (রাত্কান) সুতরাং উভয়কে আমরা পৃথক করিয়া দিয়াছি (ফাফাতাক্নাহমা) এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনা) হইতে (মিনাল) পানি (মায়ি) প্রত্যেক (কুল্লা) জিনিস (শাইয়িন) জীবন্ত (হাইয়িন), তবুও কি না (আফালা) তাহারা ইমান আনে (ইউমিনুন)।

যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহারা) কি ভাবিয়া দেখে না যে আকাশমণ্ডলি এবং জমিন উভয়েই ছিল মিলিত অবস্থায়, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছি এবং আমরা প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস পানি হইতে বানাইয়াছি, তবুও কি তাহারা ইমান আনে না?

এই আয়াতটি হতে আমরা দুটি বিষয় জানতে পারলাম : একটি হলো, আসমান এবং জমিন মিলিত অবস্থায় ছিলো এবং এই দুটিকে আল্লাহ আলাদা করে দিয়েছেন। আর অপরটি হলো, সৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হলো পানি হতে। পানি হতেই প্রতিটি জীবকে বানানো হয়েছে রূপান্তর এবং বিবর্তনের মাধ্যমে এবং এই রূপান্তর ও বিবর্তন কোটি কোটি বছরের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই দুইটি বিষয় এই আয়াত হতে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। আরও বুঝতে পারি যে যেখানে পানি নাই সেখানে নফসওয়ালা জীবেরও অস্তিত্ব নাই এবং ফেরেশতারা যে জীবের বহির্ভূত সেফাতি নুরের সত্তা ইহাও পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। সুতরাং জীবের আওতায় ফেরেশতাদেরকে কোনো অবস্থাতেই ধরা যায় না।

৩১. এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনা) মধ্যে (ফিল) জমিন (আরদি) পর্বতগুলি (রাওয়াসিয়া) যেন (আন) তাহা চলিয়া পড়ে তাহাদের-সহ (তাম্বিদাবিহিম) এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনা) ইহার মধ্যে (ফিহা) প্রশস্ত (চওড়া) (ফিজাজান) রাস্তাগুলি (সুবুলান) তাহারা যেন (লাআল্লাহম) গন্তব্যস্থলে যাইতে পারে (ইয়াহকাদুন)।

এবং জমিনের মধ্যে পর্বতগুলি আমরা (আল্লাহ) বানাইয়াছি যেন তাহা চলিয়া (না) পড়ে তাহাদের সহ এবং প্রশস্ত রাস্তাগুলি উহার মধ্যে বানাইয়াছি যেন তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে পারে।

৩২. এবং (ওয়া) আমরা বানাইয়াছি (জাআলনাস্) আকাশকে (সাম্মাআ) ছাদস্বরূপ (সাক্ফাম্) সুরক্ষিত (মজবুত) (মাহফুজ্জা) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্) হইতে (আন) তাঁহার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলি) (আয়াতিহা) মুখ ফিরাইয়া নেয় (মুরিদুন)।

এবং আমরা আকাশকে মজবুত ছাদস্বরূপ বানাইয়াছি এবং তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

৩৩. এবং (ওয়া) তিনিই যিনি (হয়াল্লাজি) সৃষ্টি করিয়াছেন (খালাকাল) রাত্রি (লাইলা) এবং (ওয়া) দিন (নাহার) এবং (ওয়া) সূর্য (শাম্সা) এবং (ওয়া) চন্দ্র (কাম্মার) সবই (কুললু) মধ্যে (ফি) কল্পপথে (ফালাকিন্) বিচরণ করে (ইয়াস্বাহন)।

এবং তিনিই যিনি দিন এবং রাত্রি(-কে) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র ও সূর্য (-কে)। প্রত্যেকেই কল্পপথের মধ্যে বিচরণ করিতেছে।

৩৪. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) বানাইয়াছি (জাআলনা) কোনো মনুষ্যের জন্য (লে বাশারিন্) হইতে (মিন্) আপনার আগে (কাবলিকাল্) অনন্ত জীবন (খুল্দা) যদি তবে কি (আফাইন্) আপনি মৃত্যুবরণ করেন (মিত্তা) সুতরাং তাহা হইলে (ফাহমুল্) চিরজীব (খালেদুন)।

এবং (হে নবি) আপনার আগে কোনো মনুষ্যের জন্য আমরা বানাই নাই অনন্ত জীবন যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তবে কি তাহারা চিরজীব হইবে?

৩৫. প্রত্যেক (কুললু) নফসই (নাফসিন্) স্বাদ গ্রহণ করিবে (জায়িকাতুল্) মৃত্যু (মউত্) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে পরীক্ষা করি (নাবলুকুম্) মন্দ দিয়া (বিশ্শাররি) এবং (ওয়া) ভালো (খাইরি) পরীক্ষা (ফিত্নাতান্) এবং (ওয়া) আমাদের দিকেই (ইলাইনা) তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে (তুরজাউন্)।

প্রত্যেক নফসই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং তোমাদেরকে আমরা পরীক্ষা করি ভালো এবং মন্দ দিয়া এবং আমাদের দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

৩৬. এবং (ওয়া) যখন (ইজা) আপনাকে দেখে (রাআকা) যাহারা (আল্লাজিনা) অস্বীকার করিয়াছে (কাফারু) না (ইন) আপনাকে তাহারা গ্রহণ করিবে (ইয়াত্‌তাখেজুনাকা) একমাত্র (ইল্লা) ঠাট্টার পাত্ররূপে (হজুআ) এই কি (আহাজাল) যে (আল্লাজি) সমালোচনা করে (ইয়াজ্‌কুরু) তোমাদের ইলাহগুলিকে (আলিহাতাকুম) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) জিকিরের সহিত (বিজিকরি) রহমানের (রাহমানি) তাহারাই (হম) কাফের (কাফরুন)।

এবং যখন আপনাকে দেখে (এবং) যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (এবং) আপনাকে তাহারা গ্রহণ করিবে না একমাত্র ঠাট্টার পাত্ররূপে (এবং বলে) এই কি (সেই ব্যক্তি) যে সমালোচনা করে তোমাদের ইলাহগুলিকে এবং তাহারাই রহমানের জিকিরের অস্বীকারকারী।

৩৭. সৃষ্টি করা হইয়াছে (খুলিকাল) মানুষকে (ইনসান) হইতে (মিন) তাড়াহড়া (আজালিন) তোমাদেরকে অচিরেই আমি দেখাইব (সাউরিকুম) আমার আয়াতগুলি (আয়াতি) সুতরাং না (ফালা) আমার কাছে তোমরা তাড়াহড়া করিও (তাস্তাজিলুন)।

মানুষকে তৈরি করা হইয়াছে (আপন খেয়ালখুশির) তাড়াহড়া দিয়া আমার আয়াতগুলি অচিরেই তোমাদেরকে আমি দেখাইব। সুতরাং আমার কাছে তোমরা (খেয়ালখুশির বশবর্তী হইয়া) তাড়াহড়া করিও না।

যেহেতু মানুষকে আল্লাহই চঞ্চলমতির করে তৈরি করেছেন সেহেতু প্রতিটি কাজে-কর্মে মানুষের মধ্যে তাড়াহড়া করার প্রতিচ্ছবিটি ফুটে ওঠে। তাড়াহড়া করার পেটাই জন্ম নেয় অস্থিরতা, চঞ্চলতা। মানুষের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আল্লাহই দুনিয়াতে পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন। তাই তাড়াহড়া করার চঞ্চলতাটি থাকা একান্ত স্বাভাবিক। স্থিরতা তখনই আসে যখন মানুষ ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা আপন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে অথবা যার যার নফসের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটিকে মুসলমান বানাতে পারে। তখনই

আপন নফস তথা আপন প্রাণ শান্ত হয়ে যায়। তাই খান্নাসমূহ নফসটিকে তথা প্রাণটিকে বলা হয় নফসে মোৎমায়েন্না এবং তখনই সেই মোৎমায়েন্না নফস জান্নাতের সুসংবাদ পাবার ঘোষণার মর্মার্থটি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পারে।

৩৮. এবং (ওয়া) তাহারা বলে (ইয়াকুলুনা) কখন (মাতা) এই (হাজাল) ওয়াদা (ওয়াদু) যদি (ইন) তোমরা (হও) (কুনতুম) সত্যবাদী (সোয়াদেকিন)।

এবং তাহারা বলে এই ওয়াদা কখন (পূর্ণ হইবে) যদি তোমরা (হও) সত্যবাদী।

৩৯. যদি (লাও) জানিত (ইয়ালান্নুন) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) সেই সময় (হিনা) না (লা) তাহারা প্রতিরোধ (নিবারণ, বাধাদান, নিরোধ, অবরোধ, প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত) করিতে পারিবে (ইয়াকুফুনা) হইতে (আন) তাহাদের মুখমণ্ডলগুলি (আনন, বদন) (উজুহিহিম) আগুন (অগ্নি, অনল, বহ্নি, পাবক, হতাশন, বৈশ্বানর) (নার) এবং (ওয়া) না (লা) হইতে (আন) তাহাদের পৃষ্ঠ (পিঠ, বকের বিপরীত দিক, পিছন দিক)-সমূহ (জুহরিহিম) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) সাহায্য (সহায়তা, আনুকূল্য) করা হইবে (ইউন্সারুন)।

যাহারা কুফরি করিয়াছে (হায়) যদি জানিত সেই সময় (যখন) তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না তাহাদের মুখমণ্ডলগুলি হইতে আগুন। এবং না তাহাদের পৃষ্ঠসমূহ হইতে এবং তাহাদের সাহায্য করা হইবে না।

৪০. বরং (বাল) তাহাদের কাছে আসিবে (তাতিহিম) অতর্কিতভাবে (অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ, অচিন্তিতভাবে, অবিবেচিতভাবে, অলক্ষিতে) (বাগতাতান) সুতরাং তাহাদেরকে হতভম্ব (কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবুদ্ধি, কর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম) করিয়া দিবে (ফাতাবহাতুহম) সুতরাং না (ফালা) তাহারা সক্ষম (সমর্থ, শক্তিয়ুক্ত, পারগ, উপযুক্ত, কর্মক্ষম) হইবে (ইয়াস্তাতিউনা) তাহারা রোধ (বাধা, অবরোধ) করিতে (রাদ্দাহা) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) অবকাশ (বিরাম, ফুরসত, অবসর, ছুটি) দেওয়া হইবে (ইউন্জারুন)।

বরং অতর্কিতভাবে তাহাদের কাছে আসিবে সুতরাং তাহাদেরকে হতভম্ব করিয়া দিবে তখন না তাহা রোধ করিতে (না) তাহারা সক্ষম হইবে এবং না তাহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

৪১. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ) ঠাট্টা (বিদ্বপ, শ্লেষমিশ্রিত উপহাস) করা হইয়াছে (ইসতুহজিয়া) রসুলদের সহিত (বিরুসুলিম) হইতে (মান) তোমার আগে (কাবলিকা) সুতরাং ঘিরিয়া (বেষ্ঠন করিয়া, আচ্ছাদিত করিয়া, আবৃত করিয়া) (ফাহাকা) তাহাদেরকে (বিল্লাজিনা) ঠাট্টা করিয়াছিল (যাহারা) (সাখিরু) তাহাদের মধ্য হইতে (মিনহম) যাহা (মা) তাহারা ছিল (কানু) যাহা লইয়া (বিহি) বিদ্বপ করিত (ঠাট্টা করিত) (ইয়াস্তাহজিউন)।

এবং নিশ্চয়ই আপনার আগের রসুলদেরকে ঠাট্টাবিদ্বপ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদেরকে ঘিরিয়া লইয়াছিল (যাহারা) ঠাট্টাবিদ্বপ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে ওই জিনিস (বিষয়) যাহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্বপ করিত।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের শুরু হতে কেবল নবি এবং রসুলেরাই ঠাট্টাবিদ্বপের পাত্র হন নি, বরং সাধারণ মানুষের মধ্য হতে যারা একটু অসাধারণ তারাও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে উপহাসের পাত্রে যে পরিণত হয়েছেন তারও অনেক অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় এবং এখনও এই দুঃখজনক ঘটনাগুলো ঘটতে দেখি। নবি-রসুলেরা কতটুকু নুরের তৈরি তা আল্লাহই ভালো জানেন, কিন্তু মহানবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (আ.) আল্লাহর জ্ঞাতনুর হতে বিচ্ছিন্ন করা একটি টুকরো, যাকে আমরা ভাষায় বুঝবার জন্য আল্লাহর নুরের সৃষ্টি বলে থাকি। হাকিকতে মহানবির জন্য ‘সৃষ্টি’ শব্দটি অবৈধ। কিন্তু একই আল্লাহর একই নুরকে খণ্ডিত করলেই উহা আর সৃষ্টির আওতায় পড়ে না। তাই হজরত হাজি এমদাদুল্লাহ মোহাম্মদের মক্কা বলে গেছেন যে, মহানবি এবং আল্লাহ একই নুর এবং যারা উহাকে অস্বীকার করবে তারা কাফের। তা ছাড়া কোরান-হাদিস হতেও মহানবি যে আল্লাহর জ্ঞাত নুর হতে ছিন্ন করা অপর একটি নুর উহার দলিল আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের অনুসারীরা উনিশবার তুলে ধরেছেন। যদিও ওহাবিরা শত দলিল দিলেও মানবে না এবং মানেও নাই। উহাতেও ওহাবিদের অনেক গালি দেওয়া

যায়, কিন্তু হাকিকতে একটিও গালি দেওয়া যায় না। আল্লাহ ওহাবিদের মেনে নেবার তকদির দিয়ে বানান নাই। তকদিরে যদি না থাকে তা হলে হাজার রকম দলিল দিলেও মেনে নেবার প্রশ্নই ওঠে না। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, যদিও আট পুরুষ আগের মানুষটির নাম ছিল শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহান। শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহানের বাপ-দাদারা গীতা-উপনিষদ-বেদ-রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে গেছেন। কিন্তু শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌহানের ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যখন মিয়াজান নাম ধারণ করলেন তখন থেকেই আমরা মুসলমান এবং অধম লিখকও মুসলমান। সুতরাং কোরান-হাদিস নিয়েই গবেষণা করছি এবং কোরান-হাদিস-এর গবেষণালব্ধ বিষয়গুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। কিন্তু আজ যদি আমি হিন্দুই থাকতাম তা হলে এই কোরান-হাদিস-এর গবেষণাটি করতাম কিনা জানি না। হয়ত তখন বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-চণ্ডী ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করতাম। তা হলে বুকে হাত রেখে পাঠকদেরকে একটি প্রশ্নই করতে চাই যে জন্মই আমার আজন্ম আশীর্বাদ, না হয় অভিশাপ, না হয় তকদির। এই তকদিরকে কয়জনে খণ্ডন করতে পেরেছে? এই তকদিরের বলয় হতে বেরিয়ে আসা চারটিখানি কথা নয়, বরং একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং আবার বলছি, শেষবারের মতো বলছি, প্রতিটি মানুষের জন্মই তার আজন্ম আশীর্বাদ, নয়তো অভিশাপ, নয়তো কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ থাকা তকদির।

৪২. বলুন (হে নবি) (কুল) কে (মান) তোমাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিদ্রাণ, অব্যাহতি, নিষ্কার, তত্ত্বাবধান) করিতে পারে (ইয়াক্লাউকুম) রাতে (বিল্লাইলি) এবং (ওয়া) দিনে (নাহারি) হইতে (মিন) রহমান (রাহমান) বরং (বাল) তাহারাই (হম) হইতে (আন) জিকির (জিকরি) তাহাদের রব (রাব্বিহিম) মুখ ফিরাইয়া লয় (মুরিদুন)।

বলুন (হে নবি) কে তোমাদেরকে রক্ষা করিতে পারে রাতে এবং দিনে রহমান (আল্লাহ) হইতে, বরং তাহারাই তাহাদের রবের জিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

জিকির শব্দটির অর্থ হলো যোগাযোগ অথবা সংযোগ। অতি সূক্ষ্ম এবং অতি উচ্চমার্গের ভাষাটি হলো, ‘স্মরণ’। জাহেরি জিকির করতে হলে পীরে

কাম্মেলের চেহারা-সুরত ধ্যানের মাধ্যমে সামনে রেখে করতে হয়। এই জিকিরটি একদম নির্জনে অথবা কোনো পর্বতগুহায় কাম্মেল পীরের ধ্যানসহ একাগ্রমনে ধৈর্যধারণ করে কয়টি বছর করতে পারলেই আল্লাহর রহস্যলোকের কিছু না কিছু দর্শন করা যাবেই। সবাই মিলে জিকির করাও সুন্দর এবং ভালো। কিন্তু আল্লাহর গোপন রহস্যগুলো হাঁহাতে ধরা পড়বে না। আল্লাহর সঙ্গে গুপ্তমিলনের আশা থাকলে কোনো নির্জন স্থানে ছোট্ট একটি ঘর বানিয়ে একাকী জিকিরে মগ্ন থাকলে অবশ্যই রহস্যলোকের দর্শন পাওয়া যায়। এই জিকিরের মাধ্যমে এবং অতি অল্প সময়ে কেমন করে আল্লাহকে পাওয়া যায় তারই বিস্তারিত ফর্মুলাটি যিনি অতি সুন্দর করে বলে গেছেন পৃথিবী বিখ্যাত গুলিয়ে কাম্মেল হজরত বাবা শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর। সুতরাং যেখানে সেখানে আউরাতাউরা (উলটাপালটা) খেয়ালখুশিমতো এই জিকির করলে অবশ্যই কাঁচকলা পাওয়া যাবে। তাই আমরা পঁচিশ বিঘা জমির উপরে একটি নির্জন স্থানে ৫৫ বান চেউটিন দিয়ে ঘেরাও দিয়ে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদা করার জন্য বেশ কয়েকটি ঘর তৈরি করেছি। অনেকে এই ধ্যানসাধনার স্থানটিকে ধ্যানসাধনার স্কুলও বলে থাকেন। আসুন, মাত্র ১২০ দিন এই স্কুলে হজরত শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর পানিপথির দেওয়া মোরাকাবাটিকে অনুসরণ করে জিকিরে মগ্ন থাকুন, অবশ্যই কিছু না কিছু রহস্যলোকের দর্শন পাবেন। অন্যথায় অধম লিখককে যা-ইচ্ছা-তাই বললেও মাথা নিচু করে থাকবো।

৪৩. কি (আম) তাহাদের আছে (লাহম) অনেকগুলি ইলাহ (ইলাহসমূহ, ইলাহগুলি, রূপক ভাষায় : দেবদেবী) (আলিহাতুন) তাহাদেরকে রক্ষা (উদ্ধার, পরিদ্রাণ, অব্যাহতি, নিষ্কার, তত্ত্বাবধান) করিতে পারে (তামনাউহম) হইতে (মিন) আমাদের ছাড়া (দুনিনা) না (লা) তাহারা সক্ষম (সমর্থ, শক্তিয়ুক্ত) (ইয়াস্তাতিউন) সাহায্য (সহায়তা, আনুকূল্য) করিতে (নাসরা) তাহাদের নফসের (নিজেদের) (আনফুসিহিম) এবং (ওয়া) না (লা) তাহাদের (হম) আমাদের পক্ষ (তরফ, দিক) হইতে (মিননা) সহযোগিতা (সহায়তা, সাহায্য) দেওয়া হইবে (ইউস্তাবুন)।

তাহাদের রক্ষা করিতে পারে (এই রকম) ইলাহুলি তাহাদের আছে কি? (একমাত্র) আমাদের ছাড়া? না তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে তাহারা সক্ষম এবং আমাদের (আল্লাহ) পক্ষ হইতে সহযোগিতা তাহাদের দেওয়া হইবে না।

নিছক মাটি পাথর অথবা অন্য যে কোনো ধাতুর তৈরি মূর্তিগুলি যে কোনো কিছুই করতে পারে না সেই কথাটি এখানে বলা হয়েছে। আমার মনে হয় বিভিন্ন ধাতুতে তৈরি এই মূর্তিগুলিকে কাফেরেরা দেবদেবীর মর্যাদার আসনে বসিয়ে উপাস্যরূপে গ্রহণ করতো সেই বিষয়টিতেই আল্লাহ নবির মাধ্যমে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষই মানুষের উপকারও করতে পারে আবার ক্ষতিও করতে পারে ইহা একটি অপ্রিয় সত্য কথা, কিন্তু নিজেদের নফসের খেয়ালখুশিমতো বানানো মূর্তিগুলো না পারে উপকার করতে আর না পারে কোনো অপকার করতে। এইসব বানানো মূর্তিগুলোকে যদি চেন্সিস খাঁ, হালাকু খাঁ, তৈমুর লঙ্, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিটলার, মুসোলিনি-র মতো জঘন্য এবং চিরঘণ্য মানুষরূপী অসুরগুলির নামও দেওয়া হয় তবু এরা মানুষরূপী অসুর নয়। এরা কেবলমাত্র নিজেদের নফসের খেয়ালখুশিমতো বানানো অথর্ব মূর্তিমাত্র।

৪৪. বরং (বাল) আমরা ধনদৌলত (ভোগসামগ্রী) দিয়াছি (মাত্তানা) তাহাদেরকে (হাউলাই) এবং (ওয়া) পূর্বপুরুষ (পিতৃপুরুষ)-দেরকে (আবাতা) তাহাদের (হম) এমনকি (হাত্তা) লম্বা (দীর্ঘ) হইয়াছিল (তাআলা) তাহাদের জন্য (আলাইহিম) আয়ুষ্কাল (বয়স) (উমুরু) সুতরাং না কি (আফালা) তাহারা দেখে (ইয়ারাউনা) যে আমরা (আননা) আনিয়াছি (নাতিল) জমিনকে (আরদা) তাহা আমরা সংকুচিত (গুটাইয়া গিয়াছে এমন, সঙ্কীর্ণ, অপ্রসারিত) করিয়াছি (নানকুসুহা) হইতে (মিন) চতুর্দিক (আত্ৰা) ইহার মধ্যে (ফিহা) সুতরাং তাহারা কি (আফাহম) বিজয়ী হইবে (গালিবুন)।

বরং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) ভোগসামগ্রী দিয়াছি এবং এমনকি তাহাদের পূর্বপুরুষদেরকে(ও), তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহারা কি দেখে না যে আমরা (আল্লাহ) জমিনকে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি তাহাদের চতুর্দিক হইতে? তারপরেও কি তাহারা বিজয়ী হইবে?

করাতে চাইলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লেখাটা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার ছিল। এবং তাতে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া হতো। তাই এর প্রকৃত ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলাম না। কত রকমের যে গোঁজামিলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে আর সেই ব্যাখ্যাটিকে আবার পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাইলাম না। অনেকে লিখেছেন, কাফেরদের জন্য জমিনকে সংকুচিত করা হয়েছে ॥ কিন্তু এই জমিন কি মাটির জমিন? যদি ধরে নিই ইহা মাটির জমিন, তা হলে কমবেশি সবার জন্যই এই জমিনকে সংকুচিত করা হয়েছে। যদি বলি বৈষয়িক বিষয়ের প্রশ্নে মুসলমানদের জমিন দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে, তা হলেও সঠিক অর্থটি মিলাতে পারছি না। যদি বলি কাফেরদের দেহগুলিকে মনের প্রসারতার প্রশ্নে সংকুচিত করা হচ্ছে, তা হলে এই আয়াতের অর্থটির মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই রকম অর্থটি না করে সোজাসুজি পাঠকদেরকে বলে দিলাম যে, এই আয়াতের অর্থটি অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। যে যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সে সেই-ধর্মের গীত গায় তথা প্রশংসা করে। তা হলে এই জন্মগ্রহণ করাটাই কি একটি বিরাট আশীর্বাদ, না কি বিরাট একটি অভিশাপ, নাকি একটি বিরাট তকদির? পাঠকদের কাছে এই প্রশ্নটির উত্তর চাইলাম। তা হলে কোন ধর্মটি শুদ্ধ আর কোন ধর্মটি অশুদ্ধ এই বিষয়ের প্রশ্নে আজীবন তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকবে। দুধ বিক্রি করে যারা তাদেরকে গোয়ালী বলা হয় এবং সব গোয়ালীই বলে যে তার দুধই ভালো। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিসের গবেষণা করছি। কিন্তু অন্য যে কোনো ধর্মে যদি জন্মগ্রহণ করতাম তা হলে অধম লিখকের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? তা হলে জন্মটাই কি একটি আজন্ম বিরাট আশীর্বাদ, নাকি একটি বিরাট জগদ্বল পাথরের মতো ঠায় বসে থাকা তকদির?

৪৫. (আপনি) বলুন (কুল), নিঃসন্দেহে (মূলত) (ইন্নালা) আমি তোমাদের সাবধান (সতর্ক) করিতেছি (উন্জিরুকুম) ওহির দ্বারা (মাধ্যমে, সহিত) (বিলওয়াহি) এবং (কিন্তু) (ওয়া) না (লা) শোনে (ইয়াস্মাউ) বধির (কানে শোনে না) (সুম্মু) কোনো আত্মান (ডাক) (দুয়াআ) যখন (ইজা) না (মা) তাহাদেরকে সতর্ক (সাবধান) করা হয় (ইউন্জারুন)।

হে নবি, (আপনি) বলুন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করিয়াছি ওহির মাধ্যমে এবং (কোনো) বধির শোনে না কোনো ডাক (আহ্বান) যখন তাহাদেরকে সতর্ক করা হয়।

মানুষকে সতর্ক করা হয় অনেক রকম মাধ্যমে। অবশ্য এই আধুনিক যুগে অনেক রকম মাধ্যম আবিষ্কার করা হয়েছে। মুখের কথার দ্বারাও মানুষকে সাবধান করা যায় এবং রেডিও-টেলিভিশনের মতো বিভিন্ন মাধ্যমেও সতর্ক করা যায়। কিন্তু এখানে মানুষকে যে সতর্ক করা হচ্ছে উহা ওহির মাধ্যমে। নবি-রসূলরাই ওহির মাধ্যমে সাবধান করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহর মনোনীত রসূলকে দিয়ে আল্লাহর তরফ হতে মানুষদেরকে এখানে সাবধান করা হচ্ছে। সুতরাং এই সাবধানতার গুরুত্বটি অপরিণীম। কিন্তু যে কানে শুনতে পায় না তথা বধির, তাকে ওহির মাধ্যমে সাবধান করে দিলেও সেই সাবধানবাণীটির উপর কোনো খেয়াল থাকে না। এই বধিরতা শব্দটি দিয়ে কানে একদম শুনতে পায় না যারা তাদের কথাটি বলা হয় নি, বরং যারা কানে পরিষ্কার শুনতে পায়, কিন্তু কোনো গুরুত্বই দেয় না ॥ এই জাতীয় মানুষদেরকেও কোরান বধির বলে আখ্যায়িত করেছে।

৪৬. এবং (ওয়া) যখন (যদি, অবশ্য) (লাইম্) তাহাদেরকে স্পর্শ করে (মাস্‌সাত্‌হম্) কিছুমাত্র (নাফ্‌হাতু) হইতে (মিন্) আজাব (আজাবি) তোমাদের রবের (রাব্বিকা) তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে (লাইয়াকুলুনা) হায় আম্মাদের দুর্ভোগ (আক্কেপ) (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্ননা) ছিলাম আমরা (কুননা) জ্বলম্ন (জালিমিন্)।

এবং নিশ্চয়ই যদি (তোমাদের রবের) সামান্য কিছু আজাব তাহাদেরকে স্পর্শ করে তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, হায় আম্মাদের দুর্ভোগ! নিশ্চয়ই আমরা জ্বলিম্ন ছিলাম।

এখানে যারা আল্লাহর ওহির মাধ্যমে যে সতর্কবাণীগুলো জানিয়ে দেওয়া হয় উহা কানে শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করে তথা মেকি বধির তাদেরকেই যখন আল্লাহর সামান্য শাস্তি স্পর্শ করে তখনই হুঁশ আসে। হুঁশ থাকা সত্ত্বেও যারা বেহুঁশের ভান করে তারাই যখন আল্লাহর আজাবের সামান্য স্পর্শ অনুভব করে তখনই এই জাতীয় বধিরেরা অকপটে বলে ফেলে যে, ‘হায়

আফসোস! আমরা আসলেই জালিম ছিলাম।’ ওহির মাধ্যমে শুনেও এই বধিরেরা কুহ-পরোয়া-নাহি ভাবখানা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু যেইমাত্র আল্লাহর অতি সামান্য আজাব এই মেকি বধিরদেরকে স্পর্শ করেছে তখনই চিল্লাচিল্লি, কান্নাকাটি এবং হায় আফসোসের বিলাপ করার কথাটি এই আয়াতে জানতে পারলাম। এবং আরও জানতে পারলাম যে, এই মেকি বধিরেরা আজাবের স্পর্শে বিবেকের চৈতন্য জালিম হবার স্বীকৃতিটি দেয়। যেমন এরা মেকি বধির সাজে তেমনি আবার আজাবের স্পর্শ লাগলেই অকপট স্বীকৃতিটি এই আয়াতে দেখতে পাই। তাই এই মেকি বধিরেরা বলে ফেলে যে, ‘নিশ্চয়ই আমরা জালিম ছিলাম।’

৪৭. এবং (ওয়া) বিশেষরূপে স্থাপন (সংস্থাপন, প্রতিষ্ঠা) আমরা (আল্লাহ) (নাদাউল) মানদগুগুলি (দাঁড়িপাল্লাসমূহ) (মাওয়াজিনাল) ন্যায়ের (সুবিচারের, সততার) (কিস্তা) দিনের জন্য (লিইয়াওমিল) কেয়ামতের (কিয়ামতি) সুতরাং না (ফালা) জুলুম করা হইবে (তুজলামুন) নফসকে (নাফসুন) কিছুমাত্রও (শাইয়ান) এবং (ওয়া) যদি (আন) হয় (কানা) পরিমাণও (মিস্কালা) একদানা (হাব্বাতিন) হইতে (মিন) শস্যের (খারদালিন) আমরা আনিব (আতাইনা) তাহাকে (বিহা) এবং (ওয়া) যথেষ্ট (কাফা) আমরাই (বিনা) হিসাব-গ্রহণকারীরূপে (হাসিবিন)।

এবং আমরা ন্যায়ের মানদগুসমূহ বিশেষরূপে স্থাপন করিব কেয়ামতের দিনের জন্য সুতরাং কিছুমাত্র (কোনো) নফসকে জুলুম করা হইবে না। এবং যদি (কৃতকর্মের) হয় শস্য হইতে একদানা পরিমাণও, তাকেও (সামনে) আমরা আনিব। এবং হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।

নিঃসন্দেহে এই ‘কেয়ামতের দিনের জন্য’ কথাটির দ্বারা একটি নফসের মৃত্যুঘটনাটিকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে চাই। কারণ আমরা জানি, কেয়ামত দুই প্রকার : একটি বড় কেয়ামত, অপরটি ছোট কেয়ামত। যেদিন আল্লাহপাক সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে দেবেন, সেই দিবসটিকেই বড় কেয়ামত বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার কোটি বছরের কম নয়। তারপরেও কথা থাকে যে বড় কেয়ামতের দিন আল্লাহ যখন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে ফেলবেন তখন

আর কোনো সৃষ্টিই থাকবে না। আর ছোট কেয়ামত হলো, একটি নফসের মৃত্যু-ঘটনা। সুতরাং কেয়ামত দিবসে যখন প্রতিটি নফসকে হিসাব গ্রহণের জন্য ওঠানো হবে তখন এই কথাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো একরূপ ধারণ করে এই ধরাধামে আবার আসতে হবে। আমরা আল্লাহর একমাত্র দ্বীন তথা ধর্মটিকে যুগে যুগে অনেক ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছি। যদি খোদা না খাস্তা কেহ হিন্দুধর্মে জন্মগ্রহণ করেই ফেলে তা পুনর্জন্মবাদটিকে সে মেনে নেবে। এমনকি জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্মেও জন্মগ্রহণ করলে পুনর্জন্মবাদটিকে মেনে নেয়। যেহেতু আমরা মোহাম্মদি ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি সেই হেতু পুনর্জন্মবাদটিকে পাশ কেটে কেয়ামত-দিবস তথা একটি নফসের মৃত্যুদিবসটিকে মেনে নেই। অতীব সূক্ষ্মবিষয় গুলো ধরা পড়ার কথা নয়, কিন্তু যারা সূক্ষ্ম জ্ঞানের সন্ধানে নিজেদের জীবনটিকে নিরপেক্ষ গবেষণায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাদের কাছে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর রহস্য পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। পোড়া কপাইলা আরজ আলী মাতুব্বের কোরান-এ বর্ণিত সম্পত্তি-বণ্টনের হিসাবটিকে তথা আউলটিকে ভুল বলে প্রমাণ করতে অপচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বের কি জানা ছিল না যে সেই সম্পদ-বণ্টনের হিসাবটি তথা আউলটি মাওলা আলি আলাইহেস সালাতুস সালাম (সম্ভবত) আটশ সংখ্যাটি দ্বারা ভাগ করে সম্মাধানটি করে গেছেন? পোড়া কপাইলা আরজ আলী মাতুব্বের সারসংক্ষেপ বক্তব্যটি এই ছিল যে, সামান্য অঙ্কশাস্ত্রটির সামনে সূক্ষ্ম হিসাবটি নেবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আরজ আলী মাতুব্বের কি জানতেন না যে কী করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল? এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যিনি এই সৃষ্টি রহস্যের বিগ ব্যাং থিওরিটি দিয়ে গেছেন তিনিই অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই বিগ ব্যাং থিওরিটি দেড় হাজার বছর আগে কোরানুল করিম ঘোষণা করে গেছে। এ রকম অনেক বিজ্ঞানের বিষয়ে পরিষ্কার সম্মাধানগুলো যে কোরান দেড় হাজার বছর আগে দিয়ে গেছে তা দিনের পর দিন সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে চলছে। অথচ আরজ আলী মাতুব্বের, হাতে-গোনা কয়েকজন কাঠমোলা তাঁরই মায়ের জানাজা পড়তে অস্বীকার করার দরুন, তিনি সমগ্র মুসলিম জাতিকে নেতিবাচক মনোবৃত্তির দ্বারা কলুষিত করতে কার্পণ্য করেন নি। দৃষ্টিভঙ্গি যখন কারো

পুরোটাই নেতিবাচক হয়ে যায় তখন তার কাছে হতাশা ছাড়া আর কীইবা আশা করা যায়? কথায় বলে, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। আরজ আলী মাতুব্বর মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে বিচার করে বিরাট ভুলটি করে গেছেন এবং এই ভুলের খেসারতটি আজও অনেককে বিভ্রান্ত করছে।

আল্লাহ এই আয়াতে আমাদেরকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, যদি তোমাদের একটি কর্মের তিলপরিমাণ ওজনও হয়, উহা তুলে ধরা হবে। সেই কর্মটি ভালো হোক আর মন্দই হোক অথবা মন্দের চেয়ে একদম জঘন্য মন্দও যদি হয়। এখানে জঘন্য কর্মের ফলটি বলতে বান্ধার হককে অস্বীকার করা অথবা বান্ধার হক আত্মসাৎ করা অথবা বান্ধার হক বেমানান হজম করে ফেলা তথা মেরে দেওয়াটাকে আল্লাহ পাক জঘন্য কর্মফলের চেয়েও জঘন্য বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ এবাদত-বন্দেগির প্রশ্নে যত না জাহান্নামে যাবে, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষ বান্ধার হক মেরে দেবার প্রশ্নে জাহান্নামে যাবে, কারণ আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বান্ধার হক মেরে দিলে ক্ষমা করার বিধানটি রাখা হয় নি, যতক্ষণ না যে-বান্ধার হক মেরে দেওয়া হয়েছে সেই বান্ধা ক্ষমা করে দেন। মানুষ বুঝতেই পারে না যে, বান্ধার হক মেরে দিলে কী ভয়ংকর শাস্তিটি অপেক্ষা করছে।

আমরা অভিজ্ঞতার সাথে দেখে আসছি যে মানুষ যে-ধর্মের এমনকি একটি ধর্মের তেহাত্তর ফেরকার যে-ফেরকায় জন্মগ্রহণ করে সেই-ফেরকাটিকে শ্রেষ্ঠ ফেরকা বলে জাহির করে। ধর্ম তো অনেক বড় কথা, কিন্তু ধর্মের অনেক ফেরকাগুলো যখন সমাজের বুকে কিলবিল করছে এবং সেই কিলবিল-করা যে কোনো একটি ফেরকার অনুসারী মানুষটি সেই ফেরকাটিকে শ্রেষ্ঠ ফেরকা বলে জাহির করে। পৃথিবীতে মাত্র হাতে-গোনা কিছু লোক যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সেই-ধর্মটিকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে। কথায় বলে, মানুষ ঘরবাড়ি, ভিটামাটি এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত হাসি-মুখে ফেলে দিতে পারে, কিন্তু যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে সেই-ধর্মটিকে কিছুতেই ফেলতে পারে না। যে কেউ যে কোনো ধর্মের অনুসারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করাটি কি একটি আশীর্বাদ নাকি একটি অভিশাপ, নাকি একটি তকদির? এই প্রশ্নের উত্তরে নিরপেক্ষ মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে মন্তব্য করাটিও যে কত বড় ভয়ংকর বিষয় তা আর বলার

প্রয়োজন হয় না। ধর্মের বন্ধনটি যে কত ভয়ংকর শক্ত তা সবাই কমবেশি বুঝতে পারে। আজ অধম লিখক মোহাম্মদি ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি এবং তেহাজুর ফেরকার একটি ফেরকাতে অবস্থান করার কথাটি ঘোষণা করছি আর সেই ফেরকার নামটি হলো আহলে সুন্নাতুল জাম্মাত। আবার এই আহলে সুন্নাতুল জাম্মাতের কয়েকটি উপশাখাও আছে। অধম লিখক নিজেকে যতই ‘নিরপেক্ষ’, ‘নিরপেক্ষ’ বলে চিৎকার করছি, কিন্তু আসলেই কি আমি নিরপেক্ষ, নাকি কাঁধের ওপর সাইনবোর্ডটি ঝুলছে? অধম লিখক যদি অন্য যে কোনো ধর্মে জন্মগ্রহণ করতাম, তা হলে কি সেই ধর্মের যাবতীয় গ্রন্থসমূহের গবেষণা ও জাহির করতাম না? সুতরাং জন্মের আগেই এই দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ আজন্ম বোঝাটি বইছে ॥ এ জন্য দায়ী কে? আমি, না যিনি আমাকে তৈরি করেছেন? কেন এই ধর্মের দেয়ালগুলো ভেঙে সার্বজনীন সনাতন একটিমাত্র ধর্মের ছায়াতলে আমরা সমবেত হতে পারছি না? আমার কথাগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হবে হালকা, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই কথাগুলো যে কত ভয়ংকর গভীর তা বুঝেও বুঝতে চাই না। পরিশেষে একটি অতীব গুঢ় রহস্যময় সত্যকথাটি বলতে চাই আর সেই সত্যকথাটি হলো : স্রষ্টা যাকে যেখানে বসিয়ে রেখেছেন, স্রষ্টার অনুমতি ছাড়া সেই স্থান হতে এক চুলও বেরিয়ে আসার ক্ষমতা কারও নাই। ইহাই বিধির বিধান। ইহাই নিয়তির রহস্যময় লীলাখেলা।

৪৮. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (অবশ্যই) (লাকাদ্) আমরা দিয়াছি (আতাইনা) মুসাকে (মুসা) এবং (ওয়া) হারুনকে (হারুন) ফুরকান (সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার কিতাব, মীমাংসাকারী কিতাব) (ফুরকান্) এবং (ওয়া) জ্যোতি (আলো, দীপ্তি, দ্যুতি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য, ময়ূখ) (দিয়াও) এবং (ওয়া) জিকির (যোগাযোগ, সংযোগ) (জিক্রাল্) মুঠাকিদের জন্য (যাহারা তাকওয়ায় ভুবে আছে তাহাদের জন্য) (লিল্মুঠাকিন্)।

এবং নিশ্চয়ই হারুন এবং মুসাকে আমরা (আল্লাহ) ফুরকান দিয়াছি এবং জ্যোতি (দিয়াছি) এবং মুঠাকিদের জন্য দিয়াছি জিকির।

র যাহা সত্য এবং মিথ্যাকে পরিষ্কার ভাগ করে দেয় উহাকেই ‘ফুরকান’ বলা হয়। যদিও কোরান এবং কিতাব অর্থেও অনেকেই ব্যবহার করেন এবং

এতে দোষের কিছু নেই। তবে একটি কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ পাক তো ‘ফুরকান’-এর স্থলে কোরান অথবা কিতাব শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে ‘ফুরকান’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যিনি বা যারা তাকওয়ায় রত আছেন তথা ধ্যানসাধনায় আল্লাহকে পাবার আশায় ভুবে আছেন তাদেরকে জিকিরের মাধ্যমে তথা সংযোগ-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সত্য এবং মিথ্যাকে পার্থক্য করার জ্যোতি লাভ করার সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর নুর তথা জ্যোতিতে একটি নফস যখন অবগাহন করতে পারে তখনই সেই নফসটি ফুরকান জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যায়। আল্লাহর এই উপদেশটি মোটেই সাধারণের জন্য নয়, বরং যারা ধ্যানসাধনায় মুঠাকি হয়ে জিকিরে তথা সংযোগ-প্রচেষ্টায় রত থাকেন। সেই কথাটি হজরত মুসা (আ.) এবং হজরত হারুন (আ.)-কেও এই বলে বলা হয়েছে যে তাদেরকে অবশ্যই ফুরকান এবং জ্যোতি দান করা হয়েছে।

৪৯. যাহারা (আল্লাজিনা) ভয় করে (ইয়াখশাউন) তাহাদের রবকে (রাব্বাহুম) না দেখিয়া (অদৃশ্য অবস্থায়) (বিল্গায়িব) এবং (ওয়া) তাহারাই (হুম) হইতে (মিন) সেই নির্দিষ্ট সময় (সাত্বাতি) ভীত সঙ্কল্প (ভয়ে শঙ্কিত) (মুশফিকুন)।

যাহারা না দেখিয়া তাহাদের রবকে ভয় করে এবং তাহারাই নির্দিষ্ট সময় হইতে ভীতসঙ্কল্প।

যারা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় ভুবে থাকা মুঠাকি, তারা তাদের রবকে না দেখেই সাধনায় রত থাকেন এবং তারা নির্দিষ্ট সময়টি হতে তথা সাত্বাত হতে তথা মৃত্যু-ঘটনা ঘটনার বিষয়টিতে সব সময় ভীতসঙ্কল্প থাকেন। যারা সংসার করেও সময়-সুযোগে নির্জন স্থানে অথবা পর্বতগুহায় মাসের পর মাস ধ্যানসাধনায় ভুবে থাকেন তাদেরকেই হাকিকতে মুঠাকি বলা হয়।

এই ধ্যানসাধনার সময়ে আল্লাহকে না দেখেই এবং নির্দিষ্ট মৃত্যু-ঘটনার সময়টিকে মনে রেখেই ভীতসঙ্কল্প হয়ে এবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকে। এভাবে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করতে করতে একদিন নিজের মধ্যেই আল্লাহ পাক রূহরূপে জাগ্রত হয়ে নফসটিকে দর্শন দান করেন। আল্লাহ

তখনই একটি নফসকে রুহরূপে দর্শন দান করেন যখন একটি নফস হতে খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে অথবা মুসলমান বানাতে পারে। যতদিন পর্যন্ত একটি নফস এবং সেই নফসের সঙ্গে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে যে দেওয়া হয়েছে উহা পরিত্যাগ না করা হয় ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর দর্শন তথা রবের দর্শন তথা রুহরূপে জাগ্রত হয়ে দর্শন দান করার প্রশ্নটি অনেকটা অবান্তর। সুতরাং আল্লাহকে না দেখেই প্রথমে ধ্যানসাধনার পথে সাধককে তথা মুঠাকিকে এগিয়ে যেতে হয়।

মুসায়ি ইসলামের সময় অনেক মুঠাকি যে বিরাট বিরাট আল্লাহর ওলি হয়েছিলেন তার জাজ্বল্য প্রমাণ আমরা আগেই জানতে পেরেছি এবং মোহাম্মদি ইসলামের জন্যও যে ধ্যানসাধনার বিষয়টি অতীব গুরুত্ব বহন করে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমরা পাই যখন মহানবি সময়ে-অসময়ে (একটানা নয়) পনেরটি বছর জাবালুন নুর নামক উঁচু পর্বতের একটি গুহায়, যে গুহার নাম হেরাগুহা, সেখানে একাকী ধ্যানসাধনা করে তাঁর উন্মতদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে যদি সত্যিকার মুঠাকি হতে চাও তো এ রকম ধ্যানসাধনার দিকে এগিয়ে যাও। মেজাজি মুঠাকিরা এ রকম নির্জনে একাকী ধ্যানসাধনাটিকে ভীষণ কষ্টদায়ক ব্যাপার মনে করে কৌশলে এড়িয়ে যান। এই এড়িয়ে যাওয়াটাও মেজাজি মুঠাকিদের তকদির। সুতরাং কাহাকেও দোষারোপ করা ঠিক নয়, বরং নীরব থাকাই সমীচীন মনে করি।

৫০. এবং (ওয়া) এই (হাজ্জা) জিকির (জিকরুম) বরকতময় (মুব্বারাকুন) তাহা আমরা নাজিল করিয়াছি (আনজালনাহ) তবুও কি তোমরা (আফাআন্তুম) তাহাকে (লাহ) অস্বীকারকারী হইবে (ইনকার করিবে) (মুনকিরুন)।

এবং এই জিকিরটি (হয়) বরকতময় যাহা আমরা নাজেল করিয়াছি। তবুও কি তোমরা তাহাকে অস্বীকারকারী হইবে?

এই জিকির তথা সংযোগ তথা যোগাযোগটি যে কতখানি বরকতময় যাহা আল্লাহ ‘আমরা’ রূপ ধারণ করে নাজেল করেছেন তাহা একমাত্র নির্জনে ধ্যানসাধনায় ভুবে থাকা মুঠাকিরাই হাতে হাতে প্রমাণ পায় বলেই উহা নিঃসন্দেহে বরকতময়। এতবড় এবং এত সুন্দর বরকতময় জিকির নাজেল

করার কথাটি বলার পরেও অনেকেই অবহেলায়, আলস্যে, পাঠা না দিয়ে এই উলঙ্গ সত্যটিকে অস্বীকার করে বসে তথা এনকার করে।

৫১. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ) আমরা দিয়াছি (আতাইনা) ইব্রাহিমকে (ইব্রাহিমা) সততা (সচ্চরিত্রতা, ন্যায়পরায়নতা) (রুশদাহ) হইতে (মিন) পূর্বে (আগে) (কাবলু) এবং (ওয়া) আমরা ছিলাম (কুননা) তাহার সম্পর্কে (বিষয়ে) (বিহি) খুব জ্ঞানতাম (খুব অবহিত, সম্যক পরিজ্ঞাত, অবগত) (আলিমিন)।

এবং নিশ্চয়ই ইব্রাহিমকে আমরা দিয়াছিলাম সততা ইতিপূর্বেও (আগে হইতে, পূর্ব হইতে) এবং আমরা ছিলাম তাহার সম্পর্কে খুব অবহিত।

৫২. যখন (ইজ) (ইব্রাহিম) বলেছিলেন (কাল) তাঁহার বাবাকে (লিআবিহি) এবং (ওয়া) তাঁহার কণ্ঠকে (কাণ্ঠমিহি) কি (মা) এই সমস্ত (এই সকল) (হাজ্জিহি) মূর্তিগুলি (তাম্মাসিনু) যাহার (লাতি) তোমরা (আনতুম) তাহাদের জন্য (লাহা) পূজায় রত (নিবদ্ধ) আছ (আকিফুন)।

যখন (ইব্রাহিম) বলেছিলেন তাঁহার বাবাকে এবং তাহার কণ্ঠকে, এই সমস্ত মূর্তিগুলো কি, তোমরা যাহার পূজায় রত আছ তাহাদের জন্য।

৫৩. (তাহারা) বলিল (কালু), আমরা পাইয়াছি (ওয়াজ্জাদনা) আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (আবাবানা) তাহাদের জন্য (লাহা) এবাদতকারীরূপে (আবিদিন)।

(তাহারা) বলিল, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা পাইয়াছি তাহাদের জন্য এবাদতকারীরূপে।

৫৪. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কাল), নিশ্চয়ই (লাকাদ) আছ (কুনতুম) তোমরা (আনতুম) এবং (ওয়া) তোমাদের বাপ-দাদারা (আবাবুকুম) মধ্যে (ফি) পথদ্রষ্টার (ভুলপথে) (দালালিম) সুস্পষ্ট (পরিষ্কার) (মুবিন)।

(ইব্রাহিম) বলিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (ছিল) সুস্পষ্ট পথদ্রষ্টার মধ্যে।

৫৫. (তাহারা) বলিল (কালু), আমাদের নিকট আনিয়াছ কি (আজ্জিতানা) সত্যের সহিত (বিল্হাক্কি) না (আম) তুমি (আন্তা) হইতে (মিনাল) কৌতুককারীদের (লাইবিন)।

(তাহারা) বলিল, আমাদের কাছে আনিয়াছ কি সত্যের সহিত না (কি) তুমি কৌতুককারীদের হইতে (অন্তর্ভুক্ত)?

৫৬. (তিনি) বলিলেন (কাল) বরং (বাল) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) যিনি রব (রাব্বুস) আকাশগুলির (আকাশসমূহের, আকাশমণ্ডলির) (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়া) জমিনের (আর্দি) তিনি (আল্লাজি) তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন (ফাতারাহুনা) এবং (ওয়া) আমি (আনা) উপর (আলা) ওই সকলের উপর (জালিকুম) হইতে (মিনাশ) প্রত্যক্ষদর্শীদের (সাক্ষ্যদাতাদের, বৃত্তান্তজ্ঞদের, কোনো বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষকারীদের) (শাহিদিন)।

বরং বলিলেন তোমাদের রব আকাশগুলি এবং জমিনের রব যিনি তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ওইসবের উপর আমি প্রত্যক্ষদর্শীদের হইতে (একজন)।

৫৭. এবং (ওয়া) আল্লাহর শপথ (প্রতিজ্ঞা, দিব্য) (তাল্লাহি) নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা (বন্দোবস্ত, আয়োজন, নিয়ম) নিব (লাআকিদান্না) তোমাদের মূর্তি (প্রতিমা, বিগ্রহ)-গুলির (আস্নানাকুম) পরে (বাদা) তোমাদের চলিয়া যাওয়ার (আন্তুয়াল্লু) পিঠ (পৃষ্ঠ, পশ্চাৎ) ফিরাইয়া (মুদ্বিরিন)।

এবং আল্লাহর শপথ তোমাদের মূর্তিগুলির (বিষয়ে) নিশ্চয়ই আমি ব্যবস্থা নিব পিঠ ফিরাইয়া তোমাদের চলিয়া যাইবার পরে।

৫৮. সুতরাং তিনি তাহাদেরকে করিয়া দিলেন (ফাজ্জাআলাহুম) টুকরা টুকরা (জুজ্জান) ব্যতীত (বাদে, ভিন্ন, ছাড়া, বিনা) (ইল্লা) বড়টা (কাবিরাল) তাহাদের (লাহুম) তাহারা যাহাতে (লাআল্লাহুম) তাহাদের দিকে (ইলাইহি) লক্ষ্য আরোপ (অর্পণ, স্থাপন) করে (ইয়ারজিউন)।

সুতরাং তিনি তাহাদেরকে (মূর্তিগুলিকে) টুকরা টুকরা করিয়া দিলেন একমাত্র বড়টা (ছাড়া) তাহারা যাহাতে তাহার (বড়টার) দিকে লক্ষ্য আরোপ করে।

এই আয়াতটিতে নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য করে দেখুন যে, মূর্তিগুলোর কথা বলা হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, মূর্তিগুলো তৈরি হয় মাটি, পাথর, প্লাস্টার অব প্যারিস, চীনামাটি ইত্যাদি দিয়ে। এইসব মূর্তির না আছে নফস তথা প্রাণ আর রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। এগুলো নিরেট জড়পদার্থ। এগুলোর মানুষের কোনো ভালো এবং মন্দ করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মানুষ নফস

এবং রুহের অধিকারী হবার পরেও এগুলোর পূজা-অর্চনা, এবাদত-বন্দেগি করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারপরেও মানুষ অজ্ঞতার বশে এগুলোর পূজো দিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ মানুষের ভালোও করতে পারে এবং মন্দও করতে পারে। মানুষের যার-পর-নাই খুব ভালো করার ফলে মানুষ ধন্যবাদ পাবার অমরতা লাভ করে। আবার পরকালে খুব খারাপ কাজ করার দরুন মানুষের স্থিতিতে অভিশপ্ত হয়ে থাকে। এই অমর এবং অভিশপ্ত হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না এই মূর্তিগুলোর, কারণ এই মূর্তিগুলোর নফসও নাই রুহও নাই, তথা জীবাত্মাও নাই এবং পরমাত্মার প্রশ্নটি তো আরও অবান্তর। ইতিহাসের পাতায় জঘন্য জালিমরূপ ধারণ করে মানবসমাজের বুকে কঠিন অত্যাচার চালিয়ে বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে চেস্টিস খাঁ, হালাকু খাঁ, ইসলামের ইতিহাসের হিটলার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুসোলিনি, হিটলার এবং আরও অনেকে। এরাই মানুষের চেহারা, মানুষের সুরতে একেকজন বড় বড় অসুর। সুতরাং অতি সহজেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া যায় যে, মানুষ মানুষের মঙ্গলও করতে পারে আবার অমঙ্গলও করতে পারে। কিন্তু এই বিষয়টির সামনে পাথরের বানানো মূর্তিগুলোর কোনো ভূমিকার কথাটি কল্পনাও করা যায় না। কিছু কিছু ধর্ম-গবেষক মূর্তির সঙ্গে মানুষটিকেও জড়িয়ে ফেলেন এবং সহজ-সরল পাঠকেরা এই বিষয়গুলো পরিষ্কার বুঝতে না পেরে লাভড়া পাকিয়ে ফেলে। অনেকে তো বলেই ফেলেন যে পীরের ধ্যান করা আর মূর্তিপূজা করা একই কথা। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখুন যে, কোথায় পাথরের মূর্তি আর কোথায় রক্ত-মাংসে-গড়া নফস আর রুহের অধিকারী মানুষ! এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটো বিষয়কে এক করে সরল-সহজ কাঁচা-গলা মোমের মতো মানুষগুলোকে ভুলপথে ঠেলে দেবার ব্যবস্থাপত্রটি করে গেছেন। মানুষ খুন করা আর মূর্তি টুকরা টুকরা করা কোনো অবস্থাতেই এক বিষয় নয়।

৫৯. তাহারা বলিল (কালু) কে (মান) করিয়াছে (ফাআলা) এইটা (হাজ্জা) আমাদের ইলাহগুলির সহিত (বিআলিহাতিনা) নিশ্চয়ই সে (ইন্নাহ) অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত (অন্তর্গত, মধ্যস্থিত) (লামিন) জালিমদের (অত্যাচারীদের, সীমালঙ্ঘনকারীদের) (জালিমিন)।

তাহারা বলিল, এইটা কে করিয়াছে আমাদের ইলাহগুলির সাথে নিশ্চয়ই সে জালিমদের অশ্রুভুক্ত।

৬০. তাহারা বলিল (কালু), আমরা শুনিয়াছি (সামিনা) এক যুবককে (ফাতাই) সমালোচনা করিতে (ইয়াজ্জুরু) তাহাদের (হম) বলা হয় (ইউকালু) তাহার (নাম) (লাহ) ইব্রাহিম (ইব্রাহিম)।

তাহারা বলিল, এক যুবককে তাহাদের (ব্যাপারে) সমালোচনা করিতে আমরা শুনিয়াছি। বলা হয়, তাহার (নাম) ইব্রাহিম।

৬১. তাহারা বলিল (কালু), সুতরাং আনো (ফাতু) তাহাকে (বিহি) উপরে (আলা) চোখের (আইউনি) মানুষদের (নাসি) তাহারা যাহাতে (লাআল্লাহম) সাক্ষ্য দিতে পারে (ইয়াশ্হাদুন)।

তাহারা বলিল, সুতরাং তাহাকে আনো মানুষদের চোখের উপরে যাহাতে তাহারা সাক্ষ্য দিতে পারে।

৬২. তাহারা বলিল (কালু) তুমি কি (আআন্তা) করিয়াছ (ফাআলতা) এইটা (হাজা) আমাদের ইলাহগুলির সহিত (বিআলিহাতিনা) হে (ইয়া) ইব্রাহিম (ইব্রাহিম)।

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের ইলাহগুলির সহিত এইটা করিয়াছ, হে ইব্রাহিম?

৬৩. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কালু) বরং (বালু) তাহা করিয়াছে (ফাআলাহ) প্রধান (কাবিরু) তাহাদের (হম) এইটা (হাজা) সুতরাং জিজ্ঞাসা করো (ফাসআলু) তাহাদেরকে (হম) যদি (ইন) পারে (কালু) তাহারা কথা বলিতে (ইয়ানতিকুন)।

বরং (ইব্রাহিম) বলিলেন তাহা করিয়াছে তাহাদের (মূর্তিগুলির) বড়টা (প্রধান, মুখ্য) এইটা তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করো তবে যদি তাহারা (মূর্তিগুলি) কথা বলিতে পারে।

৬৪. সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিল (ফারাজাউ) দিকে (ইলা) তাহাদের নফসের (আনফুসিহিম) সুতরাং তাহারা বলিল (ফাকালু) নিশ্চয়ই তোমরা (ইননাকুম) তোমরাই (আনতুম) জালিম (জালিমুন)।

সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিল তাহাদের নফসের দিকে, সুতরাং তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই তোমরা তোমরাই জালিম।

কোরান-এর এই আয়াতটি আমাদেরকে কিছুটা অবাক করে দেয় এ জন্য যে, যারা মূর্তিপূজা করে তারা নিজেদের নফসের উপর যে জুলুম করছে সেটা অনেক সময় অবচেতন মনে বুঝতে পারে এবং মাঝে মাঝে মেনেও নেয় তথা স্বীকার করে নেয়। আমরা অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাধ্যমে এটুকু জেনে অবাক হলাম বৈ কি! কারণ যারা মূর্তিপূজা করে তারা শেরেকে ভুবে আছে এবং কোরান-এ অন্যত্র এদেরকে কাফেরও বলা হয়েছে। কিন্তু এই কাফেরেরাও মাঝে মাঝে নিজেদের দোষত্রুটিগুলোকে নিজেরাই স্বীকার করে ফেলে এবং প্রকাশ্যে সবার সামনে বলে ফেলে আনতুমুজ্জ জোয়ালেমুন, ‘তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী তথা জালিম।’ এই যে নিজেদের ভুলত্রুটিগুলো নিজেরাই মাঝে মাঝে ধরে ফেলতে পারে তারই একটি অনন্য দলিল এই আয়াতটি। তা ছাড়া যারা মূর্তিপূজা করে আসছে তাদের শিকড় তথা রুট যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাই যে এই মূর্তিপূজারকদের বাপ-দাদারাও মূর্তিপূজা করে আসছে। সুতরাং মূর্তিপূজারকের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে মূর্তিপূজা করাটাই একান্ত স্বাভাবিক।

অবশ্য এই মূর্তিপূজারকদের জন্মটাই কি একটি জুলন্ত অভিশাপ, নাকি একটা নিষ্ঠুর তকদির? ইহার ব্যাখ্যা দেবার ক্লমতা অধম লিখকের নাই। হিন্দু হরিমোহনের ছেলে জগৎমোহন যখন ধর্মবিষয়ে গবেষণা করতে এগিয়ে আসবে তখন প্রথমেই যে-ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছে, সেই ধর্মের উপর রচিত বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত এবং আরও যেসব গ্রন্থ আছে সেগুলোর মাঝে গবেষণায় ভুবে থাকারই কথা। যেমন অধম লিখক মুসলমান পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই এক কোরান-এর ৪২ রকম তফসির তথা ব্যাখ্যা এবং প্রায় যতগুলো হাদিসগ্রন্থ আছে এবং আরও অনেক গ্রন্থগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং এই গবেষণা করার শেকড়টি তথা মূলটি হলো মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। সুতরাং এই কথাটি কি অকপটে বলতে পারি না যে, জন্মই আমার আজন্ম বিরাট একটি আশীর্বাদ অথবা রহমতপ্রাপ্ত একটি তকদির? আমার মনে হয়, যারা মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন

তারা আমার এই কথাগুলো যতটুকু মেনে নেবেন ততটুকু অন্যান্য ধর্মের গবেষকেরা কখনই মেনে নেবেন না। কেন মেনে নেবেন না বলে যদি কেউ প্রশ্ন করেই ফেলেন তো উত্তরটি অধম লিখকের জ্ঞানা নাই।

৬৫. ইহার পর (সুম্মা) অবনত হইয়া গেল (নুকিসু) উপরে (আলা) তাহাদের মাথাগুলি (রুউসিহিম) নিশ্চয়ই (লাকাদ) তুমি জানিয়াছ (আলামতা) না (মা) এইসব (হাউলাই) কথা বলিতে পারে (ইয়ানতিকুন)।

ইহার পর তাহাদের (মূর্তিপূজারকদের) মাথাগুলি অবনত হইয়া গেল। (আলা তথা 'উপরে' শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে মিলাইতে পারিলাম না)। তাহারা (মূর্তিপূজারকেরা) বলিল, নিশ্চয়ই তুমি (ইব্রাহিম) জানিয়াছ এইসব (মূর্তিগুলি) কথা বলিতে পারে না।

৬৬. (ইব্রাহিম) বলিলেন (কাল), তোমরা ইবাদত করিবে তবুও কি (আফাতাবুদুনা) হইতে (মিন) ছাড়া (ব্যতীত, বিনা) (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) যাহা (মা) না (লা) তোমাদের উপকার (মঙ্গলসাধন, কল্যাণ, সাহায্য, অনুগ্রহ) দিতে পারে (ইয়ানফাউকুম) কিছুমাত্র (কয়েক, অল্প, কিয়ৎ) (শাইয়াঙ) এবং (ওয়া) না (লা) তোমাদের ক্রতি (হানি, অনিষ্ট, ক্ষয়, লোকসান, ন্যূনতা) করিতে পারে (ইয়াদুররুকুম)।

(ইব্রাহিম) বলিলেন, তবুও কি তোমরা ইবাদত করিবে আল্লাহ ছাড়া যাহা তোমাদের কিছুমাত্র উপকার দিতে পারে না এবং তোমাদের ক্রতি (-ও) করিতে পারে না।

মূর্তি এবং মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কারণ পাথরের মূর্তিগুলির সামান্যতম নফসও নাই এবং রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ অপরপক্ষে একটি মানুষ যেমন নফসের অধিকারী তেমনি রুহেরও অধিকারী তথা একটি মানুষকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ের সমন্বয়ে আল্লাহ পাক বানিয়েছেন। মানুষের মর্যাদার সামনে মূর্তিগুলির সামান্যতম মর্যাদা আছে বলে মনে হয় না। একটি মানুষ ইচ্ছাশক্তির অধীন। একটি মানুষকে আল্লাহ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। মানুষ এই ইচ্ছাশক্তিটি প্রয়োগ করে উপকারও করতে পারে আবার অপকারও করতে পারে। কিন্তু মূর্তিগুলির এ রকম করার প্রশ্নটি অবান্তর। একটি সাধারণ মানুষকে যেখানে অপর একটি মানুষের

উপকার ও অপকার উভয়টি করার দৃশ্যটি সমাজের বুকে অহরহ দেখে চলছি, সেইখানে আপন নফসের কাছেই থাকা রুহটিকে যিনি ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে জাগ্রত করতে পেরেছেন তিনিই তো ইনসানে কাম্মেল। রুহ একটি মানুষের নফসের উপর তখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন আপন নফসের সঙ্গে থাকা খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। আপন নফসের অভ্যন্তরে যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেই পরীক্ষায় তখনই একটি নফস কৃতকার্য হতে পারে যখন খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। এবং যেইমাত্র খান্নাসরুপী শয়তানটি আর নফসের সঙ্গে থাকে না, তখনই সেই নফসটি নামধারণ করে পরিতৃপ্ত নফস তথা নফসে মোৎমায়েন্না। এই জাতীয় নফসকেই কোরান-এ জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই জাতীয় নফসের উপরেই রুহ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয়। হিন্দুধর্মে রুহ জাগ্রত-করা নফসটির নাম দেওয়া হয়েছে নররুপী নারায়ণ, ফারসি ভাষায় বলা হয় বান্দা নেওয়াজ আর আরবিতে বলা হয় ওয়াজহুল্লাহ তথা আল্লাহর চেহারা। এই নররুপী নারায়ণ, এই বান্দা নেওয়াজ, এই ওয়াজহুল্লাহর কাছেই মারফত-রাজ্যে প্রবেশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা অগ্রসর হতে চায় তাদেরকে আনুগত্য গ্রহণ করতে হবে। তাই বলা হয়ে থাকে, ‘যার গুরু নাই, শয়তান তার গুরু।’ মোজাদ্দের আলফেসানি, সিরহিন্দ তো একদম পরিষ্কার এবং খোলামেলা ভাষায় বলেই দিয়েছেন যে, পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত, তথা ‘তোমার পীরই হলেন তোমার প্রথম মাবুদ।’ (মাতলাউল উলুম, ৮৬ পৃ.)। ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কৌশলে একজন ইনসানে কাম্মেলকেও মূর্তি বানিয়ে ফেলেছেন এবং বিভ্রান্ত তৈরি করার তরে অনেক রকম কথা বলে থাকেন। যেমন টেলিভিশনের পর্দায় কিছুদিন আগেও বিভ্রান্ত করার কৌশল অবলম্বন করে প্রচার করা হতো, ‘পীরপূজা ইসলামেতে নাই।’ দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত লক্ক লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, সত্যসাগরে অবগাহন করতে চাইলে ইনসানে কাম্মেলকে অবশ্যই গুরুরূপে গ্রহণ করে নিতে হবে। অপরপক্ষে ওহাবি মোল্লারা ধুমসে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য গুরু ধরার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি

ওহাবি মোল্লাদের কথাটি সত্য বলে ধরে নিই, তা হলে এই লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুবেরা প্রতারকরূপে চিত্রিত হন, আবার পরক্ৰমে যদি লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালদের কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে তা হলে ওহাবি মোল্লাদের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? মেশকাত শরিফ-এর একটি হাদিসে দুনিয়াদার আলেমদের চেহারা-নকশা কেমন হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। আমরা বিস্তারিত না লিখে এই হাদিস হতে একটি কথা তুলে ধরতে চাই আর সেই কথাটি হলো : এই দুনিয়াদার আলেমদের মধ্যে এমনও কিছু আলেম নামের কলঙ্ক পাওয়া যাবে যারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। স্রষ্টার যতগুলো নাম আছে তার মধ্যে গভীর রহস্যপূর্ণ এবং জ্ঞাত ও সিফাতের তথা মূল এবং গুণ দুটোরই একত্রিত সমন্বয়কারী যে নামটি স্রষ্টাকে পরিপূর্ণরূপে বোঝায় সেই নামটি হলো আল্লাহ। মূলের প্রকাশ ও বিকাশের নামটিকে বলা হয় সিফাত তথা সৃষ্টি তথা গুণাবলি। আল্লাহ সিফাতরূপে তাঁর সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে বিরাজিত। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞাত তথা মূল নুরটি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাঝে দুইটি স্থানে এবং সৃষ্টির বাহিরে লা-মোকাম নামক স্থানে অবস্থান করেন। আল্লাহ জ্ঞাতরূপে যে লা-মোকামে অবস্থান করেন তার দলিলটি সূরা নজ্জেই দেখতে পাই। আবার পরক্ৰমে সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে দুটি জীবের সঙ্গে আল্লাহ যে জ্ঞাতরূপে অবস্থান করছেন সেই কথাটিও পাই। যেমন নাহনু আক্রাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিন্ ওয়ারিদ অর্থাৎ ‘আমরা তোমার শাহারগের তথা জীবনরগের নিকটেই আছি।’ সেই জীব দুটির নাম হলো জিন এবং ইনসান। আল্লাহ যে স্বয়ং জ্ঞাতরূপে প্রতিটি মানুষের নিকটেই থাকেন, সেই জ্ঞাতরূপটি আপন মহিমায় মহিমাবিত হয়ে আপনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই, যখন একটি মানুষ তার আপন সত্তার মধ্য হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। মানুষের পরম সৌভাগ্য যে আল্লাহ পাক জ্ঞাতরূপে মানুষের জীবনরগের নিকটেই আছেন। সেই জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষকে উপেক্ষা করে, অবহেলা করে, অস্বীকার করে অজানার পূজা করার উপদেশটি যারা দেন তাদেরকেই বা বলার কী থাকতে পারে? শুধু একটুকুই বলা যায় যে এরা আল্লাহর রহস্যের জ্ঞান হতে নিজেরাই নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

৬৭. পরিতাপ (আফসোস, ধিক্, দুঃখ, মনস্তাপ) (উফ্ফি) তোমাদের জন্য (লাকুম্) এবং (ওয়া) তাহাদের জন্যও (লিমা) তোমরা এবাদত কর (তাবুদুনা) হইতে (মিন্) ছাড়া (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) তবুও কি না (আফালা) তোমরা বুঝিবে (তাকিলুন)।

তোমাদের জন্য পরিতাপ এবং (তাহাদের) জন্যও, যাহাদের তোমরা এবাদত করো আল্লাহকে ছাড়া, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

৬৮. (মূর্তিপূজারকগণ) বলিল (কালু) তাহাকে পোড়াইয়া ফেল (হাররিকুহ) এবং (ওয়া) তোমরা সাহায্য কর (আনসুরু) তোমাদের ইলাহগুলিকে (আলিহাতাকুম্) যদি (ইন্) তোমরা (কুনতুম্) করিতে পার (ফাইলিন্)।

তাহারা বলিল, তাঁহাকে (ইব্রাহিমকে) পোড়াইয়া ফেল এবং তোমাদের ইলাহগুলিকে তোমরা সাহায্য করো যদি তোমরা করিতে পার।

৬৯. আমরা (আল্লাহ) বলিলাম (কুলনা) হে (ইয়া) আগুন (নারু) হইয়া যাও (কুনি) শীতল (ঠাণ্ডা, উদ্বেগরহিত, শান্তিপ্ৰাপ্ত) (বারদা) এবং (ওয়া) নিরাপদ (নির্বিন্, আপৎশূন্য, বিপন্মুক্ত) (সালামান্) উপরে (আলা) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিম)।

আমরা (আল্লাহ) বলিলাম, হে আগুন, শীতল হইয়া যাও এবং ইব্রাহিমের উপর নিরাপদ (হও)।

এই আয়াতটি যারা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে তাদের জন্য একটি বিরাট ওজিফা। কারণ আল্লাহ পাক তকদিরে মুবরাকম তথা যে তকদির বদলানো হয় না, সেই আগুনের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে হারখার করে দেবার তকদিরটিকেও কিছুক্ষণের জন্য বদলিয়ে ফেলার হুকুম প্রদান করলেন, যাতে নবি ইব্রাহিমকে পোড়াতে না পারে। বরং আগুনের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রটি ধারণ করতে নির্দেশ দিলেন এই বলে যে, নিরাপদ-ও শীতল-রূপটি ধারণ করো। আগুনের পক্ষে এই তকদিরে মোবরাকমটি বদলিয়ে ফেলার কোনো উপায় নেই বলেই আল্লাহ আগুনকে শীতল ও নিরাপদ হতে বললেন।

শুনেছি সাধকেরা এই আয়াতটিকে ওজিফারূপে প্রতিদিন ধ্যানযোগে হাজার হাজারবার পড়তেন এবং এই আয়াতটিকে ওজিফারূপে গ্রহণ করে কামিয়াব হবার পর বাঘ, সিংহ এবং হিংস্র প্রাণীদের পিঠে চড়ে এখানে সেখানে বেড়াতেন। শুনেছি এই আয়াতটি ১১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিলে এবং সেই পানি পান করলে অনেক রকম বালান্নুসিবত হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৭০. এবং (ওয়া) তাহারা চাহিয়াছিল (আরাদু) তাহার সাথে (বিহি) অন্যায় (ক্লতি) আচরণ করিতে (কাইদান) সুতরাং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) করিয়া দিয়াছিলাম (ফাজ্জাআল্নাহম) সবচাইতে বেশি (সর্বাধিক) ক্লতিগ্রস্ত (ক্লতি ভোগ করিতেছে এমন, যাহার ক্লতি হইয়াছে) (আখসারিন)।

এবং তাহারা চাহিয়াছিল তাহার সহিত অন্যায় আচরণ করিতে সুতরাং তাহাদেরকে আমরা (আল্লাহ) সর্বাধিক ক্লতিগ্রস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

৭১. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার (মুক্ত, রক্ষা, পরিব্রাণ, নিষ্কৃতি, উত্তোলন) করিলাম (নাজ্জাইনাহ) এবং (ওয়া) লুতকে (লুতান) দিকে (ইলা) জমিনে (মাটিতে, দেহতে) (আরদি) যেথায় (যেখানে, যেস্থানে) (লাতি) আমরা (আল্লাহ) বরকত (কল্যাণ, হিত, মঙ্গল, কুশল, সুখসমৃদ্ধি) দিয়াছি (বারাক্না) ইহার মধ্যে (ফিতা) সমস্ত আলমের জন্য (লিল্আলামিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে এবং লুতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম জমিনের দিকে যেথায় আমরা বরকত দিয়াছি ইহার মধ্যে সমস্ত আলমের জন্য।

৭২. এবং (ওয়া) আমরা দিয়াছি (ওয়াহাব্না) তাহাকে (লাহ) ইসহাক (ইসহাকা) এবং (ওয়া) ইয়াকুব (ইয়াকুবা) অতিরিক্ত হিসাবে (নাফিলাতান) এবং (ওয়া) প্রত্যেককে (কুল্লান) আমরা বানাইয়াছি (জাআল্না) সালেহিন (সালিহিন)।

এবং তাহাকে আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি ইসহাক এবং অতিরিক্ত হিসাবে ইয়াকুব, এবং প্রত্যেককে আমরা (আল্লাহ) বানাইয়াছি সালেহিন।

৭৩. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে বানাইয়াছিলাম (জাআল্নাহম) নেতাগণ (আইম্মাতাই) তাহারা পথ দেখাইত (ইয়াহদুনা) আমাদের (আল্লাহ) কথামতো (বিআমরিনা) এবং (ওয়া) আমরা ওহি করিয়াছিলাম (আওহাইনা) তাহাদের দিকে (ইলাইহিম) কাজ করিতে

(ফিলান্) ভালো ভালো (খাইরাতি) এবং (ওয়া) কায়েম করিতে (ইকামাস্) নামাজ (সালতি) এবং (ওয়া) প্রদান করিতে (ইতাআজ্) জাকাত (জাকাতি) এবং (ওয়া) তাহারা ছিল (কানু) আমাদের জন্য (লানা) এবাদতকারী (আবেদিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে বানাইয়াছিলাম নেতাগণ, আমাদের (আল্লাহ) কথামতো তাহারা পথ দেখাইত এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদের প্রতি ওহি করিয়াছিলাম ভালো ভালো কাজ করিতে এবং নামাজ কায়েম করিতে এবং জাকাত আদায় করিতে এবং তাহারা ছিল আমাদের (আল্লাহর) জন্য এবাদতকারী।

৭৪. এবং (ওয়া) লুতকে (লুতান্) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দিয়াছিলাম (আতাইনাহ্) হেকমত (ঔপ্তবিদ্যা, রহস্যলোকের জ্ঞান) (হক্মাঐ) এবং (ওয়া) জ্ঞান (ইল্মাঐ) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম (নাঈজ্জাইনাহ্) হইতে (মিনান্) জনপদ (কারিয়াতি) যাহা (লুতি) ছিল (কানাত্) লিপ্ত (তাম্বালু) খবিস কর্মগুলিতে (খাবাইসা) নিশ্চয়ই তাহারা (ইন্নাহম্) ছিল (কানু) জাতি (কাওমা) খারাপ (সাউইন্) ফাসেক (ফাসিকিন)।

এবং লুতকে আমরা (আল্লাহ) দিয়াছিলাম হেকমত এবং জ্ঞান এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম জনপদ হইতে যাহা লিপ্ত ছিল খবিস কর্মগুলিতে, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল খারাপ জাতি (এবং) ফাসেক।

৭৫. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দাখিল (সাম্মিল) করিয়াছিলাম (আদখাল্নাহ্) মধ্যে (ফি) আমাদের (আল্লাহর) রহমতের (রাহ্মাতিনা) নিশ্চয়ই (ইন্নাহ্) হইতে (মিনাস্) সালেহিনদের (সংকর্মশীলদের) (সোয়ালেহিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দাখিল (সাম্মিল) করিয়াছিলাম আমাদের (আল্লাহর) রহমতের মধ্যে নিশ্চয়ই সে (ছিল) সালেহিনদের হইতে।

৭৬. এবং (ওয়া) নুহকে (নুহান্) যখন (ইজ্) ডাকিয়াছিলেন (নাদা) হইতে (মিন্) পূর্বে (কাবলু) সুতরাং আমরা সাড়া দিয়াছিলাম (ফাস্তাজাব্না) তাহাকে (লাহ্) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম

(ফানাজ্জাইনাহ) এবং (ওয়া) তাহারা আহাল (পরিবার)-কে (আহলাহ) হইতে (মিনাল) কঠিন বিপদ (সংকট) (কারবিল) বড় (আজিম)।

এবং যখন নুহকে পূর্ব হইতে তিনি ডাকিয়াছিলেন, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিয়াছিলাম তাহাকে, সুতরাং আমরা তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং তাহার আহাল (পরিবার)-কে কঠিন (বড়) বিপদ (সংকট) হইতে।

এখানে অধিকাংশ অনুবাদক ‘স্মরণ করুন’ কথাটি গৎবাধাভাবে লিখে থাকেন। এখানে আমি ‘স্মরণ করণ’ শব্দটি পেলাম না, তাই দিলাম না। যে-বিষয়টির উপর কোনো কিছুই জানা নাই, দেখা নাই ॥ সেই বিষয়টি ‘স্মরণ করুন’ বলাটাও কি একটি আত্মবিরোধী কথা বলে মনে হয় না? আর সেই দিনে কী করে স্মরণ করা যায়, যেখানে রেডিও-টেলিভিশন, ফোন-ফ্যাক্সের জামানার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং লিখিত কাগজ আবিষ্কার হয়ে থাকলেও সেই কাগজ ছিল অতি নিম্নমানের ফেড়ফেড়ে কাগজ এবং খুব কমই পাওয়া যেত। এইসব অগ্ন্যপশ্চাৎ চিন্তা না করেই আধুনিক যুগের মাপকাঠি দিয়ে সেই যুগের ঘটনাগুলো মাপা যায় না। সুতরাং নবি এবং রসূল তাঁরাই হতে পারেন যারা ত্রিকালদর্শী তথা সব কিছু জানেন তথা পূর্ণ এলম্মে গায়েবের মালিক। তবে এলম্মে গায়েবের প্রশ্নেও অনেক প্রকারভেদ আছে। এবং এই প্রকারভেদের সর্বোচ্চ এলম্মে গায়েবের অধিকারটি আল্লাহ আবদুহকে দিয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে যে, আমরা (আল্লাহ) আবদুহকে তথা আল্লাহর বান্দাকে মেরাজে নিয়ে গেলাম। এখানে রসূল এবং নবির নামটি উচ্চারণ না করে আবদুহ তথা আল্লাহর বান্দা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭৭. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাকে (নাসারনাহ) হইতে (মিনাল) কণ্ঠ (সম্প্রদায়, জাতি) (কাওমি) যাহারা (আল্লাজিনা) মিথ্যারোপ (অস্বীকার করা) করিয়াছিল (কাজ্জাবু) আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলিকে (বিআয়াতিনা) নিশ্চয়ই তাহারা (ইন্নাহ) ছিল (কানু) কণ্ঠ (সম্প্রদায়, জাতি) (কাওমা) খারাপ (মন্দ) (সাওয়িন) সুতরাং

আমরা (আল্লাহ) তাহাদের ডুবাইয়া দেই (ফাআগ্রাক্নাহম) সকলকেই (সবাইকেই) (আজ্জমাইন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাকে কণ্ডম হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল আমাদের আয়াতগুলিকে, নিশ্চয়ই তাহারা ছিল খারাপ কণ্ডম সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহাদের সকলকেই ডুবাইয়া দেই।

একটি খারাপ জাতি অথবা সম্প্রদায়কে আল্লাহর আয়াতের উপর মিথ্যা আরোপ করার দরুণ সবাইকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন বলা হয়েছে। আল্লাহর এই কথাটি সেই হজরত নূহ (আ.)-এর জামানায় ঘটেছিল, কিন্তু এখন এই আধুনিক যুগে একটি সমগ্র কণ্ডমকে এ রকম শাস্তিপ্রদান করার ঘটনাটি চোখে পড়ছে না, তবে অবশ্যই একদিন না একদিন পড়বে। সম্ভবত মনে হয়, আগের জামানার মানুষগুলো খুবই জঘন্য এবং ঘৃণিত প্রকৃতির ছিল বলেই সবাইকে পাইকারিভাবে শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো। কিন্তু এ আধুনিক যুগ দিনে দিনেই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও অপরাধ প্রবণতাটিও কম নেই। তাই এখন আর সে রকম পাইকারি শাস্তি দেবার দৃশ্যটি দেখতে হয় না। আমরা অনেক সময় আগের দিনগুলো খুব ভালো ছিল বলে আফসোস করি, কিন্তু আগেকার দিনের মানুষেরা কতটুকু জঘন্য এবং ঘৃণিত পর্যায়ে উপনীত হলে আল্লাহ একটি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিচ্ছেন! এই আধুনিক যুগেও অনেক মানুষ আছে যারা সত্যিই ঘৃণিত এবং জঘন্য। কিন্তু একটি জাতির প্রশ্নে সবাই ঘৃণিত এবং জঘন্য বলে আল্লাহর কাছে মনে হয় না বলেই এ রকম পাইকারি ধ্বংসযজ্ঞটি আমরা দেখতে পাই না। এই ৭০/৮০ বছর আগেও ইলিশ মাছ খেয়ে বৃহত্তর বরিশাল জেলায় কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু লোক মারা যাবার কথাটি শুনেছি, কিন্তু বরিশালের সব লোক মারা গেছে এ রকম শুনিনি। আমরা আরও দেখেছি, যখন গুটিবসন্ত রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না তখন গ্রামে গ্রামে মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সবাই মারা গেছে এ রকম ঘটনাটি ঘটে নি। যেদিন এবং যখন সবাই আল্লাহর দৃষ্টিতে জঘন্য এবং ঘৃণিত বলে বিবেচিত হবে সেদিন হজরত নূহের (আ.) জামানার মতো একটি কণ্ডমকে ধ্বংস করে দিতে তিনি সামান্য দ্বিধাবোধও করবেন না।

৭৮. এবং (ওয়া) দাউদকে (দাউদা) এবং (ওয়া) সোলায়মানকে (সুলায়মানা) যখন (ইজ্জ) দুইজনে বিচার করিতেছিলেন (ইয়াহকুম্বানি) মধ্যে (ফিল) শস্যক্ষেত (হারসি) যখন (ইজ্জ) রাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল (নাফাশাত) ইহার মধ্যে (ফিহি) শ্বেষ (গানামুল) কিছু লোকের (কাওমি) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) ছিলাম (কুননা) তাহাদের বিচারের জন্য (লিহকুম্বিহিম) পর্যবেক্ষক (পরিদর্শক, নিরীক্ষক, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকারী) (শাহিদিন)।

এবং দাউদকে এবং সোলায়মানকে যখন দুইজনে বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে যখন কিছু লোকের শ্বেষ রাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ইহার মধ্যে এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম তাহাদের বিচারের প্রত্যক্ষকারী (পর্যবেক্ষক)।

৭৯. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) তাহা বুঝাইয়া দেই (ফাফাহহাম্নাহা) সোলায়মানকে (সুলায়মানা) এবং (ওয়া) প্রত্যেককেই (কুল্লান) আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি (আতাইনা) হেকমত (হক্‌মাঠ) এবং (ওয়া) জ্ঞান (ইল্মাঠ) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) অধীন করিয়া দিয়াছিলাম (সাখখার্না) সাথে (মাতা) দাউদের (দাউদাল) পাহাড়গুলিকে (জিবাল) তাহারা তসবিহ করিত (ইউসাব্বিহ্না) এবং (ওয়া) পাখিদেরকেও (তোয়াইরা) এবং (ওয়া) আমরা ছিলাম (কুননা) কর্তা (সম্পাদনকারী, নির্বাহনকারী, নিৰ্দ্দানকারী) (ফাইলিন)।

সুতরাং আমরা সোলায়মানকে তাহা বুঝাইয়া দেই এবং (তাহাদের) প্রত্যেককেই আমরা (আল্লাহ) দিয়াছি হেকমত এবং এলেক্স তথা জ্ঞান এবং আমরা (আল্লাহ) অধীন করিয়া দিয়াছিলাম দাউদের সাথে পাহাড়গুলিকে, তাহারা তসবিহ করিত এবং পাখিদেরকেও এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম কর্তা তথা সম্পাদনকারী।

এখানে ছোট্ট একটি কথা বলার আছে বলে মনে করি আর সেই কথাটি হলো যে, পাহাড়-পর্বত এবং পাখিরা সব সময়েই আল্লাহর তসবিহ-পাঠ করে ইহা কোরান-এরই ঘোষণা। তা হলে দাউদের (আ.) সঙ্গে পাহাড় এবং পাখিগুলো তসবিহ-পাঠ করে বলার মাঝে নিশ্চয়ই কোনো বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব হলো, পাহাড় এবং পাখিগুলো যে দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে

তসবিহ-পাঠ করেছে উহা সেই সময় অনেকেই দেখতে পেয়েছে। কিন্তু কোনো নবি বিহনে পাহাড় এবং পাখিরা সব সময়েই যে তসবিহ-পাঠ করেছে ইহা কোরান-এর কথা হলেও মানুষ সহজে বুঝে উঠতে পারে না। এ জন্যই জ্ঞানের সঙ্গে হেকমত তথা রহস্যলোকের বিশেষ জ্ঞানটি দেবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। হজরত দাউদ (আ.) সেই হেকমতের বলে পাহাড় এবং পাখিকে যে তসবিহ-পাঠ করিয়েছেন উহা প্রকাশ্যে অবলোকন করা যায়, তাই হজরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পাহাড় এবং পাখিরা যে তসবিহ পাঠ করেছে সেই তসবিহ-পাঠ একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ তসবিহ-পাঠ।

৮০. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাকে শিখাইয়াছিলাম (আল্লামনাহ) শিল্প (সানআতা) বর্ম (তনুত্রাণ, কবচ, আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দেহাবরণ) (লাবুসিল) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমাদের রক্ষা করিতে পারে (লিতুহসিনাকুম) হইতে (মিন) তোমাদের যুদ্ধের (বাসিকুম) সুতরাং কি (ফাহাল) তোমরা (আনতুম) কৃতজ্ঞ হইবে (শাকিরুন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাকে শিখাইয়াছিলাম বর্ম (-নির্মাণ) শিল্প তোমাদের, (যেন) তোমাদের রক্ষা করিতে পারে তোমাদের যুদ্ধের (আঘাত) হইতে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে (না)?

এ আয়াতটি প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি কথা বলতে চাই যে যুদ্ধ করার নানা প্রকার অস্ত্র তৈরি করাটাকেও শিল্প বলা হয়েছে এবং এই বর্মনির্মাণ শিল্পটি আল্লাহই দিয়েছেন। শত্রুপক্ষ হতে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই শিল্পটি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য পরে তথা যুগে যুগে এই বর্মনির্মাণ শিল্পটি শত্রু-মিত্র উভয়পক্ষই কমবেশি জানতে পেরেছে। যুদ্ধ মানেই হত্যা, যুদ্ধ মানেই হারখার করে দেওয়া, যুদ্ধ মানেই কিছুটা সঙ্ঘাত ॥ এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ উভয়কেই কমবেশি জীবন ও বৈষয়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অধম লিখকের মনে হয়, এই যুদ্ধটি নিছক বৈষয়িক যুদ্ধ ॥ তবে কেহ যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ইহাও একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ তবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো।

৮১. এবং (ওয়া) সোলায়মানের জন্য (লিসুলাইমান) বাতাসকে (বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীরণ) (রিহা) অত্যন্ত প্রবল (তীব্র, উদ্দাম, সাজ্জাতিক, ফুর্দু,

ম্বারা ত্বক, কঠিন, দুর্দমনীয়, অসংযত, বন্ধনহীন, স্বেচ্ছাবিহারী) (আসিফাতান) প্রবাহিত (হইত) (তাজরি) তাঁহার হুকুমে (তাঁহার নির্দেশে) (বিআম্মরিহি) দিকে (অভিমুখে) (ইলা) জমিনে (পৃথিবীতে, মাটিতে, মানবদেহে) (আরদি) যাহা (ল্লাতি) আমরা (আল্লাহ) বরকত (কল্যাণ, সৌভাগ্য, প্রাচুর্য) দিয়াছি (বারাক্না) ইহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) হইলাম (কুননা) সম্পর্কে (বিকুল্লি) সব বিষয়ে (শাইয়িন) সম্যক অবগত (খুব অবহিত) (আলিমিন)।

এবং সোলায়মানের জন্য অত্যন্ত প্রবল বায়ুকে তাহার (সোলায়মানের) হুকুমে প্রবাহিত হইত সেই জমিনে যেখানে আমরা (আল্লাহ) বরকত দিয়াছি ইহার মধ্যে এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা (আল্লাহ) সম্যক অবগত তথা খুব অবহিত।

আল্লাহ যা কিছু বান্দাকে দান করেন সেই দানের রূপটি কখনই ‘আম্মি’-রূপ ধারণ করে দান করেন না, বরং একই বহুরূপ ধারণ করে দান করেন; তাই দানের প্রশ্নে আল্লাহ ‘আম্মি’ শব্দটি ব্যবহার না করে সব সময় ‘আম্মরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ যেন $২+২=৪$ হবার মতো অংকের হিসাব। এই অংকের হিসাবের বাইরে আল্লাহ কোনো কিছু করেন না। তাই আমরা কোরান-এ অন্যত্র দেখতে পাই যে আল্লাহ বলছেন যে, তাঁর আইন কখনই বদলায় না। এই আয়াতটিতে ম্বারা ত্বক একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা সাধারণ মানুষের মন-মগজে না-ও ধরা পড়তে পারে আর সেই বিষয়টি হলো হজরত নবি সোলায়মানের (আ.) হুকুমে অত্যন্ত প্রবল বাতাস শান্ত হয়ে যেত এবং জমিনের সেইদিকেই প্রবাহিত করতেন যেখানে আল্লাহর বরকত রয়েছে। হজরত সোলায়মানের (আ.) হুকুমে প্রকৃতির বায়ু যেখানে প্রবাহিত হতো সেখানে কি শেরেকের গন্ধ পাওয়া যায়? কারণ আল্লাহর হুকুমের কথাটি না বলে সোলায়মানের (আ.) হুকুমে প্রকৃতির প্রচণ্ড বায়ু শান্ত হয়ে যেত এবং যে দিকে আল্লাহর বরকত রয়েছে সেইদিকে প্রবাহিত হত। কত বড় ক্রমতার অধিকারটি আল্লাহ হজরত সোলায়মানকে (আ.) দিয়েছিলেন ভাবতেও অবাক লাগে। এ রকমভাবে একেক নবি-রসূলকে একেক রকম বিশেষ ক্রমতা আল্লাহ দান করেছেন। জাঁদরেল নবি হজরত মুসা (আ.)-কে যেখানে

বেলায়েতপ্রাপ্ত এবং আবদিয়াতের অধিকারী হজরত খিজির ধৈর্যধারণের প্রশ্নে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সেই ওলি এবং আবদিয়াতের অধিকারী খিজিরকে আল্লাহ কত বড় ক্ষমতা দান করেছেন ভাবতেও অবাক লাগে। বড়পীর সাহেব এবং খাজা গরিব নেওয়াজের মতো ওলিরা যে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই কথাটি কেমন করে কী উপায়ে অস্বীকার করা যায়? নবি সোলায়মানের (আ.) হুকুমে যেখানে প্রচণ্ড বাতাস শান্ত হয়ে যায় এবং যেদিকে ইচ্ছা নবি সোলায়মান (আ.) তাঁর হুকুমে সে দিকেই প্রবাহিত করতে পারেন, সেখানে বেলায়েত এবং আবদিয়াতের অধিকারী বড়পীর সাহেব, খাজা গরিব নেওয়াজ, মারুফ কুখরি, জুননুন মিসরি, বশরে হাফি, সমনুন মোহেব, দাতা গঞ্জি বখশ, শাহাবাজ কলন্দর, মাংগো পীর, শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দর পানিপাথি, শেখ ফরিদ, মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া ॥ এ রকমভাবে লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস কুতুব-আবদাল-আরেফেরা কি আরও বেশি, আরও চমকপ্রদ, আরও বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না? এই সামান্য বিষয়টি যাদের বুঝতে কষ্ট হয় তারা কি ওহাবি নয়? তারা কি খাসসুলখাস ওহাবি দর্শনের অনুসারী নয়? তারা কি পোড়া কপাইলা তকদিরের অধিকারী নয়? যেখানে আল্লাহ পোড়া কপাইলা করে বানিয়েছেন সেখানে চরম সত্যে কোনো গালিই থাকে না। আল্লাহর বরকতময় স্থানগুলোতেই তো নবি সোলায়মানের (আ.) হুকুমে সেই বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হতো। তা হলে হজরত সোলায়মানের (আ.) দোহাই দিলে কি দোষের বিষয় হবে? খাজাবাবার মাজারে খাজাবাবার কাছে কিছু চাইলে কি কোনো দোষের বিষয় হবে? যে কোনো ওলি-আল্লাহর কাছে চাইলে কি অন্যায় হবে? কোরান-এর এই আয়াতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই ‘বিআন্নরিহি’ তথা সোলায়মানের (আ.) হুকুমে বাতাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হতো। তা হলে আল্লাহর ওলিদের কাছে কিছু চাওয়া কি শেরেক হয়? আল্লাহর ওলিরা আল্লাহকে সঙ্গে নিয়েই ওলি হয়েছেন। আল্লাহ সঙ্গে না থাকলে কেহই ওলি হতে পারেন না। সুতরাং একজন আল্লাহর ওলি কখনই আল্লাহ হতে আলাদা নন। গাছের ডাল সম্পূর্ণ একটি গাছ নয়, বরং গাছের একটি অংশ। সোজা কথায় গাছের ডাল গাছ নয়, আবার গাছ হতে আলাদাও নয়। তকদিরে

বুঝবার, জানবার অধিকারটি যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন তো অতি সহজেই বুঝতে পারবে, আর না দিলে হাজারও বুঝালেও বুঝতে পারবে না।

৮২. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনাশ) শয়তানদের (শাইয়াতিন) যাহারা (মাই) ডুবুরির কাজ করিত (ইয়াগুসুন) তাহার জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) করিত (ইয়ামালুনা) কাজ (আমালান) ছাড়াও (দুনা) ওইটা (জালিকা) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) ছিলাম (কুননা) তাহাদের জন্য (লাহম) রক্ষাকারী (সংরক্ষণকারী, হেফাজতকারী, তত্ত্বাবধানকারী) (হাফেজিন)।

এবং শয়তানদের মধ্য হইতে যাহারা ডুবুরির কাজ করিত তাহার জন্য (সোলায়মানের জন্য) এবং কাজ করিত ওইটা ছাড়াও এবং আমরা (আল্লাহ) ছিলাম তাহাদের জন্য রক্ষাকারী।

এই আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে এবং ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে শয়তান শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে জিন, অথচ এই আয়াতে জিন শব্দটির নামগন্ধও নাই। কিন্তু শয়তান জিনজাতি হতে আগমন করেছে বলেই পাইকারিভাবে জিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতেই আমরা দেখতে পাই যে, জিনজাতির মধ্যেও আল্লাহর ওলি, ভালো এবং মন্দ সবই ছিল ॥ যে রকম মানবজাতির মধ্যেও পাওয়া যায়। জিনজাতির মধ্যে নবি-রসূল আছেন কি না জানি না, তবে আল্লাহর ওলি যে আছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং শয়তান বলতেই যে সমস্ত জিনজাতিকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা লিখতে হবে বা বলতে হবে, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ বিশেষ অবাধ্যতার প্রতীকরূপেও শয়তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিশেষ অবাধ্যতার প্রতীকটি যেভাবে জিনজাতির মধ্যে আছে তেমনি মানবজাতির মধ্যেও অনেক আছে। এখানে যারা আল্লাহর বিশেষ অবাধ্য তাদেরকেই শয়তানরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহর এই অবাধ্যরা হজরত সোলায়মানের (আ.) জন্যে ডুবুরির কাজ করত এবং এই কাজ ছাড়াও আরও অনেক রকম কাজ করত। যেহেতু এই বিশেষ অবাধ্যরা তথা শয়তানেরা ডুবুরির কাজ এবং আরও অন্যান্য কাজ হজরত সোলায়মানের জন্য করত এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নটি ওঠে বলেই ‘হাফেজিন’ তথা নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় আল্লাহকে দেখতে পাই।

৮৩. এবং (ওয়া) আইউব (আইউবা) যখন (ইজ্) তিনি ডাকিয়াছিলেন (নাদা) তাহার রবকে (রাব্বাহ) নিশ্চয়ই আমি (আননি) আমাকে স্পর্শ করিয়াছে (ধরিয়াছে) (মাস্‌সানি) দুঃখ-কষ্ট (দুরক্) এবং (ওয়া) তুমি (আন্তা) সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (আরহামু) সব দয়ালুদের (রাহিমিন)।

এবং আইউব (আ.) যখন ডাকিয়াছিলেন তাহার রবকে নিশ্চয়ই আমি আমাকে ধরিয়াছে দুঃখকষ্ট এবং তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু, সব দয়ালুদের (মধ্যে)।

৮৪. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার (আইউব) জন্য (লাহ) সুতরাং আমরা দূর করিয়া দিলাম (ফাকাশাফনা) যাহা (মা) তাহার সহিত (বিহি) হইতে (মিন) দুঃখকষ্ট (দুররিউ) এবং (ওয়া) আমরা তাহাকে দিলাম (আতাইনাহ) তাহার পরিবারকে (আহ্লাহ) এবং (ওয়া) তাহাদের মতো (মিস্লাহম) তাহাদের সহিত (মাআহম) রহমতরূপে (রাহ্মাতাম) হইতে (মিন) আমাদের (আল্লাহর) পক্ষ (ইন্‌দিনা) এবং (ওয়া) জিকির (জিক্রা) এবাদতকারীদের জন্য (লিল্‌ আবেদিন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) সাড়া দিয়াছিলাম তাহার (আইউব) ডাকে, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) দূর করিয়া দিলাম যাহা তাহার সাথে দুঃখকষ্ট হইতে এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাকে দিলাম তাহার পরিবারকে এবং তাহাদের মতো তাহাদের সাথে রহমতরূপে আমাদের (আল্লাহ) পক্ষ হইতে এবং এবাদতকারীদের জন্য জিকির।

৮৫. এবং (ওয়া) ইসমাইলকে (ইসমাইলা) এবং (ওয়া) ইদ্রিসকে (ইদরিসা) এবং (ওয়া) জুলকিফালকে (জাল্কিফলি) প্রত্যেকে (কুল্লু) হইতে (মিনাস্) সবরকারীদের (সাবরিন)।

এবং ইসমাইলকে এবং ইদ্রিসকে এবং জুলকিফালকে প্রত্যেকে সররকারীদের হইতে।

৮৬. এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে দাখিল (সামিল) করিয়াছি (আদখাল্‌নাহম) মধ্যে (ফি) আমাদের রহমতে (অনুগ্রহে) (রাহ্মাতিনা) তাহারা নিশ্চয়ই (ইন্‌নাহম) হইতে (মিনাস্) সংকর্মশীল (পুন্যকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ)-দের (সালিহিন)।

এবং আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে দাখিল (সামিল) করিয়াছি আমাদের রহমতের মধ্যে, নিশ্চয়ই তাহারা সংকর্মশীলদের হইতে।

৮৭. এবং (ওয়া) জুননুকে (মাছওয়ালাকে, ইউনুস নবিকে) (জান্নুনি) যখন (ইজ) চলিয়া গিয়াছিল (জাহাবা) ক্রুদ্ধ (রাগাবিত, রুষ্ট) হইয়া (মুগাদিবান) সুতরাং মনে করিয়াছিল (ফাজান্না) যে (আন) না (লান) ধরিতে পারিব (নাক্দিরা) তাহার উপর (আলাইহি) সুতরাং তিনি ডাকিয়াছিলেন (ফানাদা) মধ্যে (ফি) অন্ধকারে (জুলুম্মাতি) যে (আন) নাই (লা) কোনো ইলাহ (ইলাহা) একমাত্র (ছাড়া) (ইল্লা) তুমি (আন্তা) ভাসমান (সুবহানাকা) নিশ্চয়ই আমি (ইন্নি) ছিলাম (কুনতু) হইতে (মিনাজ্জ) জালিমদের (সীমালজ্জানকারীদের) (জালেমিন)।

এবং যখন ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল জুননুকে সুতরাং মনে করিয়াছিল যে ধরিতে পারিব না তাহার উপর সুতরাং তিনি ডাকিয়াছিলেন অন্ধকারের মধ্যে যে নাই কোনো ইলাহ তুমি ছাড়া, তুমিই ভাসমান, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম জালিমদের হইতে।

৮৮. সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) তাহাকে আমরা উদ্ধার করিয়াছিলাম (নাজ্জাইনাহ) হইতে (মিন) দুশ্চিন্তা (উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা) (গাম্মিনি) এবং (ওয়া) ওইরূপেই (কাজালিকা) আমরা উদ্ধার করি (নুন্জিল) মোমিনদেরকে (মুম্মিনিন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিলাম তাহার জন্য এবং তাহাকে আমরা উদ্ধার করিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং ওইরূপেই আমরা উদ্ধার করি মোমিনদেরকে।

এ -আয়াতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, আল্লাহ ইমানদারদেরকে উদ্ধার করার কথাটি না বলে তথা আম্মানুদের কথাটি না বলে বলা হলো, 'মোমিনদেরকে উদ্ধার করি।' এবং 'ওইরূপে' না বলে 'জালিকা' তথা 'ওইরূপে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'আম্মানু' তথা ইমানদার এবং 'মোমিন'-দের মাঝে যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আমরা দেখতে পাই উহাই এই আয়াতে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ আল্লাহ আম্মানুদের সঙ্গে থাকেন, এ রকম

একটি আয়াতও কোরান-এ নাই, বরং মোমিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে।

৮৯. এবং (ওয়া) জাকারিয়াকে (জাকারিয়া) যখন (ইজ্) তিনি ডাকিয়াছিলেন (নাদা) তাহার রবকে (রাব্বাহ) হে আমার রব (রাব্বি) না (লা) আমাকে ছাড়িও না (তাজারনি) একাকী (ফার্দাও) এবং (ওয়া) তুমি (আন্তা) উত্তম (খাইরু) উত্তরাধিকারীদের (ওয়ারেসিন)।

এবং জাকারিয়াকে যখন তিনি তাহার রবকে ডাকিয়াছিলেন, (হে) আমার রব, আমাকে (একাকী) ছাড়িও না, এবং উত্তরাধিকারীদের তুমিই উত্তম।

৯০. সুতরাং আমরা ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম (ফাস্তাজাবনা) তাহার জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) আমরা দিয়াছিলাম (ওয়াহাবনা) তাহার জন্য (লাহ) ইয়াহিয়াকে (ইয়াহইয়া) এবং (ওয়া) আমরা উপযোগী (উপযুক্ত, কার্যকর, অনুকূল) করিয়াছিলাম (আস্লাহনা) তাহার জন্য (লাহ) তাহার স্বীকে (জাওজাহ) নিশ্চয়ই তাহারা (ইন্নাহম) ছিল (কানু) প্রাণপণ (স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত) পণ করিয়া কার্যসাধনের সঙ্কল্পপূর্ণ) চেষ্ঠা (ইউসারিউন্) মধ্যে (ফি) ভালো কাজগুলিতে (খাইরাতি) এবং (ওয়া) আমাদেরকে ডাকিত (ইয়াদ্উনানা) আগ্রহ (ঐকান্তিক ইচ্ছা, বশেষতা) (রাগাবাও) এবং (ওয়া) ভীতি (ভয়, শঙ্কা) সহকারে (রাহাবান) এবং (ওয়া) ছিল (কানু) আমাদের কাছে (লানা) ভীত (খাশিয়িন)।

সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম তাহার জন্য এবং আমরা দিয়াছিলাম ইয়াহিয়াকে তাহার জন্য এবং আমরা উপযোগী করিয়া দিয়াছিলাম তাহার জন্য তাহার স্বীকে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণপণ (চেষ্ঠা) করিত ভালো কাজগুলির মধ্যে এবং আগ্রহ (লইয়া) আমাদেরকে (আল্লাহকে) ডাকিত এবং ভীতি সহকারে এবং তাহারা ছিল আমাদের (আল্লাহ) কাছে ভীত।

৯১. এবং (ওয়া) যে (ল্লাতি) রক্ষা করিয়াছিল (সংরক্ষণ করিয়াছিল, বজায় রাখিয়াছিল, টিকাইয়া রাখিয়াছিল) (আহসানাত্) তাহার কামপ্রবৃত্তিকে (তাহার সতীত্বকে, যৌন সম্বোগকে) (ফারজাহা) সুতরাং আমরা (আল্লাহ) ফুৎকার দিয়াছিলাম (ফানাফাখনা) তাহার (মরিয়ম) মধ্য (ফিহা) হইতে

(মিন) আমাদের রুহ (রুহিনা) এবং (ওয়া) তাকে বানাইয়াছিলাম (জাআলনাহা) এবং (ওয়া) তাহার পুত্রকে (আবনাহা) একটি আয়াত (নিদর্শন) (আয়াতাল) জন্য (লিল) সমস্ত আলমের (বিশ্ববাসীদের) (আলআমিন)।

এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য।

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, আল্লাহ কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই রুহ ফুৎকার করেন না, বরং মানুষের তৈরি সমাজে অবহেলিত নারীর মধ্যেও আল্লাহর রুহ ফুৎকার করেন। নারী জাতিকে দুর্বল পেয়ে পুরুষরা নারীদেরকে সমাজের বুকে তেমন মর্যাদা দেয় না, কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফুৎকার করেন। যদি সেই নারী রুহ ফুৎকার করার উপযুক্ততা আল্লাহর দৃষ্টিতে পাবার যোগ্য হন তা অবশ্যই রুহ ফুৎকার করা হয়। আমরা কোরান হতে জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রথম রুহ ফুৎকারটি আদমের মধ্যে করেছিলেন। আরও একটু ভালো করে লক্ষ করুন যে, এখানে তথা এই আয়াতে নফস ফুৎকার করার কথাটি বলা হয় নি, এবং নফস ফুৎকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আল্লাহর কোনো নফস নাই। যেহেতু আল্লাহর কোনো নফসই নাই, সুতরাং ফুৎকার দেবার প্রশ্নই ওঠে না। নফস জীবন-মৃত্যুর অধীন। নফস সুখ-দুঃখ ভোগ করে। নফসের ক্লান্তি-অবসাদ-ঘুম-আলস্য আছে। সুতরাং আল্লাহ এইসব বিষয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে তথা মৃত্যু-ঘটনাটির মুখোমুখি নফসটিকেই হতে হয়, যাকে আমরা বাংলায় জীবাত্মা বলে থাকি। প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, বলা হয়েছে কোরান-এ, কিন্তু কোরান মৃত্যুতে নফসটি ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটি একবারও বলে নি। যেমন কোরান বলছে, কুললু নাফসুল জায়েকাতুল মউত, তথা প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু ‘তাবাকাতুল মউত’ তথা মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এই কথাটি বলা হয় নি। ‘জায়েক’ অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা, চেখে দেখা। মা-বোনেরা তরকারিতে লবণ হয়েছে কি না তরকারির

শুরুয়া চেখে দেখলে বুঝতে পারেন। সেই রকম প্রতিটি নফসকে মৃত্যু-ঘটনাটি কেমন উহা চেখে দেখতে হবে। যেহেতু রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নহে, রুহ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে না, সেই হেতু রুহকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। যেমন ‘কুল্লু রুহিন জায়েকাতুল মাউত’ অর্থাৎ প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এই কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। গায়েব জোরে গুপ্তা হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। যারা রুহকেও সৃষ্টির আওতায় এনে ‘বুরানি মাখলুক’ তথা নুরের সৃষ্টি বলতে চায় এবং ব্যাখ্যা করতে চায়, তাদেরকেও বলার কিছু থাকে না। কারণ তকদীর তাকে অথবা তাদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে দেয় না। আরও লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ এক হয়েও ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রুহ শব্দটি কোরান-এ কোথাও বহুবচনে ব্যবহার করা হয় নি। আল্লাহর রুহ কেবলমাত্র ইসা (আ.)-এর মাকেই ফুৎকার করেন নি, বরং তাহার পুত্রকেও ইসা (আ.) (অনেকে যিশু খ্রিস্টও বলে থাকেন) রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন। কোরান -এ ‘ওয়া আরনাহা’ ॥ ‘এবং তাহার পুত্রকেও’ রুহ ফুৎকার করেছেন বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান মরিয়ম-এর পুত্রকেও সমস্ত আলমের জন্য একটি আয়াত করে রেখেছেন তথা ‘আইয়াতাল্লিল্ আল আমিন।’ আল্লাহর প্রতিটি আয়াতই একেকটি বিস্ময়, কিন্তু ইসা (আ.) হলেন আল্লাহর একটি বিস্ময়ের বিস্ময় নামক আয়াত। কারণ ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেই কথা বলেছিলেন এবং দোলনায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথা বলেছেন এরও নিদর্শন আমরা দেখতে পাই এবং আরও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাই, যেমন ॥ হজরত ইসা (আ.) জন্মান্নকে চক্কু দান করেছেন, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছেন এবং যে বিষয়টি সবচেয়ে বিস্ময়কর : মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং মাটির তৈরি একটি পাখি, যার মধ্যে নফস নাই তথা জীবনই নাই, সেই পাখিটিকে ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে গেল এবং ইসা (আ.)-র সাহাবারা কে কী দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন সেটাও বলে দিতে পারতেন এবং সাহাবাদের ঘরের ভেতর কী কী আছে তাও পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে হজরত ইসা (আ.)-এর এলমে গায়েব জানবার পরিষ্কার দলিলটি পেলাম, সেখানে মহানবি এলমে গায়েব জানতেন না

বলাটা যে একটি কুফরি আকিদা, এটা অনেকেই বুঝেও বোঝেন না। যারা বুঝেও বোঝেন না তাদেরকেই বা কী করে দোষারোপ করব? কারণ ইহা তাদের তকদির। মহানবি আবু জাহেলের হাতের মুঠোর পাথরকণাগুলোকে কলেমা পাঠ করালেন, যে পাথরকণার নফস থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে কোরান-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মূল বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহানবি সম্পর্কে যা তা বলাটাকে সমীচীন মনে করি না।

৯২. নিশ্চয়ই (ইন্না) এই যে (হাজিহি) তোমাদের উম্মত (জাতি) (উম্মাতুকুম) উম্মত (জাতি) (উম্মাতাউ) একই (ওয়াহিদাতাউ) এবং (ওয়া) আমি (আনা) তোমাদের রব (রাব্বুকুম) সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো (ফাবুদুন)।

নিশ্চয়ই এই যে তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত করো।

পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতি যে আসলে একই জাতি ইহাই কোরান বলেছে। পৃথিবীর সব মানুষ একই জাতির হয়েও এত বিভিন্নতা দেখতে পাই কেন? প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ অবশ্যই হেদায়েত করার জন্য সেই উম্মতের বিশ্বস্ত ভাষায় নবি-রসূল পাঠিয়েছেন, মানুষকে হেদায়েত করার জন্য। অনেক উম্মতের অনেক রকম ভাষায় নবি-রসূল পাঠানোর দরুন এবং সেই উম্মতের পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেই নবি-রসূলেরা হেদায়েত করে গেছেন। হেদায়েত করার প্রশ্নে প্রতিটি উম্মতের নিজস্ব প্রয়োগ-পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকাটি একান্ত স্বাভাবিক এবং এই প্রয়োগ-পদ্ধতির বিভিন্নতা নিয়েই যত মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। তাই অন্যত্র কোরান আমাদেরকে এই বলে শিক্ষা দিচ্ছে যে, কোনো নবি-রসূলকে ছোট-বড় করতে যেয়ো না অথবা পার্থক্য করো না। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটির দরুন মতপার্থক্য, ভেদাভেদ, ছোটবড় ইত্যাদি করাটি একান্ত স্বাভাবিক। মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান থাকার দরুন অনেক ধরনের কুমন্ত্রণা প্রতিনিয়ত দিয়ে চলছে। এবং শয়তানের এই অনেক রকম কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়ে মানুষ সঠিক পথের পরিচয় জানতে গিয়ে দিশেহারা হতে অনেকটা বাধ্য হয়। কোনটা শয়তানের কথা আর কোনটা শয়তানমুক্ত

নফসের কথা ইহা ধরাটাও একটি সামাজিক বিষয়। শয়তান যে প্রতিটি মানুষের ভেতর আপন নফসের সঙ্গেই জড়িয়ে থেকে কত রকম বিভ্রান্তি প্রতিনিয়ত ছড়াচ্ছে তার হিসাব রাখার প্রশ্নটি তো একদম অবান্তর। কিন্তু কিছুটা বুঝ তখনই আসতে পারে যখন মানুষ এবাদতের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি হতে আন্তরিক মুক্তি কামনা করে। তাই আল্লাহ বলছেন ‘আম্মারই এবাদত করো’ তথা ‘ফাবুদুন’। যদিও আম্মরা একই উন্নত হতে এসেছি, কিন্তু এখন আর আম্মরা একের মধ্যে থাকতে পারছি না, তাই কোরান বলছে যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে নবি-রসূল পাঠিয়ে সেই কওমের ভাষায় সেই কওমের কৃষ্টি-কালচারের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েত করা হয়। পাঠকদের কিছুটা ধারণা দিতে পারি কি না সেই জন্য কোরান-এর সূরা বাকারার ২৮৫ নম্বর আয়াতটি দেখতে বলছি। আবার, সূরা নেসার ১৬৪ নম্বর আয়াতটিও দেখতে পারেন। আবার, সূরা ইউনুস-এর ৪৭ নম্বর আয়াতটিও পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা রাদ-এর ৭ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা ইউবাহিম-এর ৪ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা নহল-এর ৩৬ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা ফাতির-এর ২৫ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। আবার, সূরা মোমিন-এর ৭৮ নম্বর আয়াতটি পড়ে দেখতে পারেন। অধম লিখকের অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু ধরতে পেরেছি সেটুকুই আপনাদেরকে অকপটে তুলে ধরলাম।

৯৩. এবং (ওয়া) তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল (তাকাত্তাও) তাহাদের কার্যকলাপ (আম্মরাহম) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) প্রত্যেকে (কুল্লুন) আম্মাদের (আল্লাহ) দিকেই (ইলাইনা) ফিরিয়া আসিবে (রাজিউন)।

এবং তাহাদের কার্যকলাপ (একটি ধর্মের প্রশ্নে) তাহাদের মাঝে (সুসম্পর্কের প্রশ্নে) তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই আম্মাদের (আল্লাহ) দিকেই ফিরিয়া আসিবে।

৯৪. সুতরাং যে (ফাম্মাই) আম্মল (কাজ) করিবে (ইয়াম্মাল) হইতে (মিনাস) সালেহ করে (ন্যায়পরায়নতা, নিরপেক্ষতা) (সালিহাতি) এবং (ওয়া) তিনি (হয়া) মোমিন (মুমিনুন) সুতরাং না (ফালা) ব্যর্থ হইবে (কুফরানা)

তাহার চেষ্টার জন্য (লিসাইহি) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্না) তাহার জন্য (লাহ) লিখক (কাতিবুন)।

সুতরাং যে আমল করিবে সালাহ হইতে এবং যে মোমিন সুতরাং ব্যর্থ হইবে না তাহার চেষ্টার জন্য এবং আমরা (আল্লাহ) নিশ্চয়ই তাহার জন্য লিখক।

৯৫. এবং (ওয়া) হারাম (নিষিদ্ধ) (হারামুন) উপরে (আলা) লোকালয় (জনপদ) (কারইয়াতিন) আমরা (আল্লাহ) যাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি (আহলাক্নাহা) তাহারা যে (আননাহম) না (লা) ফিরিয়া আসিতে পারিবে (ইয়ারজিউন)।

এবং (কোনো) লোকালয়ের উপরে হারাম আমরা (আল্লাহ) যাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি তাহারা যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

৯৬. যে পর্যন্ত না (যতদিন না) (হাত্তা) যখন (ইজা) রেহাই (মুক্তি, পরিব্রাণ, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি) দেওয়া হইবে (ফুতিহাত্) ইয়াজুজ (ইয়াজুজু) এবং (ওয়া) মাজুজকে (মাজুজু) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) হইতে (মিন) প্রত্যেক (এক এক করিয়া) (কুল্লি) উচ্চ ভূমি (উঁচু মাটি, জমি) (হাদাবিন) ছুটিয়া আসিবে (ইয়ান্সিলুন)।

যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ এবং মাজুজকে যখন মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উচ্চভূমি হইতে প্রত্যেকে ছুটিয়া আসিবে।

অধম লিখক এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলান্ন না। কারণ ইহা আমার জানা নাই। ইয়াজুজ-মাজুজ সম্বন্ধে অনেক তফসিরকারক অনেক রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তাদেরকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু আমি ইহার ম্লেজাজি এবং হাকিকি অর্থটি কী হবে কিছুই বুঝতে পারলান্ন না। অনুমানের গুলমারা বিদ্যা জাহির করে কিছু একটা লিখতে আমার বিবেক প্রচণ্ড রকমের বাধা দেয়, তাই অনুমানের ব্যাখ্যাটিও লিখতে পারলান্ন না।

৯৭. এবং (ওয়া) নিকটবর্তী (আসন্ন, নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত, সমীপবর্তী) হইবে (আক্তারাবা) ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা) (ওয়াদুল) সত্য (ঠিক, যথার্থ, নির্ভুল, প্রকৃত) (হাক্কু) সুতরাং যখন (ফাইজা) তখন (হিয়া) বিস্তারিত (ভয়াবহ আকার ধারণ) হইবে (শাখিসাতুন) চোখগুলি (চক্সুমূহ) (আব্সোয়ারু) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি

করিয়াম্বিল (কাফার) আম্মাদের দুৰ্ভোগ (দুৰ্গতি, লাঞ্ছনা, কষ্ট) হায় (ইয়াওয়াইলানা) নিশ্চয়ই (কাদ) আম্মরা ছিলাম্ব (কুন্না) ম্বে (ফি) গাফলতির (অমনোযোগের, অবহেলার, কুঁড়েমির) (গাফ্লাতিম্ব) হইতে (মিন) এইটা (হাজা) বরং (বাল) আম্মরা ছিলাম্ব (কুন্না) জালিম্ব (সীমালঙ্ঘনকারী) (জালিম্বিন)।

এবং সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হইবে সুতরাং যখন চোখগুলি বিস্তারিত হইবে তখন যাহারা কুফরি করিয়াম্বিল (এবং বলিবে) হায় আম্মাদের দুৰ্ভোগ নিশ্চয়ই গাফলতির ম্বে আম্মরা ছিলাম্ব এইটা হইতে বরং আম্মরা ছিলাম্ব জালিম্ব।

ওয়াদার সত্যটি যখন কাছে আসবে তখন কাফেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে ॥ এই কথাটির দ্বারা মানুষের মৃত্যু-ঘটনা নামক ছোট কেয়ামতটিকেই বোঝানো হয়েছে। মৃত্যু-ঘটনা নামক ছোট কেয়ামতটি যখন উপস্থিত হয়, সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তথা পরিষ্কার বুঝতে পারে। তখন বিপথগামীরা নিজেরাই সব কিছু অকপটে মেনে নেয় এবং মেনে নিতে বাধ্য। তাই বিপথগামীরা বলে ফেলে যে, আম্মরা অলসতার ম্বে ভুবেছিলাম্ব এবং আম্মরা যে জালিম্ব ছিলাম্ব এতে কোনো সন্দেহ নাই।

৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা (ইন্নাকুম্ব) এবং (ওয়া) যাহাদের (মা) তোমরা এবাদত করিতে (তাবুদুনা) হইতে (মিন) ছাড়া (দুনি) আল্লাহ (আল্লাহ) ইক্বন (আগুন জ্বলাইবার উপকরণ) (হাসাবু) জাহান্নামে (জাহান্নামা) তোমরা (আনতুম্ব) তাহাতে (লাহা) প্রবেশকারী (যে ভিতরে ঢোকে, প্রবেশক) (ওয়ারিদুন)।

নিশ্চয়ই তোমরা এবং যাহাদের হইতে তোমরা এবাদত করিতে আল্লাহ ছাড়া (বিনা, ব্যতীত) তোমরা জাহান্নামের আগুন জ্বলাইবার উপকরণ (হইবে) (এবং) তাহাতে প্রবেশকারী (হইবে)।

আপন আপন প্রবৃত্তি নামক মূর্তিগুলি যারা প্রতিনিয়ত পূজা করছে তথা এবাদত করছে ॥ সেই মূর্তিগুলি মেজাজিই হোক আর হাকিকিই হোক ॥ তাতে আল্লাহর এবাদত হয় না, বরং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

৯৯. যদি (লাউ) হইত (কানা) এইসব (হাউলাই) ইলাহ (কর্তা, নেতা, অধিকারী, মাবুদ) (আলিহাতাম্ম) না (মা) তাহাতে প্রবেশ করিত (ওয়ারাদুহা) এবং (ওয়া) প্রত্যেকে (কুললুন) ইহার মধ্যে (ফিহা) স্থায়ী (পাকাপোক্ত, প্রতিষ্ঠিত, স্থির) হইবে (খালিদুন)।

যদি এইসব পূজা করিবার (যোগ্য) হইত (তাহা হইলে) তাহাতে প্রবেশ করিত না এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেকে স্থায়ী হইবে।

১০০. তাহাদের জন্য (লাহম্ম) ইহার মধ্যে (ফিহা) কানফাটা আর্থনাদ (কাতর বা আকুল চিৎকার) (জাফিরু) এবং (ওয়া) তাহারা (হম্ম) ইহার মধ্যে (ফিহা) না (লা) শুনিত পাইবে (ইয়াস্মাউন)।

তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে (থাকিবে) কানফাটা আর্থনাদ এবং তাহারা ইহার মধ্যে শুনিত পাইবে না (কিছুই)।

১০১. নিশ্চয়ই (ইন্ন) যাহাদের (লাজিনা) প্রথম (পূর্ব) হইতে নির্ধারিত হইয়াছে (সাবাকাত্) তাহাদের জন্য (লাহম্ম) আমাদের (আল্লাহ) হইতে (মিন্‌নাল) সৌন্দর্য (ভাল, শুভ, মঙ্গলকর, উপযুক্ত) (হসনা) ওইসব লোকে (উলাইকা) তাহা হইতে (আনহা) দূরে রাখা হইবে (মুব্বাদুনা)।

নিশ্চয়ই আমাদের (আল্লাহ) হইতে সৌন্দর্য প্রথম হইতেই নির্ধারিত হইয়াছে যাহাদের (জন্য) তাহাদের জন্য (এবং) ওইসব লোকে তাহা (জাহান্নাম) হইতে দূরে রাখা হইবে।

প্রথম থেকেই অথবা পূর্বেই নির্ধারিত করা আছে যাদের জন্য সৌন্দর্যের রহমত তাদেরকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জীবনটি কি পূর্বের কর্মফলের জীবন? যদি কর্মফল বলি তা হলে মৃত্যু নামক কেয়ামত ঘটে যাবার পর আবার অন্য দেহ-নামক পোশাক ধারণ করে আসবার কথাটি বুঝতে চাই। কারণ, প্রথম থেকেই যাদের উপর আল্লাহর অশেষ সৌন্দর্যটি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে ॥ কথাটির দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন উহা বুঝতে পারলাম না। কারণ তা হলে বলতে হয় যে আমার জন্মটাই একটা বিরাট আশীর্বাদ নতুবা একটি বিরাট অভিশাপ নতুবা একটি স্থিরকৃত তকদির। ধরে নিলাম এই আয়াতটির অর্থ এ রকমই হবে, তা হলেও আমার বলার কিছুই থাকে না, কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ

যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করতে পারেন। ভালো কাজই নিয়তের হেরফেরে জাহান্নামে যাবার পথ করে দেয়, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কাজটি তো ভালোই করেছে। কিন্তু এই ভালো কাজের ভিতর নিশ্চয়ই নিয়তের হেরফের ছিল। আসলে এই আয়াতের অর্থটি কোন দিক দিয়ে কোন পথে নিতে হবে অধম লিখকের তা জানা নাই, তাই এই আয়াতের মর্মার্থটি অধম লিখক উদ্ধার করতে পারলান না।

১০২. না (লা) তাহারা শুনিতে পাইবে (ইয়াস্মাউন) সামান্যতম শব্দ (হাসিসাহা) এবং (ওয়া) তাহারা (হম) মধ্যে (ফি) যাহা (মা) চাইবে (আশতাহাত) তাহাদের নফস (আনফুসুহম) স্থায়ী হইবে (খালিদুন)।

ল্ট তাহারা শুনিতে পাইবে না (জাহান্নামের) সামান্যতম শব্দ এবং তাহারা (ইহার) মধ্যে যাহা চাইবে তাহাদের নফস প্রতিষ্ঠিত (স্থায়ী) হইবে।

‘ভোগ’ শব্দটি ব্যাপকরূপে ব্যবহৃত হয়। জাহান্নামেও ভোগ আছে : এই ভোগ শাস্তির ভোগ, নির্যাতনের ভোগ, লাঞ্ছনার ভোগ। রূপক ভাষায় তথা মেজাজিরূপে এই ভোগকে পুঁজ, রক্ত, পচা মাংস ইত্যাদিও বলা হয়। খাদ্যগ্রহণ করাটাও একটা ভোগ। জান্নাতেরও ভোগ আছে, তবে জান্নাতের ভোগে অনাবিল আনন্দ থাকে। তাই জান্নাতের ভোগটিকে বলা হয় সুখের ভোগ, মুক্তির ভোগ। পরক্লে, জাহান্নামের ভোগটিকে বলা হয় দুঃখের ভোগ। যারা জান্নাতবাসী হবে তাদের জাহান্নামের কোনো শাস্তি নামক ভোগ পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং জাহান্নামের সামান্য শব্দটিও শুনে পাবে না। জান্নাতীদের নফস এর জান্নাতের সুখভোগ পাবার কথাটি এখানে বলা হয়েছে। এবং এই পাওয়াটা অস্থায়ী মোটেই নয়, বরং স্থায়ী। জান্নাতে প্রবেশ করলেও জান্নাতের নফসটি হারিয়ে যায় না, বরং সব রকম কলুষতা হতে মুক্তি লাভ করে। জান্নাতের ভোগে নিজের নফসের সুখভোগটি কোনো বন্ধন নয়, কারণ কলুষিত কামনার স্থান জান্নাতে নাই। সুতরাং এ রকম ভোগটিকে ভোগ না বলে মুক্তি পাবার কথাটি বলা চলে। যেহেতু জান্নাতে দুঃখভোগের প্রশ্ন ওঠে না, সেইহেতু জান্নাতে বাস করা প্রতিটি নফস সর্বপ্রকার কলুষতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়। জান্নাতের ভোগটি আসলে কোনো ভোগই নয়। ভোগ শব্দটি এখানে রূপক তথা মেজাজি। রূপক তথা মেজাজি না থাকলে আসল তথা হাকিকির রূপটি

ধরতে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন, মেজাজি হজ আছে বলেই হাকিকি হজের কথাটি কিছু জ্ঞানী লোক বুঝতে পারে। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি আপন গুরুকে ভক্তি এবং তোয়াফ করাটাকেই আসল তথা হাকিকি হজ বলে ঘোষণা করেছেন। তবে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি রূপক তথা মেজাজি হজটিকেও গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কারণ সমাজে আম জনতা রূপক তথা মেজাজিটিকেই ধরে রাখে এবং মেজাজিটাকেই একমাত্র সত্য মনে করে। সুতরাং জ্ঞানাত অর্থ হলো আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানকে মুক্ত করে দেওয়া, যাকে অনেক রকম ভাষায় বলা হয় আমিত্ত্ব, অহং, অহংবোধ, খুদি, হাস্তি, ইগো – ইত্যাদি। আসলে অনেকগুলো শব্দ, মূল বিষয়টি একই। জল, পানি, ওয়াটার, একোয়া, সুই, তান্নি, এবং আব শব্দগুলো ভিন্নভিন্ন, কিন্তু সবই এক পানির প্রতিশব্দ।

১০৩. না (লা) তাহাদেরকে ভাবিত (চিহ্নিত, উদ্ভিন্ন) করিবে (ইয়াহজুনুহ্মুল) ভীতি (ভয়, শঙ্কা, ভ্রাস) (ফাজাউল) চরম (চূড়ান্ত, কঠিনতম, মৃত্যুকালীন) (আকবারু) এবং (ওয়া) তাহাদেরকে অভ্যর্থনা (সংবর্ধনা, সম্ভাষণ, আপ্যায়ন) করিবে (তাআলাক্কাহম) ফেরেশতারা (মালাইকাতু) এই (হাজা) তোমাদের দিন (ইয়াওমুকুম) যাহারা (আল্লাজি) তোমাদেরকে (কুনতুম) ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) করা হইয়াছিল (তুয়াদুন)।

তাহাদেরকে চিহ্নিত করিবে না চরম ভীতি এবং তাহাদেরকে ফেরেশতারা অভ্যর্থনা করিবে (এই বলিয়া), এই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হইয়াছিল।

এই আয়াতে মৃত্যু-ঘটনাটিকেই চরম ভীতির দিবস বলা হয়েছে। মরে যাবার আগেও মারা যাওয়াটাকে বলা হয়, মৃতু কাব্লা আন্তামুত্ তথা ‘মরার আগে মরে যাও।’ মৃত্যু-ঘটনাটি একবারই ঘটে। সুতরাং যারা মারা যাবার আগে মরে যায় তাদের আর মরণভীতি থাকে না। যদিও মরণভীতিটা একটা চরম ভীতি। এই চরম ভীতিটি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে সাধক যখন অতিক্রম করতে পারে, এবং এই অতিক্রমের সময়ে সাধকদের ভয়ভীতি থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু অতিক্রম করা-মাত্র আর কোনো ভয়ভীতি থাকে না, কারণ এটাকেই বলা হয় মরার আগে মরে যাওয়া। এই মরার আগে মরে যাওয়ার ধ্যানসাধনাটি মোটেও একটা মামুলি বিষয় নয়। কারণ খান্নাসরূপী

শয়তানজনিত নফসটি জেহাদের সাধনায় সব সময় মশগুল থাকে এবং এই জেহাদে যারা লিপ্ত থাকে তাদের আর মরণ নাই, কারণ মরণকে জয় করতে পারলে হয় জেহাদ, নতুবা উহা হয় রূপক জেহাদ, মেজাজি জেহাদ এবং লোক দেখানো জেহাদ। কোরান-এর অন্য এক সূরায় আছে যে, এই জেহাদে যারা কামিয়াব হয় তাদের উপর শক্তিশালী রুহ এবং ফেরেশতাদের নাজেল করা হয় তথা পাঠানো হয়। সুতরাং যারা জীবিত থেকেও মরে যাবার ধ্যানসাধনাটিতে কামিয়াব হয়েছে তাদের আর কোনো ভয়ভীতি থাকে না। যদিও মৃত্যু-ঘটনাটিতে একটি চরম ভীতির সম্মুখীন হতে হয়, এই চরম ভীতিটি অতিক্রম করে যেতে পারলেই সাধক দেখতে পায়, তার কাছে অনেক ফেরেশতা পাঠানো হয়ে থাকে এবং সেইসব ফেরেশতারা নানা রকম শুভ সংবাদ জানিয়ে অভ্যর্থনা করে। এই আয়াতে ফেরেশতাদের অভ্যর্থনার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু রুহ পাঠানো তথা নাজেলের কথাটি বলা হয় নি। এই জন্য এই আয়াতটিকে ভবিষ্যৎকালের মধ্যে ফেলা হয়েছে। আসলে বর্তমান কাল বলে কিছুই নাই, একটি মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে বর্তমান কালটি দাঁড়িয়ে অতীত কালের দিকে চলে যায়। সুতরাং ভবিষ্যৎ আর অতীত কালই হলো আসল কাল। বর্তমান কালটি এতই ছোট যে একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে অতীত কালের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। তাই আল্লাহর মহাপ্রতিশ্রুতির কথাটি এই আয়াতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরও সৌন্দর্যবর্ধন করেছে।

১০৪. সেইদিন (ইয়াওম) আমরা গুটাইয়া ফেলিব (নাফিস) আকাশকে (সাম্মাআ) যেমন গুটানো (কাতায়িস) দফতর অথবা খাতা (সিজিল্লি) জন্য লিখিত (লিল্কুতুবি) যেমন (কাম্মা) আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (বাদানা) প্রথম (আউয়ালা) সৃষ্টি (খাল্কিন) তাহা আমরা পুনরায় সৃষ্টি করিব (নুইদুহ) ওয়াদা (ওয়াদান) আমাদের উপর (আলাইনা) নিশ্চয়ই আমরা (ইন্না) আমরা হইলাম (কুন্না) সম্পাদনকারী (ফাইলিন)।

ল্ট আকাশকে যেদিন আমরা (আল্লাহ) গুটাইয়া ফেলিব লিখিত দফতর বা খাতা যেমন গুটানো (হয়) যেমন আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি প্রথম সৃষ্টি তাহা আমরা (আল্লাহ) পুনরায় সৃষ্টি করিব। আমাদের (আল্লাহ) দায়িত্ব (এবং) ওয়াদা আমরা নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) হইলাম সম্পাদনকারী।

এই আয়াতটিতে যে-আকাশকে কাগজ গুটানোর মতো আল্লাহ গুটিয়ে ফেলবেন সেই আকাশটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভাসমান আকাশ নয়, বরং প্রতিটি নফসের তথা মনের আকাশকে গুটিয়ে ফেলার কথাটি বলা হয়েছে। প্রতিটি মনের আকাশকে গুটিয়ে ফেলার অর্থটি হলো জীবনের সব রকম চাহিদাগুলো মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা তথা ছোট কেয়ামতের দ্বারা গুটিয়ে ফেলা তথা সমাপ্ত করে দেওয়া। সৌরমণ্ডলের জন্ম যদি কমপক্ষে ৥ বিজ্ঞানীদের মতে ৥ সাড়ে তিন হাজার কোটি বছর হয় তা হলে শূন্য আকাশের জন্মটির বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজও কিছু বলে নি। এই আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর তা হলো, যেমন প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই রকম পুনরায় সৃষ্টি করা। ইহাতে কখনওই ভাসমান গ্রহ-নক্ষত্রের আকাশটির কথা বলা হয় নি, বরং প্রতিটি মানুষের মনের আকাশের কথা বলা হয়েছে। তাই এই বিষয়টিতে প্রথম সৃষ্টির মতো পুনরায় একই রকম সৃষ্টি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

১০৫. এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (লাকাদ্) আমরা (আল্লাহ) লিখিয়াছিলাম (কাতাবনা) মধ্যে (ফি) জাবুর (আসমানি গ্রন্থ) (জাবুরি) হইতে (মিন) পরে (বাদি) জিকিরের (জিকরি) যে (আননাল) জমিনের (আরদা) তাহার উত্তরাধিকারী হইবে (ইয়ারিসুহা) আমার বান্দা (ইবাদিয়াস্) সালেহিন (সৎকর্মশীল) (সালিহন)।

এবং নিশ্চয়ই জবুরের মধ্যে আমরা লিখিয়াছিলাম জিকির হইতে পরে যে-জমিনের উত্তরাধিকারী হইবে (সেই হইবে) আমার (আল্লাহর) সালেহিন (সৎকর্মশীল) বান্দা।

এই আয়াতটির ‘আর্দ’ বলতে কি জমিন বোঝানো হলো না দেহ বোঝানো হলো এটা পরিষ্কার হলো না। কারণ সালেহিন তথা আল্লাহর দৃষ্টিতে সৎকর্মশীল বান্দা হওয়া মোটেই চারটিখানি কথা নয়। এই জমিনের উত্তরাধিকারী সালেহিনদের দ্বারা যদি এটা পরিচালিত এবং তাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হয় তা হলে মহাকালের একটি কাল এই যুগে ইহার লক্ষণ দেখা তো দূরের কথা, বরং চোর-চোট্টা, ডাকাত, লুচা, বদমাশ, জুয়াড়ি, ভোগী এবং এমন কোনো অসৎ কাজ নেই যাহা করে না, সেইসব জঘন্য মানুষগুলো সালেহিন তথা সৎকর্মশীলদের পোশাকের মুখোশে দুনিয়াটাকে দখল করে

রেখেছে এবং এরাই সর্ববিষয়ে বর্তমান যুগে দণ্ডমুণ্ডের কৰ্তা। অথচ আল্লাহ্ আল্লাহর সালেহিন তথা সংকৰ্মশীল বান্দাদের কৰ্তৃত্ব দেবার কথাটি ঘোষণা করেছেন। অবশ্যই মহাকালের একটি ঋণকালের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ রকম কথা বলা যায় না। কারণ এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বান্দা সালেহিনদের তথা সংকৰ্মশীলদের নেতৃত্বে এবং কৰ্তৃত্বে পরিচালিত হবেই। কারণ ইহা কোরান-এর ঘোষণা এবং কোরান নিজেই বলছে যে জুবুর নামক আসমানি কিতাব যাহা হজরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাজেল করা হয়েছিল, সেখানে সেই একই কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং মহাকালের মাঝে সামান্য একটি ঋণকালের উপর দাঁড়িয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মোটেই ঠিক নয়। বরং সেই আকাঙ্ক্ষিত সংকৰ্মশীলদের নেতৃত্ব এবং কৰ্তৃত্ব দেখার উদ্দেশ্যে অবশ্যই আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তথা সবর করতে হবে। কারণ আমরা জানি যে, আল্লাহ্ সবরকারীদের সঙ্গে অবশ্যই আছেন অথবা থাকেন।

১০৬. নিশ্চয়ই (ইন্ন) মধ্যে (ফি) ইহার (হাজা) পয়গাম (বাণী) (লাবালাগাল) কণ্ঠের জন্য (লিকাউমিন) এবাদতকারী (আবিদিন)।

নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে (আছে) পয়গাম (বাণী) এবাদতকারী কণ্ঠের জন্য।

এই বাণীর মধ্যে তথা আসমানি কিতাবগুলির মধ্যে তথা বিশেষ করে কোরানুল করিম-এর মধ্যে এই বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, এবাদতকারী কণ্ঠের জন্য ইহা একটি সামাজিক ওজনওয়ালা বাণী। এবাদতকারী কণ্ঠই এই বাণীর যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবে একদিন।

১০৭. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা পাঠাইয়াছি আপনাকে (আরসাল্নাকা) একমাত্র (ইল্লা) রহমতরূপে (রাহ্মাতান) সমস্ত আলমের জন্য (লিল্আলআমিন)।

এবং না আমরা পাঠাইয়াছি আপনাকে একমাত্র রহমতরূপে সমস্ত আলমের জন্য।

এই আয়াতে মহানবিকে রহমতরূপে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। শুধু একটি আলমের জন্য নয় এবং এমনকি দুটি আলমের জন্যও নয়, বরং আল্লাহর সমস্ত আলমের জন্য মহানবিকে রহমতরূপে পাঠানো হয়েছে। যে কণ্ঠ বা জাতি

মহানবিকে আন্তরিক অনুসরণ করবে সেই কণ্ডম তথা সেই জাতি বাহির এবং ডেতর তথা মেজাজি এবং হাকিকি উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য কণ্ডম হিশাবে অবশ্যই বিবেচিত হবে। আরেকটি কথা এসে যায় যে, মহানবিকে একটি আলমের অথবা দুইটি আলমের রহমতরূপে আল্লাহ্ চিহ্নিত করেন নি, বরং পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে মহানবি সমস্ত আলমের রহমত – সুতরাং আজ হোক আর কাল হোক, একদিন না একদিন সমগ্র পৃথিবীর কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব সেই কণ্ডমের হাতেই আসবে যারা মহানবিকে আন্তরিক অনুসরণ করবে। যে-মহানবিকে আল্লাহ্ এত বড় বিশাল রহমতটি দান করেছেন সেই রহমতপ্রাপ্ত মহানবি কী করে এলমে গায়েব জানেন না বলে অপবাদ দেওয়া হয়? এই রকম আকিদা পোষণ করাটাকে একটি কুফরি আকিদা বলে আমরা মনে করি।

১০৮. বলুন (কুল) প্রকৃতপক্ষে (মূলত, মূলে, আসলে) (ইন্নাম্মা) ওহি করা হইয়াছে (ইউহা) আমার দিকে (ইলাইয়া) যে (আননাম্মা) তোমাদের ইলাহ (ইলাহকুম) ইলাহ (ইলাহউ) এক (ওয়াহিদুন) সুতরাং কি (ফাহাল) তোমরা (আনতুম) মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী) (মুসলিমুন)।

প্রকৃতপক্ষে (আপনি) বলুন, আমার দিকে ওহি করা হইয়াছে যে, তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ সুতরাং তোমরা কি মুসলমান হইবে না?

এই আয়াতে যারা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কেবলমাত্র তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়েছে। কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নামধারী মুসলমানের কথাটি এই আয়াতে বলা হয় নি। আল্লাহর কাছে যারা আনুগত্যের মাথা অবনত করতে পেরেছেন তাদেরকেই এই আয়াতে মুসলমান বলা হয়েছে।

১০৯. সুতরাং যদি (ফাইন) তাহারা মুখ ফিরায় (তাওয়াল্লাউ) সুতরাং বলুন (ফাকুল) তোমাদেরকে সাবধান করিয়া দিয়াছি (আজানতুকুন) উপরে (আলা) সম্মানভাবে (সাওয়াইন) এবং (ওয়া) না (ইন) আমি জানি (আদরি) নিকটে কি (আকারিবুন) বা (অথবা) (আম্ম) দূরে (বাইদুম্ম) যাহা (ম্মা) তোমাদেরকে ওয়াদা করা হইয়াছে (তুয়াদুন)।

সুতরাং যদি তাহারা মুখ ফিরায়ে সুতরাং বলুন, ‘তোমাদেরকে সাবধান করিয়া দিয়াছি সম্মানভাবে (সকলের) উপরে এবং আমি জানি না নিকটে কি বা দূরে যাহা তোমাদের ওয়াদা করা হইয়াছে।

এই সাবধানবার্তাটি যাহা মহানবি কর্তৃক দেওয়া হয়েছে উহা সম্মানভাবে সকলের উপর দেওয়া হয়েছে। তোমাদের নিকটে এবং দূরে কী আছে উহা মহানবি জানেন না বলাতে ওহাবিরা মহানবি যে এলম্মে গায়েব জানতেন না সেই দলিলটি দাঁড় করিয়ে দেয়। ইহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। ইহার দ্বারা সার্বিক সিদ্ধান্তটি টানা যায় না।

১১০. নিশ্চয়ই তিনি (ইব্রাহিম) জানেন (ইয়ালান্নু) প্রকাশিত হয় (জাহরা) হইতে (মিন) কথা (কাউলি) এবং (ওয়া) তিনি জানেন (ইয়ালান্নু) যাহা (মা) তোমরা গোপন করো (তাকতুমুন)।

‘নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) জানেন (যাহা) প্রকাশিত হয় কথা হইতে এবং জানেন যাহা তোমরা গোপন করো।

১১১. এবং (ওয়া) না (ইন) আমি জানি (আদরি) সেইটা হয়তো (লাআল্লাহ) ফিৎনা (পরীক্ষা) (ফিত্নাতুল) তোমাদের জন্য (লাকুম) এবং (ওয়া) জীবনকে উপভোগের (মাতাউন) দিকে (ইলা) কিছুকাল (হিন)।

‘এবং আমি জানি না সেইটা হয়তো ফিৎনা (পরীক্ষা) তোমাদের জন্য এবং কিছুকাল জীবনকে উপভোগের পর্যন্ত।’

১১২. বলিলেন (কাল), ‘হে আমার রব (রাব্বি), তুমি মীমাংসা (ফয়সালা, নিষ্পত্তি, রায়) করিয়া দাও (আহকুম) হকের সহিত (ন্যায্যের সহিত) (বিল্হাক্কি) এবং (ওয়া) আমাদের রব (রাব্বানা) রহমান (রাহমানু) সহায়স্থল (মুস্তাআনু) উপরে (আলা) যাহা (মা) তোমরা বলিতেছ (তাসিফুন)।

বলুন, ‘হে আমার রব, হকের সহিত ফয়সালা করিয়া দাও এবং আমাদের রব রহমান, সহায়স্থল, তোমরা বলিতেছ যাহার উপায়।’

সূরা : হজ্জ
মাদানি র আয়াত : ৭৮, রুকু : ১০

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর নামের সহিত (বিস্মিল্লাহে) যিনি একমাত্র দাতা (আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)।

১. হে (ইয়াআইউহান) মানুষেরা (লোকেরা) (নাসু) ভয় করো (তাকু) তোমাদের রবকে (রাব্বাকুম) নিশ্চয়ই (ইন্না) অতিশয় কম্পন (প্রকম্পন) (জাল্জালাতাস) মৃত্যু নামক ঘটনার কেয়ামতটি (সাত্বাতি) জিনিস (শাইউন) ভয়ঙ্কর (ভীতিজনক, ভীষণ) (আজিম)।

হে মানুষেরা, তোমাদের রবকে ভয় করো। নিশ্চয়ই সাত্বাতের প্রকম্পন ভয়ঙ্কর জিনিস।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর সেটা হলো, আল্লাহ এই আয়াতে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার না করে ‘সাত্বাতি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ সকল মানুষকে এই ‘সাত্বাত’-এর বিষয়ে ভীতিজনক জিনিসটি জানিয়ে দিচ্ছেন এই বলে যে, তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামত তথা ‘সাত্বাত’-এর মুখোমুখি হবেই।

২. যেদিন (ইয়াওম্মা) তাহা তোমরা দেখিবে (তারাতুনাহা) ভুলিয়া যাইবে (বিস্মৃত হইবে) (তাজ্হালু) প্রত্যেক (এক এক করিয়া সমুদয়) (কুললু) যে দুধ দেয় (স্তন্যদাত্রী) (মুরদিয়াতিন) তাহা হইতে যাহাকে (আম্মা) সে দুধ পান করাইয়াছে (আরদাতাত্) এবং (ওয়া) গর্ভপাত করিবে (তাদাউ) প্রত্যেক (কুললু) করিবে (জাতি) গর্ভবতী (হামলিন) তাহার গর্ভে থাকা বস্তুকে (হামলাহা) এবং (ওয়া) দেখিবে (তারান) মানুষদেরকে (নাসা) নেশাগ্রস্ত (মাতাল সদৃশ) (সুকারা) এবং (ওয়া) না (মা) তাহারা (হম্ম) মাতাল (বিসুকারা) কিছু (ওয়ালাকিন্না) আজাব (শাস্তি) (আজাবা) আল্লাহর (আল্লাহি) কঠিন (ভয়ঙ্কর, ভীষণ) (শাদিদ)।

যেদিন তোমরা তাহা দেখিবে (সেই দিন) প্রত্যেকে ভুলিয়া যাইবে স্ত্রী
ন্যদানকারী তাহা হইলে (যাহাকে) সে দুধপান করাইয়াছে এবং গর্ভপাত
করিবে প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভের বস্তুকে এবং মানুষদেরকে দেখিবে
মাতালের মতো এবং তাহারা (যদিও) মাতাল নহে কিন্তু আল্লাহর আজাব
(বড়ই) কঠিন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ‘সাত্মাত’ শব্দটি, যার দ্বারা মৃত্যু-ঘটনার
কেয়ামতটির কথা বোঝানো হয়েছে। ‘সাত্মাত’ শব্দটির দ্বারা কখনওই
আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস করে ফেলার কথাটি বোঝায় না, বরং
মৃত্যুপথযাত্রী যখন মৃত্যুবরণায় বিদায় নেবে-নেবে অবস্থায় থাকে তখন একটি
মানুষের অবস্থানের যে কতদূর পরিবর্তন হয় তারই দৃশ্যটি এখানে সুন্দর করে
বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুবরণার অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে
যে তোমরা প্রত্যেকেই এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখবে তথা মৃত্যু নামক ঘটনার
‘সাত্মাত’-টি তথা কেয়ামতটির মুখোমুখি হতেই হবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা
লিখতে গিয়ে অনেকেই বড় কেয়ামতের ঘটনাটি বর্ণনা করেন, কিন্তু ইহা
মনের অজান্তে একটি ভুল। সবাইকে এই কেয়ামতের কঠিন আজাবের দৃশ্যটি
দেখতে হবে বলার মাঝে সবাইকে একসঙ্গে মেলজাজি কবর হতে উঠে দেখার
কথাটি বলা হয়েছে। তা হলে পাঁচ হাজার বছর আগে যে মারা গেছে সে কি
ওই মেলজাজি কবরের গম্বির মাঝেই অবস্থান করবে এবং যে বড় কেয়ামতের
ঘটনাটি ঘটান আধাঘণ্টা আগে মারা গেছে ॥ উভয়েই কি একই সঙ্গে উঠে
দাঁড়াবে? যদি পাঁচ হাজার বছর আগে মৃত এবং কেয়ামতের আধাঘণ্টা আগের
মৃত ॥ উভয়েই একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে হয় ॥ তা হলে ইহা কেমন শোনায?
পাঁচ হাজার বছর আগে মৃত মানুষটি যদি আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ
করেই বসে যে, ‘আমি পাঁচ হাজার বছর কবরে শুয়ে রইলাম আর ওই
ব্যক্তিটি কেয়ামতের মাত্র আধাঘণ্টা আগে মারা যাবার পর উঠে দাঁড়িয়েছে ॥
তা হলে এতদিন আমি কেন কবরে শুয়ে রইলাম আর ওই লোকটি মৃত্যুর
গোসল দেবার আগেই উঠে দাঁড়ালো?’ তা হলে কেউ যদি এ রকম প্রশ্ন অধম
লিখককে করেই বসে তো অধম লিখকের এ রকম প্রশ্নের উত্তরটি জানা নাই।
কিন্তু এই আয়াতটিতে যে মৃত্যু-নামক ঘটনার কেয়ামতটির বর্ণনা করা হয়েছে

এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। এরপরেও যদি কেহ সন্দেহ পোষণ করে তো অধম লিখকের বলার কিছুই রইল না। আরেকটি প্রশ্ন হয়তো আসতে পারে যে, একটি নফসের দেহ-ধারণ কি করতেই হবে? দেহ-ধারণটি কি একেকটি নফসের একেক রকম পরিচয় বহন করে? কাপড়ের পোশাকটি যেমন দেহের পোশাক, সে রকম নফস তথা জীবাত্মার পোশাকটি হলো দেহ। কাপড়ের পোশাকটি যেমন দেহ-পোশাক সেই রকম নফস তথা জীবাত্মার পোশাক বলতে কি এই দেহকেই বোঝানো হয়েছে? জীবাত্মার সঙ্গে দেহটিকে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে যে অনেকটা দুধের ভেতর লুকিয়ে থাকা মাখনের মতো। দুধবিহনে যেমন মাখন আশা করা যায় না তেমনি দেহবিহনে জীবাত্মাটি কি অবস্থান করতে পারে? যদি পারে বলা হয় তা

হলে সেই পারাটাই একটি অদৃশ্যমান জগতের লীলাখেলা। অনেক রকম প্রশ্ন হতে পারে আবার অনেক রকম উত্তরও হতে পারে, কিন্তু আসল বিষয়টি বোঝাতে চাইলে অনেক কিছুই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যেতে হয়। সত্যের কোনো পোশাক থাকে না। সত্য একদম উলঙ্গ। সত্যের গায়ে যে পোশাকগুলো লাগানো হয় সেই পোশাকগুলোর নাম হলো মেকাজি, রূপক, মেন্টাফোরিকাল ॥ ইত্যাদি। আমাদের আসল উদ্দেশ্যটি হলো উলঙ্গ সত্যটি খুঁজে বাহির করা। যদি দেহ নামক পোশাকের দ্বারাই নফস তথা জীবাত্মার পরিচয়টি চেনা যায়, ধরা যায় তা হলে পুনর্জন্মবাদটিকে কেমন করে অস্বীকার করি? জ্ঞানীদেরকে নিরপেক্ষ হয়ে তকদির নামক ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি ফেলে এই বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণা করতে অনুরোধ করছি। যদিও অনুরোধ করাটাও একটি তকদির এবং অনুরোধটি রক্ষা করা এবং গবেষণা করাটাও একটি তকদির। এই তকদির নামক জগদ্দল পাথর হতে আমরা কেউ একচুলও এদিক-সেদিক যেতে পারব না। অধম লিখক মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোরান-হাদিস নিয়ে গবেষণার পর গবেষণা করে চলছি। কিন্তু আজ যদি আমি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম এবং নিজেকে ধর্ম-বিষয়ের গবেষণায় ডুবিয়ে রাখতাম তাহলে বেদ-গীতা-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর উপর গবেষণায় ডুবে থাকতাম। তা হলে মুসলমানের ঘরে যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি

সেই জন্মগ্রহণ করাটা কি একটা জগদ্বল পাথরের মতো অনড় তকদির নাকি অফুরন্ত রহস্য, নাকি ভয়ঙ্কর একটি অভিশাপ? তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে জন্মটাই একজনের আজন্ম তকদির অথবা আশীর্বাদ নতুবা অভিশাপ। তা হলে তো চরম সত্যে অন্যধর্মের অনুসারীদেরকে যা-তা মন্তব্য করাটা অশোভনীয় বলেই মনে করি। কারণ আমি যদি গালি দেই তো অন্যধর্মের গবেষকও গালি আবিষ্কার করে ফেলবে। তখন সমাজ জীবনে একটি সাধারণ শাস্তি আর বজায় থাকবে না, বরং মারমার, কাটকাট, হিয়াইয়া ইত্যাদি আত্মফালনের সঙ্গে জঙ্গি মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

৩. এবং (ওয়া) হইতে (মিন) মানুষদের (লোকদের) (নাসি) যে (মান) তর্ক (বিতর্ক, বাদানুবাদ, সংশয়, অনুমান) করে (ইউজাদিলু) মধ্যে (ফি) আল্লাহর (আল্লাহি) না জানিয়া (বিগাইরি) কোনো এলেন (জ্ঞান) (ইলমিউ) এবং (ওয়া) অনুসরণ করে (ইয়াত্‌তাবিউ) প্রত্যেক (কুল্লা) শয়তানকে (শাইতোনাম) গর্বিত (উদ্ধত, অবিদিত, ধুষ্ট, স্পর্ধিত, দুর্দান্ত, গোয়ার) (মারিদ)।

এবং মানুষদের (মধ্য) হইতে যে তর্ক করে আল্লাহর (সহজ্জে) মধ্যে কোনো জ্ঞান না জানিয়া এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক গর্বিত শয়তানকে।

এই আয়াতটি ছোট মনে হলেও ইহার গভীরতা খুবই ব্যাপক। অনেক মানুষই আছে যাদের আল্লাহ সহজ্জে খুব একটা ভালো ধারণা নাই, অথচ না জেনে না শুনে এবং নিছক জ্ঞানের অভাবে তর্কবিতর্কের ঝড় তুলে দেয়। আল্লাহ বিষয়টি এতই ব্যাপক যে কয়েকটি কথার বাক্য গঠন করে বোঝানো মোটেই সম্ভবপর নয়। তবে মোটামুটিভাবে একটি ধারণা দেওয়া যায়। কোরান বলছে, যেদিকেই তাকাও না কেন, আল্লাহ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ হতে নির্গত হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির রূপ ধারণ করে যাহা অবিরাম নির্গত হয়ে চলছে উহা আল্লাহর সিকাত তথা গুণাবলি, কিছু জ্ঞাত নয়। জ্ঞাত এবং সিকাতের অখণ্ডতার নামই হলো আল্লাহ। তবে সিকাত তথা গুণাবলিকে আল্লাহ না বলে আল্লাহর সিকাত বলতে হবে। কারণ আল্লাহর অসংখ্য সিকাতগুলো জ্ঞাত আল্লাহ হতে আগমন করছে। আল্লাহ জ্ঞাতরূপে মাত্র তিনটি স্থানে অবস্থান করেন : একটি

সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের শেষ যেখানে সেই লা-মোকামে এবং অপর দুইটি স্থান হলো, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি জীবের সঙ্গে আল্লাহ জাতরূপে অবস্থান করেন ॥ সেই জীব দুটোর নাম হলো একটি জিন ও অপরটি ইনসান তথা মানুষ। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ মানুষের সঙ্গে বা সাথে আল্লাহ ‘আমরা’-রূপটি ধারণ করে জীবন-রণের তথা শাহারণের নিকটেই অবস্থান করেন (নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিন্ ওয়ারিদ তথা ‘আমরা (আল্লাহ) তোমাদের জীবন-রণের নিকটেই আছি’)। যিনি বা যারা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বিরাট ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছার রহমতে যাঁর নফসের মধ্যে আল্লাহর উদ্ভাসিত রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, কেবলমাত্র তিনি বা তাঁরা আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ॥ অন্যথায় ‘বিগাইরি ইলিম্’ তথা আল্লাহ বিষয়টি পুথির বিদ্যা দিয়ে জানাটা মোটেই সম্ভবপর নয়। পুথির বিদ্যার বড় বড় সার্টিফিকেট অর্জন করা যায়, কিন্তু আল্লাহ সত্ত্বকে গুঢ় রহস্যের জ্ঞানটি অর্জন করা যায় না। আল্লাহর গুঢ় রহস্যময় জ্ঞানটি যাদের জ্ঞানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তারা মাত্র একটি বছর ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদাটি নির্জনে একাকী বিরাট ধৈর্যধারণ করে অর্জন করার চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে কিছু না কিছু বুঝতে পারবেই। এই বোঝাতেও আল্লাহ-বিষয়ে তর্ক করা মোটেই ঠিক নয়। কমপক্ষে ১০/১২ বছর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি যাঁরা করতে পেরেছেন, তাঁরাই আল্লাহ সত্ত্বকে কিছু বলার অধিকার রাখেন বলে মনে করি। কিন্তু এই রকম সাধকেরা আল্লাহ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও বোঝা যায় না। সোজা কথায় পুথির বিদ্যা দিয়ে ইহা মোটেই সম্ভবপর নয়, বরং হেরাণ্ডহার মতো নির্জন স্থানে একাকী মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও বোঝা যায়। বাহ্যিক জগতের দৃশ্যাবলি এবং আত্মিক জগতের রহস্যময় দৃশ্যাবলি মোটেই এক বিষয় নয়। আত্মিক জগতের রহস্যাবলির সামান্য কিছু প্রত্যেকেই জানতে পারবে তবে একটি বিষয়ের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়, সেই বিষয়টি হলো একটি ঘটনা। সেই ঘটনাটির নাম হলো মৃত্যু-ঘটনা। মৃত্যু মোটেই ধ্বংস নয়, বরং পরিবর্তন। তাই যারা মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যধারণ করে উঠে-পড়ে লেগে আছে তারাই মৃত্যু-নামক ঘটনার আগেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করে নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে জানার আশ্রয় যাদের আছে তাদেরকে সেই সাধকদের অনুসরণ ব্যতীত জানা সম্ভবপর নয়। (মৃত্যু কাবলা আনতা মৃত) তথা মরার আগে মরে যাও)।

শয়তান-বিষয়টিরও একটা মোটামুটি ধারণা না থাকলে বিভ্রান্তির বেড়া জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, শয়তান কোথায় কোথায় অবস্থান করে এবং অবস্থান করার অনুমতি আল্লাহ কর্তৃক পেয়েছে। শয়তান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করার অনুমতি পেয়েছে তথা থাকতে পারবে। এই দুইটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত শয়তানের পক্ষে এক পা-ও বাড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। কেবলমাত্র এই দুইটি স্থানই শয়তানের যত আকাম-কুকামের নির্দিষ্ট স্থান। সেই দুইটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম হলো : জিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর বিহনে শয়তানকে থাকার আর কোনো অনুমতি দেওয়া হয় নি। বড়ই দুঃখ করে বলতে হয় যে, শয়তানের এই দুইটি স্থানে অবস্থান করা ছাড়া আর যে কোথাও থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি সেটাও বড় বড় ইসলাম-গবেষকদের অনেকেই জানেন না। সুতরাং বিভ্রান্তির খিচুড়ি ছাড়া এদের কাছে আর কীইবা আশা করা যায়? অথচ এই শ্রদ্ধেয় গবেষকদের কাছে আল্লাহর বিষয়টি এবং শয়তানের বিষয়টি জানতে চাইলে একটি মুচকি হাসি দিয়ে সব কিছু জানার ভান করে মানুষগুলোকে দিশেহারা করে তোলে। একটি মানুষের অন্তর ছাড়া শরীরের আর কোনো অঙ্গে শয়তানকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি। তাই বলা হয়ে থাকে, একটি মানুষের হাত-পা-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সবই মুসলমান, কেবলমাত্র অন্তরটি ছাড়া। শয়তানের যত প্রকার আকাম-কুকামের কারখানাটি হলো একমাত্র অন্তরটি। এই শয়তানটিকে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে, কেমন করে এই শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে হবে ॥ ইত্যাদি বহু উপদেশের মাঝে মাত্র একটি কথাই হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় গ্রহণ করা। তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে উদ্ধৃত অহংকারী শয়তানটিকে অনুসরণ না করতে। অনেক গবেষক শয়তানের অনুবাদ করতে গিয়ে সমগ্র জিনজাতিকেই টেনে এনে মনের অজান্তে অপমান করে ছাড়ে। ইহা মোটেও ঠিক নয়। কারণ মানুষের মাঝে যেমন ভালোমন্দ আছে, তেমনি

জিনজাতির মাঝেও ভালোমন্দের অবস্থানটি আমরা জানতে পারি। নিঃসন্দেহে শয়তানের আগমন জিনজাতি হতে, কিন্তু তাই বলে পাঁকারিভাবে সমগ্র জিনজাতিকে গালি দেওয়া মোটেও ঠিক নয়। অন্তরের মাঝে শয়তানটিকে রেখেই যখন মানুষ মুক্তচিন্তার নাম ধারণ করে স্বাধীনতাটি ভোগ করতে চায় তখনই মনের অজান্তে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়। অথচ মানুষ বুঝতেই পারে না যে সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেছে। তাই বলা হয়ে থাকে, মানুষের ভেতর একটি গোপন গোশ্বতের টুকরা আছে, সেই গোশ্বতের টুকরাটির নাম হলো অন্তর। সেই অন্তরটি যখন কলুষিত হয়ে যায় তখন সমস্ত মনপ্রাণই কলুষিত হয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণে সেই অন্তরটি যখন পবিত্র হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহমনটি পবিত্র হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষ একেকটি নফস তথা ‘আম্নি’ এই ‘আম্নি’-টি পবিত্র, কিন্তু এই ‘আম্নি’-র সঙ্গে তথা এই নফসের সঙ্গে যখন শয়তানটি অবস্থান করে তখনই নফসটি কলুষিত হয়ে পড়ে। এই কলুষিত নফসের অভ্যন্তরেই শয়তান উদ্ধত অহংকারীর অদৃশ্য রূপটি ধারণ করে। তাই এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, উদ্ধত অহংকারী শয়তানের অনুসরণ করছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শয়তান মোটেও বাহিরে থাকে না, বরং প্রতিটি নফসের তথা প্রতিটি মানুষের অন্তরেই অবস্থান করে। নফস যোগ শয়তান সম্মান সম্মান ‘আম্নিত্ব’, নফস বিয়োগ শয়তান সম্মান সম্মান ‘আম্নি’। সুতরাং নফসটি তথা ‘আম্নি’-টি মোটেও অপবিত্র নয়, কলুষিত নয় এবং এই নফসই যখন মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে ‘এতমেনান’ অর্জন করে ‘মোৎমায়েন্না’ হয়ে যায় তখনই জান্নাতের সুসংবাদটি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়।

৪. লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে (নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বিধান, নির্দেশ, প্রথা) (কুতিবা) তাহার সম্পর্কে (সংযোগ, সংস্ক, সংস্রব) (আলাইহি) যে তাহা (আন্নাহ) যে কেউ (মান) তাহাকে বন্ধু (মিত্র, স্বজন, সখা, সুহৃদ, প্রিয়জন) বানাইবে (তাওয়াল্লাহ) সুতরাং সে নিশ্চয়ই (ফাআন্নাহ) তাহাকে বিভ্রান্ত (সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত, সঠিক পথ হইতে ভুল পথে নেওয়া) করিবে (ইউদিল্লুহ) এবং (ওয়া) তাহাকে পরিচালিত করিবে (ইয়াহদিহি) দিকে (ইলা) আজাব (শাস্তি) (আজাবিস) জ্বলন্ত আগুন (প্রজ্বলিত অগ্নি) (সাইর)।

তাহার (শয়তান) সম্পর্কে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহাকে বন্ধু বানাইবে সে তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বিভ্রান্ত করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে আজাবের দিকে (সেই আজাবটি) জ্বলন্ত আগুন।

এখানে শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে অথবা নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে – বলার অর্থটি হলো, শয়তানের আজন্ম তকদিরটি হলো মানুষকে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। এক কথায় সব বিষয়ের খারাপ দিকটির দিকে মানুষকে ধাবিত করা। মন্দ বিষয়ের প্রতিমূর্তিই হলো শয়তান, ইহাই শয়তানের তকদির। অবশ্য শয়তানের ইহা আজন্ম তকদির না বলে অর্জিত তকদির বললেই ভালো মানায় এবং কোরান-সম্মত হয়। কারণ শয়তান আগে হজরত আজাজিল আলাইহেস সালাতু সালাম নামটি ধারণ করে ফেরেশতাদের ইমাম ছিলেন। কিন্তু আদমকে সেজদার বিষয়টি অমান্য করার দরুনই আজাজিল ইবলিসে পরিণত হয়। সুতরাং আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে বলেই ইহা শয়তানের অর্জিত তকদির। সুতরাং মানুষকে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করার অর্জিত তকদিরটি নিয়ে অবস্থান করছে শয়তান। তাই এই আয়াতে মানুষদেরকে আল্লাহ সাবধান করে দিচ্ছেন এই বলে যে, খবরদার, শয়তানকে কখনওই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়ো না। কারণ শয়তান বাহিরে থাকে না, বরং আপন নফসের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে খান্নাসরূপে অবস্থান করে। তাই আপন কলুষিত প্রবৃত্তিই হলো শয়তানের কারখানা। শয়তান মানুষকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। এখানে জ্বলন্ত আগুন বলতে মানুষের অন্তর জ্বলতে থাকে। অনেক সময় মানুষ এই শাস্তি, জ্বলন্ত আগুনের দাহটি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে ফেলে। এই আজাবের আগুন বাহ্যিক চোখে যদিও দেখা যায় না, কিন্তু যে বা যারা এই আগুনে জ্বলতে থাকে তারা বুঝতে পারে এর দহন কতটুকু ভয়ংকর। এই আজাবের আগুন ঘরবাড়ি জ্বালায় না, কাপড়-চোপড় জ্বালায় না এবং কোনো কিছুই জ্বালায় না, কেবলমাত্র মানুষের অন্তরটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কী প্রচণ্ড, কী ভয়ংকর এই জ্বলন্ত আগুনের শাস্তিটি! চোখে দেখা যায় না, অথচ জ্বলতে হচ্ছে। ইহা কি সত্যি একটি ভয়ংকর বিষয় নয়? তাই কোরানুল করিম এই জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি হতে মুক্ত থাকার জন্য বার বার মানুষকে শয়তান সম্পর্কে

সাবধান করে দিচ্ছে। আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তোয়ানুর রাজিম তথা ‘পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই’ কথাটি হাজারবার পড়লেও শয়তান ছেড়ে দেয় না। তা হলে এই শয়তান হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থাপত্রটি আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি কেমন করে করতে হবে সেই ফর্মুলাটির মাধ্যমে দিয়ে গেছেন। যারা আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফদেরকে অমান্য করে আপন কলুষিত প্রবৃত্তির দ্বারা বানানো পথে চলে এবং চলার ব্যবস্থাপত্রটি দিয়ে যায় নিঃসন্দেহে এদেরকেই ওহাবি বলা হয়। এবং এই ওহাবিদের বইপত্র দিয়ে বাজার ছেয়ে গেছে।

৫. হে (ইয়া আইউহান) মানুষেরা (নাসু) যদি (ইন) তোমরা হও (কুনতুম) মধ্যে (ফি) সন্দেহের (সংশয়ের) (রাইবিন) হইতে (মিনাল) পুনরায় উত্থান (পুনরুত্থান, পুনরায় জাগরণ) (বাসি) সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই (ফাইননা) তোমাদেরকে আমরা (আল্লাহ) সৃষ্টি করিয়াছি (খালাক্নাকুম) হইতে (মিন) মাটি (তুরাবিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) বীর্ষ (শুরু, রেতঃ, ধাতু) (নুৎফাতিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) সংযুক্ত (বুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড, এমন কিছু যা লাগিয়া থাকে) (আলাকাতিন) ইহার পর (সুম্মা) হইতে (মিন) মাংসপিণ্ড (মুদগাতিম) পরিপূর্ণ আকৃতির (পূর্ণাকৃতির) (মুখাল্লাকাতিউ) এবং (ওয়া) নহে (নয়) (গাইরি) পরিপূর্ণ আকৃতি (মুখাল্লাকাতিন) আমরা আসল সত্য স্পষ্ট করি (লিনুবাইয়িনা) তোমাদের জন্য (লাকুম) এবং (ওয়া) আমরা স্থায়ী করি (নুকিররু) মধ্যে (ফি) জরায়ুগুলিতে (আরহামি) যেমন (মা) আমরা চাই (নাশাউ) দিকে (ইলা) সময় (আজালিম) নির্দিষ্ট (বিশেষভাবে প্রদর্শিত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত) (মোসাম্মান) ইহার পর (সুম্মা) আমরা তোমাদেরকে বাহির করি (নুখরিজুকুম) শিশুরূপে (বাচ্চারূপে) (তিফলান) ইহার পর (সুম্মা) যেন তোমরা পৌঁছাইতে পার (লিতাবলুগ) যৌবনে (আশুদদা) তোমরা (কুম) এবং (ওয়া) তোমাদের মধ্য হইতে (মিনকুম) কাহাকেও (মান) মৃত্যু দেওয়া হয় (ইউতাওয়াফ্ফা) এবং (ওয়া) তোমাদের মধ্য হইতে (মিনকুম) কাহাকেও (মাই) ফেরত (প্রত্যর্পণ) দেওয়া হয় (ইউরাদদু) দিকে (ইলা) দুর্দশাগ্রস্ত

(আরজালি) বয়সে (উম্মরি) যেন না (লিকাইলা) সজ্জান থাকে (ইয়ালান্না) পরেও (মিম্বাদি) সব কিছু জানিয়া লওয়া (ইলমিন) কিছুমাত্র (শাইয়ান) এবং (ওয়া) তুমি দেখিয়াছ (তারাল) জমিনকে (আরদা) শুকনা (হাম্বিদাতান) সুতরাং যখন (ফাইজা) আমরা বর্ষণ করি (আনজালনা) উহার উপরে (আলাইহা) পানি (মাতাহ) তাহা সতেজ হয় (তাজ্জাত) এবং (ওয়া) ফুলিয়া উঠে (ফীত হয়) (রাবাত) এবং (ওয়া) উদ্গত (উখিত, বহির্গত) (আম্বাতাত) সর্বপ্রকার (সকল প্রকার) (মিনকুল্লি) উদ্ভিদ (তৃণলতা, যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে) (জাওজিম) সুদৃশ্য (দেখিতে সুন্দর, শোভাময়, সুদর্শন) (বাহিজি)।

হে মানুষেরা, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে (পতিত হও) সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা (আল্লাহ) মাটি হইতে আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি ইহার পর শুষ্ক হইতে ইহার পর রক্তপিণ্ড হইতে, ইহার পর মাংসপিণ্ড হইতে পরিপূর্ণ আকৃতি (দিয়া) এবং পূর্ণ আকার নহে, আমরা (আল্লাহ) সত্য স্পর্শ করি তোমাদের জন্য এবং জরায়ুগুলির মধ্যে আমরা (আল্লাহ) স্থায়ী করি যেমন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা (আল্লাহ) চাই, ইহার পর আমরা (আল্লাহ) তোমাদেরকে বাহির করি শিশু (রূপে) ইহার পর তোমরা যেন যৌবনে পৌঁছাইয়া যাও এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আগেই মৃত্যু দেওয়া হয় এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও দুর্দশাগ্রস্ত বয়সের দিকে (লইয়া যাওয়া হয়) যেন সব কিছু জানিয়া লইবার পরেও কিছুমাত্র (আগের মতো) জ্ঞান থাকে না এবং তুমি দেখিতেছ শুষ্ক জমিনের উপর যখন আমরা পানি বর্ষণ করি (তখন) তাহা সতেজ হয় এবং (উহা) ফুলিয়া উঠে এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করে (এবং) সুদৃশ্য (রচনা করে)।

এই আয়াতে আল্লাহ কোনো বিশেষ শ্রেণীকে বলছেন না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে উপদেশের ভাষায় আল্লাহ বলছেন যে মারা যাবার পর আবার তোমাদেরকে ওঠানো হবে। এই ওঠানোটি বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? একইরূপে ওঠানো হবে, নাকি অন্যরূপে ওঠানো হবে? মানুষ কি কখনও একইরূপ সব সময় ধারণ করতে পারে, না পারে না? কারণ শিশুটি যখন বড় হয় তখন আর সেই বড় হবার মধ্যে শিশুরূপটি থাকে না

তথা হারিয়ে যায়। প্রশ্ন আসে, ইহা কি মানবদেহের পরিবর্তন নাকি জীবাত্মার পরিবর্তন? অবশ্য দেহের বিভিন্ন অবস্থায় একটি মানুষ বিভিন্ন রকম পরিচয় বহন করে। কারণ দেহটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে থমকে যায় না। শিশু দেহটি বালকরূপ ধারণ করে। বালকরূপটি পূর্ণবয়স্ক যুবকের রূপ ধারণ করে। তারপর প্রৌঢ়, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অনেক বৃদ্ধ এবং তারপরেও যদি বেঁচে থাকে তা হলে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। একটি দেহ প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে সে রকম কি জীবাত্মাটিরও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে না? মানবদেহটি কি একটি জীবাত্মার পরিচয় বহন করার একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য, নাকি অবস্থান থেকে অবস্থানে এর পরিবর্তন? দেহের একেক রকম অবস্থানে জীবাত্মাটি কি একেক রকম বাস্তব অভিনয় করে চলছে? হিন্দুধর্মের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশগুলি অর্জুনকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটা উপদেশ হলো, ‘হে অর্জুন, মানুষ যেমন পুরনো পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক ধারণ করে সেই রকম আত্মাও পুরনো দেহ ফেলে দিয়ে নতুন দেহ ধারণ করে।’ তা হলে আমরা অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এই কথাটুকু জানতে পারলাম যে, দেহ পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করার একটি পোশাকমাত্র। দেহকে একটি নিছক পোশাকমাত্র বলে অর্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেই পোশাকটিকে আত্মার অংশ বলা হয় নি, বরং মানুষ যে রকম জীর্ণ পোশাক ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক পরিধান করে সে রকম আত্মাও বার বার দেহ নামক পোশাকটি ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি অর্জুনকে বিরাট ভুল শিক্ষা দিয়ে গেলেন, নাকি কোরান-এর জীবন-মৃত্যুর রহস্যটির কথাই বলে গেলেন? কোরান-হাদিসের জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের জ্ঞানটি কি ইসলাম ধর্মের গবেষকেরা সঠিকভাবে তুলতে পেরেছেন, নাকি পারেন নাই? কারণ এই জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নে ইসলাম-গবেষকদের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিপরীত ভাবধারাটি ফুটে ওঠে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দূরকম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ফলটি কি আমরা আশা করতে পারি? কারণ আজ যদি আমি (অধম লিখক) হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতাম এবং বেদ-গীতা-র গবেষণা চালিয়ে যেতাম তা হলে আমার অবস্থানটি কোথায় থাকত? তা হলে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করে হিন্দুধর্মের

উপর গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম উহা কি আমার জন্মের আগেই তকদির দিয়ে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে? যেখানে একবারই জন্মগ্রহণ করতে হবে সেখানে আমার এই অবস্থানটির জন্য আমি কাকে দায়ী করব? এখানে অনুমানের গুলমারা বিদ্যা দিয়ে যেন তেন ব্যাখ্যা দিয়ে একটা কিছু বলা যেতে পারে, কিন্তু যেখানে একবারই আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং তাও হিন্দুর ঘরে, তা হলে পুনর্জন্মবাদটিকে মেনে নিলে এই কথা কি বলা যায় না যে জন্মই আমার আজন্ম মহাপাপ? এই আয়াতে কেবলমাত্র মুসলমানকে বলা হচ্ছে না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে উপদেশটি দেওয়া হয়েছে এবং প্রথমেই বলা হয়েছে যে পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? এই পুনরুত্থান বলতে কি সেই কবে-কখন-কতদিন আমাদেরকে কবরে অবস্থান করতে হবে? ইস্রাফিল নামক ফেরেশতার শিঙায় ফুৎকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব উঠে দাঁড়াব, নাকি মৃত্যু-ঘটনা-নামক 'সাত্বাত'-নামক কেয়ামতটির কথা এখানে বলা হয়েছে? এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে তৈরি করা হয়েছে প্রথমে মাটি হতে, তারপর বীর্ষ হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর মাংসপিণ্ড হতে এবং তারপর পরিপূর্ণ মানবাকৃতির শিশুরূপে, তারপর বয়সের হেরফেরে মৃত্যু-ঘটনার কথাটি, তারপর শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টিবর্ষণ করে সেই ভূমিকে সতেজ করা হয় এবং নানা প্রকার উদ্ভিদের আগমন ঘটে এবং পরে পরিপূর্ণ একটি সুদৃশ্য দৃশ্যের রচনা করে। এতগুলো কথার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে কী বোঝাতে চেয়েছেন? দুনিয়ার জীবনটা কি নিছক একটা মায়া, নাকি একটা ভীতি, নাকি একটি মোরাকাবার ধ্যানসাধনায় মশগুল থেকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা? আমার মতো অতি ক্ষুদ্র ইসলাম-গবেষক বড় বড় ইসলাম-গবেষকদেরকে মাত্র একটি প্রশ্নই করতে চাই আর সেই প্রশ্নটি হলো: আজ যদি আপনারা হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করতেন এবং ধর্ম-গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন তা হলে আপনাদের ধর্ম-গবেষণার অবস্থানটি কোথায় থাকত? বুকে হাত রেখে একদম নিরপেক্ষ হয়ে অধম লিখকের এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরটি দেবেন কি?

৬. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিয়ান্না) আল্লাহ (আল্লাহ) তিনিই (হয়াল) সত্য (হাক্কু) এবং (ওয়া) এই জন্য যে তিনি (আন্নাহ) জীবিত

করেন (ইউইয়িল) মৃতকে (মৃত্যু) এবং (ওয়া) তিনি (আননাহ) উপর (আলা) সব (সমস্ত) (কুল্লি) কিছু (শাইয়িন) ক্ষমতাবান (কাদির)।

ওইটা এই জন্য যে, আল্লাহ (হইলেন) তিনিই একমাত্র সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছু উপর ক্ষমতাবান।

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গেলে আল্লাহর অনেক গোপন কথা যে লুকিয়ে আছে এই আয়াতের মধ্যে তা তুলে ধরা যায়। প্রথমেই ‘জালিকা’ তথা ‘ওইটা’ দিয়ে আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এখানে ‘এইটা’ তথা ‘হাজাল’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। বাক্যটির প্রথমেই ‘এইটা’ না বলে ‘ওইটা’ বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ‘তিনিই একমাত্র সত্য।’ এখানে ‘একমাত্র সত্য’ বলতে কী বোঝায়? আর কোনো সামান্য সত্য অথবা অতিক্রম্য সত্য সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও অবস্থান করে না এবং অবস্থান করার প্রশ্নই আসে না। কারণ তিনিই একমাত্র সত্য তথা সৃষ্টিজগতে যাহা কিছু অস্তিত্ব আছে উহাই আল্লাহর সঙ্গে সীফাতরূপে তথা গুণাবলি এবং বহু গুণাবলিরূপে অবস্থান করছে। সুতরাং আর কোনো সামান্য সত্য থাকলে তো কিছু বলা যেত। এই আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানাহ-কে ‘আল্ হাক্কা’ তথা একমাত্র সত্য বলা হয়েছে তথা আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নাই। যদি সত্যের অস্তিত্ব সামান্য হলেও থাকত তা হলে তো সেই সত্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যেত। আসলে কোনো সত্যই নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, সুতরাং অন্য কোনো সত্য আছে বলে ধারণা করাটাও মনের ভুল এবং বিরাট আত্মবিরোধী কথা এ জন্যই যে, তিনি মৃতকে জীবন দান করেন। অন্য কেহ অথবা কোনো আল্লাহ হতে আলাদা বিচ্ছিন্ন শক্তি যদি থাকত তা হলে ‘তিনিই মৃতকে জীবিত করেন’ কথাটিতে বিস্ময় প্রকাশ করা হতো। এই জন্যই এই বিষয়টিতে বিস্ময় প্রকাশের কোনো অবকাশ থাকে না, যেহেতু আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্য তথা আর কোনো সামান্য সত্যও আল্লাহ হতে আলাদা হয়ে অবস্থান করে না। সুতরাং অন্য কোনো শক্তির অবস্থান করার ধারণাটি একটি বিরাট মিথ্যা ধারণা। অনেকটা দড়িকে সাপ মনে করার মতো একটি বিভ্রম। তাই আয়াতের শেষে আল্লাহ অতি সহজ ভাষায় বলে দিচ্ছেন এই বলে যে, সৃষ্টিজগতে যাহা কিছু অবস্থান করছে উহা আল্লাহর সীফাতরূপে তথা গুণাবলিরূপে বিরাজ

করছে। তাই তিনি সর্ববিষয়ের উপর এবং সর্বস্থানের উপর তথা গুণাবলির উপর একমাত্র ক্ষমতাবান। তাই তিনি এবং তাঁর রূপটি হলো সর্বশক্তিমান তথা সর্ববিষয়ের উপর সর্বাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাবান তথা একমাত্র সর্বশক্তিমান।

৭. এবং (ওয়া) মৃত্যুটি (আননা) সাত্মাত (সাত্মাতা) নিশ্চয়ই ঘটবে (অবশ্যজ্ঞাবী, না ঘটিয়া পারে না এমন) (আতিয়াতুল) নাই (লা) কোনো সন্দেহ (রাইবা) ইহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই আল্লাহ (আননাল্লাহা) উঠাইবেন (ইয়াবআসু) যাহারা (মান) মধ্যে (ফিল) কবরগুলিতে (কুবুরি)।

এবং সাত্মাতের মৃত্যুটি নিশ্চয়ই ঘটবে ইহার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ উঠাইবেন যাহারা কবরগুলিতে আছেন।

মৃত্যু নামক ঘটনার ‘সাত্মাত’-টিকেও ছোট কেয়ামত বলা হয় এবং এই ‘সাত্মাত’ নামক ছোট কেয়ামতটির মুখোমুখি সবাইকে একদিন না একদিন হতে হয়। এখানে আল্লাহ কেয়ামত শব্দটি না বলে ‘সাত্মাত’ শব্দটি বলেছেন। যেহেতু এখানে জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি বলা হয়েছে সেই হেতু কবর হতে ওঠাবার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে ধ্বংস করার কেয়ামতটির কথা যদি এখানে বলা হতো তা হলে কবর হতে ওঠাবার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন না। এই ‘সাত্মাত’-এর বিষয়টিতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই ‘ইহার মধ্যে’ তথা ‘ফিহা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, যারা কবরগুলির মধ্যে আছেন বা থাকবেন বা ছিলেন তাদেরকে কবরসমূহ হতে ওঠানো হবে। এখানে কবর শব্দটির কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি। কবর দুই প্রকার : একটি মেরুজাজি কবর, অপরটি হাকিকি কবর। প্রতিটি মানুষের প্রতিটি জীবন্ত দেহটিকে একেকটি কবর বলা হয়। তাই বলা হয়েছে, ‘কবরের মধ্যে যারা আছেন’, তথা ‘ফিল কুবুরি।’ প্রতিটি জীবন্ত মানবদেহ একেকটি জীবাত্মার কবর। এই জীবাত্মার জীবন্ত কবরটিতে প্রতিনিয়ত অনেক রকম আজাবের শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং কোনো একটি বিশেষ মৃত্যুতে এইসব জীবন্ত কবর হতে মানুষদেরকে ওঠানো হবে।

৮. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান) মানুষদের (নাসি) কেহ কেহ (মান) যুক্তি দেখায় (তর্ক করে, ঝগড়া করে) (ইউজাদিলু) মধ্যে (ফিল) আল্লাহর (লাহি) ছাড়াই (বিগাইরি) জ্ঞান (ইলমিউ) এবং (ওয়া) না (লা) সঠিক পথ দেখানো (হদাউ) এবং (ওয়া) না (লা) কিতাব (কিতাবিম) নুরময় (উজ্জ্বল, দীপ্তিমান, দ্যুতিময়, প্রভাময়) (মুনরি)।

এবং মানুষদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আল্লাহর মধ্যে যুক্তি দেখায় জ্ঞান ছাড়াই এবং সঠিক পথের নির্দেশনা নাই এবং না (আছে) নুরময় কিতাব।

র যদিও এই সূরার এই আয়াতটি আকারে ছোট, কিন্তু এর অর্থ বড়ই কঠিন এবং বড়ই সামাজিক ‘যাহা সাধারণের’ পক্ষে তো বোঝার কথা বাদই দিলাম, বরং বড় বড় ইসলাম-গবেষকেরাও হিম্মসিম্ম খেয়ে যাবে। তাই অধিকাংশ গবেষকেরা অনুমানে ঢিল ছুঁড়ে সব কিছুই সমাধান টেনে বসেন এবং ইহা একান্ত স্বাভাবিক, তাই দোষারোপ করছি না। প্রথমেই বলা হয়েছে, মানুষদের মধ্য হতে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর বিষয়ে তথা আল্লাহ বলতে কী বোঝায় না জেনেই তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলে রাশিরাশি সংশয় আর দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়। এই জন্য ‘ইলাল্লাহি’ না বলে তথা আল্লাহ বিষয়ে না বলে ‘ফিল্লাহি’ তথা আল্লাহর মধ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহর মধ্যে ডুব দিতে না পারলে তথা ফানা হতে না পারলে আল্লাহ সঙ্কল্পে যা কিছু বলবে উহা হবে এলেন-বহির্ভূত কথা তথা জ্ঞান নেই অথচ জ্ঞানীদের মতো চং করে কথা বলা। তাই বলা হয়েছে, ‘বিগাইরি ইলমিউ’ অর্থাৎ আল্লাহ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নাই অথচ জ্ঞানীর ভান করে এটাসেটা বলে।

এই জ্ঞানটি তথা এই এলেনটি কি বাহ্যিক এলেন তথা জ্ঞান, নাকি রহস্যপূর্ণ জ্ঞান? আমরা বুখারি শরিফ-এর ৯৫ নম্বর হাদিসে জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে জানতে পারি যে, জ্ঞান দুই প্রকার : একটি জাহেরি এলেন, অপরটি বাতেনি এলেন। এই বাতেনি এলেন যিনি বা যারা অর্জন করতে পেরেছেন তারাই আল্লাহর বিষয়ে কিছু বলা, কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার উপযুক্ত। তাই অন্যত্র হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীরা বাহ্যিক জ্ঞানের অধিকারী এবং এরা ডেড়ার পালের মতো গুঁতাগুঁতি করে। এদের থেকে সাবধান থাকার উপদেশটি হজরত

ইবনে আব্বাস (রা.) দিয়ে গেছেন। এই ভিতরের এলেনটি তথা জ্ঞানটি বড় কষ্ট করে, বড় সাধনা করে জেনে নিতে হয়। কারণ এই জ্ঞান গোপনীয়। তাই হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এই কথাটিও বলেছেন যে, এই জ্ঞানের কথাটি প্রকাশ করামাত্র আমাকে তোমরা যা-তা অপমান করতেও কসুর করবে না ॥ যেটাকে আরবি ভাষার বাগধারায় বলা হয় : কাটা যাইবে আমার এই গলা। সুতরাং এই রহস্যময় এলেন তথা জ্ঞান যার জ্ঞানা নাই তিনি কেমন করে সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন অথবা পাবেন? এলেন তথা জ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ‘হৃদাউ’ তথা সঠিক পথটি জেনে নেওয়া। যদি সঠিক পথ এবং এলেন তথা জ্ঞানটি না থাকে তা হলে কিতাব বললে কাগজের উপর কতগুলো কালির অঙ্কর দিয়ে সাজানো লেখাগুলোকেই কিতাব মনে করবে। কাগজ-কালিতে ছাপানো অঙ্করগুলো নুরানি কিতাবের ছায়ামাত্র, কিন্তু নুরানি কিতাব নয়। বাঘ-সিংহের চার রঙে ছাপানো ছবি দুটো দেখলে মনে হবে হুবহু বাঘ আর সিংহ, কিন্তু আসলেই কি কাগজে ছাপানো বাঘ আর সিংহ দুটি আসল সিংহ-বাঘ? আসল বাঘ আর সিংহ যদি কেউ স্বচক্ষে দেখতে চান তাহলে নির্দিষ্ট একটি স্থানে গিয়ে আপনাকে দেখে আসতে হবে। সেই নির্দিষ্ট স্থানের নামকে বলা হয় চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানা ছাড়া যে রকম জীবন্ত বাঘ ও সিংহ দেখা যায় না, সেই রকম আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার পর এই নুরানি কিতাবের পরিচয় মেলে। যারা নুরানি কিতাবের পরিচয় পেয়েছেন তাঁরাই আল্লাহর আবদাল, বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলি এবং আল্লাহর নির্বাচিত নবি এবং রসূল। ঐরা কাগজে ছাপানো কিতাব পড়িয়ে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দেন না, বরং বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে, তথা মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করার পরই সঠিক পথের পরিচয় এবং নুরানি কিতাবের পরিচয়টি পাওয়া যায়। অন্যথায় কতগুলো কথা শেখা ছাড়া এবং তর্ক-বিতর্কের গুঁতাগুঁতিতে জড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখানে আর একটু লক্ষ্য করে দেখুন, বলা হয়েছে ‘কিতাবিম্ মুনিরি’ তথা নুরানি কিতাব, কিন্তু বলা হয় নি নুরানি কোরান। নুরানি কোরান এবং নুরানি কিতাবের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য রয়ে গেছে এবং কোরান ও কিতাব-এর মাঝে এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা

ও বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী তাঁর রচিত কোরান-এর তফসিরটিতে, যা তিনি কোরান দর্শন নাম দিয়ে তিন খণ্ডে রচনা করে গেছেন।

৯. বাঁকা করে (সানিয়া) তাহার গর্দান (ঘাড়) (ইত্‌ফিহি) বিদ্রান্ত করিবার জন্য (লিউদিল্লা) হইতে (আন) পথ (রাস্তা) (সাবিলি) আল্লাহর (লিল্লাহি) তাহার জন্য (লাহ) মধ্যে (ফি) দুনিয়ার (দুন্‌ইয়া) অপমান (লাঞ্ছনা, ভৎসনা, নিন্দা, উৎপীড়ন) (খিজ্‌ইউ) এবং (ওয়া) আমরা (আল্লাহ) তাহাকে স্বাদগ্রহণ করাইব (নুজিকুহ) দিনে (ইয়াওমাল) কেয়ামতে (কিয়ামতি) আজাব (শাস্তি, যন্ত্রণা) (আজাবাল) আগুনে পোড়ানোর (দহনের) (হারিকি)।

আল্লাহর পথ হইতে বিদ্রান্ত করিবার জন্য তাহার গর্দান বাঁকা করে তাহার জন্য দুনিয়ার মধ্যে (আছে) অপমান এবং তাহাকে আমরা (আল্লাহ) স্বাদ গ্রহণ করাইব কেয়ামতের দিনে আগুনে পোড়ানোর শাস্তির)।

যদিও ইহা একটি ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা নামক কেয়ামত যাকে ‘সাত্মাত’ বলা হয়, কিন্তু এখানে ‘সাত্মাত’ শব্দটি ব্যবহার না করে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও ইহা একটি মৃত্যু-ঘটনা নামক শাস্তি এবং সেই শাস্তিটি হবে আগুনে পোড়ানো। এই আগুন অধিকাংশ সময়ে অদৃশ্যমান তথা চোখে দেখা যায় না, কারণ এই দহনের জ্বালা-যন্ত্রণা, এই দহনের আগুনে পোড়ানো সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কখনও কখনও সমাজবদ্ধ মানুষগুলোর উপরও এই দহনের শাস্তিটি দেখা যায়। জাহান্নামের আগুন বাড়িঘর জ্বালায় না, কাপড়চোপড় জ্বালায় না, কেবলমাত্র একটি জিনিসই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় ॥ আর সেটা হলো অস্ত্র। জাহান্নামের আগুন কেবলমাত্র মানুষের অস্ত্রটিকে জ্বালায় এবং অন্য কোনো কিছু জ্বালায় না। এই একই রকম কথাটি জিনজাতির উপরও সমভাবে প্রযোজ্য, যদিও জিনজাতির কথাটি উল্লেখ করা হলো না।

১০. ওইটা (জালিকা) এই কারণে যাহা (বিমা) আগে (পূর্বে) পাঠাইয়াছে (কাদ্দামাত্) তোমার হাতে (ইয়াদাকা) এবং (ওয়া) আল্লাহ যে (আন্বাল্লাহা) নহেন (লাইসা) জুলুমকারী (বিজাল্‌লামিল) বান্দাদের উপর (লিল্‌আবিদ)।

ওইটা এই কারণে যাহা তোমার হাতে আগে পাঠাইয়াছে এবং আল্লাহ যে বান্দাদের জুলুমকারী নহেন।

১১. এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান) মানুষদের (নাসি) যে অথবা কেউ (মান) এবাদত করে (ইয়াবুদু) আল্লাহর (আল্লাহ) উপর (আলা) এক কিনারায় (একপ্রান্তে, একধারে) (হারফিন) সুতরাং যদি (ফাইন) পৌঁছায় তাহার (আসাবাহ) কোনো কল্যাণ (হিত, মঙ্গল, কুশল, সুখসমৃদ্ধি) (খাইর) সে নিশ্চিত থাকে (নিত্মাআননা) ইহার মধ্যে (বিহি) এবং (ওয়া) যদি (ইন) তাহার (উপরে) পৌঁছায় (আসাবাত্হ) কোনো ফিৎনা (বিপর্যয়) (ফিত্নাতু) ফিরিয়া যায় (নিংকালাবা) উপর (আলা) তাহার চেহারা (ওয়াজ্হিহি) সে ক্রতিগ্রস্ত হয় (খাসিরা) দুনিয়াতে (দুনইয়া) এবং (ওয়া) আখেরাতে (আখিরাতা) ওইটা (জালিকা) সেইটা (হয়াল) ক্রতি (খুসরানু) সুস্পষ্ট (কিছু গোপন নাই এমন, প্রকাশিত, খোলাখুলি) (মুবিন)।

এবং মানুষদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহর এবাদত করে একপ্রান্তের উপর সুতরাং যদি তাঁহার (নিকট) পৌঁছায় কোনো কল্যাণ (তখন) ইহার সহিত সে নিশ্চিত থাকে এবং যদি তাহার (নিকট) পৌঁছায় কোনো ফিৎনা তাহার চেহারার উপর ফিরিয়া যায়, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে সে ক্রতিগ্রস্ত হয় ওইটা সুস্পষ্ট সেই ক্রতি।

এই আয়াতটিতে একটি সার্বজনীন লাভ এবং ক্রতির স্পষ্ট চেহারাটি তুলে ধরা হয়েছে। একমাত্র মোমিন ছাড়া (অনেকেই ভুলবশত ‘প্রকৃত মোমিন’ লেখেন, আসলে মোমিনই হলেন প্রকৃত, সুতরাং প্রকৃত শব্দটি অতিরিক্ত) আসলে মোমিন ছাড়া মানবজাতির সবারই উপর এই লাভ-ক্রতির খুশি এবং বেজার হবার দৃশ্যটি আমাদের জীবনপথে চলতে গিয়ে অহরহ দেখতে পাই। এই লাভ এবং ক্রতির অস্থিরতাটি যারা ভিঙিয়ে গেছেন তাঁরাই মোমিন এবং একমাত্র মোমিন ছাড়া সবাই কমবেশি ক্রতিগ্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছে। হয়তো এই প্রিয় সত্যকথাটি কেউ মানবে, আবার কেউ মানবেও না। পাইলে খুশি আর না পাইলে বেজার ॥ ইহা তো একটি অতি প্রচলিত সত্যের প্রতিচ্ছবি। এই দুর্বলতায় একমাত্র মোমিন ছাড়া সবাই কমবেশি ভোগে। সুতরাং মানবচরিত্রের দুর্বলতম স্থানটির একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই

আয়াতে। তাই কোরান-এর সূরা আনফাল-এর ১৯ নম্বর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মোমিনদের সাথেই আছেন বা থাকেন (ওয়া আননালাহা মাআল মোমেনিনা তথা এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মোমিনদের সাথেই আছেন)।

১২. তাহারা ডাকে (ইয়াহু) হইতে (মিন) পরিবর্তে (দুনি) আল্লাহর (আল্লাহি) যাহা (মা) না (লা) তাহাকে ক্রটি করিতে পারে (ইয়াদুরুহ) এবং (ওয়া) যাহা (মা) না (লা) তাহার উপকার করিতে পারে (ইয়ানফাউহ) ওইটা (জালিকা) সেই (হয়া) সঠিক পথ ছাড়িয়া বিপথে চলা (পথদ্রষ্টতা) (দালালুল) চরম (কঠিনতম অবস্থা, চূড়ান্ত) (বাইদ)।

আল্লাহর পরিবর্তে তাহারা ডাকে (মূর্তিগুলিকে) যাহা তাহাদের ক্রটি করিতে পারে না এবং তাহাদের উপকারও করিতে পারে না ওইটা সেই চরম সঠিক পথদ্রষ্টতা।

মূর্তিগুলি, যাহা মাটি-পাথর-ইট-বালু-সুরকি ইত্যাদি পদার্থ দ্বিজে বানানো হয়, উহাতে না আছে নফস তথা প্রাণ, আর রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, তাই প্রাণহীনকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অধিকারীরা কী করে উপাসনা করবে? এই উপাসনা যে চরম সঠিক পথদ্রষ্টতা ইহা বুঝেও বুঝতে পারে না। কারণ এই প্রাণহীন মূর্তিগুলো না পারে তাদের উপকার করতে আর না পারে কোনো অপকার করতে। মানুষের মনের যে কত বিচিত্র চাওয়া-পাওয়া থাকে এবং এই চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নে আল্লাহকে ছেড়ে প্রাণহীন মূর্তিগুলোকে কেন্নন করে যে তারা তাদের মাবুদ বলে মেনে নেয় ভাবতেও অবাক লাগে। অথচ বাস্তবে এই রকম প্রার্থনার অনুষ্ঠানগুলো আমরা দেখতে পাই। ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা এই মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহর ওলি-আল্লাহদেরকে যোগ করে মানুষদেরকে আরেক নতুন ফেশ্বার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। যেখানে নবি সোলায়মানের ক্রমতায় রহমতের বাতাস কোথায় প্রবাহিত করা হবে তার নিয়ন্ত্রণভারটি ছিল নবি সোলায়মানের হাতেই, এতবড় একটি জুলন্ত সত্য যাহা সোলায়মান নবির কাছে পাই সেখানে ওহাবিরা কেন্নন করে মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহর ওলিদের জড়িয়ে এক করে ফেলে জনসাধারণকে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে! আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতার প্রশ্নে আবদিয়াতের প্রতিচ্ছবি হলেন

খিজির আবদুহ। এই খিজির আবদুহ কেমন করে মুসা নবির মতো জাঁদরেল নবিকে আগেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না বলে তিনবার তিনটি গায়েবি দৃশ্যের অবতারণা করে মুসা নবিকে বিদায় করে দিলেন। অথচ মুসা নবির নামটি কোরান-এ সবচেয়ে বেশিবার বলা হয়েছে। সম্ভবত একশত পঁয়ত্রিশবার। তাই আমরা দেখতে পাই, ওহাবি ফেরকার অনুসারী গবেষকেরা সূরা কাহাফকে ভীষণ ভয় পায় এবং যত গাঁজাখুরি কথার গল্পো দিয়ে এইটা-সেইটা বলে থাকে। ওহাবিরা তো খিজিরকে একদম সহ্য করতে পারে না। তাই মাওলা আলির একটি মহামূল্যবান উপদেশ মনে রাখার মতো। তিনি খারেজিদের সঙ্গে নাহওয়ানের যুদ্ধটি হবার আগে যুদ্ধ না করার একটি চুক্তি করার জন্য কিছু সাহাবাকে পাঠাবার সময় এই উপদেশটি দিয়েছিলেন যে, খবরদার, কোরান-এর আয়াত সামনে রেখে চুক্তি করতে গেলেই খারেজিরা কোরান-এর আয়াতের অন্যরকম অর্থ করবে। আজ ওহাবিরা কোরান-এর সুন্দর সুন্দর বিকৃত অর্থ দিয়ে মানুষের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে আসল বিষয়টিকে ঢেকে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৩. সে ডাকে (ইয়াহু) এমন কিছুকে (লামান) যাহার ক্রতি (দারুহ) নিকটতর (আক্রাবু) হইতে (মিন) তাহার উপকারিতা (নাফইহি) কত নিকৃষ্ট (জঘন্য, নীচ) (লাবিসাল) মাওলা (মাওলা) এবং (ওয়া) কত নিকৃষ্ট (লাবিসাল) সাথী (সঙ্গী, সহচর) (আশির)।

সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্রতি উপকারিতা হইতে অধিকতর কত নিকৃষ্ট অভিভাবক বা মাওলা এবং কত নিকৃষ্ট সহচর।

১৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নালাহা) দাখিল করিবেন (ইউদখিলুল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আমেলুস) সালিহাত (সালিহাতি) জান্নাতে (জান্নাতিন) প্রবাহিত হয় (তাজরি) হইতে (মিন) নিম্নদেশ (পাদদেশ, মূলদেশ, নীচ) (তাহতিহাল) ঝরনা (প্রস্রবন, ফোয়ারা, নির্ঝর, প্রবাহ)-গুলি (আনহারু) নিশ্চয়ই (ইন্নালা) আল্লাহ (ল্লাহা) করেন (ইয়াফআলু) যাহা (মা) চাহেন (এরাদা করেন) (ইউরিদ)।

যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আমলে সালেহা করিয়াছে (তাহাদেরকে) নিশ্চয়ই আল্লাহ দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশ হইতে প্রবাহিত হয় ঝরনাগুলি নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

১৫. যে কেহ (মান্‌কানা) মনে করে (ধারণা করে) (ইয়াজুজু) যে কখনও না (আল্লাহ) তাহাকে সাহায্য করিবেন (ইয়ান্সুরাহল) আল্লাহ (লাহ) মধ্যে (ফি) দুনিয়া (দুন্‌ইয়া) এবং (ওয়াল) আখেরাতে (আখিরাতি) সুতরাং সে টানিয়া লগ্না করুক (ফাল্‌ইয়ামদুদ) একটি রশি (দঁড়ি, রজ্জু)-কে (বিসাবাবিন) দিকে (ইলাস) আকাশ (সাম্মায়ি) ইহার পর (সুম্মাল) কাটিয়া দেউক (ইয়াক্তাও) সুতরাং দেখুক (ফাল্‌ইয়ানজুর) কী (হাল) দূর করিতে পারিবে (ইউজ্‌হিবান্না) তাহার কৌশল (প্রচেষ্টা) (কাইদুহ) যাহা (মা) রাগান্বিত (কুদ্ব, ক্রোধযুক্ত) করে (ইয়াজিজু)।

যে মনে করে যে আল্লাহ কখনও তাহাকে সাহায্য করিবেন না দুনিয়ার মধ্যে এবং আখেরাতে সুতরাং সে টানিয়া লগ্না করুক একটি দড়িকে আকাশের দিকে ইহার পর কাটিয়া দিক সুতরাং দেখুক তাহার কৌশল দূর করিতে পারিবে কি যাহা রাগান্বিত করে?

১৬. এবং (ওয়া) এইরূপেই (কাজালিকা) তাহা আমরা নাজিল করিয়াছি (আনজাল্নাহ) আয়াত (আয়াতিম) খোলাখুলি (সুস্পষ্ট, প্রকাশিত, কিছু গোপন নাই এমন) (বাইনাতিউ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (আননাল) আল্লাহ (লাহা) হেদায়েত দান করেন (ইয়াহদি) যাহাকে (মাই) চাহেন (ইউরিদ)।

এবং এইরূপেই আমরা তাহা নাজিল করিয়াছি খোলাখুলি আয়াত এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদায়েত দান করেন যাহাকে চান।

১৭. নিশ্চয়ই (ইন্‌নাল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আম্মানু) এবং (ওয়াল) যাহারা (লাজিনা) ইহদি (হাদু) এবং (ওয়া) সাবেয়ি (সাবিয়িনা) এবং (ওয়া) খ্রিস্টান (নাসারা) এবং (ওয়া) অগ্নিপূজারক (মাজুসা) এবং (ওয়া) যাহারা (লাজিনা) শেরেক করিয়াছে (আশ্‌রাকু) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্‌নাল্লাহা) ফয়সালা করিয়া দিবেন (ইয়াফসিলু) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) দিনে (ইয়াওমা) কেয়ামতের (কিয়ামাতি) নিশ্চয়ই আল্লাহ

(ইন্নাল্লাহা) উপরে (আলা) সমস্ত (কুল্লি) কিছু (শাইয়িন) প্রত্যক্ষকারী (শাহিদ)।

নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহদি এবং সাবেয়ি এবং খ্রিষ্টান এবং অগ্নিপূজারক এবং যাহারা শেরেক করিয়াছে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফয়সালা করিয়া দিবেন তাহাদের মাঝে কেয়ামতের দিনে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত কিছুর উপরে প্রত্যক্ষকারী।

এই আয়াতটির সামান্য কিছু ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে যদি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা আমাকে এ রকম প্রশ্ন করে বসেন যে, যদি ইহদি ধর্মের অনুসারীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাতেই ইহদি হয়েছি তা হলে কি বলতে পারি না যে, ইহাই আমার জন্মের আগে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া তকদির? অথবা আশীর্বাদ? অথবা অভিশাপ? এই প্রশ্নটির উত্তর অধম লিখকের জানা নাই। যদি বলেই ফেলেন যে প্রতিটি শিশু মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে তাদের ধর্মে নিয়ে আসেন ॥ এই কথাটি এই বিষয়ে মোটেই ধোপে ঢেকে না এবং ঢেকার প্রশ্নই ওঠে না, তবে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারবেন। যারা সাবেয়ি ধর্মের অনুসারীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাও কি ওই একই রকম প্রশ্ন তুলতে পারে না? এবং যারা খ্রিষ্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাও কি ওই একই কথা বলতে পারে না? এবং যারা আগুনের পূজা করে তারাও কি একই প্রশ্ন তুলতে পারে না? এবং যারা মূশরিকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাও কি একই রকম প্রশ্ন তুলতে পারে না? এই প্রশ্নটির সঠিক জবাব অধম লিখকের জানা নাই।

১৮. আপনি কি দেখেন নাই (আলামতারা) যে আল্লাহ (আননাল্লাহা) সেজদা করে (ইয়াসজুদু) তাহাকে (আল্লাহকে) (লাহ) যাহা কিছু (মান) মধ্যে (ফি) আকাশগুলিতে (সামাওয়াতি) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মান) মধ্যে (ফি) জমিনে (দেহতে, পৃথিবীতে) (আরদি) এবং (ওয়া) সূর্য (শামসু) এবং (ওয়া) চন্দ্র (কামারু) এবং (ওয়া) তারকাগুলি (নুজুমু) এবং (ওয়া) পর্বতগুলি (জিবালু) এবং (ওয়া) বৃক্ষলতা (শাজারু) এবং (ওয়া) জীবজন্তু (দাওয়াবু) এবং (ওয়া) অনেকে (কাসিরুন) হইতে (মিন) মানুষদের (নাসি) এবং (ওয়া) অনেকে (কাসিরুন) সত্য (হাক্কা) যাহার উপর (আলাইহিল) শাস্তি

(আজাবু) এবং (ওয়া) যাহাকে (মাই) হেয় করেন (ইউহিনি) আল্লাহ (-
ল্লাহ) সুতরাং নাই (ফাম্মা) তাহার জন্য (লাহ) কোনো (মিন) ইজ্জতদাতা
(সম্মানদাতা) (মুকরিমিন) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নাল্লাহা) করেন (ইয়াফ্‌আলু)
যাহা (ম্মা) তিনি চান (ইয়াশাআ)।

ল্ট আপনি কি দেখেন নাই যে আল্লাহ সেজদা করে তাহাকে যাহা কিছু
আকাশগুলির মধ্যে এবং যাহা কিছু জমিনের মধ্যে (আছে) এবং সূর্য এবং চন্দ্র
এবং তারকাগুলি এবং পর্বতসমূহ এবং বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্য
হইতে অনেকে, আবার অনেকের (প্রতি) অবধারিত হইয়াছে যাহার উপর
শাস্তি এবং আল্লাহ যাহাকে হেয় করেন সুতরাং নাই তাহার জন্য কোনো
সম্মানদাতা। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন যাহা তিনি চাহেন।

এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে সেজদা দুই প্রকার : একটি
ম্লেজাজি সেজদা ॥ যাহা সবাই দেখতে পায় এবং অপরটি হাকিকি সেজদা ॥
যাহা চোখে ধরা পড়ে না এবং যেই সেজদা চোখে ধরা পড়ে না উহাই আসল
সেজদা। ম্লেজাজি তথা রূপক সেজদা দিবে কেমন করে আসল সেজদায় তথা
যে সেজদা চোখে দেখা যায় না সেই সেজদায় আসা যায়? আসল সেজদায় না
আসা পর্যন্ত ম্লেজাজি সেজদাটি একটি বাহনমাত্র এবং এর বেশি কিছু নয়।
ম্লেজাজি সেজদাটি তথা যে সেজদাটি চোখে দেখা যায় উহা যে-কোনো সময়
যে-কোনো পরিস্থিতিতে তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু যে সেজদাটি হাকিকি তথা
চোখে দেখা যায় না উহা কখনওই তুলে নেওয়া যায় না এবং তুলে নেবার
প্রশ্নই ওঠে না। যে সেজদাটি করাও যায় আবার উঠিয়েও নেওয়া যায় উহা
কোনো সেজদাই নহে, বরং উহা হাকিকি সেজদার মধ্যে পৌঁছাবার একটি
বাহনমাত্র। বাহন নামক ম্লেজাজি সেজদাটিকে যে কেহ যে কোনো মুহূর্তে
অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু যেই মাত্র হাকিকি সেজদার মধ্যে ভুবে যায়, উহা
হতে মুখ ফেরাবার আর প্রশ্নই ওঠে না। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-বৃক্ষ-লতা-
পাহাড়-পর্বতগুলো কোরান -এ বর্ণিত সেজদায় রত আছে এবং এই রত থাকা
সেজদাটি আমরা চোখে দেখতে পাই না এবং চোখে দেখার প্রশ্নই ওঠে না,
কারণ ইহাই হলো হাকিকি সেজদা তথা আসল সেজদা। এই আয়াতে আরও
বলা হয়েছে যে, মানবজাতির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশও সেজদায় আছেন এবং

মানবজাতির এই ক্ষুদ্র অংশটিকেই বলা হয় মোম্বিন-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফ ইত্যাদি। হাকিকি সেজদাটি বাদে যারা মেজাজি সেজদা করে তারা সেই মেজাজি সেজদাটিকে যে কোনো সময় তুলে নিতে পারে তথা অস্বীকার করে ফেলতে পারে। আবার পরক্লেণে আরেকটি সেজদা আছে যাকে সেজদা না বলাই ভালো কারণ উহা দেখতে অনেকটা মেজাজি সেজদার মতো, কিন্তু হাকিকতে উহা কোনো সেজদাই নয়, কারণ এই রকম চোখে-দেখা সেজদাটির না আছে কোনো মেজাজি রূপ আর না আছে কোনো হাকিকি রূপ। কারণ আপন পীর ও মুর্শিদকে মুরিদানের যে সেজদাটি করতে দেখি এবং করি উহা কোনো সেজদার আওতাতেই আসে না। সুতরাং দেখতে অনেকটা মেজাজি সেজদার মতো, কিন্তু আসলে উহা কোনো সেজদাই নয়। মেজাজি সেজদারও একটি সুনির্দিষ্ট আইন আছে, যেমন পাক-সাফ, ওজু-গোসল, পশ্চিম দিকে দাঁড়ানো এবং নামাজের নিয়ত বাঁধা তারপর সূরা ফাতেহা পড়া তারপর কোরান-এর সামান্য কিছু অংশ মনে মনে অথবা জোরে পাঠ করা তারপর রুকুতে যাওয়া তারপর সেজদায় গিয়ে সোবহানু রাব্বুল আলা উল আজিম তিনবার পাঠ করার পর যে সেজদাটি দেওয়া হয় উহাকেই বলে মেজাজি সেজদা। কিন্তু আপন পীর ও মুর্শিদকে যে সেজদাটি দেওয়া হয় উহা দেখতে সেজদার মতো কিন্তু আসলে উহা কোনো সেজদাই নয়, কারণ এই রকম সেজদার মধ্যে না আছে পাক-পবিত্রতা, ওজু-গোসলের বলাই, না আছে পশ্চিম দিকে দাঁড়ানোর শর্ত আর না আছে সূরা ফাতেহা ও কোরান-এর একটি অংশ পাঠ করা। সুতরাং আপন পীর ও মুর্শিদকে যে সেজদাটি করা হয় উহা মোটেই মেজাজি সেজদা নয়, বরং সন্মানের সেজদা তথা সেজদায়ে তাজিম্বি। আপন পীর ও মুর্শিদকে যারা এই জাতীয় সেজদাটি করেন তাদের বিরুদ্ধেও যা-তা মন্তব্য অনেকেই করে থাকে, কারণ তারা সেজদার চংটি দেখতে পায়। তারা বুঝতে চায় না যে উহা একটি নিছক সন্মানজনক সেজদা এবং এই সন্মানজনক সেজদার মধ্যে মেজাজি সেজদার শর্তগুলো নাই। সূরা ইউসুফের ১০০ নম্বর আয়াতটিতে আমরা দেখতে পাই যে পুত্র ইউসুফ নবি (আ.)-কে পিতা ইয়াকুব নবি (আ.) এবং ইউসুফ নবির মাতা এবং ইউসুফ নবির বড় এগার ভাই সেজদা করছেন। অধম লিখকের মনে হয়, উহা একটি

নিছক তাজিমি সেজদা। এই রকম সেজদাটিকেও নাসেক-মনসুখের আওতায় আনা হয় নাই। মোল্লা জিউন এবং মাওলানা জালালউদ্দিন সমুতির মতো জাঁদরেল আলেমও নাসেক-মনসুখের প্রশ্নে এই জাতীয় সেজদার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। একটিমাত্র হাদিসে দেখতে পাই যে, যদি সেজদা করার হুকুমটি দেওয়া হতো তা হলে স্বামীকে সেজদা করার জন্য স্বীকে বলা হতো। এখানে ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ কোনো কিছু সোজাসুজি বলা হয় নাই। তা ছাড়া আমাদেরকে ভালো করে জেনে নিতে হবে যে হীরা দিয়ে কাচ কাটা যায়, কিন্তু কাচ দিয়ে হীরা কাটা যায় না। কোরান দিয়ে হাদিস কাটা যায়, কিন্তু হাদিস দিয়ে কোরান-এর দলিল কাটা যায় না।

১৯. এই দুই (হাজানি) বিবদমান পক্ষ (খাস্মানিখ) তর্ক করিতেছে (তাসাম্ম) মধ্যে (ফি) তাহাদের রব (রাব্বিহিম) সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে (কুত্তিয়াত্) তাহাদের জন্য (লাহম্) পোশাক (সিয়াবুম্) হইতে (মিন্) আগুন (নারিন্) ঢালিয়া দেওয়া হইবে (ইউসাব্বু) হইতে (মিন্) উপর (ফাউকি) তাহাদের মাথায় (রুউসিহিমুল্) ফুটন্ত পানি (হামিম্)।

এই দুই বিবদমান পক্ষ তর্ক করিতেছে তাহাদের রবের মধ্যে তাই যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের জন্য কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে আগুন হইতে পোশাক। ফুটন্ত পানি তাহাদের মাথার উপর হইতে ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

২০. গলাইয়া ফেলা হইবে (ইউস্হাকু) তাহা দিয়া (বিহি) যাহা কিছু আছে (ম্মা) মধ্যে (ফি) তাহাদের পেটগুলির (বুতুনিহিম্) এবং (ওয়া) চামড়াগুলির (জুলুদ্)।

গলাইয়া ফেলা হইবে তাহা দিয়া যাহা কিছু আছে তাহাদের পেটগুলির মধ্যে এবং চামড়াগুলির (মধ্যে)।

২১. এবং (ওয়া) তাহাদের জন্য (লাহম্) মুগুরগুলি (মাকামিউ) হইতে (মিন্) লোহা (হাদিদ্)।

এবং তাহাদের জন্য (রহিয়াছে) মুগুরগুলি লোহা হইতে (তৈরি)।

এই আয়াতটিতে লোহার তৈরি মুগুর বলার কারণ হলো, সেই যুগে কোনো আধুনিক – যাহা এই যুগে চালু ॥ অস্ত্র ছিল না বললেই চলে। তাই লোহার

তৈরি মুণ্ডরের কথা বলা হয়েছে বিষয়টিকে সহজ-সরলভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

২২. যখনই (কুললামা) চাইবে (আরাদু) যে (আন) তাহারা বাহির হইবে (ইয়াখরুজু) তাহা হইতে কারণে (মিন্‌হামিন) ভয়ে (গাম্মিন) তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে (উইদু) তাহার মধ্যে (ফিহা) এবং (ওয়া) তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো (জুকু) শাস্তি (আজাবা) জ্বলন্ত আগুনের দহন (হারিক)।

যখনই তাহারা বাহির হইতে চাইবে যে ভয়ের কারণে তাহা হইতে তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তাহার মধ্যে এবং জ্বলন্ত আগুনে দহনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।

২৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নাল্লাহা) দাখিল (প্রবেশ) করাইবেন (ইউদখিলুল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আম্নেলুস) ভালো (নেকি, উত্তম, শুভ, হিতকর) (সালিহাতি) জ্ঞানাতগুলিতে (জান্নাতিন) প্রবাহিত (তাজরি) হইতে (মিন) পাদদেশ (মূলদেশ, নিম্নদেশ) (তাহতিহাল) ঝরনাগুলি (আনহারু) তাহাদেরকে সাজানো হইবে (তাহাদেরকে অলঙ্কৃত করা হইবে) (ইউহাল্লাওনা) ইহার মধ্যে (ফিহা) হইতে (মিন) কঙ্কন (আসাইরা) হইতে (মিন) স্বর্ণের (জাহাবিট) এবং (ওয়া) মুক্তার (লুলুয়ান) এবং (ওয়া) তাহাদের পোশাক (লিবাসুহম) ইহার মধ্যে (ফিহা) রেশমের (হারিক)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবেশ করাইবেন জ্ঞানাতগুলিতে যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং ভালো কাজ করিয়াছে, ঝরনাগুলি প্রবাহিত হয় (তাহার) পাদদেশ হইতে ইহার মধ্যে তাহাদেরকে অলঙ্কৃত করা হইবে স্বর্ণ হইতে কঙ্কন হইতে এবং মুক্তার এবং ইহার মধ্যে রেশমের পোশাক তাহাদের (হইবে)।

যারা ইমানদার এবং আমলে সালেহা করেছে তাদেরকে জ্ঞানাতগুলিতে আল্লাহ নিশ্চয়ই দাখিল করবেন। এখানে আল্লাহ জ্ঞানাতে প্রবেশ করার শর্ত হিসাবে দুইটি শর্ত দিয়েছেন : একটি ইমান, অপরটি আমলে সালেহা। কেবলমাত্র ইমানদার কথাটি না বলে সঙ্গে আমলে সালেহার কথাটি যুক্ত করে দিয়েছেন। ইমানদার না হয়েও আমলে সালেহা তথা ভালো কাজ করলেই জ্ঞানাতে যাবার কথাটি বলা হয় নি, বরং ইমানদার হতে হবে। আবার

ইমানদারের সঙ্গে আমলে সালেহা তথা ভালো কাজটি করার শর্তটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একদিকে যেমন ইমানদার হতে হবে আবার সেই সঙ্গে আমলে সালেহা তথা ভালো কাজ করার কথাটি বলা হয়েছে। জান্নাতিদের জান্নাতের পাদদেশ দিয়ে অনেক রকম বরনা প্রবাহিত হবে এবং স্বর্গের তৈরি ককন এবং মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো থাকবে এবং জান্নাতিদের পোশাক হবে রেশমের।

এখানে একটু নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করলেই একটি প্রশ্ন উদ্ভিত হয় যে স্বর্গ, মণিমুক্তা এবং রেশমের পোশাক দুনিয়ার জিন্দেগিতে শরিয়তের মানদণ্ডে না পরাই ভালো বলা হয়েছে। অথচ জান্নাতে প্রবেশ করার পর এই সমস্ত জিনিসগুলোর বিষয়ে বারণটি নাই। কারণ দুনিয়ার কলুষিত আদমিটি, যাহা আমার মধ্যেই বসবাস করে, তথা যে শয়তানটি খান্নাস-রূপে আমার সঙ্গেই অবস্থান করছে উহা হতে মুক্ত হতে পারলেই জান্নাতে অবস্থান করা যায় সুতরাং আমার ‘আম্মি’-র সঙ্গে যে-খান্নাসরূপী শয়তানটি আছে উহাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারলে স্বর্গ, মণিমুক্তা এবং রেশমের পোশাক সবই তখন শোভনীয় বলে বিবেচিত হয়।

২৪. এবং (ওয়া) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে (হুদু) দিকে (ইলা) পবিত্র (বিগ্গুদ, পূত) (তাইয়্যিবি) হইতে (মিনাল) বাণী (কথা, উক্তি) (কাউলি) এবং (ওয়া) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে (হুদু) দিকে (ইলা) পথের (রাস্তা, সড়ক) (সিরাতিল) প্রশংসিত (প্রশংসা করা হইয়াছে এমন, প্রশংসাপ্রাপ্ত) (হাম্মিদ)।

এবং পবিত্রের দিকে (তাহাদেরকে) হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে বাণী হইতে এবং হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে প্রশংসিতের পথের দিকে।

২৫. নিশ্চয়ই যাহারা (ইন্নালাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) এবং (ওয়া) বাধা দেয় (ইয়াসুদুনা) হইতে (আন) পথ (রাস্তা, সড়ক) (সাবিলি) আল্লাহর (ল্লাহি) এবং (ওয়া) মসজিদ (মাস্জিদিল) হারাম (হারাম্মি) যাহা (আল্লাজি) আমরা করিয়াছি তাহা (জাআল্নাহ) মানুষদের জন্য (লিন্নাসি) সম্মান (সাওয়াআনিল) স্থানীয় বাসিন্দা (আকিফু) ইহার মধ্যে (ফিহি) এবং (ওয়া) বহিরাগত (বাদি) এবং (ওয়া) যে (মান) ইচ্ছা করে (ইউরিদ্) ইহার মধ্যে (ফিহি) পাপ কাজের (বিইল্হাদিম) জুলুমের সহিত (বিজুলমিন) আমরা

(আল্লাহ) তাহাকে আশ্বাদন করাইব (নুজিক্হ) হইতে (মিন) শাস্তি (আজাবিন) যল্পণাদায়ক (আলিম)।

ল্ট নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং আল্লাহর রাস্তা হইতে বাধা দিয়াছে এবং মসজিদুল হারাম (হইতে) যাহা আমরা (আল্লাহ) মানুষদের জন্য করিয়াছি তাহা সমান। ইহার মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা এবং বহিরাগত এবং যে ইচ্ছা করে ইহার মধ্যে পাপকাজের জুলুম আমরা (আল্লাহ) তাহাকে আশ্বাদন করাইব যল্পণাদায়ক শাস্তি হইতে।

যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদান করে এবং যে মসজিদুল হারাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষদের জন্য সমানভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে ॥ হোক সে কাছের অথবা দূরের ॥ তার পথে বাধা দেয় এবং যে ইচ্ছা করে পাপ কাজ ও জুলুম করে ॥ তাদেরকে আল্লাহ ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে যল্পণাদায়ক শাস্তির আশ্বাদন করাবেন। এই আয়াতে যে মসজিদুল হারামের কথা বলা হয়েছে সেই মসজিদুল হারামের মেজাজি রূপটি তথা জাহেরি রূপটি হলো মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরটি। কিন্তু আসল মসজিদুল হারাম তথা হাকিকি মসজিদুল হারামটি দুনিয়ার সব রকম মানুষের জন্য খুলে রাখা হয়েছে। এই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করার আশ্বানটি সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন, এ জন্য ‘জাআল্লাহ লিন্নাসি’ তথা সমগ্র মানবজাতির জন্য এই হাকিকি মসজিদুল হারাম। এই আসল মসজিদুল হারামটি ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে বানানো হয় না এবং বানিয়ে ফেলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই মসজিদুল হারামটি হলো একেকটি মানুষের সুরতে আল্লাহর ঘর। এই মসজিদুল হারাম জীবন্ত। এই মসজিদুল হারামের দরজা সবার জন্য খোলা। কিন্তু মেজাজি মসজিদুল হারামটি কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য। যদি ইহা জাহেরি মসজিদুল হারাম হতো তা হলে ‘লিন্নাসি’ তথা ‘মানুষদের জন্য’ আশ্বানটি থাকতো না। ইহা আল্লাহর একটি সার্বজনীন আশ্বান। তা ছাড়া এমন কোনো জাতি এবং এমন কোনো কণ্ঠ দুনিয়াতে নাই যাদেরকে হেদায়েত করার জন্য সেই জাতি এবং সেই কণ্ঠের একান্ত নিজস্ব ভাষায় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার জন্য নবি-রসূল পাঠানো হয় নি। তা হলে সেই সব কণ্ঠ এবং সেই সব জাতির মসজিদুল

হারামটি কোথায় অবস্থান করে? হয়তো সেই সব জাতির, সেই সব কণ্ঠের নিজস্ব ভাষায় মসজিদুল হারামের মতো জাহেরি কিছু একটা থাকবারই কথা এবং এই রকম থাকবার কথাটি সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে মেনে নেওয়াটা বড়ই কষ্টকর। প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক কণ্ঠের অনুসারী মানুষেরাই কমবেশি মনে করতে চায় যে, আল্লাহ শুধু তাদেরই জন্য। এবং এই রকম চিন্তাধারা হতেই যুগে যুগে, কালে কালে আমরা মানুষ হত্যার বীভৎস দৃশ্যটি ধর্মের নামে দেখে আসছি। অথচ এরা কেউ সার্বজনীন ধর্মটি হয়তো বুঝতে পারে নি বা হয়তো ইচ্ছা করেই মেনে নেয় নি এবং আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে কে কতটুকু মেনে চলছে তা আমরা জানি না। জননীর গর্ভ হতে বাহির হয়ে আসার পরই পিতামাতা তাদের ধর্মের সাইনবোর্ডটি কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অধম লিখকের পিতা হেলালউদ্দিন এবং মাতা সেতারা বেগম ॥ ইকবাল আহমদ এবং ডাকনাম জাহাঙ্গীরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। পিতামাতা শিশু জাহাঙ্গীরের কাঁধে প্রথমেই ধর্মের সাইনবোর্ডটি ঝুলিয়ে দিয়েছে। তা হলে কি এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া যায় না যে আমার জন্মের আগেই আমার তকদিরটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে? জন্মের আগেই যদি আমার তকদিরটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তা হলে হিন্দুর ঘরে, বৌদ্ধের ঘরে, পার্শির ঘরে, জৈনের ঘরে, কনফুসিয়াসের ঘরে, তাওয়ের ঘরে, সাবাইয়ার ঘরে, সেক্টুর ঘরে, ইহুদির ঘরে, খ্রিস্টানের ঘরে এবং মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাটাই একেকটি মানুষের একেকটি তকদির। এই তকদিরের জগদ্বল পাথরটি সরানো মোটেই সম্ভবপর হয় না। তবে মাঝে-সাজে লক্ষ মানুষের মধ্যে দু'একটি এদিক-সেদিক হওয়াটাকে কোনো ঘটনা বলা যায় না। আল্লাহ তো আদিল তথা সুক্ল বিচারক। সুতরাং যে কোনো ধর্মে জন্মগ্রহণ করা মানুষটি যদি আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করে যে, আমার জন্মটাই কি একটি আজন্ম মহাপাপ, নাকি একটি মহাতকদির? তা হলে দুনিয়াতে ধর্মে ধর্মে যে মারামারি, কাটাকাটি হয়েছে ইহা তো নিছক প্রতিটি ধর্মের হাতে-গোনা কিছু জ্ঞানপাপীর হীন স্বার্থ উদ্ধারের একটি নিকৃষ্টতম জঘন্য প্রচেষ্টাই ছিল। সুতরাং সুফিবাদই একমাত্র মহাসার্বজনীন বিষয়, যেখানে কোনো ধর্মের কোনো সাইনবোর্ডের স্থানই নাই। যারা সাইনবোর্ড

কাঁধে নিয়ে সুফিবাদের কথা বলে বেড়ায়, তারা সামনে খাসির মাথা রেখে ভেড়ার মাংস বিক্রি করে।

২৬. এবং (ওয়া) যখন (ইজ্জ) আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম (বাওয়ানা) ইব্রাহিমের জন্য (লিইব্রাহিমা) স্থান (মাকানা) ঘরের (বাইতি) যে (আন) না (লা) শেরেক করা (তুশরিক) আমার সাথে (বি) কোনো কিছু (শাইয়াঠ) এবং (ওয়া) পবিত্র রাখো (তাহহির) আমার ঘরকে (বাইতিইয়া) তোয়াফকারীদের জন্য (লিত্তাইফিনা) এবং (ওয়া) কায়েমকারীদের (কায়িমিনা) এবং (ওয়া) রুকুকারীদের (রুক্কাই) সেজদাকারীদের (সুজুদ)

এবং যখন ইব্রাহিমের জন্য আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম ঘরের স্থান যে শেরেক করিও না আমার সাথে কোনো কিছু, আমার ঘরকে তোয়াফকারীদের জন্য পবিত্র রাখো এবং কায়েমীদের জন্য এবং রুকুকারীদের (এবং) সেজদাকারীদের (জন্য)।

২৭. এবং (ওয়া) ঘোষণা দাও (আজ্জিন) মধ্যে (ফি) মানুষদের (নাসি) হজের (বিল হাজ্জি) তোমার নিকট আসিবে (ইয়াতুকা) পায়ে হাঁটিয়া (রিজালাও) এবং (ওয়া) উপর (আলা) সর্ব (কুল্লি) শীর্ণকায় উটের (দামিরি) তাহারা আসিবে (ইয়াতিনা) হইতে (মিন) সমস্ত (কুল্লি) রাস্তা (ফাজ্জিন) দূরবর্তী (আমিকিন)।

এবং ঘোষণা দাও মানুষদের মধ্যে হজের তোমার নিকট আসিবে পায়ে হাঁটিয়া এবং শীর্ণকায় সর্ব (প্রকার) উটের উপর তাহারা আসিবে সব (রকম) দূরবর্তী পথ হইতে।

২৮. তাহারা প্রত্যেক (ইন্দিয়গোচর, ইন্দিয় দ্বারা উপলব্ধি, দর্শন) করে (লিইয়াশ্হাদু) সুফল (ফায়দা, লাভ)-গুলিকে (মানাফিআ) তাহাদের জন্য (লাহম) এবং (ওয়া) উচ্চারণ (মুখদ্বারা শব্দকরণ, কথন, বাচনভঙ্গী) করে (ইয়াজ্জুরুস) নাম (মা) আল্লাহর (আল্লাহি) মধ্যে (ফি) দিনগুলির (আইয়ামিম) নির্দিষ্ট (স্থিরীকৃত, নির্ণিত, বিশেষভাবে প্রদর্শিত) (মালুমাতিন) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন (রাজাকাহম) হইতে (মিন) চারিচরণ বিশিষ্ট (চতুর্দ) জন্তু (বাহিমাতিল) গৃহপালিত (আনআমি) সুতরাং তোমরা খাও (ফাকুলু) ইহা হইতে (মিন্হা) এবং (ওয়া) খাওয়াও

(আত্মইমুল) দূরবস্থাপনদের (দুঃস্থ, গরিব, দুঃখপীড়িত-দের) (বাইসাল) ফকিরদের (চরম দরিদ্রদের, চরমদুর্দশাগ্রস্তদের, অভাবগ্রস্তদের) (ফাকির)।

তাহাদের জন্য ফায়দাগুলিকে তাহারা প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নির্দিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যাহা (তাহাদের) উপর তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন গৃহপালিত চতুর্দ জন্তু হইতে। সুতরাং তোমরা খাও ইহা হইতে এবং খাওয়াও দুঃস্থদেরকে এবং ফকিরদেরকে।

২৯. ইহার পর (সুম্মাল) তাহারা দূর করে (ইয়াক্দু) তাহাদের ময়লা (অপরিচ্ছন্নতা) (তাফাসাহম) এবং (ওয়া) তাহারা পূর্ণ করে (ইউফু) তাহাদের মানতগুলিকে (নুজুরাহম) এবং (ওয়া) তাহারা তোয়াফ করে (ইয়াত্‌তাওয়াফু) ঘরের সহিত (বিল্বাইতি) প্রাচীন (পুরাতন) (আতিক)।

ইহার পর তাহাদের ময়লা তাহারা (যেন) দূর করে এবং তাহাদের মানতগুলিকে তাহারা (যেন) পূর্ণ করে এবং তাহারা (যেন) তোয়াফ করে প্রাচীন ঘরের সহিত।

৩০. ওইটাই (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান) সন্মান করে (ইউআজ্জিম) পবিত্র অনুষ্ঠানগুলি (মর্যাদাসমূহ) (হরুম্মাতি) আল্লাহর (আল্লাহি) সুতরাং উহা (ফাহয়া) উত্তম (ভালো) (খায়রুন) তাহার জন্য (লাহ) নিকট (ইন্দা) তাহার রবের (রাব্বিহি) এবং (ওয়া) হালাল করা হইয়াছে (উহিল্লাত) তোমাদের জন্য (লাকুম) ঘরে পালন করা জানোয়ার (গৃহপালিত জন্তু) (আনআমু) একমাত্র (ইল্লা) যাহা (ম্মা) শোনানো হইয়াছে (ইউত্লা) তোমাদের উপর (আলাইকুম) সুতরাং তোমরা দূরে থাকো (ফাজ্‌তানিবুর) অপবিত্রতা (রিজ্সা) হইতে (মিন) মূর্তিগুলির (আওসানি) এবং (ওয়া) তোমরা দূরে থাকো (ওয়াজ্‌তানিবু) কথা (কাওলা) মিথ্যা (জুর)।

ওইটাই এবং যে আল্লাহর মর্যাদাগুলির সন্মান করে সুতরাং উহাই উত্তম তাহার জন্য তাহার রবের নিকট এবং হালাল করা হইয়াছে তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু একমাত্র যাহা তোমাদেরকে শোনানো হইয়াছে সুতরাং তোমরা দূরে থাকো মূর্তিগুলির অপবিত্রতা হইতে এবং তোমরা দূরে থাকো মিথ্যা কথা (হইতে)।

৩১. পরিশুদ্ধ (বিশেষভাবে পরিষ্কৃত, শোধিত বা পবিত্রীকৃত, একনিষ্ঠ) (হনাফাআ) আল্লাহর জন্য (লিল্লাহ) ব্যতীত (ভিন্ন, বাদে, বিনা, ছাড়া) (গাইরা) যাহারা শরিক করে (মুশরিকিনা) ইহার মধ্যে (বিহি) এবং (ওয়া) যে (মান) শরিক করে (ইউশরিক) আল্লাহর সহিত (বিল্লাহি) সুতরাং যেন (ফাকাআননামা) পড়িয়া গেল (খাররা) হইতে (মিন) আকাশ (সাম্মায়ি) সুতরাং তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে (ফাতাখতাফুহ) পাখি (তাইরু) অথবা (আও) উড়াইয়া লইয়া যাইবে (তাহবি) ইহার মধ্যে (বিহি) বাতাস (রিহ) মধ্যে (ফি) স্থানে (মাকানিন) দূরবর্তী (সাহিকি)।

পরিশুদ্ধ হইয়া আল্লাহর জন্য তাহার সহিত যাহারা শরিক করে (তাহারা) ব্যতীত এবং যে শরিক করে আল্লাহর সহিত সুতরাং যেন সে আকাশ হইতে পড়িয়া গেল সুতরাং তাহাকে পাখি ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে অথবা তাহাকে বাতাস উড়াইয়া লইয়া যাইবে দূরবর্তী স্থানের মধ্যে।

৩২. ওইটাই (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান) সন্মান করে (ইউআজিম) বিধানসমূহ (শাআইরা) আল্লাহর (লিল্লাহি) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাইননাহা) হইতে (মিন) তাকওয়া (তাকওয়াল) কলবগুলির (অন্তরসমূহের) (কুলুব)।

ওইটাই এবং যে আল্লাহর বিধানগুলিকে ইচ্ছত করে সুতরাং তাহা অন্তরগুলির তাকওয়া হইতে (আসে)।

৩৩. তোমাদের জন্য (লাকুম) ইহার মধ্যে (ফিহা) ফায়দা (সুফল, লাভ) (মানাফিউ) দিকে (ইলা) সময় (আজালিম) নির্দিষ্ট (মুসাম্মান) ইহার পর (সুম্মা) তাহার জায়গা (মাহিললুহা) দিকে (ইলাল) ঘর (বাইতি) প্রাচীন (আতিক)।

তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে ফায়দা নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ইহার পর তাহার জায়গা প্রাচীন ঘরের দিকে।

৩৪. এবং (ওয়া) প্রত্যেকের জন্য (লিকুল্লি) জাতির (উম্মাতিন্) আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি (জাআলনা) কুরবানির নিয়ম (মানসাকা) তাহারা উচ্চারণ করে সহিত (লিইয়াজকুরস্) নাম (মা) আল্লাহর (আল্লাহি) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন (রাজাকাহম) মধ্য হইতে (মিন) চতুর্দ জল্পর (বাহিমাতিন্) গৃহপালিত (আনআম) সুতরাং

তোমাদের ইলাহ (ফাইলাহকুম) ইলাহ (ইলাহ) এক (ওয়াহিদুন) সুতরাং তাহার জন্য (ফালাহ) আত্মসমর্পণ করো (আস্‌লিমু) এবং (ওয়া) সুসংবাদ দাও (বাশ্‌শিরিল) বিনীতগণকে (মুখবিতিনা)।

এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা (আল্লাহ) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি কুরবানির নিয়ম তাহারা আল্লাহর নামের সহিত উচ্চারণ করে যাহা তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছেন (উহার) উপর গৃহপালিত চতুর্দ জন্তুর মধ্য হইতে, সুতরাং তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ সুতরাং তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।

৩৫. যাহারা (আল্লাজিনা) যখন (ইজা) আল্লাহর জিকির করা হয় (জুকিরাল্লাহ) কাঁপিয়া উঠে (ওয়াজিলাত) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) ধৈর্যধারণকারী (সাবেরিনা) উপর (আলা) যাহা (মা) তাহাদের উপর পতিত হয় (আসাবাহম) এবং (ওয়া) কায়েমকারী (মুকিম্বি) সালাত (সালাতি) এবং (ওয়া) যাহা হইতে (মিন্‌মা) আমরা (আল্লাহ) তাহাদেরকে রেজেক দিয়াছি (রাজাক্নাহম) তাহারা খরচ করে (ইউন্‌ফিকুন)।

ল্ট যাহারা আল্লাহর যখন জিকির করা হয় তাহাদের অন্তরগুলি কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের উপর যাহা পতিত হয় (উহার) উপর ধৈর্যধারণকারী এবং সালাত কায়েমকারী এবং যাহা হইতে তাহাদের আমরা (আল্লাহ) রেজেক দিয়াছি তাহারা খরচ করে।

৩৬. এবং (ওয়া) উটগুলি (বুদনা) সেইগুলিকে আমরা (আল্লাহ) করিয়াছি (জাআল্নাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) হইতে (মিন্‌) আল্লাহর দৃষ্টান্তগুলির (নিদর্শনাবলির) (শাআইরিল্লাহি) তোমাদের জন্য (লাকুম) উহার মধ্যে (ফিহা) মঙ্গল (কল্যাণ) (খাইরুন) সুতরাং উচ্চারণ করো (ফাজ্‌কুরুস) আল্লাহর নাম (মাল্লাহি) তাহাদের উপর (আলাইহা) শ্রেণীবদ্ধভাবে (সারিবদ্ধভাবে) (সাওয়াফ) সুতরাং যখন (ফাইজা) হেলিয়া পড়ে (চলিয়া পড়ে) (ওয়াজাবাত) তাহাদের পিঠগুলি (জুবুহা) সুতরাং তোমরা খাও (ফাকুলু) উহা হইতে (মিন্‌হা) এবং (ওয়া) তোমরা খাওয়াও (আত্‌ইমুলু) অভাবীদেরকে (কানিয়া) এবং (ওয়া) যাহারা চায় সেই অভাবীদেরকে (মুতাররা) ওইভাবে (কাজালিকা) সেইগুলিকে আমরা (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছি (সাখখারনাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমরা যাহাতে (লাআল্লাকুম) শুকুর করো (তাশকুরুন)।

এবং উটপ্তলি তোমাদের জন্য আমরা (আল্লাহ) সেইপ্তলিকে করিয়াছি আল্লাহর দৃষ্টান্তবলির মধ্যে উহার মধ্যে তোমাদের জন্য মঙ্গল (রহিয়াছে) সুতরাং উচ্চারণ করো শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদের উপর আল্লাহর নাম সুতরাং যখন হেলিয়া পড়ে ইহাদের পিঠপ্তলি সুতরাং তোমরা খাও উহা হইতে এবং অভাবীদেরকে এবং যাহারা চায় সেই অভাবীদেরকে তোমরা খাওয়াও তোমাদের জন্য ওইভাবে আমরা (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি সেইপ্তলিকে যাহাতে তোমরা শুকুর করো।

৩৭. কখনওই না (লাই) পৌছায় (ইয়ানালা) আল্লাহর (আল্লাহা) উহাদের গোশতপ্তলি (লুহমুহা) এবং (ওয়া) না (লা) উহাদের রক্ত (দিম্মাউহা) এবং কিছু (ওয়ালাকিন) তাহার (কাছে) পৌছায় (ইয়ানালুহ) তাকওয়া (তাকওয়া) তোমাদের হইতে (মিনকুম) ওইভাবে (কাজালিকা) সেইপ্তলিকে তিনি (আল্লাহ) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন (সাখখারনাহা) তোমাদের জন্য (লাকুম) তোমরা কবির (শ্রেষ্ঠত্ব) ঘোষণা করো (লিতুকাব্বিরু) আল্লাহর (আল্লাহা) উপরে (আলা) যাহা (মা) তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন (হাদাকুম) এবং (ওয়া) সুসংবাদ দাও (বাশশিরিল) সংকল্পপরায়ণ লোকদেরকে (মুহসিনি)।

উহাদের গোশতপ্তলি এবং উহাদের রক্ত আল্লাহর (কাছে) কখনওই না পৌছায় না এবং কিছু তাঁহার (কাছে) পৌছায় তাকওয়া ওইভাবে তোমাদের হইতে সেইপ্তলিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন তোমাদের জন্য তোমরা কবির (শ্রেষ্ঠত্ব) ঘোষণা করো আল্লাহর, তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন যাহা উপরে এবং সুসংবাদ দাও সংকল্পপরায়ণ লোকদেরকে।

যে কোনো হালাল পশুর রক্ত এবং গোশত আল্লাহর নিকট কখনওই পৌছায় না ॥ এই কথাটি আল্লাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন। বরং আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিলেন যে তোমাদের মনের খাস নিয়তটি তথা তাকওয়াটি আল্লাহর নিকট পৌছায়। পবিত্র নিয়তটিও যে তাকওয়ার একটি বড় অংশ অথবা পুরোটাই ॥ সেই কথাটি এই আয়াতের নিরিখে বলা চলে। পবিত্র নিয়ত নামক তাকওয়ার উপরেই ধর্মভীরুতার পরিচয়টি ফুটে ওঠে। এখানে

আমিদের কোরবানিটিকেই তথা যে খান্নাসরূপী শয়তানটি জীবাত্মার সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। এই আমিদের কোরবানির জন্য যারা ধ্যানসাধনার তাকুওয়ায় ভুবে আছে তাদেরকে সঠিক পথটুকু অবশ্যই দেখানো হয়। পশু কোরবানিটি হলো ম্লেজাজি কোরবানি এবং আমিদের কোরবানিটিই হলো হাকিকি কোরবানি। আমার সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে উহাকে ‘তু’ বলা হয়। সুতরাং আমি যোগ ‘তু’ সম্মান সম্মান আমি তু। আমি যোগ খান্নাসরূপী শয়তান সম্মান সম্মান ‘উদ্‌উনা’। আমার ভেতরে পরীক্ষা করার জন্য যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারলেই ‘আমি’ কেবলই একা থাকি। এই খান্নাসমুজ্জ আমিটিকেই বলা হয় ‘উদ্‌উনি’। এই ‘উদ্‌উনি’ হতে পারলেই আল্লাহর রহস্যলোকের দরজাগুলো নিজের ভেতরে খুলতে থাকে এবং নিজের ভেতরেই আল্লাহর ডাকসমূহ শুনতে পায়। এখানে ম্লেজাজি কোরবানিটি চালু না রাখা হলে হাকিকি কোরবানিটির রহস্য ধরাটা বড়ই কষ্টকর হতো। সেই জন্যই বিমূর্ত (যাহা দেখা যায় না) কোরবানিটি বুঝবার জন্যে মূর্ত কোরবানি পশু কোরবানির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কেউ বুঝতে পারে, আবার কেউ মোটেও বুঝতে পারে না। অবশ্য বোঝাটাও তকদির এবং না বোঝাটাও তকদির। এই তকদিরের বন্ধনটিকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়।

৩৮. নিশ্চয়ই (ইন্নান) আল্লাহ (আল্লাহা) বাধাদান (নিবারণ, অবরোধ, প্রতিরোধ) করেন (ইউদাফিউ) হইতে (আন্) যাহারা (লাজিনা) ইম্মান আনিয়াছে (আম্মানু) নিশ্চয়ই (ইন্নান) আল্লাহ (আল্লাহা) না (লা) ভালোবাসেন (ইউহিব্বু) প্রত্যেক (কুল্লা) বিশ্বাসঘাতক (খাওয়ানিন্) যে উপকার স্বীকার করে না (অকৃতজ্জ) (কাফুর)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ বাধাদান করেন যারা ইম্মান আনিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন না প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্জকে।

প্রথমেই বলতে চাই যে ‘আন্’ তথা হইতে শব্দটি এই বাক্যে ব্যবহার করতে পারলাম না। সুতরাং শব্দটি শব্দের জায়গাতেই রয়ে গেল। তারপর

একটি মারাত্মক কথা হলো, এখানে এই আয়াতে ‘আম্মানু’ তথা ইম্মানদার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ অনেক অনুবাদকারী ‘আম্মানু’ শব্দটিকে অনুবাদ করতে গিয়ে ‘মোমিন’ লিখে ফেলেছেন। অবশ্য ইহা দোষের বিষয় হলেও জ্ঞানের স্বল্পতায় অথবা কথার মারপ্যাচ খাটিয়ে ‘আম্মানু’-কে তথা ইম্মানদারকে ‘মোমিন’ লিখে ফেলেছেন। আল্লাহ যেখানে ‘আম্মানু’ তথা ইম্মানদার শব্দটি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন সেখানে হুবহু না রেখে ইম্মানদারকে মোমিন বানিয়ে ফেলেছেন। অথচ ‘আম্মানু’ এবং ‘মোমিন’-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকুও যারা করতে পারেন না তাদেরই বা দোষ দিয়ে লাভ কী? বাইবেল-এর হুবহু অনুবাদটি না থাকার দরুন বাইবেল-এর জগাখিচুড়ি অবস্থাটি আমরা দেখতে পাই এবং বাইবেল পড়লেই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের কিছু কথা ঢুকে পড়েছে। মূল কোরান-টি আছে বলেই অনুবাদকদের অবস্থানগুলো পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়।

৩৯. আদেশ দেওয়া হইল (অনুমতি দেওয়া হইল) (উজ্জিনা) তাহাদের জন্য (লিল্লাজিনা) যুদ্ধ করা হইতেছে (ইউকাতালুনা) কারণ তাহাদের প্রতি (বিআননাহম্) জুলুম করা হইয়াছে (জুলিমু) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) উপরে (আলা) সাহায্যের (নাসরি) তাহাদের (হিম্) অবশ্যই ক্রমতাবান (লাকাদির)।

তাহাদেরকে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইল কারণ তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের সাহায্যের উপরে, অবশ্যই ক্রমতাবান।

এই যুদ্ধের আদেশটি তাদেরকেই দেওয়া হয়েছে যারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত হবার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই যুদ্ধটি আদ্যোপান্ত একটি প্রতিরোধের যুদ্ধ। নিছক প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধটির আদেশ দেওয়া তথা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিরোধের যুদ্ধে যারা এগিয়ে যায় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম এবং অবশ্যই ক্রমতাবান। এই রকম প্রতিরোধের যুদ্ধগুলোতে আমরা দেখতে পাই প্রায় ক্রেত্রেই বিজয়ী হয়েছে, পরাজিত হবার তুলনায়। কারণ আল্লাহ কখনওই জালিমদের সঙ্গে

অবস্থান করেন না, বরং যারা জালিমদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত তাদের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত সহানুভূতিশীল।

৪০. যাহারা (আল্লাজিনা) বহিস্কৃত হইয়াছে (যাহাদের বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে) (উখরিজু) হইতে (মিন) তাহাদের ঘরবাড়িগুলি (দিআরিহিম) অন্যায়ভাবে (বিগাইরিহাক্কিন) একমাত্র (ইল্লা) যে (আই) তাহারা বলে (ইয়াকুলু) আমাদের রব (রাব্বানাল) আল্লাহই (লাহ) এবং (ওয়া) যদি (লাও) না (লা) প্রতিহত করিতেন (দাফ্ট) আল্লাহ (আল্লাহিন) মানুষদের (নাসা) তাহাদের কিছু অংশকে (বাদাহম) কিছু অংশের দ্বারা (বিবাদিল্লা) অবশ্যই ধ্বংস করা হইত (হুদদিমাত) সংসারবিরাগীদের আশ্রমগুলি (সাওয়ামিউ) এবং (ওয়া) গির্জা (বিইয়াউ) এবং (ওয়া) ইহুদিদের উপাসনালয়গুলি (সালাওয়াতুউ) এবং (ওয়া) মসজিদগুলি (মাসাজিদু) জিকির করা হয় (ইউজ্জাকরু) উহার মধ্যে (ফিহাসু) আল্লাহর নাম (মুল্লাহি) অনেক (কাসিরান) এবং (ওয়া) অবশ্যই সাহায্য করিবেন (লাইয়ানসুরা) আল্লাহ (আল্লাহ) যে (মান) তাঁহাকে (আল্লাহকে) সাহায্য করে (ইয়ানসুরুহ) নিশ্চয়ই আল্লাহ (ইন্নাল্লাহা) অবশ্যই ক্ষমতাবান (লাকাইয়ুন) মহিমাবিত ক্ষমতাবান (আজিজ)?

যাহাদেরকে তাহাদের ঘরবাড়িগুলি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে অন্যায়ভাবে একমাত্র (কারণটি হইল) যে তাহারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের রব।’ এবং আল্লাহ যদি না প্রতিহত করিতেন মানুষদেরকে তাহাদের কিছু অংশকে (অন্য) কিছু অংশের দ্বারা (তাহা হইলে) অবশ্যই ধ্বংস করা হইত সংসারবিরাগীদের আশ্রম এবং গির্জা এবং ইহুদিদের উপাসনালয়গুলি এবং মসজিদগুলি, উহার মধ্যে জিকির করা হয় বেশি বেশি আল্লাহর নাম এবং আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহিমাবিত ক্ষমতাবান।

এই আয়াতে একটিমাত্র অপরাধের জন্য অন্যায়ভাবে যাদেরকে ঘরবাড়িগুলো হতে বাহির করে দেওয়া হয়েছে সেই অন্যায়টি হলো যে, তারা বলতো, ‘আল্লাহই আমাদের রব তথা প্রতিপালক।’ আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করার ঘোষণাটির মধ্যেও সে যুগে যে কী ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হতো

এমনকি নিজেদের বসতভিটা হতেও উচ্ছেদ করে দেওয়া হতো তারই নজির, তারই দৃষ্টান্ত এই আয়াতে ফুটে উঠেছে। তাই আল্লাহ পাক আরও বলছেন যে মানুষদের মাঝেই একটি দলকে অপর দল দিয়ে প্রতিহত করানো হয়। যদি এ রকম ব্যবস্থাপত্রটি আল্লাহ না করে দিতেন তা হলে অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হতো সংসারবিরাগীদের আশ্রম এবং খ্রিস্টানদের গির্জা এবং ইহুদিদের কালিসা এবং মুসলমানদের মসজিদগুলো। কারণ উহাদের মাঝেই জিকির করা হয় আল্লাহর নাম বেশি বেশি। আল্লাহ যে কারও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাটিকে গর্হিত অপরাধ মনে করেন তারই জ্বলন্ত দলিল হলো এই আয়াতটি। সংসারবিরাগীদের আশ্রমে বেশি বেশি জিকির করা হয় আল্লাহর নাম। এই সংসারবিরাগীদের আশ্রমটিকেও আল্লাহ জিকির করার একটি উত্তম স্থান বলে ঘোষণা করলেন এবং সংসারবিরাগীরাও যে আশ্রমে থেকে আল্লাহর নামে অধিক জিকির করেন তার স্বীকৃতিটিও এই আয়াতে দেওয়া হলো এবং ওই একইভাবে খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদিদের কালিসা এবং মুসলমানদের মসজিদগুলোর কথাও বলা হলো। তারপর সর্বশেষে আল্লাহ চমকিত এবং আশাবিত্ত করলেন এই বলে যে, যে আল্লাহকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এই কথাটি যে কেউ মেনে নেবে, কিছু মানুষ কেমন করে আল্লাহকে সাহায্য করে সেটাই তো বিস্ময়কর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তা হলে কি আল্লাহ জাল্লা শানাহর প্রশংসায় জিকির-ফিকিরে মশগুল হয়ে ধ্যানসাধনা করাটাকেই আল্লাহকে সাহায্য করা বলা হয়েছে? মানুষ যাতে জিকির-ফিকিরে, ধ্যানসাধনায় মশগুল হয়ে আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রশ্নে নিরাশায় না ভোগে তারই জন্য আল্লাহ নিজেকে ‘কাইয়ুন’ তথা অবশ্যই ক্রমতাবান এবং আজিজ তথা মহিমাবিত ক্রমতাবান বলে ঘোষণা করেছেন। তার মানে, হে মানুষ, তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আছো উহাতে নিরাশ হবার কিছু নাই, কারণ সর্বময় ক্রমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানাহ।

৪১. যাহারা (আল্লাজিনা) যদি (আন) তাহাদেরকে ক্রমতা দেই আমরা (আল্লাহ) (মাক্কান্নাহম) মধ্যে (ফি) জমিনে (পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) তাহারা কায়ুম করে (আকামুস) সালাত (সালাতা) এবং (ওয়া) তাহারা দেয়

(আতুজ্জ) জাকাত (জাকাতা) এবং (ওয়া) নির্দেশ দেয় (আম্মারু) মহৎ কাজের সহিত (বিল্‌ম্মারুফি) এবং (ওয়া) মানা করে (নাহাও) হইতে (আনিল) অন্যায় কাজ (মুনকারি) এবং (ওয়া) আল্লাহরই জন্য (লিল্লাহি) পরিণতি (আকিবাতুল) সব বিষয়ের (উম্মুর)।

এই জমিনের মধ্যে আমরা (আল্লাহ) যদি তাহাদেরকে ক্ষমতা দেই (তাহা হইলে) তাহারা কায়েম করে সালাত এবং তাহারা জাকাত দেয় এবং নির্দেশ দেয় মহৎ কাজের এবং অসৎ কাজ হইতে মানা করে এবং আল্লাহরই জন্য সব বিষয়ের পরিণতি।

এই আয়াতে বিশেষ একটি শ্রেণীকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন যে, যদি এই বিশেষ শ্রেণীকে ক্ষমতা দেওয়া হতো তাহলে চারটি বিষয় হতে কখনওই বিচ্যুত হতো না। সেই চারটি বিষয়ের প্রথমটি হলো সালাত কায়েম করা। এই সালাত কি সত্যিই ওয়াজিয়া সালাত নাকি দায়েমি সালাত? প্রশ্ন এ জন্যই করলাম যে দায়েমি সালাতের কথাটি সূরা মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতে একদম খোলাসা করে বলে দেওয়া হয়েছে এবং হাদিসেও বলে দেওয়া হয়েছে যে ওয়াজিয়া সালাত হতে দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে (সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম্ মিনাল সালাতিল ওয়াজি)। সবাইকে বলছি না, বরং বেশ কিছু ওয়াজিয়া সালাত পালনকারীদেরকে দেখতে পাই সুদ খেতে, এতিমের হক মেরে দিতে, জাল দলিল করে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে, খাদ্যে ভেজাল মেলাতে, বিদেশে পাঠাবার নামে গরিবের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করতে – ইত্যাদি অপকর্মগুলো করতে। বুকে হাত রেখে বলুন তো, এই রকম ওয়াজিয়া নামাজিদের চলনবলন দেখে মানুষ কী করে আস্থা স্থাপন করবে? তা হলে কি আল্লাহর বর্ণিত সালাতটির মর্যাদা দায়েমি সালাতের দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে? অভিজ্ঞতার শর্তে কী সিদ্ধান্ত নেব ভেবে পাই না। তারপরে আসে জাকাতের কথা। এই জাকাত কি মালের জাকাত, নাকি আমিত্বের কোরবানি দেবার জাকাত? অর্থের জাকাতের প্রশ্নেই আসা যাক। শতভাগের আড়াইভাগ যদি অর্থের জাকাতটি হয়ে থাকে তা হলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের দেশগুলোতে সরকার আয়ের উপর অনেক অনেক বেশি কর ধার্য করে রেখেছে। হাতের আঙুল যেমন আয়না দিয়ে দেখতে হয় না, তিক তেমনি এদের

করের কথাটিও না বললেও চলে। তা হলে এই জাকাতের আসল বিষয়টি কী হতে পারে? ইহার গবেষণা করাটি প্রয়োজন বোধ করি। অবশ্য সংকীর্ণতার এবং গোড়ামির কুপমণ্ডুকতার সাইনবোর্ড কাঁধে নিয়ে গবেষণা করতে গেলেই গবেষণার ফলটি যে বিরাট একটি অশ্বভিষ প্রসব করিবে ইহাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ আছে কি? তৌহিদের শিক্ষাটি হলো, নিজে আগে পালন করে অপরকে শিক্ষা দেওয়া। মহং কাজের উপদেশ কারা দেবে? অসং লোকের মুখে মহং কাজের আদেশ উপদেশটি কি মানায়? প্রথমে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সং হতে হবে। তারপর মহং কাজের উপদেশটি মানাবে। ওই একই কারণে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার আদেশ-উপদেশটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও কথাগুলো নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বলা হয়েছে, কিন্তু সমাজ-জীবনের করুণ অবস্থা দেখে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি আপনিই এসে যায়।

৪২. এবং (ওয়া) যদি (ইন) আপনার উপর মিথ্যারোপ করে (ইউকাজ্জিবুকা) সুতরাং নিশ্চয়ই (ফাকাদ) মিথ্যারোপ করিয়াছিল (কাজ্জাবাত) তাহাদের আগেও (কাব্লাহম) কওম (জাতি) (কাওমু) নুহের (নুহিউ) এবং (ওয়া) আদ (আদুন) এবং (ওয়া) সামুদ (সামুদ)।

এবং যদি আপনার উপর মিথ্যারোপ করে নিশ্চয়ই মিথ্যারোপ করিয়াছিল তাহাদের আগেও নুহের কওম এবং আদ এবং সামুদ।

৪৩. এবং (ওয়া) কাওম (কাওমু) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিমা) এবং (ওয়া) কওম (কাওমু) লুতের (লুতি)।

এবং ইব্রাহিমের কওম এবং লুতের কওম।

৪৪. এবং (ওয়া) অধিবাসীরা (আস্হাবু) মাদাইয়ানের (মাদইয়ানা) এবং (ওয়া) মিথ্যারোপ করিয়াছিল (কুজ্জিবা) মুসাকেও (মুসা) সুতরাং আমি (আল্লাহ) সুযোগ (অবকাশ) দিয়াছিলাম (ফাআম্লাইতু) কাফেরদের জন্য (লিল্কাফিরিনা) ইহার পর (সুম্মা) আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার (পাকড়াও) করিয়াছিলাম (আখাজ্জতুহম) সুতরাং কেমন (ফাকাইফা) ছিল (কানা) আমার সাজা (শাস্তি, দণ্ড, নিগ্রহ) (নাকিরি)।

এবং মাদাইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যারোপ করা হইয়াছিল মুসাকেও সুতরাং আমি সুযোগ দিয়াছিলাম কাফেরদের জন্য ইহার পর আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছিলাম সুতরাং কেমন ছিল আমার সাজা।

উপরের এই তিনটি আয়াতে আমরা দেখতে পাই, সেই প্রাচীন যুগেও ঘোর বস্তুর পূজারিরা নবি-রসুলদের উপর জঘন্য মিথ্যারোপ করার দরুন কী রকম ভয়ংকর শাস্তি পেতে হইয়াছিল তারই কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। হজরত নুহ (আ.)-এর আমলে এবং আদ ও সামুদ জাতিও নবিদেরকে অস্বীকার করেছিল তথা অধ্যাত্মবাদকে অস্বীকার করেছিল – এমনকি ইব্রাহিম (আ.) এবং লুত (আ.)-এর কণ্ঠস্বর এবং মাদাইয়ানের অধিবাসীরা এবং হজরত মুসা নবি (আ.)-র মতো জাঁদরেল নবিকেও যুগে যুগে এই ঘোর বস্তুর-পূজারিরা অস্বীকার করে এসেছিল এবং নানা রকম মিথ্যারোপ করতেও এইসব কাফেরদের অন্তরাত্মা এতটুকুও কেঁপে ওঠে নি। আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করে এইসব কাফেরদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দিচ্ছেন, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানো তো দূরে থাক, বরং আরও ভয়ংকর, আরও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে নবি-রসুলদের অপমানের পর অপমান করে গেছে। কিন্তু সুযোগেরও তো একটা সীমা আছে। যখন সীমার বাঁধ ভেঙে গেছে তখনই আল্লাহ এইসব কাফেরদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আসলেই যুগে যুগে এবং এই সর্বাধুনিক যুগেও ঘোর বস্তুর-পূজারিরা নবি-রসুলদের অধ্যাত্মবাদের মোড়ানো বস্তুবাদকে কখনওই গ্রহণ করে নিতে পারে নি এবং এখনও পারে না। এই সর্বাধুনিক যুগে পরিবেশ-দূষণের যে ভয়ংকর রূপটি আশ্বে আশ্বে ভয়ংকরতম রূপটি ধারণ করতে যাচ্ছে তাতে পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্যটি নষ্ট হয়ে গেলে কী যে ভয়ংকর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা কিছুটা সবাই বুঝতে পারে। সুনামির মতো ভয়ংকর সমুদ্রকম্পন, বড় বড় ভূমিকম্প, ঝড়, টর্নেডোগুলো যে কী রুদ্রমূর্তিতে ছোবল মেরে যাচ্ছে তা আমরা সবাই কমবেশি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। যদি আধুনিক যুগের কিছু লোক মনে করে থাকে যে আগের যুগের শাস্তির মতো শাস্তির নমুনাটি তো এখনও দেখতে পাচ্ছি না ॥ যেদিন আল্লাহর এই ভয়ংকর শাস্তিটি পতিত হতে থাকবে তখনই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। কারণ ঘোর বস্তুর-পূজারিরা কখনওই আত্মার

অবস্থানটিকে কোনোদিন কোনোকালেও স্বীকার করে নেয় নি এবং এখনও অনেকেই স্বীকার করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে যারা মুখে স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে স্বীকার করে না। তাদের সংখ্যাও সব যুগেই কম ছিলো না। ঘোর বস্তুর-পূজারীদেরকে কোনোকালেই হেদায়েত করা যায় নি এবং এখনও যায় না। কারণ এরা ঘোর কাফের। হেদায়েতের বাণী এদের অন্তরকে আঘাত করা তো দূরের কথা, বরং নানা রকম টিটকারি করে গিয়েছে এবং এখনও করে। এই রকম কাফেরেরা সর্বযুগেই কলুষিত বস্তুর-পূজারি। এরা নবি-রসুল, ওলি-আবদাল এবং এমনকি স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানাহকেও অস্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। সুতরাং আল্লাহর শাস্তি আস্তে আস্তে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয়ংকর বোবা শাস্তিটি সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে রীতিমতো ঘাবড়িয়ে দিয়েছে এবং সেই আল্লাহর বোবা শাস্তিটির নাম সবারই কমবেশি জানা আছে। তবু খোলাসা করে বলে দিচ্ছি – আল্লাহর সেই বোবা মহাশাস্তিটির নাম হলো একোয়ার্ড ইম্মিউন ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম, সংক্ষেপে এইডস নামক ভয়াবহ রোগ।

৪৫. সুতরাং কতই না (ফাকাআইইম) হইতে (মিন) জনপদ (কারইয়াতিন) আমরা (আল্লাহ) তাহা ধ্বংস করিয়াছি (আহ্লাক্নাহা) এবং (ওয়া) তাহা (হিয়া) জালিম (জালিমাতুন) সুতরাং তাহা (ফাহিয়া) যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল (খাইইয়াতুন) উপর (আলা) ইহার ছাদগুলির (উরুশিহা) এবং (ওয়া) কুপ (কুয়া) (বিরিম) বর্জিত (পরিত্যক্ত) (মোয়াত্‌তালাতিউ) এবং (ওয়া) অট্টালিকা (প্রাসাদ) (কাসরিম) সুদৃঢ় (মাশিদিন)।

সুতরাং কতই না জনপদ হইতে তাহা আমরা (আল্লাহ) ধ্বংস করিয়াছি এবং তাহা (ছিল) জালিম সুতরাং তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল ইহার ছাদগুলির উপর এবং পরিত্যক্ত কুপ এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা (ধ্বংস করা হইয়াছিল)।

এই আয়াতে জালিমদের জনপদ ধ্বংস করার আরও নমুনা তুলে ধরেছেন আল্লাহ। বিরাট বিরাট অট্টালিকাগুলোতে বাস-করা জালিমদেরকে অট্টালিকার ছাদসহ ভেঙে পড়ে চাপা-দেওয়া মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করানো হয়েছে। সেই যুগে কত পানির কুপগুলোকে পানি পান করার যোগ্যতা হারিয়ে পরিত্যক্ত

অবস্থায় ফেলে রেখে জালিমদেরকে শাস্তি দেবার কঠোরতার কথাটি আল্লাহ ঘোষণা করছেন।

৪৬. তবে কি (আফালাম) তাহারা ভ্রমণ করে নাই (ইয়াসিরু) মধ্যে (ফি) জমিনে (দেহে, মাটিতে, পৃথিবীতে) (আরদি) সুতরাং হইত (ফাতাকুনা) তাহাদের জন্য (লাহম) কলবগুলি (কুলুবুই) বুঝিত (ইয়াকিলুনা) উহার দ্বারা (বিহা) অথবা (আও) কানগুলি (আজানুই) শুনিত (ইয়াসমাউনা) উহার দ্বারা (বিহা) সুতরাং উহা (ফাইন্নাহা) না (লা) অন্ধ হয় (তাম্মাল) চোখগুলি (আবসারু) এবং (ওয়া) কিছু (লাকিন) অন্ধ হয় (তাম্মাল) কলবগুলি (কুলুবু) যাহা (লাতি) মধ্যে (ফি) বুকগুলিতে (বক্সসমূহে) (সুদুর)।

তবে কি তাহারা বেড়ায় (ভ্রমণ, পর্যটন, ঘূর্ণন করে) নাই জমিনের মধ্যে অথবা আপন দেহের মধ্যে সুতরাং তাহাদের জন্য অন্তরগুলি বুঝিতে পারিত উহার দ্বারা অথবা উহার দ্বারা কানগুলি শুনিতে পারিত সুতরাং উহার দ্বারা চোখগুলি অন্ধ হয় না এবং অন্ধ হয় কিছু কলবগুলি যাহা বুকগুলির মধ্যে (আছে)।

এই আয়াতে ভ্রমণ করার কথাটি মুখ্য বলে মনে হয়। জমিনের উপর ভ্রমণ তথা দেশভ্রমণ করলেই যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তা শতভাগ মেনে নেওয়া যায় না। ঘোর নাস্তিক প্রাক্তন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই সমগ্র পৃথিবী তিন যুগ ভ্রমণ করলেও যদি কেউ এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করত তা হলে উনি সোজা বলে দিতেন যে, ‘স্রষ্টাই তো নাই।’ সুতরাং এই ভ্রমণটিতে আপন দেহের ভিতরে ভ্রমণ করার কথাটি বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে চাই। জমিনের উপর তো বহু মানুষই অহরহ ভ্রমণ করছে, কিন্তু চোখ অন্ধ না হলেও বকের অভ্যন্তরে কলবগুলো অন্ধ থাকে বলেই এসব কথার রহস্য বুঝে উঠতে পারে না। এদের চোখ মোটেও অন্ধ নয়, কানগুলোও বধির নয়, কিন্তু দেহের মধ্যে অবস্থিত কলবগুলো অন্ধ থাকার দরুনই চোখ এবং কানগুলো অন্ধ থাকার ভূমিকাটি পালন করে। এরা কানে শুনতে পায় বটে, কিন্তু রহস্যময় বিষয়গুলোর রহস্যের কথাগুলো শুনতে পায় না এবং চোখে পরিষ্কার দেখতে পেলেও কলবগুলির অন্ধত্বের দরুন রহস্যের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারে না।

৪৭. এবং (ওয়া) আপনাকে তাড়াতাড়ি (শিয়) করিতে বলে (ইয়াস্তাজিলুনাকা) আজাবের সহিত (বিলআজাবি) এবং (ওয়া) কখনওই না (লান) ভঙ্গ করেন (ইউখলিফা) আল্লাহ (আল্লাহ) তাঁহার ওয়াদা (ওয়াদাহ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) সেই দিন (ইয়াওমান) কাছে (ইন্দা) তোমার রবের (রাব্বিকা) এক হাজার (কাআল্ফি) বছর (সানাতিম্ম) তাহা হইতে যাহা (মিম্মা) তোমরা গণনা করো (তাউদুন্)।

এবং আজাবের জন্য আপনাকে তাড়াহড়া করিতে বলে এবং আল্লাহ তাঁহার ওয়াদা কখনওই ভঙ্গ করেন না এবং নিশ্চয়ই সেই দিনটি তোমার রবের নিকট যাহা তোমরা গণনা করো এক হাজার বছর।

এই আয়াতে আমাদেরকে তথা পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, যে-আজাবের কথাটি তাড়াতাড়ি হচ্ছে না কেন বলে প্রশ্ন করাতে উত্তরটি সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : হে বিশ্বের মানবজাতি, তোমাদের গণনার এক হাজার বছর আল্লাহর গণনায় মাত্র একদিন। সুতরাং এই আজাবটি যে আস্তে আস্তে তোমাদেরকে আর্চেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে তারই নমুনা কি তোমরা দেখতে পাও না? পরিবেশ দূষণের উন্নতিটি কি ধীরে ধীরে টের পাওয়া যাচ্ছে না? অবধারিত মৃত্যু নামক এইড্‌স রোগটি কি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে না এবং ধীরে ধীরে অনেক লোককে গ্রাস করছে না? সুতরাং মানুষের গণনার হিসাবটি আর আল্লাহর গণনার হিসাবটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্যটি দেখতে পাই।

৪৮. এবং (ওয়া) কত (কাআইইম্ম) হইতে (মিন্) জনবসতি (কারইয়াতিন্) আমি সুযোগ দিয়াছি (আম্লাইতু) তাহাদেরকে (লাহা) এবং (ওয়া) তাহা (হিয়া) জালিম (জোয়ালিমাতুন) ইহার পর (সুম্মা) আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছি (আখাজ্জুহা) এবং (ওয়া) আমারই নিকট (ইলাইয়াল) ফিরিয়া আসিবে (প্রত্যাবর্তন করিবে) (মাসির)।

এবং আমি কত জনবসতি হইতে সুযোগ দিয়াছি তাহাদেরকে এবং তাহা জালিম (ছিল) ইহার পর আমি তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়াছি এবং আমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে (প্রত্যাবর্তন)।

৪৯. বলিয়া দিন (কুল) হে (ইয়া আইউহান) মানুষেরা (নাসু) প্রকৃতপক্ষে (মূলতঃ) (ইন্বান্না) আমি (আনা) তোমাদের জন্য (লাকুম) সাবধানকারী (সতর্ককারী) (নাজিরুম) অত্যন্ত স্পষ্ট (সুস্পষ্ট, স্পষ্ট) (মুবিন)।

বলিয়া দিন, হে মানুষেরা, প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট সাবধানকারী।

যেহেতু এই আয়াতটি সমস্ত মানবজাতিকে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে সেইহেতু সমগ্র মানবজাতির জন্য মহানবির অন্যান্য গুণগুলো না বলে কেবলমাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। এই আয়াতটি আম্মানু, মুসলমান, আলবাব, আফসার এবং মোমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয় নি, তাই কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। কারণ সমগ্র মানবজাতি মহানবির আসল রহস্যটা বুঝতে পারবে না এবং পারার কথা নয়। আম্ম জনতাকে যখন কিছু লক্ষ্য করে বলা হয় তখন সবচেয়ে সহজ-সরল বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তাই মহানবিকে এই আয়াতে কেবলমাত্র সুস্পষ্ট সাবধানকারী বলা হয়েছে। আম্ম জনতার পক্ষে গভীর রহস্যপূর্ণ মহানবির দর্শনগুলো বুঝবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ গরুর নাকে সুগন্ধীয় ফুল ধরলে জিভ বের করে খেয়ে ফেলবে, কারণ গরু সুগন্ধীর প্রশ্নে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

৫০. সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) ইম্মান আনে (আম্মানু) এবং (ওয়া) কাজ করে (আম্মিলুস) ন্যায়পরায়ণতা (ন্যায় ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, পক্ষপাতহীনতা, নেকিগুলি, নিরপেক্ষতা, সংকল্প) (সালিহাতি) তাহাদের জন্য (লাহুম) রুম্মা (মাগ্ফিরাতু) এবং (ওয়া) রেজেক (জীবিকা) (রিজ্কুন) সম্মানজনক (কারিম)।

সুতরাং যাহারা ইম্মান আনে এবং আম্মলে সালেহা করে তাহাদের জন্য রুম্মা এবং সম্মানজনক রেজেক।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে যারা ইম্মান আনে এবং এই ইম্মান আনাটির বিষয়ে কতটুকু ব্যাপকতা আছে তাহা ধর্তব্য হবে কি না বুঝতে পারলাম না। এখানে গবেষকদের মাঝে বিশ্বর মতভেদ আছে। বিশেষ করে ইম্মান আনার প্রশ্নে। তারপর আরেকটি কথা আরও ব্যাপক, বিশ্বত এবং অত্যন্ত গভীর আর সেই কথাটি হলো ‘আম্মেলুস সালিহাত’। এই ‘আম্মেলুস সালিহাত’ কথাটির

ব্যাপকতা এতই বেশি এবং প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায় যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হিমসিম খেতে হয়। যদি আমলে সালেহা কথাটি দিয়ে সংকর্ম অথবা মহৎ কর্মকেই বোঝানো হয়ে থাকে তা হলে এখানেও একটি বিরাট প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। কারণ পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা ধর্মের প্রশ্নে উদাসীন অথবা সন্ধেহবাদী অথবা নাস্তিক অথবা ঘোর নাস্তিক ॥ তাদেরও তো অনেক সংকর্ম এবং মহৎকর্ম করার দৃষ্টান্তগুলো চোখের সামনে দেখতে পাই। তা হলে এই সংকর্ম এবং মহৎকর্মগুলিকে কেমন করে ‘আমলে সালেহা’-র সত্যিকার অনুবাদ করা যায়? সুতরাং সব কিছু চিন্তা করে অবশেষে ‘আমলে সালেহা’-র ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদটি করেও, সঠিক অনুবাদ হলো না বলে ‘আমলে সালেহা’-কে অনুবাদেও ‘আমলে সালেহা’-ই রাখতে বাধ্য হলাম। তারপরেও যদি কেহ পঁচাত্তর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে চায় তা হলে অধম লিখক ইহার অর্থটি জানি না বলে ঘোষণা করতে চাই। এরপর আসে সম্মানজনক ‘রেজেক’। ‘রেজেক’-এর অর্থ যদি জীবিকা অনুবাদ করি এবং ‘কারিম’-কে সম্মানজনক অনুবাদ করি তাতেও আমার কাছে মনে হয় অনুবাদটি সঠিক হলো না। অনেক সময় কোনো উপায় না দেখে এবং আরবি লোগাতসমূহ ও অনেক আরবি ডিকশনারি খুলেও মনঃপূত এবং নিরপেক্ষ না হলে অনুবাদেও ‘রেজেক’-এর অর্থ জীবিকা না লিখে ‘রেজেক’-ই লিখে ফেলি। এবং এই বিষয়েও যদি কেহ পঁচাত্তর প্রশ্ন তুলে ধরেন তা হলে ‘আমি জানি না’ উত্তরটি ভালো মনে করি। কারণ বাজারে প্রচলিত অনুবাদগুলো হতে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে লিখে চলছি। সুতরাং পাঠকের কাছে একটু ব্যতিক্রম এবং খাপছাড়া বলে মনে হলে খুব বেশি একটা অবাক হবো না।

৫১. এবং (ওয়া) যাহারা (লাজিনা) চেঁচা করে (সাআও) মধ্যে (ফি) আমাদের (আল্লাহ) আয়াতগুলির (আয়াতিনা) হেয় (হীন, নীচ) করিয়া দেখিতে (মোয়াজ্জিনা) ওই সকল (উলাইকা) অধিবাসী (সম্মী) হইবে (আস্হাবু) দোজখের (জাহিম)।

এবং যাহারা চেঁচা করে আমাদের আয়াতগুলির মধ্যে হেয় করিয়া দেখাইতে ওই সকল (লোক) অধিবাসী হইবে দোজখের।

এই আয়াতটির অর্থটি মনে হবে খুবই সহজ, আসলে তা মোটেই নয়। কারণ কালি-কাগজের উপর কোরান-এর বাক্যগুলোকে আয়াত বলা হয় এবং ইহা অবশ্যই আয়াত। হাকিকি কোরান যেমন নূর, তেমনি তার আয়াতগুলিও অখণ্ড নূরেরই অংশ। সুতরাং এই অখণ্ড নূরী কোরান-এর যে কোনো নূরী অংশটি তথা হাকিকি আয়াতটিকে যারা অবহেলা করে, যারা হীন প্রতিপন্ন করতে চায়, শ্রেষ্ঠ দিয়ে হয় প্রতিপন্ন করে – তাদের স্থান তো নিচেই থাকার কথা। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ওইসব লোকেরা দোজখের অধিবাসী হবে।

৫২. এবং (ওয়া) না (মা) আমরা (আল্লাহ) পাঠাইয়াছি (আরসালনা) হইতে (মিন) আপনার আগে (কাবলিকা) হইতে (মিন) রসুলকে (রাসুলিউ) এবং (ওয়া) না (লা) নবিকে (নাবিয়ান) একমাত্র (ইল্লা) যখন (ইজা) আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে (তামাননা) নিক্ষেপ করিয়াছে (ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, ঢালিয়া দিয়াছে, সন্দেহ সৃষ্টি করিয়াছে) (আল্কা) শয়তান (শাইতানু) মধ্যে (ফি) তাহার আকাঙ্ক্ষার (উম্মনিইয়াতিহি) সুতরাং বিদূরীত (দূর) করিয়াছেন (ফাইয়ানসাখু) আল্লাহ (আল্লাহ) যাহা (মা) নিক্ষেপ করে (উল্কি) শয়তান (শাইতানু) ইহার পর (সুম্মা) অত্যন্ত দূর করেন (ইউহকিমু) আল্লাহ (আল্লাহ) তাঁহার আয়াতকে (আয়াতিহি) এবং (ওয়া) আল্লাহ (আল্লাহ) সব কিছু জানেন (আলিমুন) বিজ্ঞানময় (হাকিমুন)।

এবং আপনার পূর্ব হইতে কোনো রসুল হইতে এবং না কোনো নবিকে আমরা (আল্লাহ) পাঠাই নাই একমাত্র যখন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে সুতরাং আল্লাহ দূর করিয়াছেন যাহা শয়তান নিক্ষেপ করিয়াছিল ইহার পর আল্লাহ তাঁহার আয়াতকে অত্যন্ত দূর করেন এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন, বিজ্ঞানময়।

এই আয়াতে শয়তান যে নবি-রসুলদের আকাঙ্ক্ষার উপরেও কখনও কখনও শয়তানের রঙ-রূপ নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাহা দূর করে দিয়েছেন ॥ যদিও নবি-রসুলদের যে কোনো আকাঙ্ক্ষাই মহাপবিত্র এবং শয়তান কোনো কিছুই নিক্ষেপ করতে পারে না ॥ সেই কথাটি আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। কারণ নবি-রসুলেরা শয়তানকে প্রথমেই মুসলমান বানিয়ে

ফেলেছেন এবং এই মুসলমান বানিয়ে ফেলাটাকেই অন্য ভাষায় বলা হয় শয়তানকে দূর করে দেওয়া। সুতরাং শয়তান নবি-রসুলদের চাওয়া-পাওয়ার উপর কোনো প্রকার সামান্যতম ছলনাও নিক্ষেপ করতে পারে না। ইহাই আল্লাহ প্রকাশ্যে এই আয়াতে ঘোষণা করেছেন এবং সর্বশেষে এই কথাটিও বলেছেন যে আল্লাহ জ্ঞানময় তথা সব কিছু জানেন এবং বিজ্ঞানময় তথা হেকমতওয়ালা।

৫৩. এই জন্য তিনি বানাইয়া দেন (লিইয়াজ্জালা) যাহা (মা) নিক্ষেপ করে (ইউল্কি) শয়তান (শাইতানু) ফিৎনা (ফিত্নাতান) যাহাদের জন্য (লিল্লাজিনা) মধ্যে (ফি) যাহাদের কলবগুলিতে (কুলুবিহিম) রোগ (মারাজুন) এবং (ওয়া) পাথর (পাষাণ, প্রস্তর) (কাসিয়াতি) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহিম) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) জালেমেরা (জোয়ালিমিনা) অবশ্যই ক্বেরে (লাফি) বিরোধিতার (শিকাতিম) বহুদূরে (বাইদিন)।

এই জন্য তিনি বানাইয়া দেন শয়তান যাহা নিক্ষেপ করে (উহা) ফিৎনা তাহাদের জন্য যাহাদের কলবগুলির মধ্যে রোগ (আছে) এবং তাহাদের কলবগুলি পাথর এবং নিশ্চয়ই জালেমেরা বিরোধিতার ক্বেরে অবশ্যই বহুদূরে।

এই আয়াতে শয়তান যে ফিৎনা নিক্ষেপ করে সেই ফিৎনা তাদেরই জন্য যাদের কলবগুলিতে রোগ আছে এবং যাদের কলবগুলি পাষাণ-পাথরের মতো শক্ত এবং যারা জালিম তারা এই সত্য উপলব্ধির প্রশ্নে বহু দূরে অবস্থান করে, কারণ শয়তান তার অনেক রকম ফিৎনার মোহ দেখিয়ে জালিমদেরকে বিভ্রান্ত হতে বিভ্রান্তির অতলে তলিয়ে দেয় এবং সত্য হতে বহুদূরে তখন অবস্থান করে এবং সত্যের বিরোধিতা করাটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিক – কারণ সত্যের ছিটাকোঁটাও এই জালিমদের নাগালে আর অবস্থান করে না। এই আয়াতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, শয়তানের ফিৎনাগুলো অন্তরের মধ্যেই উদ্ভিত হবার কথাটি বলা হয়েছে। কারণ শয়তান অন্তরের বাহিরে অবস্থান করে না এবং অন্তরের বাহিরে অবস্থান করার বিধানটি আল্লাহ-কর্তৃক দেওয়া হয় নি। শয়তান এবং তার ফিৎনাগুলি একমাত্র দুইটি স্থানেই অবস্থান করে : একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর বিহনে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে শয়তানের অবস্থান করার আর কোনো জায়গা নাই।

৫৪. এবং (ওয়া) জ্ঞানিবার জন্য (লিআলাম্মা) যাহারা (আল্লাজিনা) আতা করিয়াছে (দেওয়া হইয়াছে) (উতুল) জ্ঞান (ইল্মা) যেন তাহা (আন্নাহ) সত্য (হাক্কু) হইতে (মিন) তোমার রবের (রাব্বিকা) সুতরাং তাহারা ইমান আনে (ফাইউমিনু) তাহার উপর (বিহি) সুতরাং অবনত করানো হইয়াছে এমন (ফাতুখ্বিতা) তাহার জন্য (লাহ) তাহাদের কলবগুলি (কুলুবুহম) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) পথ দেখায় (লাহাদি) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আম্মানু) দিকে (ইলা) পথের (সিরাতিম) সঠিক (মুস্তাকিম)।

এবং যাহাদেরকে জ্ঞানদান করা হইয়াছে (তাহারা) যেন জানে যে তাহা সত্য তোমার রবের নিকট হইতে সুতরাং তাহারা ইমান আনে তাঁহার উপর। সুতরাং নত করা হয় তাহার জন্য তাহাদের কলবগুলি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পথ দেখান যাহারা ইমান আনিয়াছে সঠিক পথের দিকে।

এই আয়াতে জ্ঞানদান করার কথাটি বলা হয়েছে তাই যারা জ্ঞানদান করার ভাগ্যটি অর্জন করেছে তারা রব তথা প্রতিপালকের উপর ইমান আনে এবং তাদের উদ্ধৃত কলবগুলিকে ইমানের পরশে নত করে দেওয়া হয় এবং তখনই আল্লাহ পথ দেখান তথা সত্যের পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তখনই সব রকম ভুল পথগুলো হতে সঠিক পথটির সন্ধান মেলে। এখানে ‘মুস্তাকিম’ শব্দটির অর্থ অনেকেই ‘সরল’ করেন কিন্তু ‘সরল পথ’ আর ‘সঠিক পথ’-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সরল-সোজা পথটি মনে হয় খুবই একটি সহজ পথ, কিন্তু সহজ পথেই এগিয়ে যাবার কথাটি এখানে বলা হয় নি, বরং যে-পথে অগ্রসর হলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় সেই পথ যদি বন্ধুর এবং দুর্গমও হয় তবু সেটাই সঠিক পথ। সঠিক পথ দিয়েই দুনিয়ার দৃষ্টিতে মানুষ তার নিজস্ব ঠিকানায় এগিয়ে চলে। সেই সঠিক পথটি বন্ধুরই হোক অথবা দুর্গমই হোক অথবা এবড়ো-খেবড়োই হোক – সেই পথ দিয়েই মানুষ তার সঠিক গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে। অন্যথায় যত সহজ-সরল পিচঢালা মসৃণ পথই হোক না কেন, সেই পথ যদি গন্তব্যস্থানের দিকনির্দেশনা না দেয়, তবে উহা কখনওই সঠিক পথ নয়। সেই পথ যতই সরল-সহজ হোক না কেন, যতই মসৃণ পিচঢালা পথ হোক না কেন – সেই পথের কোনো

প্রয়োজন নাই। অনেক অনুবাদক মনের অজ্ঞাত্রে ‘সরল পথ’ লিখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন, কিন্তু ইহা মোটেই ঠিক নয়। তারপর অনুবাদক ‘যারা ইমান আনে’ তথা ‘আম্মানু’দেরকে অনুমানে একলাফে ‘মোমিন’ বানিয়ে ছাড়ে। ‘আম্মানু’ আর ‘মোমিন’-এর মাঝে যে বিরাট পার্থক্য, অনুবাদক মনের অজ্ঞাত্রে সেই কথাটি ভুলে যায়। এই ভুলে যাবার কথাটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলতে হচ্ছে যে অন্যত্র ইমানদারকে আবার ইমান আনার কথাটি বলা হয়েছে। যিনি ইমান এনেছেন তাঁকে কেন পুনরায় ইমান আনার কথাটি বলা হলো? এই কথাটির সামান্য গবেষণা করলেই মনের অজ্ঞাত্রের এই ভুলটুকু সংশোধন করে নেওয়া যায়।

৫৫. এবং (ওয়া) না (লা) বিরত হইবে (ক্লান্ত হইবে, নিবৃত্ত হইবে, নিরস্ত হইবে) (ইয়াজালু) যাহারা (লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) মধ্যে (ফি) সন্ধেহের (সংশয়ের, সত্যতা নির্ণয়ে অনিশ্চয়তার) (মিরইয়াতিম্) তাহা হইতে (মিনহ) যতরূপ না (হাত্তা) তাহাদের (কাছে) আসিয়া পড়িবে (তাতিয়াহম্মু) সাআত (সাআতু) হঠাৎ করিয়া (সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে, পূর্বে কোনো বিবেচনা না করিয়া) (বাগ্‌তাতান) অথবা (আত্ত) তাহাদের (কাছে) আসিবে (ইয়াতিইয়াহম্ম) আজাব (আজাবু) দিনে (ইয়াওমিন) খারাপ (মন্দ, নিকৃষ্ট, দুর্দশাগ্রস্ত, অশুভ) (আকিমি)।

ল্ট এবং বিরত হইবে না যাহারা সন্ধেহের মধ্যে কুফরি করিয়াছে যতরূপ না তাহা হইতে তাহাদের (কাছে) আসিয়া পড়িবে হঠাৎ করিয়া সাআত অথবা খারাপ দিনে আজাব তাহাদের (কাছে) আসিবে।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সন্ধেহ নামক কুফরি করা হয় তাহা হতে আর বিরত রাখা যায় না। সুতরাং এটুকু বলা যেতে পারে যে, সন্ধেহের পেটেই কুফরির জন্ম হয়, আবার এই সন্ধেহই সঠিক পথে সত্যকে আলিঙ্গন করার প্রেরণা যোগায়। যদি সন্ধেহটি মন্দ হয়ে থাকে তা হলে কুফরি হতে বিরত করা যায় না। পক্ষান্তরে সন্ধেহটি যদি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় তা হলে এই সন্ধেহ মজিল-এ মকসুদে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে। অনেকটা কসাইয়ের ছুরি আর সার্জনের ছুরির মতো। দুটো ছুরিই একই ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি। অথচ নিয়তের ভিন্নতায় সার্জন অপারেশন করে জীবন রক্ষা করার তরে

প্রাণপণ চেষ্টা চালান, যদিও হায়াত-মউত আল্লাহরই হাতে, তবু নিয়তের মতুই এখানে ফুটে ওঠে। কিন্তু পক্ষান্তরে কসাইয়ের ছুরি গলা কেটে গোশত বিক্রি করে। ধাতব পদার্থ একই, অথচ নিয়তের ভিন্নতায় কত তফাৎ! এই আয়াতে ‘কেয়ামত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি, বরং ব্যবহার করা হয়েছে ‘সাত্বাত’। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু সাত্বাত শব্দটি এ জন্যই ব্যবহার করেছেন যে একটি মানুষের মৃত্যু-ঘটনাটিও একটি ছোট কেয়ামত। তাই এই ছোট কেয়ামতটিকে আল্লাহ সাত্বাত বলেছেন। ব্যক্তির মৃত্যুই যে সাত্বাত তারপরেই বলা হয়েছে, খারাপ দিনের আজাব তথা যে-দিন ব্যক্তির জীবনে মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটবে উহাকেই বলা হয়েছে খারাপ দিন। কাফেরদের জন্য যে আল্লাহপ্রদত্ত শাস্তিটি অবধারিত ইহাও এই আয়াতে বলা হয়েছে।

৫৬. একমাত্র মালিকানা (আধিপত্য, বাদশাহী, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব) (আলমুলকু) সেই দিন (ইয়াওমা) আল্লাহর জন্যই হইবে (ইজিল্লিল্লাহি) তিনি বিচার করিয়া দিবেন (ইয়াহকুমু) তাহাদের মধ্যে (বাইনাহম) সুতরাং যাহারা (ফাল্লাজিনা) ইমান আনিয়াছে (আমানু) এবং (ওয়া) কাজ করিয়াছে (আমিনুস) সালেহার (সালিহাতি) মধ্যে (ফি) জান্নাতগুলির (জান্নাতি) নেয়ামতে পরিপূর্ণ (নাজ্জিম)।

একমাত্র মালিকানা সেই দিন আল্লাহরই হইবে তাহাদের মধ্যে তিনি বিচার করিয়া দিবেন, সুতরাং যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সালেহার কাজ করিয়াছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতগুলির মধ্যে (তাহারা থাকিবে)।

যদিও এই আয়াতে বলা হয়েছে সেদিনের মালিকানা আল্লাহরই হবে, কিন্তু হাকিকতে তথা সত্য বলতে কি, সব সময়ে সর্বাবস্থায় সব কিছুর মালিকানা আল্লাহরই হাতে আছে। কিন্তু সেই সময়ের অথবা সেই দিনের মালিকানাটি একমাত্র আল্লাহরই হবে বলার মাঝে এ কথাটিই বোঝানো হয়েছে যে, মানুষের প্রবৃত্তি হতে নির্গত কাল্পনিক কথাগুলো তথা প্রবৃত্তির চিল্লাচিল্লি আর থাকবে না। তাই সেই দিনটিরও মালিকানার কথাটি বলা হয়েছে। এখানে সেই দিনটি বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? মৃত্যু-নামক ঘটনাটি যখন ঘটে যাবে। কারণ মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটবার আগে মানুষকে আল্লাহ সীমিত স্বাধীন

ইচ্ছাশক্তিটি দিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটে যাবার পর সেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিরও সমাপ্তি ঘটে। তাই প্রতিটি মৃত্যু-ঘটনা এক-একটি সাআত, যাকে মৃত্যু নামক ঘটনার কেয়ামত বলা হয়। সুতরাং সেই দিন আল্লাহ সব কিছুর ফয়সালা করে দিবেন। তাই যারা ইমান এনেছে এবং আমলে সালেহার কাজ করেছে, তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতগুলির মধ্যে যে অবস্থান করবে, তারই সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

৫৭. এবং (ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করে (কাফার) এবং (ওয়া) মিথ্যারোপ করে (কাজ্জাবু) আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলির সহিত (বিআইয়াতিনা) সুতরাং ওইসব মানুষ (ফাউলাইকা) তাহাদের জন্য (লাহম) শাস্তি (আজাবুম) মানহানিকর (অপমানকর, লাঞ্ছনাদায়ক, ভৎসনাদায়ক, নিন্দাজনক, উৎপীড়নমূলক) (মুহিনু)।

এবং যাহারা কুফরি করে এবং আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলির উপর মিথ্যারোপ করে সুতরাং ওইসব মানুষ তাহাদের জন্য মানহানিকর আজাব (রহিয়াছে)।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে, যারা কুফরি করে এবং আল্লাহর আয়াতগুলির উপরে মিথ্যারোপ করে তাদেরকেই শাস্তির বারতা শোনানো হয়েছে। যারা কেবলমাত্র আপন প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং আপন প্রবৃত্তির খেয়ালখুশিতে ডুবে আছে এবং আল্লাহর কোনো আদেশ-নিষেধই শোনে না তারাই প্রতিনিয়ত কুফরি করে চলছে। মুখে কুফরির কথা বললেই কুফরি হয় না, বরং প্রতিটি কাজকর্মের মাঝে ফুটে ওঠে তৌহিদ অথবা কুফরি। এই তৌহিদ এবং কুফরি বোঝাটাও সাদা চোখে অনেক কষ্টকর, কারণ বাহির দেখে ভেতরটা যাচাই করা খুবই কঠিন। কেউ যদি সাধু সাজে তা হলে সবার চোখেই ধরা পড়ে, কিন্তু আসল সাধু যারা তাদেরকে কেমন করে ধরতে পারা যায়? কারণ আসল সাধু সাধু সেজেও বসে থাকে, আবার সাধু না-সেজেও বসে থাকে। সুতরাং মোটা দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং মুখে মুখে কুফরির কথাটি বললেই কুফরি হয় না। ধরুন, একজন মানুষ এতিমের হক আত্মসাৎ করলো এবং পূর্ণ সুন্নতি লেবাসে নামাজ আদায় করলো। সুন্নতি লেবাসটি এবং নামাজ আদায়ের বিষয়টি সহজেই চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু এতিমের মাল আত্মসাৎ করার

বিষয়টি জ্ঞানা না থাকলে কেমন করে ধরা পড়বে? একটা মানুষ যদি এতিমের মাল আত্মসাৎ করে তা হলে সেই মানুষটি কুফরি করার চেয়েও ভয়ংকর কাজটি করে ফেলে। কারণ যারা এতিমের মাল আত্মসাৎ করে তারা বিসমিল্লাতেই ইসলাম হতে বিনা শর্তে বাতিল হয়ে যায়। তাই সূরা মাউন-এ বলা হয়েছে, যারা এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা প্রথমেরই ইসলাম ধর্ম হতে বহির্ভূত তথা বাদ। কোরান মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা বলেছে, কিন্তু এতিমের মাল আত্মসাৎ করাটি যে মুখ ফেরানো হতে কোটি গুণে ভয়ংকর তা কি সবাই বুঝতে পারে? তারপরে বলা হয়েছে, আল্লাহর আয়াতগুলির উপরে যারা মিথ্যারোপ করে। এই আয়াত কি কালিতে ছাপানো কাগজের উপরে লেখা আয়াত, নাকি চলার পথে প্রতিটি ক্বেরে আল্লাহর আদেশগুলো পালন করা? একটি বিষয়ের সঙ্গে অপর একটি বিষয়ের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় প্রতিটি ক্বেরে। ধরুন, বলা হয়েছে বেহেশতের চাবি হলো নামাজ, কিন্তু এটুকু বলেই বিষয়টুকু শেষ করে দেওয়া হয় নি, বরং নামাজের সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই শর্তটি পালন না করা পর্যন্ত নামাজ হয় না এবং নামাজ না হলে বেহেশতে যাওয়া যায় না ॥ নামাজের সেই শর্তটির নাম হলো ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা। এই পবিত্রতা বলতে কী বোঝায়? মনের পবিত্রতাই এখানে আসল পবিত্রতা এবং বাহিরের পবিত্রতা এখানে ম্লেজাজি পবিত্রতা। ভেতরের পবিত্রতা নাই, কিন্তু ম্লেজাজি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ তা হলে কি এটাকে ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা বলা চলে? তাই ‘তাহারত’ তথা পবিত্রতা হলো নামাজের প্রথম এবং শেষ শর্ত এবং তারপরেই বেহেশতের চাবি হতে পারে নামাজ। সুতরাং প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে, না গবেষণা করে সহসা একটি সিদ্ধান্ত টানা বোকামিরই লক্ষণ।

৫৮. এবং (ওয়া) যাহারা (আল্লাজিনা) ইজ্জত করিয়াছে (হাজ্জারু) মধ্যে (ফি) পথে (সাবিলি) আল্লাহর (আল্লাহি) ইহার পর (সুম্মা) কতল করা হইয়াছে (নিহত হইয়াছে) (কুতিলু) অথবা (আও) মারা গিয়াছে (মাতু) অবশ্যই তাহাদেরকে রেজেক দিবেন (লাইয়ারজুকান্নাহম) আল্লাহ (আল্লাহ) রেজেক (রিজকান) সুন্দর (উত্তম, উৎকৃষ্ট) (হাসানান) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই

(ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) তিনি অবশ্যই (লাহয়া) উত্তম (অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) (খাইরু) রেজেকদাতাদের (রাজিকিন)।

এবং হিজরত করিয়াছে যাহারা আল্লাহর পথের মধ্যে ইহার পর খুন হইয়াছে (নিহত হইয়াছে) অথবা (স্বাভাবিক) মারা গিয়াছে অবশ্যই আল্লাহ তাহাদেরকে রেজেক দিবেন, সুন্দর রেজেক এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই তিনি রেজেকদাতাদের উত্তম।

এই আয়াতে যারা হিজরত করেছেন তথা বাহির হয়েছেন অথবা ত্যাগ করেছেন অথবা পলায়ন করেছেন আল্লাহর পথের মধ্যে, তাদেরই কথা বলা হয়েছে। এখানে হিজরত বলতে যে ত্যাগ করার কথাটি বলা হয়েছে সেই হিজরতটি কেমন হতে হবে এবং কোথা হতে হিজরত করতে হবে, এর উত্তরটি এভাবে দেওয়া হয়েছে যে ‘আল্লাহর পথের মধ্যে।’ এখানে ‘আল্লাহর পথের মধ্যে’ বলতেই বা কী বোঝানো হয়েছে? ইহার ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাখ্যাটি অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর পথের মধ্যে যারা হিজরত করেন অর্থাৎ যারা আপন নফস তথা জীবাত্মা হতে খান্নাসরূপী শয়তানের প্ররোচনামগ্নিত প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হবার ধ্যানসাধনায় রত আছেন এবং আল্লাহকে পাবার পথে আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়াবার ধ্যানসাধনায় মগ্ন হইয়া আছেন এবং এই অবস্থায় যদি খুন হয়ে যান তথা নিহত হয়ে যান অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন তা হলেও তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই রেজেক দান করবেন। আবার প্রশ্ন এসে যায়, নিহত এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা মানুষের জন্য যে রেজেকটি দেওয়া হবে উহা কি খাদ্যজাতীয় রেজেক নাকি খাদ্যবিহনে অন্য কোনো ধরনের বিশেষ এবং অবাক-করা রেজেক, যাহা আল্লাহর ওলিরা ছাড়া অন্যদের জানা নাই? কারণ রেজেক বলতে যদি খাদ্য-পানীয় বলে এখানে ধরে নিই, তা হলে নিহত এবং মৃত্যুবরণ করা মানুষটি কী করে খাদ্য গ্রহণ করবে? কারণ মরা মানুষের পক্ষে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই রেজেক মৃত মানুষের জন্য নয়, বরং জীবিতদের জন্য। এই রেজেকের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহর ওলিরাই জানেন। সাধারণ মানুষ এবং ধর্মগবেষকদের পক্ষেও এই রেজেক বিষয়টির রহস্য জানা মোটেও সম্ভবপর নয়। অনুমানের গুলতানি এবং মনগড়া পঁচামারা অনেক রকম কথা তুলে ধরা

যায়, কিন্তু এই রকম রেজেকের রহস্যটি একমাত্র আল্লাহর ওলিরা ছাড়া অন্য যে কোনো মানুষের পক্ষে বোঝাটা অসম্ভব। তাই এই আয়াতে এই রেজেকটি যে একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী রেজেক তাহাও বলে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে ‘রিজ্কান্ হাসানান্’ তথা সুন্দর রেজেক। আবার আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি যত রকম রেজেকই দেন না কেন, কিন্তু এই বিষয়ে যে রেজেকটি দেওয়া হয় উহা উত্তম।

৫৯. অবশ্যই তিনি দাখিল করাইবেন তাহাদেরকে (লাইউদখিলান্নাহম্) দাখিলের স্থানে (মুদখালাই) তাহাতে তাহারা খুশি (তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, পছন্দ) হইবে (ইয়ারদাওনাহ) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই সব কিছু জানেন (লাআলিমুন) অত্যন্ত ধৈর্যশীল (পরম সহনশীল) (হালিম)।

অবশ্যই তিনি দাখিল করিবেন তাহাদেরকে দাখিলের স্থানে, তাহাতে তাহারা খুশি হইবে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই সব কিছু জানেন, অত্যন্ত ধৈর্যশীল।

এই আয়াতের এই বিষয়টি সাধারণ মানুষ এবং ধর্ম-গবেষকদের সম্পূর্ণ জ্ঞানবহির্ভূত কথা। কারণ যারা আল্লাহর পথের মধ্যে হিজরত করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন অথবা মারা গিয়েছেন তাদের খুশি হবার কথাটি এই আয়াতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা যে স্থানে তাদেরকে দাখিল করা হবে সেই বিষয়ে তারা খুশি হবেন অথবা সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং এই আয়াতটিতে রহস্যলোকে প্রবেশ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে তাদেরই জন্য যারা আপন নফসের ভেতরে অবস্থান করা খান্নাসটি হতে মুক্তি পাবার আশায় ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় বিরাট ধৈর্যধারণ করে দিনের পর দিন ধ্যানসাধনায় রত থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন অথবা নিহত হয়েছেন। তাদেরই জন্য এই আয়াতে আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাই সর্বশেষে আল্লাহ বলছেন যে তিনি সব কিছু জানেন এবং বিরাট ধৈর্যশালী। এই বিরাট ধৈর্যশীল আল্লাহ পাকের গুণে যদি কেহ গুণাবিত হতে চায় তা হলে তাকেও ধৈর্যশীল হতে হবে এবং আল্লাহর পথের মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহর রহমত কামনা করতে হবে।

৬০. ওইটা (জালিকা) এবং (ওয়া) যে (মান্) প্রতিশোধ লইবে (আকাবা) মিসালের সহিত (বিমিসলি) যাহা (মা) নিপীড়ন করা হইয়াছে (উকিবা)

তাহার প্রতি (বিহি) ইহার পর (সুম্মা) বাড়াবাড়ি (অতিরিক্ত) করা হইয়াছে (বুগিয়া) তাহার উপর (আলাইহি) অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন (লাইয়ানসুরান্নাহ) আল্লাহ (আল্লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই কলুষ (পাপ)-মোচনকারী (লাআফুয়ান) গফুর (ক্লামাশীল) (গাফুর)।

ওইটা এবং যে সমতুল্য প্রতিশোধ লইবে যাহা তাহার প্রতি নিপীড়ন (উৎপীড়ন, নিগ্রহ, কষ্টদান, দলন) করা হইয়াছে ইহার পর তাহার উপর বাড়াবাড়ি (আতিশয্য, আধিক্য, সীমালঙ্ঘন) আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই কলুষমোচনকারী, ক্লামাশীল।

৬১. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিআন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) ভিতরে গমন করান (প্রবেশ করান) (ইউলিজু) রাত্রিকে (রজনীকে, যামিনীকে) (লাইলা) মধ্যে (ফি) দিনের (নাহারি) এবং (ওয়া) প্রবেশ করান (ইউলিজু) দিনকে (নাহারি) মধ্যে (ফি) রাতের (লাইলি) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) শোনে (সামিউন) দেখেন (বাসিরুন)।

ওইটা এই জন্য যে আল্লাহ প্রবেশ করান রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং প্রবেশ করান দিনকে রাত্রির মধ্যে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনে, দেখেন।

৬২. ওইটা (জালিকা) এই জন্য যে (বিআন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) একমাত্র তিনিই (হয়াল) সত্য (হাক্কু) এবং (ওয়া) যে (আন্না) যাহা (মা) তাহারা ডাকে (ইয়াদ্উনা) হইতে (মিন্) তাহাকে ছাড়া (দুনিহি) তাহা (হয়াল) বাতিল (বাতিলু) এবং (ওয়া) যে (আন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) একমাত্র তিনিই (হয়াল) উঁচু (আলিউল) একমাত্র বড় (কাবির)।

ওইটা এই জন্যই যে তিনি আল্লাহ একমাত্র সত্য এবং যে যাহা তাহারা ডাকে তাহাকে ছাড়া তাহা বাতিল এবং যে আল্লাহ একমাত্র তিনিই উঁচু, একমাত্র বড়।

এই আয়াতে ‘মিন্’ তথা হইতে শব্দটিকে বাক্যের মধ্যে আনতে পারলাম না। তাই পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখলাম এ জন্য যে হবহ অনুবাদ করতে গেলে খুব কষ্ট এবং পরিশ্রম করতে হয়, তারপরেও ‘মিন্’ শব্দটিকে বাক্যের কোথাও মিলিয়ে নিতে পারলাম না এ জন্য পাঠকদের কাছে ক্লামাপ্রার্থী।

৬৩. আপনি কি দেখেন না (আলামতারা) যে (আননা) আল্লাহ (-
ল্লাহা) নাজেল করেন (বর্ষণ করেন) (আনজালা) হইতে (মিন) আকাশ
(সাম্মায়ি) পানি (মায়ান) সুতরাং হইয়া উঠে (ফাতুস্বিহ) মাটি (জমিন, দেহ,
পৃথিবী) (আরদু) সবুজশ্যামল (মুখদোররাতান) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-
ল্লাহা) পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনকারী (সুন্ধদর্শী) (লাতিফুন) সম্যক অবহিত (খুব
ভালো জানেন, পরিজ্ঞাত) (খাবির)।

আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ আকাশ হইতে বর্ষণ করেন পানি, সুতরাং
মাটি সবুজ-শ্যামল হইয়া ওঠে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনকারী,
সম্যক অবহিত।

৬৪. তাঁহারই (আল্লাহর) জন্য (লাহ) যাহা কিছু (মা) মধ্যে (ফি)
আকাশগুলি (সাম্মাওয়াতি) এবং (ওয়া) যাহা কিছু (মা) মধ্যে (ফি) মাটিতে
(জমিনে, পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) এবং (ওয়া) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-
ল্লাহা) অবশ্যই তিনি (লাহয়া) ধনী (অভাবমুক্ত) (গানি) একমাত্র প্রশংসিত
(হামিদ্)।

তাঁহারই জন্য জমিনের মধ্যে যাহা এবং আকাশগুলির মধ্যে যাহা (আছে)
এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই ধনী, একমাত্র প্রশংসিত।

৬৫. আপনি কি দেখেন নাই (আলামতারা) যে (আন) আল্লাহ (আল্লাহা)
অধীন (আয়ত্ত, বশীভূত, আশ্রিত, বাধ্য, অন্তর্ভুক্ত) করিয়া দিয়াছেন
(সাখ্খারা) তোমাদের জন্য (লাকুম) যাহা (মা) মধ্যে (ফি) মাটিতে (জমিনে,
পৃথিবীতে, দেহে) (আরদি) এবং (ওয়া) নৌকাগুলি (ফুলকা) চলাচল করে
(তাজরি) মধ্যে (ফি) সাগরে (সমুদ্রে) (বাহরি) তাহার হকুমে (বিআম্মরিহ)
এবং (ওয়া) তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন (ইউম্মসিকুস) আকাশকে (সাম্মাতা) যে
(আন) পতিত হয় (তাকাতা) উপর (আলা) মাটিতে (পৃথিবীতে, জমিনে,
দেহে) (আরদি) একমাত্র (ইল্লা) তাহার হকুমে (বিইজ্জনিহি) নিশ্চয়ই
(ইন্না) আল্লাহ (আল্লাহা) মানুষের সহিত (বিন্নাসি) করুণাশীল (দয়াদ্দ,
দয়াপরবশ) (লারাউফুর) পরম দয়ালু (দয়াবান, মেহেরবান) (রাহিম)।

আপনি কি দেখেন নাই যে আল্লাহ জমিনের মধ্যে যাহা (আছে) তোমাদের
জন্য অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই হকুমে সাগরের মধ্যে নৌকাগুলি

চলাচল করে এবং আকাশকে তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন জমিনের উপর পতিত (না) হয় একমাত্র তাঁহার হুকুম (ছাড়া) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষদের উপর করুণাশীল, রহিম।

এ আয়াতে একটি স্থানে আসমান পতিত হওয়াটিকে অনেক তফসিরকারকই ‘বৃষ্টি পড়া’ বলেছেন এবং বিশ্ববিখ্যাত কোরান-এর তফসির-লিখক হজরত আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি দ্য হোলি কোরান নামক ইংরেজি ভাষায় রচিত তফসিরেও আকাশ হতে বৃষ্টি পড়ার কথাটি বলেছেন। অধম লিখকেরও মনে হয়, ইহাই সঠিক, কিন্তু যেহেতু হবহ অনুবাদ করতে হচ্ছে তাই নিরুপায় হয়ে আকাশ হতে বৃষ্টি পড়ার কথাটি লিখতে পারলাম না।

৬৬. এবং (ওয়া) তিনিই (হয়াল) যিনি (লাজি) জীবন দিয়াছেন (আহুঁয়া) তোমাদেরকে (কুম) ইহার পর (সুম্মা) মৃত্যু দিবেন (ইউম্মিতু) তোমাদেরকে (কুম) ইহার পর (সুম্মা) তোমাদের পুনরায় জীবিত করিবেন (ইউহুঁকুম) নিশ্চয়ই (ইননা) মানুষ (ইনসানা) অবশ্যই বড় অকৃতজ্ঞ (লাকাফুর)।

এবং তিনিই যিনি জীবন দিয়াছেন তোমাদেরকে ইহার পর তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন ইহার পর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করিবেন, নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই বড় অকৃতজ্ঞ।

এই আয়াতটিকে পুনর্জন্মবাদের একটি নির্ভেজাল স্পষ্ট দলিল বলে মনে করতে চাই। কারণ ‘সাত্বাত’ নামক কেয়ামতটি মৃত্যু-ঘটনা ঘটান পরপরই পুনরায় জীবিত করা হবে, এই কথাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সার্বিক কেয়ামতের ঘটনাটি ঘটবার আগের কথাটি বলা হয়ে থাকে। ‘সাত্বাত’ নামক মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটবার পরপরই যে পুনরায় জীবিত করা হবে ইহাই এই আয়াতের আসল কথা। কিন্তু অন্যান্য ধর্মদর্শনের সঙ্গে মিলে যায় বলে ইহাকে নানা রকম যুক্তিতর্ক দাঁড় করিয়ে পুনরায় জীবন দান করার কথাটিকে সার্বিক কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা বলা হয়ে থাকে। আসলে ইহা মোটেই সঠিক বলে মনে করতে চাই না। কারণ আল্লাহর সৃষ্টিজগত আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, এই সৃষ্টিজগতের বয়স কম-সে-কম সাড়ে তিন হাজার কোটি বছর হবে। এই সাড়ে তিন হাজার কোটি বছরেও সার্বিক

কেয়ামতের ঘটনা আমরা দেখতে পাই নি, অথচ সাআত নামক মৃত্যু-ঘটনার কেয়ামতটিকে মনের অজান্তে সার্বিক কেয়ামতের সামনে এনে সবাইকে তথা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবগুলো মানুষকে একত্রিত করে উঠানোর কথাটি বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মে পুনর্জন্মবাদের কথাটি বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক গবেষক এই পুনর্জন্মবাদটিকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। আজ যে সকল গবেষক রাজি হচ্ছে না তারাই যদি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ধর্মে জন্মগ্রহণ করতো এবং ধর্ম-বিষয়ের উপর গবেষণা চালাতো তা হলে তাদের অবস্থানটি কেমন হতো? তাহলে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ধর্মে জন্মগ্রহণ করাটাই কি একটি আজন্ম মহাপাপ বলে ধরে নেব? আল্লাহ কোরান-এ, আমার জানা মতে, আটবার আটস্থানে বলেছেন যে, এমন কোনো জাতি, এমন কোনো কওম নাই যেখানে নবি-রসূল পাঠানো হয় নি, এবং সেই নবি-রসূলদের সেই জাতির, সেই কওমের ভাষায় আল্লাহর আয়াতসমূহকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেবার জন্য পাঠানো হয়েছে। তা হলে এত মতভেদ, এত শ্বেষ, এত কাদা ছোঁড়াছুড়ি, এত নোংরামির কুপমণ্ডুকতার বৃত্তে কেন আমরা একে অপরের উপর চড়াও হই? এই ঘণার দেয়াল আমাদেরকেই একত্র হয়ে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা চালাতে হবে। তবে এখানেও একটি মহা-কিন্তু থেকে যায়। সেই মহা-কিন্তুটির নাম হলো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে নি, ঘটে না এবং ঘটবেও না। সুতরাং কোনো সন্দেহ না রেখেই বলতে চাই যে, কোরান-এর এই আয়াতটিতে যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে তোমরা মারা যাবে, তোমাদেরকে জীবন দান করি এবং পরে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তারপর আবার জীবন দান করা হবে ॥ আসুন আমরা সবাই সব রকম সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সত্য উদ্ধারের গবেষণাটি চালিয়ে যাই। এই গবেষণার পেছনে প্রতি পদে পদে কুপমণ্ডুকতার আবর্জনা থাকবেই এবং এটাকেই সরিয়ে ধাপে ধাপে সার্বজনীন সত্যটিকে উদ্ধার করতে হবে এবং সত্যসাগরে অবগাহন করার সার্বজনীন আস্থানটি জানাতে হবে।

৬৭. প্রত্যেক জন্য (লিকুল্লি) উন্মত (জাতি, কওম, সম্প্রদায়) (উন্মাতিন) আমরা (আল্লাহ) রাখিয়া দেই (জাআল্না) এবাদতের নিয়ম (মান্‌সাকা) তাহারা (হম) সেই নিয়ম অনুসরণ করে

(নাসিকুহ) সুতরাং না (ফালা) আপনার (সাথে) তর্ক (ঝগড়া, বিতর্ক, কথা কাটাকাটি) করে (ইউনাজিউননাকা) মধ্যে (ফি) হকুম (আদেশ, নির্দেশ) (আম্রি) এবং (ওয়া) আপনি ডাকুন (আদউ) দিকে (ইলা) আপনার রবের (রাব্বিকা) নিশ্চয়ই আপনি (ইননাকা) অবশ্যই উপর (লা আলা) পথের (হদাম) সঠিক (মুস্তাকিম)।

প্রত্যেক কণ্ঠের জন্য আমরা (আল্লাহ) রাখিয়া দিয়াছি এবাদতের নিয়ম, তাহারা সেই নিয়ম অনুসরণ করে, সুতরাং আপনার (সঙ্গে) তর্ক না করে এই হকুমের মধ্যে এবং আপনি ডাকুন আপনার রবের দিকে, নিশ্চয়ই আপনি সঠিক পথের উপর অবশ্যই (আছেন)।

এই আয়াতে আমরা জানতে পারলাম যে প্রত্যেক কণ্ঠের মধ্যে এবাদত-বন্ধেগির একেক রকম নিয়ম-পদ্ধতি চালু আছে। এই নিয়ম-পদ্ধতিগুলো নবী-রসুলেরাই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং শিখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক এবাদতের নিয়মকানুনগুলো ভিন্নভিন্ন হতে বাধ্য, কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে নিয়মকানুনগুলি ভিন্নভিন্ন হতে বাধ্য। এবাদতের নিয়মকানুন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাটা বৃথা। তাই ‘আপনি আপনার রবের দিকে’ ডাকুন, কারণ আপনি সঠিক পথের উপর অবশ্যই অবস্থান করছেন। এই সঠিক পথটি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? আল্লাহর নৈকট্য লাভের যে পথটি সঠিক সেই পথেই তো আপনি যাচ্ছেন।

৬৮. এবং (ওয়া) যদি (ইন) আপনার সাথে তাহারা তর্ক করে (জাদালুকা) সুতরাং বলুন (ফাকুলি) আল্লাহ (-ল্লাহ) জানেন (আলামু) যাহা কিছু (বিদ্মা) তোমরা কাজ করিতেছ (তাম্মালুন)।

এবং আপনার সাথে যদি তাহারা তর্ক করে, সুতরাং বলুন আল্লাহ জানেন যাহা কিছু তোমরা করিতেছ।

৬৯. আল্লাহ (আল্লাহ) ফয়সালা করিয়া দিবেন (মীমাংসা করিয়া দিবেন) (ইয়াহকুমু) তোমাদের মধ্যে (বাইনাকুম) দিনে (ইয়াওমাল) কেয়ামতের (কিয়ামতি) সেই বিষয়ে (ফিমা) তোমরা ছিলে (কুনতুম) ইহার মধ্যে (ফিহি) মতভেদ করিতে (তাখতালিফুন)।

কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন সেই বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে তোমরা ইহার মধ্যে।

৭০. নাকি (আলাম) আপনি জানেন (তালাম) যে (আননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) জানেন (ইয়ালামু) যাহা (মা) মধ্যে (ফি) আকাশে (সাম্মায়ি) এবং (ওয়া) জমিনে (পৃথিবীতে, মাটিতে, দেহে) (আরদি) নিশ্চয়ই (ইন্না) ওইটা (জালিকা) মধ্যে (ফি) কিতাবে (কিতাবিন্) নিশ্চয়ই (ইন্না) ওইটা (জালিকা) উপরে (আলা) আল্লাহ (-ল্লাহি) সহজ (ইয়াসির)।

আপনি কি জানেন না যে আল্লাহ জানেন জমিনে এবং আকাশের মধ্যে যাহা কিছু (আছে) নিশ্চয়ই ওইটা কিতাবের মধ্যে, নিশ্চয়ই ওইটা আল্লাহর উপরে সহজ।

এই আয়াতে প্রথমেই একটি রহস্যময় কথা আল্লাহ এই বলে তুলে ধরেছেন যে, ‘আপনি কি জানেন না?’ এই প্রশ্নটি মহানবিকে এ জন্যই করা হয়েছে যে তিনিও আল্লাহর গোপন ভেদরহস্যগুলো ভালো করেই জানেন। এই ছোট্ট বাক্যটিতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মহানবি এলম্মে গায়েব জানেন। আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিনের সব কিছু জানা তো একটি মামুলি ব্যাপার, বরং তার উপরেও যাহা কিছু আছে উহাও তিনি জানেন। তাই আল্লাহ বলছেন, ওইটা কিতাবের মধ্যেই আছে এবং ওইটা যে একদম সহজ বিষয় আল্লাহর উপর, ইহাও সহজে বোঝা যায়। তবে ‘কিতাব’ শব্দটি এই আয়াতে একটি অতীব রহস্যময় বিষয়। ইহা কি কাগজ-কালিতে লেখা কিতাব, নাকি আল্লাহর সিফাতের প্রকাশমান অবিরাম ছুটে চলার বিকাশ এবং প্রকাশের ধারাটিকেই কিতাব বলা হয়েছে? ইহা জানতে হলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী-রচিত কোরান দর্শন নামে কোরান-এর তিন খণ্ডের তফসিরটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

৭১. এবং (ওয়া) তাহারা এবাদত করে (ইয়াবুদুনা) হইতে (মিন্) পরিবর্তে (দুনি) আল্লাহ (-ল্লাহি) যাহা (মা) নাই (লাম্) নাজেল করেন (ইউনাজ্জিল্) এই বিষয়ের (বিহি) দলিল (সুলতোয়ানাও) এবং (ওয়া) যাহা (মা) নাই (লাইসা) তাহাদের কাছে (লাহম্) সেই বিষয়ে (বিহি) জ্ঞান (ইল্মুন) এবং

(ওয়া) নাই (মা) জালিমদের জন্য (লিজ্জোয়ালিমিনা) হইতে (মিন) সাহায্যকারী (নাসির)।

এবং তাহারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে, যাহা নাজেল করেন নাই এই বিষয়ের দলিল এবং যাহা নাই তাহাদের কাছে এই বিষয়ে জ্ঞান এবং জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই।

৭২. এবং (ওয়া) যখন (ইজা) তেলাওয়াত করা হয় (তুতলা) তাহাদের নিকট (আলাইহিম) আমাদের (আল্লাহ) আয়াতগুলি (আয়াতুনা) সুস্পষ্ট (বাইয়িনাতিন) আপনি খেয়াল (লক্ষ্য) করিবেন (তারিফু) মধ্যে (ফি) মুখমণ্ডলগুলিতে (উজুহি) যাহারা (লাজিনা) কাফেরদের (কাফারু) অস্বীকার (অসন্তোষ, ঘণাভাব) (মুনকারা) মনে হয় (ইয়াকাদুনা) তাহারা আক্রমণ করিবে (ইয়াসতুনা) যাহারা সহিত (বিল্লাজিনা) তেলাওয়াত করে (ইয়াতলুনা) তাহাদের নিকট (আলাইহিম) আমাদের আয়াতগুলি (আয়াতিনা) বলুন (কুল) তবে কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব (আফাউনাববিউকুম) মন্দ (নিকৃষ্ট) কিছু সম্পর্কে (বিশাররিম) হইতে (মিন) তোমাদেরকে ওইটার (জালিকুম) আগুন (আননারু) ওই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (ওয়াদাহা) আল্লাহ (-ল্লাহ) যাহারা (আল্লাজিনা) কুফরি করিয়াছে (কাফারু) এবং (ওয়া) কত নিকৃষ্ট (বিসা) গন্তব্যস্থল (প্রত্যাবর্তনস্থল) (নাসির)।

এবং তাহাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয় যখন আমাদের (আল্লাহর) সুস্পষ্ট আয়াতগুলিকে আপনি খেয়াল করিবেন মুখমণ্ডলগুলির মধ্যে যাহারা কাফের অস্বীকার করে মনে হয় যেন তাহারা আক্রমণ করিবে যাহারা তেলাওয়াত করে আমাদের (আল্লাহর) আয়াতগুলি তাহাদের নিকট বলুন, ‘তবে কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব মন্দ কিছু সম্পর্কে ওইটা হইতে আগুন ওই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন আল্লাহ যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।’

৭৩. হে (ইয়াআইউহান) মানুষেরা (নাসু) সম্মুখে স্থাপন (দাখিল, নিবেদন, পেশ) করা হইতেছে (দুরিবা) একটি উপমা (সাদৃশ্য, তুলনা) (মাসালুন) সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়া শোনো (ফাসতামিউ) ইহার প্রতি

(লাহ) নিশ্চয়ই (ইন্নাল) যাহাদেরকে (লাজিনা) তোমরা ডাকিতেছ (তাদউনা) হইতে (মিন) পরিবর্তে (দুনিল) আল্লাহর (-লাহি) কখনই নয় (লান) তাহারা সৃষ্টি করিতে পারে (ইয়াখলুকু) একটি মাছি (জুবাবাউ) এবং (ওয়া) যদি (লাও) তাহারা একত্রিত হয় (ইজ্জামাউ) সেই জন্য (লাহ) এবং (ওয়া) তাহাদের হইতে ছিনাইয়া লয় (ইয়াসলুবহমুজ্জ) মাছি (জুবাবু) কোনো কিছুই (শাইয়া) না (লা) তাহা উদ্ধার (পরিদ্রাণ, নিষ্কৃতি, উত্তোলন) (ইয়াস্তানকিজুহ) তাহা হইতে (মিনহ) রুগণ (দুর্বল, হীনবল, শক্তিহীন, ক্লীণ) (দাউফা) প্রার্থী (যাচক, প্রার্থনাকারী) (তালিব) এবং (ওয়া) যাহার কাছে প্রার্থনা করা হয় (মাতলুব)।

হে মানুষেরা, একটি উপমা সামনে ধরা হইতেছে, সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়া শোনো ইহার প্রতি, নিশ্চয়ই যাহাদেরকে তোমরা ডাকিতেছ হইতে আল্লাহর পরিবর্তে তাহারা কখনই সৃষ্টি করিতে পারে না একটি মাছি এবং যদি তাহারা সেই জন্য একত্রিত হয় এবং যদি তাহাদের হইতে মাছি ছিনাইয়া লয় ইহা হইতে কোনো কিছুই উদ্ধার করিতে পারিবে না, দুর্বল প্রার্থী এবং যাহার কাছে চাওয়া হয় (সে-ও দুর্বল)।

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আপন কলুষিত প্রবৃত্তির দ্বারা যে সব মূর্তি মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে এবং এমনকি স্বর্ণ দিয়ে ॥ গরুর বাছুরের মতো স্বর্ণের বাছুর বানিয়ে, পূজা করা হয়, তাদের ভালো-মন্দ করার কোনোই ক্ষমতা নাই। সুতরাং এরা দুর্বল। এদের না আছে সাহায্য করার ক্ষমতা আর না আছে সাহায্যপ্রার্থীর প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা। একটি মাটির পাত্র অথবা স্বর্ণের মূর্তির কোনো ক্ষমতাই নাই, এমনকি একটি অতিক্রুদ্ধ মাছিও যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবু না। মানুষ জীবাত্মার অধিকারী এবং সেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মাও নিকটেই অবস্থান করেন। যদি জীবাত্মার অধিকারী মানুষ ধ্যানসাধনার মাধ্যমে পরমাত্মার রূপরূপটিকে জাগ্রত করে ফেলতে পারে তবে সেই রূহরূপী পরমাত্মাই কর্ম করেন, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে উহা জীবাত্মার অধিকারী মানুষই করছে। তাই যার কাজ তিনিই করে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে হবে জীবাত্মার অধিকারী মানুষই করে যাচ্ছে। এই সূক্ষ্ম দর্শনটি অনেকেই বুঝতে

না পেরে বিদ্রাষ্ট্রির মধ্যে পড়ে যায় এবং এটাসেটা লিখে মানুষকে বিদ্রাষ্ট্র করে। সুতরাং সে নিজেও বিদ্রাষ্ট্র এবং তার লিখনীও বিদ্রাষ্ট্রিতে ভরা থাকে।

৭৪. না (মা) মর্যাদা দেওয়া (কাদারু) আল্লাহর (-ল্লাহা) সত্য (হাককা) তাহার মর্যাদা (কাদরিহি) নিশ্চয়ই (ইন্না) আল্লাহ (-ল্লাহা) অবশ্যই ক্রমতাবান (শক্তিমান, মহাশক্তিধর) (লাকাইউন্) মহাপরাক্রমশালী (পরাক্রমযুক্ত, মহাবলশালী, মহাতেজী, মহাবীরত্বপূর্ণ) (আজিজ)।

উহারা আল্লাহর মর্যাদা দিল না, হক্ মর্যাদা তাঁহার, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবশ্যই ক্রমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।

হক্ মর্যাদাবান এবং মহাপরাক্রমশালী যে একমাত্র আল্লাহ, উহা এই জাতীয় লোকেরা বোঝেও না এবং বুঝবার চেষ্টাও করে না। এই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ মানুষের জীবনরগের নিকটেই ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে অবস্থান করার কথাটি কোরান-এ অন্যত্র ঘোষণা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী হয়েও ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে প্রতিটি মানুষের জীবনরগের নিকটেই যে অবস্থান করার কথাটি কোরান-এর অন্যত্র ঘোষণা করেছেন ইহা একটি মহাবিস্ময়কর মহাবিজ্ঞানময় ঘোষণা। কারণ এই ক্ষুদ্র মানুষ জীবাত্মার অধিকারী, তার উপর পরীক্ষা করার উদ্দেশে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জাল্লা শানাহ ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছেন এই আল্লাহর ঘোষণাটি একটি মহাবিস্ময়কর ঘোষণা একটি মহাচমকানো চমকিয়ে দেবার ঘোষণা। এইখানেই তাঁর বিজ্ঞানময় ওয়াহাদানিয়াতের পরিচয়টি ফুটে ওঠে। তৌহিদের মহারহস্যের ঢাকনাগুলো খুলে যায়। জীবাত্মার অধিকারী সাধকেরা তখন চমকে উঠে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে পায়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জাল্লা শানাহর লীলাখেলাই চলছে। এই মহাবিস্ময়কর বিষয়টি একমাত্র তারাই বুঝতে পারে যারা আল্লাহকে পাবার জন্য ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদায় বছরের পর বছর ভুবে থাকে, যারা যোগী তথা দায়েমি সালাত পালনকারী; অন্যথায় বইপড়া বিদ্যাওয়ালা অথবা বড় বড় ডিগ্রিধারীরা এই রহস্যের ধারেকাছেও যেতে পারে না। তাই অনুমান আর আন্দাজের কত রকম রঙ্গিলা ঢিল ঝুঁড়তে থাকে আর সেই ঢিলের আঘাতে অনেকেই জর্জরিত হয়ে

বিদ্রাস্ত হতে বাধ্য হয়। দ্য স্পিরিট অব ইসলাম এবং দ্য হিন্ডু অব স্যারাসিন্স-এর রচয়িতা শ্রদ্ধেয় বিখ্যাত আমির আলি সাহেব এই রহস্যময় জ্ঞানের ধারেকাছেও যেতে পারেন নি, তাই সুফিবাদের উপর যা-তা মন্তব্য করে গেছেন। যদিও সৈয়দ আমির আলি একজন শিয়া ফেরকার অনুসারী, কিন্তু নিরপেক্ষতার ভান করে শিয়াদের মতাদর্শই প্রচার করে গেলেন এবং সুফিবাদকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। দুনিয়ার বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্মানিত হতে পারেন, কিন্তু সুফিবাদের মানদণ্ডে তাঁর মর্যাদা কতটুকু তা আল্লাহই ভালো করে জানেন এবং সাধকেরাও সৈয়দ আমির আলিকে বোকার স্বর্গে বাস করা কান্ডিময় অতিথি মনে করে।

৭৫. আল্লাহ (আল্লাহ) মনোনীত করেন (ইয়াস্তাফি) মধ্য হইতে (মিনাল) ফেরেশতাদের (মালাইকাতি) রসুল (রসুলান) এবং (ওয়া) মধ্য হইতে (মিনান) মানুষদের (নাসি) নিশ্চয়ই (ইননা) আল্লাহ (-ল্লাহা) শোনে (সামিউন) দেখেন (বাসিরুন)।

আল্লাহ মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য হইতে রসুল এবং মানুষদের মধ্য হইতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শোনে, দেখেন।

যদিও এই আয়াতটি আয়তনের প্রশ্নে ছোট, কিন্তু নীতিনির্ধারণের প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। কারণ এই আয়াতে স্পষ্ট আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ মনোনীত করেন ফেরেশতাদের থেকেও রসুল এবং তারপরে বলা হলো, মানুষদের থেকেও রসুল মনোনীত করা হয়। ফেরেশতাদের থেকে রসুল মনোনীত করার কথাটি কোরান-এর অন্যত্র কয়েকবার দেখতে পাই। ফেরেশতারা আল্লাহর সেফাতি নুরে তথা গুণবাচক নুরে তৈরি এবং ফেরেশতাদেরকে নফস তথা জীবাত্মা এবং রুহ তথা পরমাত্মা ॥ এই দুইটির একটিও আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয় নি। সুতরাং ফেরেশতাদের কোনো নিজস্ব সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা যতই সেফাতি নুরে তৈরি হোক না কেন এবং যত বড় ক্ষমতাই আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু ফেরেশতাদেরকে কোরান-এর একটি আয়াতেও ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় নি, বরং মানবজাতির প্রত্যেক এবং পরোক্ষভাবে সেবা করার জন্যই বানানো হয়েছে। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ ফেরেশতাদের নাম

উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভাবে গদগদ হয়ে পড়ি, কিন্তু একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখতে পাই যে সকল ফেরেশতাকেই মানুষের খেদমতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং ফেরেশতাদের আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হবার প্রশ্নই ওঠে না। ফেরেশতাদের মন্দ কর্ম করার কোনো প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, তাই ফেরেশতাদের দ্বারা কোনো মন্দ কর্ম করার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমরা এই আয়াতে দেখতে পাই যে আল্লাহ প্রথমেই বলছেন যে, তিনি ফেরেশতাদের মধ্য হতে রসূল মনোনীত করেন। তারপর বলা হয়েছে, মানবজাতি হতেও রসূল মনোনীত করা হয়। একটু খেয়াল করে দেখুন তো, কোরান-এর কোনো একটি আয়াতেও ফেরেশতাদের থেকে নবি মনোনীত করার কথাটি আছে কি না। না, নাই। নবি মনোনীত করার প্রশ্নে ফেরেশতাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানবজাতি হতে নবি মনোনীত করার কথাটি পাই। সুতরাং নবির মর্যাদা রসূলের মর্যাদা হতে উপরে। এই সোজা কথাটির মধ্যে অনেকেই এটাসেটা বলে এবং ব্যাখ্যা দিয়ে রসূলকে নবি হতে বেশি মর্যাদা দেবার কথাটি দেখতে পাই। ইহা একটি অনিচ্ছাকৃত মারাত্মক ভুল। এই ভুল শিকার দরুন সহজ-সরল মানুষগুলো বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। যদি মানুষ হতে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি হয়ে থাকে তা হলে কোনো সন্দেহ নাই যে রসূলই নবির চেয়ে মর্যাদার প্রশ্নে বড়। কিন্তু মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। ফেরেশতাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অনেক গবেষকদের কিছু কিছু ভুলের খেসারত আমরা দিয়ে চলছি। যেমন কোরান যেখানে ‘আম্মানু’ তথা ইম্মানদার বলছে সেখানে অনুবাদক আম্মানুকে ‘মোমিন’ লিখে ফেলেন। কেন? আল্লাহ কি আম্মানুর সাথে মোমিন বলতে পারতেন না? কোরান খুলে দেখুন, আম্মানুর মর্যাদা কোথায় আর মোমিনের মর্যাদা কোথায়। এই রকম ভুলগুলো আমাদেরকে সত্য উঁচু ঘাটনের প্রশ্নে বিব্রত করে ছাড়ে।

৭৬. তিনি জানেন (ইয়ালাম্মু) যাহা (মা) মধ্যে (বাইনা) তাহাদের (আইদিহিম) এবং (ওয়া) যাহা (মা) তাহাদের পিছনে (খাল্ফাহম) এবং

(ওয়া) আল্লাহর দিকে (ইল্লাল্লাহি) ফিরিয়া আসিতে হয় (প্রত্যাবর্তিত হয়) (তুরজাউ) সব বিষয়ে (সব ব্যাপারে, সব ঘটনায়) (উম্মুর)।

তিনি জানেন যাহা তাহাদের মধ্যে এবং যাহা তাহাদের পিছনে (আছে) এবং সব বিষয়ে আল্লাহরই দিকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

৭৭. হে (ওহে) (ইয়াআইউহাল) যাহারা (লাজিনা) ইমান আনিয়াছ (আম্মানু) রুকু করো (আরকাউ) এবং (ওয়া) সেজদা করো (আসজুদু) এবং (ওয়া) এবাদত করো (বুদু) তোমাদের রব (রাব্বাকুম) এবং (ওয়া) তোমরা করো (আফআলু) ভালো কাজ (খাইরা) যাহাতে তোমরা (লাআল্লাকুম) সফলতা লাভ করিতে পারো (সফলকাম হইতে পারো) (তুফলিহন)।

ওহে যাহারা ইমান আনিয়াছ, রুকু করো এবং সেজদা করো এবং এবাদত করো তোমাদের রবের এবং তোমরা করো ভালো কাজ যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৭৮. এবং (ওয়া) জেহাদ করো (জাহিদু) আল্লাহর মধ্যে (ফিল্লাহি) সত্য (হাক্কা) তাহার জেহাদ (জিহাদিহি) তিনি (হয়া) তোমাদেরকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন (আস্তাবাকুম) এবং (ওয়া) না (মা) অর্পণ করিয়াছেন (জাআলা) তোমাদের উপর (আলাইকুম) মধ্যে (ফি) দ্বীনের (দ্বীনি) হইতে (মিন) সক্ষীর্ণতা (হারাজিন) মিল্লাতে (মিল্লাতা) তোমাদের বাবা (আবিকুম) ইব্রাহিমের (ইব্রাহিমা) তিনি (হয়া) তোমাদের নাম দিয়াছেন (সাম্মাকুম) মুসলিম (মুসলিমিনা) হইতে (মিন) আগেও (কাবলু) এবং (ওয়া) মধ্যে (ফি) এই (হাজা) হয় যেন (লিয়াকুনা) রাসুল (রাসুলু) সাক্কী (শাহিদান) তোমাদের উপর (আলাইকুম) এবং (ওয়া) তোমরা হও (তাকুনু) সাক্কী (শুহাদায়া) উপর (আলা) মানুষদের (নাসি) সুতরাং কায়েম করো (ফাআকিমুস) সালাত (সালাতা) এবং (ওয়া) দাও (আতুজ্জ) জাকাত (জাকাতা) এবং (ওয়া) আঁকড়াইয়া ধরো (তাসিমু) আল্লাহর সহিত (বিল্লাহি) তিনিই (হয়া) তোমাদের মাওলা (মাওলাকুম) সুতরাং কত ভালো (ফানিমা) মাওলা (মাওলা) এবং (ওয়া) কত ভালো (নিমা) সাহায্যকারী (নাসির)।

এবং জেহাদ করো আল্লাহর মধ্যে তাঁহার হক জেহাদ। তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন এবং দ্বীনের মধ্যে তোমাদের উপর

হইতে কঠোরতা (সকীর্ণতা) আরোপ করেন নাই। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতে তিনি তোমাদের নাম দিয়াছেন মুসলিম পূর্ব হইতে এবং তোমাদের উপর সাক্ষী হন রসূল ইহার (কোরান-এর) মধ্যে মানবজাতির উপর তোমরাও সাক্ষী হও সুতরাং কায়েম করো সালাত এবং দাও জাকাত এবং আঁকড়াইয়া ধরো আল্লাহকে তিনিই তোমাদের মাওলা সুতরাং কত উত্তম মাওলা এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

র এই আয়াতে প্রথমেই আল্লাহর পথে জেহাদ করতে বলা হয়েছে এবং এই জেহাদটিকে বলা হয়েছে হক জেহাদ তথা সত্য জেহাদ। এই জেহাদ তরবারি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার জেহাদ নয়, এই জেহাদ মানুষ হত্যা করার বন্ধুক কাঁধে নিয়ে ঘোরাঘুরির জেহাদ নয়, এই জেহাদ আপন নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষার উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেবার জেহাদ, উহাকে মুসলমান বানাবার জেহাদ। এখানে আল্লাহর পথে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহকে পাবার পথে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তিগুলো সামনে এসে দাঁড়ায় উহাকে পরাভূত করে সত্যের মধ্যে ডুবে যাবার জেহাদ। তাই এখানে ‘ফি’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘ফি’-র অর্থ হলো মধ্যে, তারপরের শব্দটি আল্লাহ, সুতরাং আল্লাহর মধ্যে বলা হয়েছে। আবার ‘হাক্কা’ শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। ‘হাক্কা’ শব্দটির অর্থ হলো নিরোট সত্য। ইহা কোনো বৈষয়িক বিষয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারার জেহাদ নয়। বৈষয়িক বিষয়ের মারামারি- কাটাকাটিকে মোটেও জেহাদ বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে যুদ্ধ। জেহাদ এবং যুদ্ধের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই ব্যবধানটুকুর কারণেই পিতা ইব্রাহিমের দেওয়া মুসলিম নামকরণটিকে কলঙ্কিত করে যুগে যুগে, কালে কালে ॥ মুসলমান নাম ধারণ করেই ॥ মুসলমানে মুসলমানে অনেক অনেক করুণ নৃশংস যুদ্ধ ঘটে গেছে। ইতিহাস হতে জানতে পারি যে, একই মুসলমান নামধারী একদল যখন অপর দলকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছে তখন সেই দলের নিরীহ মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি বিশ্বয়ে অবাক হতে হয় যখন ইতিহাসের পাতায় পড়তে হয় যে নিরীহ মুসলমানদেরকে অপর মুসলমানেরা কেবল হত্যাই করে নি, বরং কবর হতে অর্ধগলিত লাশগুলোকে উঠিয়ে

জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেহাদের নামে কী জঘন্য এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডগুলিই না করা হয়েছে! ইচ্ছা করেই সেইসব মুসলমানদের নামগুলো পাঠকদেরকে জানিয়ে দিলাম না। আশা করি ইসলামের ইতিহাসের উপর রচিত বড় বড় গ্রন্থগুলো পড়লেই হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, টের পাবেন মুসলমান নাম ধারণ করে এদের বর্বরতার বীভৎস চিত্র। মুসলমান হয়ে মুসলমান খুন করার দানবীয় অট্টহাসি। মুসলমান হয়ে মুসলমানের মস্তক ছিন্ন করার সময়ে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিয়ে উল্লাস প্রকাশের দৃশ্যগুলো। তাই আজ মুসলমানদের অবস্থানটি কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে তা পাঠকই বিচার করবেন। অথচ এই আয়াতে পরে বলা হলো যে আল্লাহর দ্বীনের উপর কোনো প্রকার সন্ধীর্ণতার স্থানই নাই, অথচ ইসলামের ইতিহাস পড়লেই দেখা যায় প্রতি পদে পদে, প্রতি ছত্রে ছত্রে সন্ধীর্ণতার বিকট দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোরান আমাদেরকে কী শিখাচ্ছেন আর আমরা কী শিখছি! কোরান-এ কত আশা করে আল্লাহ মুসলমানদেরকে মানবজাতির সাক্ষীরূপে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই তথাকথিত মুসলমান নামধারীরা কী জঘন্য সাক্ষী হয়ে আল্লাহর বাণীকে উপহাস করছে! তারপর এই আয়াতে বলা হয়েছে, এই মানবজাতির জন্য মুসলিম নামটির যদি সার্থকতা ফুটিয়ে তুলতে চাও তা হলে নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে আঁকড়িয়ে ধরো। তাহলে তো এদের নামাজ এবং এদের জাকাত আদায় এবং এদের আল্লাহকে আঁকড়িয়ে ধরার নমুনাগুলো কেমন তার বিচারের ভার পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম। সব শেষে এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তিনিই তোমাদের ম্যাওলা, সুতরাং কত উত্তম ম্যাওলা এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। দুনিয়ার আশিটি বছরের জীবনে লোভনীয় স্বার্থগুলো যখন মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মুখে মুখে আল্লাহকে উত্তম ম্যাওলা, উত্তম সাহায্যকারী বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এর পরিচয়টুকু সমাজ জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বা হচ্ছে তার বিচারের ভারটি পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম

